ফররুখ আহমদ

জীবন ও সাহিত্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ

ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০০
জুন ১৯৯৩

বা এ ২৮৩৩

পাণ্ডুলিপি
গবেষণা উপবিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা সংকলন ফোকলোর বিভাগ

মুদ্রক
আশফাক-উল-আলম
ব্যবস্থাপক
•বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
একশত পঁচাত্তর টাকা

ARRUKH AHMED :/JIBAN O SAHITYA by Abdul Manna
ed, published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesl
st edition : June 1993. Price : Taka 175.00 only.

ISBN 984-2822-3.

www.pathagar.com

উ ৎ স র্গ

সৈয়দা সালমা হোসেন
সৈয়দ এ. মঈদ
সৈয়দ এ. মোমিন
সৈয়দা নার্গিস আলী
সৈয়দা শিরিন কবির
সৈয়দ এ. মাবুদ
সৈয়দ এ. মাসুদ
সৈয়দা শাহীন মাহমুদ
সৈয়দ আহমদ মাসুম

আমার ভাইবোনদের জন্যে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪) এদেশের একজন প্রধান কবি। তাঁর রচনাশৈলী ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। দূরবিসর্পিত স্বপ্নলোকে কবি মানস-ভ্রমণ করেছেন। এই রোমান্টিকতার সঙ্গে ধ্রুপদী সাহিত্যরীতির মেলবন্ধন ঘটেছে ফররুখ-কাব্যে। আধুনিক বাংলা কবিতার আঙ্গিক ও ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে কবি ঐতিহ্যের নবরূপায়ন ঘটিয়েছেন তাঁর কাব্যে। কবির চার দশকের কবিতা-ধারায় অনেক স্তর-পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন তিনি পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন, তেমনি মুসলিম তাহজীব ও তমদ্দুনের কথা অপূর্ব শিল্পদক্ষতায় প্রকাশ করেছেন। মুসলিম রেনেসাঁর এই কবি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সর্ব স্তরেই ফররুখ একজন মানবতাবাদী কবি। আবার, কবিতার প্রকরণেও তিনি বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

কবি ফররুখ আহমদের ৭৫-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা একাডেমী আবদুল মান্নান সৈয়দের গবেষণামূলক এই গ্রন্থটি প্রকাশ করছে। ফররুখ আহমদের জীবন ও সাহিত্যকর্মের বহু মূল্যবান তথ্য লেখক সংযোজন করেছেন অনুসন্ধিৎসু গবেষকের নিষ্ঠা নিয়ে। ফররুখ আহমদের সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণেও তিনি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। এই গ্রন্থ রচনার জন্যে আবদুল মান্নান সৈয়দকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

এমন একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হবে ব'লে আমি আশা করি।

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ

মহাপরিচালক

বাংলা একাডেমী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূ চি প ত্র

প্রবেশক [নয়]

জী ব ন

১ জন্ম ও বংশপরিচয় ৩
২ শিক্ষাজীবন ৩
৩ সংসারজীবন ৪
৪ কর্মজীবন ৮
৫ সাহিত্যজীবন ১১
৬ সাময়িকপত্র সম্পাদনা ২৮
৭ চরিত্রবৈশিষ্ট্য ২৯
৮ শেষ জীবন, মৃত্যু, মৃত্যুত্তর প্রতিক্রিয়া ৩০

সা হি ত্য

১ সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত ৫১
২ প্রথম প্রকাশিত কবিতা ৬৩
৩ "সাত সাগরের মাঝি" ৬৯
৪ মন্বন্তরের কবি ৮৩
৫ রবীন্দ্রোত্তর কাব্যনাট্য ও "নৌফেল ও হাতেম" ৯৪
৬ একটি কাব্যনাট্য : দুই লেখন ১০৩
৭ 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' ১১১
৮ 'বন্দরে সন্ধ্যা' ১১৬

www.pathagar.com

৯ "হাতেম তা'য়ী" ১১৯
১০ 'বীভৎস নগরী' ১৪২
১১ শব্দ ১৪৯
১২ চিত্রকল্প ১৬৬
১৩ সনেট ১৭৩
১৪ ছোটোগল্প ১৮৪
১৫ জীবনদর্শন ও সাহিত্যবৈশিষ্ট্য ১৯৬

প রি শে ষ

১ জীবনপঞ্জি ২০৭
২ গ্রন্থপঞ্জি ২১৩
৩ সংকলনভুক্ত রচনাপঞ্জি ২৩৪
৪ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনাপঞ্জি ২৪০
৫ সমকালীন প্রতিক্রিয়া ২৬৩
৬ সাক্ষাৎকার : ফররুখ আহমদ ৩০৫
৭ পাণ্ডুলিপি ৩১২
৮ পত্রাবলি ৩২২

ত থ্য ও নি র্দে শি কা

প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জি ৩৫০
নির্দেশিকা ৩৬১

www.pathagar.com

প্র বে শ ক

১ : ইতিবৃত্ত

কলেজে উঠে, ষাটের দশকের সূচনামুহূর্তে, আধুনিক বাংলা কবিতার দুয়ার খুলে যায় আমার সামনে। আমি ছিলাম ঢাকা কলেজের ছাত্র। ঢাকা কলেজের প্রাচীন গ্রন্থাগারটি ছিলো অমূল্য রত্নে ভরা। লাইব্রেরি থেকে আক্ষরিক অর্থে ধূলিধূসর, যে-সব বই ইস্যুই হ'তো না প্রায়, সেইসব কবিতার বই আমাকে এক আশ্চর্য স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়। কী না ছিলো সেখানে। মোহিতলাল মজুমদারের "বিস্মরণী", জীবনানন্দ দাশের "ঝরা পালক", সুধীন্দ্রনাথ দত্তের "অর্কেস্ট্রা" ও "ক্রন্দসী", বিষ্ণু দে-র "চোরাবালি", অজিত দত্তের "কুসুমের মাস", বুদ্ধদেব বসুর "বন্দীর বন্দনা", প্রেমেন্দ্র মিত্রের "প্রথমা" — আধুনিক বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ বইগুলি ঠিক আমার চেতনার প্রথম উন্মীলনের মুহূর্তে প্রকৃতি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলো। এদিকে একই সময়ে বাড়িতে কাজী নজরুল ইসলামের "সঞ্চিতা"র সঙ্গে ছিলো ফররুখ আহমদের (১৯১৮–৭৪) দুটি বই : "সাত সাগরের মাঝি" ও "সিরাজাম মুনীরা"। এই বইদুটি বাড়িতে ছিলো আমার ভগ্নিপতি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, রকিব হোসেনের (১৯২৫–৮১) জন্যে। তিনি ছিলেন ঐ দুই গ্রন্থের প্রকাশক, 'তমদ্দুন প্রেসে'র মালিক তৈয়েবুর রহমানের (১৯২৫–৮৬) স্কুলের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই হিশেবেই বই দুটি তৈয়ব সাহেব তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। রকিব হোসেন সে-সময় আমেরিকা সফরে যাওয়ায়, আমার বড়ো বোন অধ্যাপিকা সালমা হোসেন আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। বইপত্রগুলিও ছিলো ঐ সূত্রেই। সে যাই হোক, আধুনিক প্রধান বাঙালি কবিদের সঙ্গে ফররুখ আহমদের "সাত সাগরের মাঝি"র অনেক কবিতাও আমার কণ্ঠস্থ হ'য়ে যায়। এবং আজো আমার ধারণা, কৈশোরক অবচেতনার প্রভাবেই কিনা জানি না, "সাত সাগরের মাঝি" ঐসব বইএরই তুল্য এক অসাধারণ কবিতাগ্রন্থ।

কয়েক বছরের মধ্যেই আমি সাহিত্যজগতে প্রবেশ করি, আমার লেখমালা এদিক-ওদিক ছাপা হ'তে থাকে। কবি হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২–৮৩) আমাকে কবি আবদুল গনি হাজারীর (১৯২৫–৭৬) সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন — হাজারী ভাই তখন লেখকসংঘের মুখপত্র 'পরিক্রম'-এর সম্পাদক। 'পরিক্রম'-এর শেষদিকে আমার কয়েকটি লেখা ছাপা হয়। 'পরিক্রম' ও লেখক সংঘের অফিস ছিলো বর্তমান বাংলা একাডেমীর গেটের কাছের ছোটো ঘরটি। তারই বারান্দায় ফররুখ আহমদকে আমি প্রথম দেখি ও আলাপ হয় এক মিনিটের জন্যে। ফররুখ আহমদ – কবিতা লিখি শুনে – বললেন, 'কবিতা লেখেন আপনি? পুঁথি নিয়ে কবিতা লিখুন।' আমি তখন "জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছে"র টানা গদ্যের কবি — পুঁথির সঙ্গে আমার ফারাক আসমানজমিনের ; আজো পুঁথি সম্পর্কে আমার উৎসাহ নেই। কিন্তু আমি

www.pathagar.com

অবাক হ'য়ে যাই ফররুখ আহমদের ঐ একটিমাত্র বাক্যে – তিনি তাঁর বিশ্বাসটি অকুণ্ঠচিত্তে আমাকে যে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এতে তাঁর স্বভাবের বলিষ্ঠতা–দৃঢ়তা–অকৃত্রিমতার পরিচয়ই আজ আমার কাছে ঐ একটিমাত্র বাক্য–মাণিক্যে প্রোজ্জ্বল।

হাসান ভাই–ই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন কবি সিকান্দার আবু জাফরের (১৯১৯–৭৫) কাছে। জাফর ভাই তখন এদেশের প্রধানতম সাহিত্যপত্র 'সমকালে'র দুর্ধর্ষ সম্পাদক। আমি মাসিক 'সমকালে'র নিয়মিত লেখক হ'য়ে যাই। সিলেটে সরকারি এম. সি. কলেজে জয়েন করার পরেও ওখান থেকে নিয়মিত গুচ্ছ–গুচ্ছ লেখা পাঠাতাম — এবং তা যথারীতি প্রকাশিতও হ'তো। ১৯৬৮ সালের দিকে আমি বিদেশি কবিতা ও নাটকের প্রবল পাঠক হ'য়ে উঠি। সিলেটে ব'সেই, খানিকটা অবসর যাপনের উদ্দেশ্যেই, একগুচ্ছ কবিতা অনুবাদ করি — 'বৈদেশী কবিতাগুচ্ছ' নামে এডগর এ্যালান পো, জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো, গীওম আপোলিনেয়ার, লুই আরাগঁ, আন্তনিও মাকাদো, হোয়ান রামোন হিমেনেথ, রাফাএল আলবের্তি ও ওক্তাবিয়ো পাজ–এর একগুচ্ছ কবিতা 'সমকালে' (১২ : ১০–১২, ১৩৭৬) প্রকাশিত হয়। ঢাকায় ফিরে, জাফর ভাই–এর সঙ্গে দেখা হ'তেই তিনি বলেন, 'ফররুখ তোমার অনুবাদ–কবিতাগুলোর প্রশংসা করেছে।' কবি ফররুখ আহমদের এই এক লাইনের পরোক্ষ প্রশংসা আমি অর্জন করেছিলাম।

১৯৭০ সালে ঢাকায় বদলি হ'য়ে আসি। তখনকার দিনে তদানীন্তন তরুণ কবিদের এক প্রধান আড্ডা ছিলো শাহবাগের রেডিও অফিসে। রেডিও প্রোগ্রাম করতে গিয়ে, বা এম্নিতেই, আমরা অনেকসময় রেডিও অফিসে আড্ডা দিতে যেতাম। একদিন বেশ দুপুর হ'য়ে গেছে, আড্ডাধারীরাও ক'মে গেছে অনেকে, দু–তিনজন মাত্র তখনো আছি – হঠাৎ দেখি, ফররুখ আহমদ এলেন কাউন্টারে পয়সা মেটাতে। ফিরে যাবার সময় আমার চোখে চোখ পড়তেই বুঝলাম, তিনি আমাকে চিনেছেন। কিন্তু স্বভাবলাজুক আমার আর এগিয়ে যাওয়া হ'লো না। তারই মধ্যে দেখলাম তাঁর কাঁধের কাছে পাঞ্জাবি ছেঁড়া (অথবা তালি–দেওয়া, আজ ভুলে গেছি)।

তথ্য হিশেবে এটিও এখানে উল্লেখনীয় মনে করি যে, ঐ ১৯৭০ সালেই বাংলা একাডেমীর বটতলায় একুশে ফেব্রুয়ারির এক অনুষ্ঠানে কবি আল মাহমুদ বাংলাদেশের কবিতা বিষয়ে এক আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ পড়েন। কবি সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন ঐ অনুষ্ঠানের সভাপতি। তখনকার দিনে তরুণ ও অপ্রতিষ্ঠিত আমি অনিমন্ত্রিত শ্রোতা হিশেবে উপস্থিত হয়েছিলাম। যা–ই হোক, ঐ অনুষ্ঠানে ঘটনাচক্রে ফররুখ আহমদ এবং আমি বিতর্কের কেন্দ্র হ'য়ে উঠেছিলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন কবি শহীদ কাদরী ও প্রাবন্ধিক–'কণ্ঠস্বর'–সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, এটুকু মনে আছে আমার। ফররুখ অনুষ্ঠানে ছিলেন না।

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদের জীবদ্দশায় তাঁর সঙ্গে এটুকুই ছিলো আমার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সংযোগ।

১৯৭৪ সালে ফররুখ আহমদের ইন্তেকালের পরে সিকান্দার আবু জাফরের ধানমন্ডির বাসভবনে গেছি একদিন। জাফর ভাইকে কী-জানি-কেন তখন একটু বিমর্ষ ও নিঃসঙ্গ মনে হ'তো। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিলো একজন সম্পাদকের সঙ্গে একজন লেখকের চেয়ে অনেকানেক গভীর — তাঁর কাছে আমার লেখকজীবনের কৃতজ্ঞতার ঋণ এ জীবনে শোধ করা যাবে না। তাই তাঁর মৃত্যুর পরে বাংলা একাডেমীতে আমি যে-বক্তৃতা দিয়েছিলাম, যা পরে মুদ্রিত হয়েছিলো সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' পত্রিকায়, তার শিরোনাম দিয়েছিলাম সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-৬০) বাক্য ব্যবহার ক'রে : 'ঋণশোধের জন্যে নয়, ঋণস্বীকারের জন্যে'। সে যাই হোক, ফররুখ আহমদের কথা তুলতেই নজরুল-স্বভাবী জাফর ভাই বললেন, 'ফররুখ? ও ছিলো আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কবি।' অন্যের গুণ গ্রহণে ও উচ্চারণে জাফর ভাইয়ের মধ্যে কোনোদিন কোনো মালিন্য দেখিনি। সাহিত্যে যদি সামান্যতম সুকৃতি অর্জন ক'রে থাকি, তাহ'লে এইসব মানুষের সংস্পর্শে এসেই সম্ভব হয়েছে।

১৯৭৪-এর ১৯শে অক্টোবর ফররুখ ইন্তেকাল করেন। ২৩শে অক্টোবর, বুধবার, বিকেল সাড়ে-চারটায় বাংলা একাডেমীতে একটি 'ফররুখ আহমদ স্মরণ-সভা' অনুষ্ঠিত হয়। খুবসম্ভবত এটাই ছিলো ফররুখের মৃত্যুপরবর্তী প্রথম অনুষ্ঠান। (বাংলা একাডেমী নয় – অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান ছিলো ঐ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ; – তখন বাংলা একাডেমীর বর্ধমান হাউসের অডিটোরিয়ামে অন্য প্রতিষ্ঠানও অনুষ্ঠানাদি করতে পারতো।) এই সভার সভাপতি ছিলেন কবি আবদুল কাদির (১৯০৬-৮৪)। 'ফররুখ আহমদ : কবি' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ আমি পাঠ করেছিলাম। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন : ফররুখের সমসাময়িক দুই কবি আহসান হাবীব (১৯১৭-৮৬) ও কবি আবুল হোসেন (১৯২২), ফররুখ সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থপ্রণেতা অধ্যাপক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯২৯-৮৪) এবং লেখক আহমদ ছফা, যিনি 'কবি ফররুখ আহমদের কি অপরাধ?' (দৈনিক 'গণকণ্ঠ', ১ আষাঢ় ১৩৮০) নামে এক আতীব্র প্রতিবেদন পেশ ক'রে ফররুখের চাকরির পুনর্বহালে সহায়তা করেছিলেন। আমার প্রবন্ধটি 'দৈনিক বাংলা'র সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত হয় ২৭শে অক্টোবর। পরে আমার "করতলে মহাদেশ" (নলেজ হোম, ১৯৭৯) প্রবন্ধগ্রন্থে অন্তর্ভূত হয়।

১৯৭৫এর মার্চ মাসের দিকে আমার অপরিচিত দুজন তরুণ, ফাওজুল কবির খান ও মাসুদ আলী, "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" সম্পাদনার প্রস্তাব নিয়ে আসেন — যার জন্যে আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। ওঁরা সরাসরি বলেন সম্পাদক হিশেবে আমাকে কোনো অর্থ তাঁরা দিতে পারবেন না, কিন্তু তাঁরা সর্বান্তঃকরণে চান যে বইটি আমিই সম্পাদনা করি। আমি খানিকটা হতচকিত হ'য়ে, কি বলবো বুঝে উঠতে না-পেরে, ড্রয়িংরুম থেকে উঠে গিয়ে

www.pathagar.com

আমার আব্বাকে জিগেস করি। আমার আব্বা এমনই গম্ভীর ও রাশভারি ধরনের পুরুষ ছিলেন যে, শেষ-পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমাদের – তাঁর সন্তানদের – দূরত্ব ঘোচেনি। আব্বা বললেন, 'এ পর্যন্ত তুই যা সাহিত্যকাজ করেছিস, আমি মনে করি, এটাই তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো কাজ হবে।' আমি মুহূর্তমাত্র দেরি না-ক'রে, ড্রয়িংরুমে ফিরে এসে, তরুণদ্বয়কে আমার অনুমোদন জানিয়ে দিলাম। পরবর্তী মাস তিনেক ধ'রে ফররুখের ইস্কাটনস্থ ফ্ল্যাটে আমরা কয়েকজন অনুক্ষণ কাজ ক'রে বইটিকে প্রস্তুত করি। সে-সময় যে-তরুণটি সর্বাধিক সপ্রেম পরিশ্রম দিয়েছিলো তার নাম ফজল মাহমুদ, কবিতা লিখতো, পরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং কোনো অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা করে। ফররুখের "মুহূর্তের কবিতা" বইএর পরিশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণের (বর্ণমিছিল, ১৯৭৮) সম্পাদক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এই ছেলেটিকেই বইটি উৎসর্গ করেন এই ব'লে, 'অকালপ্রয়াত তরুণ/নাজমুল হোসেন (ফজল মাহমুদ)-এর স্মরণে/ – যে কবিকে ভালোবেসেছিলো।' "শ্রেষ্ঠ কবিতা" সম্পাদনা করতে গিয়ে ফজল মাহমুদের সঙ্গে আমিও খানিকটা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। সে আমাকে প্রায়ই প্রণোদিত করতো ফররুখ আহমদের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখবার জন্যে – আমি কিছুতেই রাজি হতাম না। আজ যখন ফররুখ সম্পর্কে আমার এই বড়ো বইটি প্রকাশিত হচ্ছে, তখন তার কথা খুব মনে পড়ছে। সরল, আবেগী, ছোটোখাটো এই তরুণটিকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" প্রকাশের মাত্র কয়েক বছর পরে, তার অকালমৃত্যুতে, 'ফজল মাহমুদ-কে : একটি ঠিকানাহীন চিঠি' নামে একটি শোকলিখন লিখেছিলাম সাপ্তাহিক 'পূর্বাণী' পত্রিকায় (১ জুন ১৯৭৮)। "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" সর্বাংশে সফল হয়েছিলো। ফররুখের মৃত্যুর পরে, এই গ্রন্থের মধ্য দিয়েই তাঁর পুনর্জয়যাত্রা সূচিত হয়। "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা"র 'প্রসঙ্গ-কথা' লিখেছিলেন সাহিত্যিক আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩), যিনি ছিলেন ফররুখের একসময়কার স্কুলশিক্ষক, তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। সে-বছর ১০ই জুন ফররুখ আহমদের জন্মবার্ষিকীতে "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা"-র এক জাঁকজমকপূর্ণ প্রকাশন-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শিল্পকলা একাডেমীতে – অন্যান্য অনেকের সঙ্গে আবুল ফজলও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন আবদুল কাদির। বক্তৃতা দিয়েছিলেন : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ সিদ্দিক আহমদ প্রমুখ।

এর পর বাংলা একাডেমীর সহায়তায়, আহমদ পাবলিশিং হাউস যখন "ফররুখ-রচনাবলী" (প্রথম খন্ড, ১৯৭৯) প্রকাশ করে, তখন আমি এবং মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ যৌথভাবে বইটি সম্পাদনা করি। "ফররুখ-রচনাবলী"র পরবর্তী আর-কোনো খন্ড প্রকাশিত হয়নি – এবং ঐ প্রথম খন্ড বহুদিন হ'লো নিঃশেষিত। তারপর বাংলা একাডেমীর জীবনী-

www.pathagar.com

সিরিজে আমার "ফররুখ আহমদ" (১৯৮৮) বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইটির 'প্রসঙ্গ-কথা' লেখেন বাংলা একাডেমীর তদানীন্তন মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-৮৯)। এই "ফররুখ আহমদ" বইটি লিখি আমি খানিকটা আকস্মিকভাবেই। আমাকে দেওয়া হয়েছিলো কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) ও কবি জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-৭৬)-এর জীবনী লিখতে। জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে একটি খাতায় নোট্‌ও করেছিলাম বেশ-খানিকটা - কিন্তু দেখলাম কলকাতায় না-গেলে (যেখানে জসীমউদ্‌দীনের জীবন ও সাহিত্যের অনেকখানি অতিবাহিত হয়েছে) এই বড়ো কবির প্রতি সুবিচার করা অসম্ভব। সেজন্যে এই জীবনী আমি লিখিনি। তখন আমাকে ভার দেওয়া হয় ফররুখ আহমদ সম্পর্কে লিখতে। এদিকে, সেই সময়ে আমি আজিমপুর সরকারি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। ফররুখ আহমদের পরিবারও কাছেই থাকেন। কবিপুত্র ও তরুণ কবি আহমদ আখতার আড্ডা দিতে অনেক রাত্রে মাঝে-মাঝে আসে আমার কাছে। কবিপরিবারের সর্বাত্মক সহায়তায়, আবু হেনা মোস্তফা কামালের কঠিন আদেশে, কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের নিরন্ত তাগিদে "ফররুখ আহমদ" রচিত ও প্রকাশিত হয়। এর পর "ফররুখ আহমদের গল্প" (সৃজন, ১৯৯০) ও "ফররুখ আহমদ : নির্বাচিত কবিতা" (বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৯৯২) নামে আরো দুটি বই সম্পাদনা করি।

ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে ফররুখ-নামাঙ্কিত 'ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার' প্রথমবার আমাকেই দেওয়া হয় ১৯৯১ সালে।

খানিকটা আকস্মিকভাবে যুক্ত হ'য়ে গিয়ে, গত প্রায় দুই দশক ফররুখ-চর্চা ক'রে চলেছি। প্রথম কৈশোরে যে-কবির "সাত সাগরের মাঝি"র কবিতার পর কবিতা আমাকে মুগ্ধ-স্নাত করেছিলো - ভাবতে ভালো লাগে - পরিণত বয়সের অনেক বছর উদ্‌যাপন করেছি তাঁকে নিয়েই। আজ মনে করি, সবার উপরে আমার আব্বা আলহাজ সৈয়দ এ. এম. বদরুদ্দোজার (১৯১০-৮৯) দোয়া ও প্রেরণাই আমাকে ফররুখ-চর্চায় এতোখানি উদ্বুদ্ধ-নিযুক্ত রেখেছে।

২ : প্রস্তুতিপ্রসঙ্গ

"ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য" বইটিতে একতিরিশটি অধ্যায়কে তিনটি অংশে ভাগ ক'রে দিয়েছি : প্রথমাংশে কবিজীবনী ; দ্বিতীয়াংশে তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক বিবেচনা ; তৃতীয়াংশ 'পরিশেষে' তাঁর জীবন-ও-সাহিত্য সম্পর্কে বিবিধ তথ্যাবলি। এই একতিরিশটি অধ্যায়ের মধ্যে তিরিশটি আমার রচনা ; 'পরিশেষ' অংশের ফররুখ আহমদের সাক্ষাৎকারটি, সম্ভবত এটিই কবির একমাত্র সাক্ষাৎকার, 'বই' পত্রিকার জুন ১৯৬৮ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

www.pathagar.com

'জীবন' অংশের আটটি অধ্যায়ই ১৯৮৮ সালে রচিত ; সর্বশেষ অধ্যায় 'শেষ জীবন, মৃত্যু, মৃত্যুত্তর প্রতিক্রিয়া' এ বছর পরিবর্ধিত করা হয়েছে। 'সাহিত্য' ও 'পরিশেষ' অংশের রচনা ও প্রকাশকাল নিচে দেওয়া হ'লো :

সা হি ত্য

১. সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত		১৯৮১
(পাদটীকা সংযোজন ১৯৮৯)		
২. প্রথম প্রকাশিত কবিতা		১৯৯০
৩. "সাত সাগরের মাঝি"	প্রথম লেখন :	১৯৮৫
	পরিশোধিত লেখন :	১৯৯১
৪. মন্বন্তরের কবি		১৯৯৩
৫. রবীন্দ্রোত্তর কাব্যনাট্য ও "নৌফেল ও হাতেম"		১৯৯২
৬. একটি কাব্যনাট্য : দুই লেখন		১৯৯০
৭. "হাতেম তা'য়ী"		১৯৯৩
৮. 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি'		১৯৭৮
৯. 'বন্দরে সন্ধ্যা'		১৯৯০
১০. 'বীভৎস নগরী'		১৯৯২
১১. শব্দ		১৯৮৯
১২. চিত্রকল্প		১৯৮৯
১৩. সনেট		১৯৯০
১৪. ছোটোগল্প		১৯৯০
১৫. জীবনদর্শন ও সাহিত্যবৈশিষ্ট্য		১৯৮৮

www.pathagar.com

প রি শে ষ

১. জীবনপঞ্জি	১৯৯৩
২. গ্রন্থপঞ্জি	১৯৮৮
৩. সংকলনভুক্ত রচনাপঞ্জি	১৯৮৮
৪. সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনাপঞ্জি	১৯৮৮
৫. সমকালীন প্রতিক্রিয়া	১৯৮৮
৬. সাক্ষাৎকার : ফররুখ আহমদ	১৯৬৮
৭. পান্ডুলিপি	১৯৯২
৮. পত্রাবলি	১৯৯৩

বলা বাহুল্য, গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে প্রত্যেকটি রচনা অল্প বা ব্যাপকভাবে পরিশোধিত–পরিবর্ধিত হয়েছে। 'সাহিত্য' অংশের প্রথম অধ্যায়টি ১৯৮১ সালে রচিত ; ১৯৮৯ সালে এই প্রবন্ধের পাদটীকাসমূহ সংযোজন করেছি। "সাত সাগরের মাঝি"র প্রথম লেখন ১৯৮৫ সালে ; কিন্তু এই প্রবন্ধের ১৯৯১ সালের পরিশোধিত লেখনই এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। লেখাগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কয়েকটি লেখা আমার "ফররুখ আহমদ" গ্রন্থভূত ; কিন্তু এখানে বহুলভাবে পরিবর্তিত–পরিবর্ধিত। 'সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত' প্রবন্ধটি (পাদটীকা বাদে) আমার "নির্বাচিত প্রবন্ধ" (মুক্তধারা, দ্বিতীয় খন্ড : ১৯৮৭) গ্রন্থে এবং 'প্রথম প্রকাশিত কবিতা' প্রবন্ধটি আমার "দরোজার পর দরোজা" (বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯১) গ্রন্থে সংকলিত। 'ছোটোগল্প' প্রবন্ধটি আমার সম্পাদিত "ফররুখ আহমদের গল্প" (সৃজন, ১৯৯০) গ্রন্থের ভূমিকা হিশেবে মুদ্রিত।

বর্তমান গ্রন্থ কোনো দ্রুতরচনা নয় – সমালোচনাকর্মে আমি দ্রুততা সর্বাংশে পরিত্যাজ্য ব'লে মনে করি। এটি আমার কুড়ি বছরের ফররুখ-চর্চার ফসল। অন্তর্বর্তীকালে ফররুখ বিষয়ে আমি যে-সব রচনা লিখেছি, এটি নিছক তার সংকলন নয় – এর বাইরেও ফররুখ-সম্পর্কিত আমার লেখা আছে, উৎসুক পাঠক সেগুলি খুঁজে নেবেন। এর মধ্যে আমি কেবল ফররুখের প্রকাশিত বইগুলি পাঠ করিনি – পত্রিকায় ছড়িয়ে-থাকা তাঁর অজস্র কবিতা ও অন্য রচনা পাঠ করেছি ; ১৯৭৫ সালে "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" সম্পাদনা করতে গিয়ে যে-অভিভূতি হয়েছিলো, একজন সৃষ্টি-উৎসবমুখর কবির কবিতায়-কবিতায় ভেসে গিয়েছিলাম, যেন তা-ই আমাকে অনেকখানি চালিত করেছে ; এর মধ্যে রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ফররুখ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছি ; আমার আগ্রহের অন্য কবি-লেখকদের

www.pathagar.com

সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে-নিয়ে অগ্রসর হয়েছি। ফলত এই গ্রন্থে পাঠক ধারাবাহিকতা, যান্ত্রিকতা ও সুপরিকল্পনার অভাব লক্ষ্য করবেন। ফররুখের যে-সব গ্রন্থে, বিষয়ে বা কবিতায় উৎসাহ বোধ করেছি – কেবল সেগুলিরই প্রতিফলন আছে এখানে। অর্থাৎ, আমি ফররুখ-বিচারে সৃষ্টিশীলভাবে অগ্রসর হয়েছি। তারপরেও ফররুখ বিষয়ে যে-বিপুল তথ্য এখানে আহরণ ও সংকলন করেছি, আমার বিশ্বাস, তাতে বর্তমান ও ভাবী পাঠক-সমালোচক-গবেষক স্থায়ীভাবে উপকৃত হবেন। অনেক অসম্পূর্ণতা এতে আছে ; কিছু ভ্রান্তিও থাকা সম্ভব। সুযোগ পেলে, পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি শুধরে নেওয়া যাবে।

৩ : কৃতজ্ঞতা

এই গ্রন্থ প্রণয়নে মূলত ব্যবহার করেছি বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার। "সাত সাগরের মাঝি" বইটির আলোচনার পাদটীকায় উদ্ধৃত ফররুখের কবিতা বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা থেকে উদ্ধার করেছিলাম কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে। কবিপরিবারের সর্বাত্মক সহযোগিতা ব্যতিরেকে এ ধরনের গ্রন্থ প্রযোজনা অসম্ভব ; সমূহভাবেই তা পেয়েছি। বিশেষত কবিপুত্র ও স্বয়ং কবি আহমদ আখতার প্রভূত সহায়তা করেছে। আমার প্রিয় ছাত্র, শিশুসাহিত্যিক সাজ্জাদ হোসাইন খান কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ব্যবহার করতে দিয়েছে আমাকে – আমার অবিশ্বাস্য অলস দীর্ঘসূত্রিতায় হাস্যমুখ বজায় রেখে।

ফররুখ আহমদের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ এই গ্রন্থ দ্রুত প্রকাশের জন্য সকল পর্যায়ে উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। জনাব শামসুজ্জামান খান ও জনাব আজহার ইসলাম প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। অপরিসীম পরিশ্রম করেছেন অনুজপ্রতিম ড. সুকুমার বিশ্বাস। বাংলা একাডেমীর কারিগরি প্রশিক্ষণ উপবিভাগের উপ-পরিচালক জনাব আবদুল গফুর ও উপ-পরিচালক জনাব মুহম্মদ আবদুল মজিদ এবং অন্যান্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ দ্রুত-দক্ষ সহযোগিতা দান করেছেন।

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী তাঁর বিরাট ব্যস্ততার মধ্যে এই বইএর প্রচ্ছদ অংকন ক'রে আমাকে নন্দিত করেছেন।

এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি মহান আল্লাহতায়ালার কাছে — যাঁর অশেষ রহমত ব্যতিরেকে আমার মতো ব্যক্তির পক্ষে এই গ্রন্থ রচনা ছিলো অসম্ভব ॥

৫১ গ্রীন রোড, ঢাকা ১২০৫

আবদুল মান্নান সৈয়দ

www.pathagar.com

জীবন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জন্ম ও বংশপরিচয়

ফররুখ আহমদের জন্ম ১০ই জুন ১৯১৮ সাল। জন্মস্থান যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানার মাঝআইল গ্রাম। মাঝআইল গ্রাম মধুমতী নদীর তীরে অবস্থিত। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ হাতেম আলী ; মাতা, বেগম রওশন আখতার। দাদা সৈয়দ আব্বাস আলী। সৈয়দ হাতেম আলী পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন — আই. এ. পাশ ক'রে চাকরিতে ঢোকেন। তিনি খুলনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় কাজ করেছেন। মাঝে-মাঝে কলকাতায় যেতেন আই. জি. পুলিশ অফিসে রিপোর্ট দাখিল করতে। সৎ মানুষ হিশেবে সুনাম ছিলো, মজলিশী ছিলেন। 'খান সাহেব' উপাধি পেয়েছিলেন। 'The father, a police officer was noted for his courage and integrity - qualities for which he was made a khan Sahib, after retirement. He was a colourful man, gregarious, effusive and rather temperamental. Farrukh had inherited these qualities, though in his artistic personality they underwent a subtle change'. ('Farrukh Ahmed' : Zillur Rahman Siddiqui, 'Bangla Academy Journal', July-December 1984). তাঁর দুই বিবাহ — প্রথম পক্ষের স্ত্রী ১৯২৪ সালে মারা যাবার পর দ্বিতীয় বিবাহ করেন। ফররুখ আহমদ প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁরা তিন ভাই, দুই বোন। ফররুখের বড়ো বোনের নাম সৈয়দা শরফুল আরা মোকাদ্দেসা খাতুন, বড়ো ভাই সৈয়দ সিদ্দীক আহমদ, ছোটো ভাই সৈয়দ মুশীর আহমদ। মুশীর আহমদ কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্টস স্কুলে পড়েছেন। এঁদের দাদা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে কাজ করতেন। চাচা সৈয়দ কাসেম আলী ডাক্তার ছিলেন। তাঁর সাহিত্য-চর্চার নেশা ছিলো, বিভিন্নরকম বইপত্র পড়তেন। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, ফররুখ ছিলেন সচ্ছল পরিবারের সন্তান। তাঁদের পরিবার ছিল শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত। পর-পর তিনটি মেয়ের জন্মের পর ফররুখের জন্ম হয়। রমজানের সময়ে ফররুখের জন্ম হয়েছিলো ব'লে তাঁর দাদী তাঁকে আদর ক'রে 'রমজান' ব'লে ডাকতেন। ছয় বছর বয়সে মাতৃহারা হয়েছিলেন ফররুখ ; দীর্ঘজীবী দাদীই তাঁকে লালনপালন করেন। ১৯৪৩-এ ফররুখের পিতা ইন্তেকাল করেন। তাঁর দাদীও ঐ বছর মারা যান।

শিক্ষাজীবন

মাঝআইল গ্রামের পাঠশালায় ফররুখ কিছুদিন পড়েছিলেন। ফারসি-জানা এক মহিলা বাড়িতে ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। তারপর কলকাতায় গিয়ে মডেল এম. ই. স্কুলে ভর্তি হন। কলকাতার তালতলা এলাকার ইউরোপিয়ান এ্যাসাইলাম লেনে এই স্কুল অবস্থিত

www.pathagar.com

ছিলো। তারপর কিছুদিন পড়েন বালিগঞ্জ হাই স্কুলে। বালিগঞ্জ হাই স্কুলে কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর শিক্ষক ছিলেন। এর পর ফররুখ ভর্তি হন খুলনা জেলা স্কুলে। এই স্কুলে তাঁর শিক্ষক ছিলেন সাহিত্যিক আবুল ফজল ও সাহিত্যিক আবুল হাশেম। এই স্কুলের বার্ষিকীতেই ফররুখের প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয়। এই স্কুল থেকেই ১৯৩৭ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কলকাতায় এসে রিপন কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩৯ সালে রিপন কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে আই. এ. পাশ করেন। আই. এ. পাশ করার পর তিনি প্রথমে দর্শন ও পরে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ.-তে ভর্তি হন। পড়েন দুটি কলেজে — স্কটিশ চার্চ কলেজে ও সিটি কলেজে। তাঁর অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ। সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন উত্তরকালে বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়, অভিনেতা ফ'তেহ লোহানী, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। যে-কোনো কারণেই হোক, শেষ-পর্যন্ত বি. এ. পরীক্ষা দেননি।

সংসারজীবন

১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে আপন খালাতো বোন সৈয়দা তৈয়বা খাতুন (লিলি)-র সঙ্গে ফররুখের বিবাহ হয়। তৈয়বা খাতুনের পিতার নাম সৈয়দ মোহাম্মদ নূরুল হুদা। বিবাহের উদ্যোক্তা ছিলেন ফররুখ ও তৈয়বা খাতুনের নানা মোহাম্মদ হুরমাতুল্লাহ। তিনি ৩১. ৭. ৪২ তারিখে দুর্গাপুর থেকে এক চিঠিতে ফররুখের বড়ো ভাই সৈয়দ সিদ্দীক আহমদকে লেখেন :

> তোমার ২৮শে তারিখের পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম। . . . ফররোখ বর্তমানে কি করিতেছে। তাহার তো লেকচার Culture আছে। আর একবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। একটা degry থাকা ভাল। . . . সে একবার এখানে আসিলে আমি খুব সন্তুষ্ট হইতাম। তাহার যাতায়াত খরচ আমি দিতে প্রস্তুত। লিখিলেই ইনশাল্লাহ পাঠাইয়া দিব। . . . লিলীকে খুবই ভালবাসি। তাকে একটা সুপাত্রের হাতে দিয়া যাইতে পারিলে মনের শান্তি হইত। সে এমন সুন্দর লেখাপড়া শিখিয়াছে যে একটা মূর্খের সহিত বিবাহ হইলে সে জীবনে মড়া হইয়া থাকিবে। তাহার জন্য একটু চেষ্টা কর। গাফিলী করিও না।

বিবাহ যথাসময়ে দুর্গাপুরেই সম্পন্ন হয়।

ফররুখ কলকাতায় ছিলেন ৩৮ দিলখুশা স্ট্রীটে, ৬ নম্বর সার্কাস রোডে, এবং যাদবপুরে তাঁর পিতার সাহায্যে নির্মিত তাঁর অগ্রজের বাড়িতে। যাদবপুরে ঐ বাড়ির নাম ছিলো 'আলোকপুরী'। কবির তখনকার ঠিকানা : আলোকপুরী, যাদবপুর, ২৪ পরগনা।

www.pathagar.com

ছাত্রাবস্থায় তো বটেই, বিবাহের পর এই বাড়িতেই কবি সপরিবারেও থেকেছেন। তাঁর নিজের বিয়ে উপলক্ষে ফররুখ 'উপহার' নামে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি 'সওগাত' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ সংখ্যায় ছাপা হয়। কবিতাটি এই :

উপহার

আমরা দুজনে ধরার ধূলায় বাঁধব বাসর-ঘর,
রবে চিরদিন এ স্বয়ম্বরে সত্যের স্বাক্ষর,
রবে চিরদিন বিবাহ-লগ্ন
রইব প্রেমের মধুতে মগ্ন
হাতে হাত রেখে চলব আমরা অন্তরে অন্তর ;
আমরা দুজনে ধরার ধূলায় বাঁধব বাসর-ঘর।।

যেথা তুমি আছো যেথা আমি আছি, যেখানে এ পরিচয়
সেখানে রবে না কোনদিন আর কোন ভয়, সংশয়।
আমরা প্রেমের কপোত-কপোতী
আলোক-পিয়াসী, উর্দ্ধের জ্যোতি
রবে চিরদিন আমাদের চোখে মধুময় ভাস্বর,
আমরা দুজনে ধরার ধূলায় বাঁধব বাসর-ঘর।।

মিলবে প্রভাত, সন্ধ্যা, রজনী বিবাহের উৎসবে,
আমাদের ঘরে নিত্য প্রেমের মিলনোৎসব হবে।
পাড়ি দিয়ে যাবো সাগরে তরণী,
আমাদের মোহে জাগবে ধরণী
অশ্রু শোনিতে ভাসানো ধরার আশ্রয় বন্দর ;
আমরা দুজনে ধরার ধূলায় বাঁধব বাসর-ঘর।।

নিবিড় বাঁধনে চিরদিন মোরা বাঁধা রবো পাশাপাশি,
দুর্যোগ রাতে, আঘাতে, ব্যথাতে ফোটাবো প্রেমের হাসি,
ফোটাবো উর্দ্ধে কন্টকহীন
রাঙা শতদল নিত্য নবীন,
সামনে দাঁড়ালে প্রলয়-ভাঙন পাব না আমরা ডর ;
আমরা দুজনে ধরার ধূলায় বাঁধব বাসর-ঘর।।

www.pathagar.com

শত ভাঙনের মুখে গড়ে যাব মোরা শত বালুচর,
মুখোমুখী হয়ে কথা কবে রাতে তারা-ঘেরা অম্বর
অজানা যে পথ রয়েছে বিথারি'
নির্ভয়ে দেব সেই পথে পাড়ি
পথ-প্রান্তের ফোটা ফুল তুলে ছড়াব ধরণী 'পর ;
আমরা দুজনে ধরার ধূলায় বাঁধব বাসর-ঘর।।

যেথা তুমি আছো, যেথা আমি আছি, যেথা আছে ভালোবাসা —
যেখানে নিত্য প্রেমের শিখায় জাগে জীবন্ত আশা,
সেথা এসে মোরা দাঁড়াব দুজনে
হাতে হাত রেখে মন রেখে মনে
জাগাবো সেখানে প্রাণ-উৎসব বিচিত্র সুন্দর
আমরা দুজনে ধরার ধূলায় বাঁধব বাসর-ঘর।।

['সওগাত', অগ্রহায়ণ ১৩৪৯]

তাঁর স্ত্রীর ডাক-নাম লিলি। 'লিলি' নামে একটি কবিতা 'মৃত্তিকা' পত্রিকার বসন্ত ১৩৪৯ সংখ্যায় ছাপা হয়। 'লিলি আহমদ' নামে একটি কবিতাও ছাপা হয় 'সওগাতে'। 'লিলি' কবিতাটি উদ্ধৃত হ'লো :

লিলি

পদ্মবনে প্রভাত সমীরণে যে মেলেছে দল,
দেখেছে সে লীলাকমল রক্তিম উজ্জ্বল,
ভোর না হতে পথ চেয়ে যে পাপড়ি মেলে আছে
উদয়নের শুভ্র বিভা ফিরছে তাহার কাছে।

তোমার সৌভাগ্য লিলি! চিরদিন নবসূর্য সাথে —
পার হয়ে কাল মৃত্যু উদিত যে নবীন আশাতে
তাকায় তোমার পানে, তুমি ফিরে চাও তার মুখে,
সূর্যের কৌতুক লিলি, চিরদিন তোমারি কৌতুকে।

সে-প্রাণ উচ্ছল দীপ্তি কক্ষপথে নিত্য গতিমান
আকন্ঠ পিপাসা তব পূর্ণ করে দিয়া শেষ দান,

www.pathagar.com

পরম বন্ধুর মতো তারপর তাকায় পুলকে ;
তোমরা জাগিয়া ওঠো সূর্য ! লিলি ! আলোর ঝলকে।

তোমাদের দুজনার দীর্ঘরাত্রি অবসান হয়ে এল লিলি !
হাজার ঝর্ণার মতো প্রথম সূর্যের আলো খেলে ঝিলিমিলি,
অন্ধকালো আবছায়া সরে যায় প্রভাতের আলোর চুম্বনে ;
জাগো সূর্য ! জাগো লিলি ! লগ্ন এলো রাত্রিশেষে ধূলিতে গগনে।

জীবনে তোমার বিচিত্র উৎসব, একের পরে মেলছে সে আর দল,
পাপড়ি খোলো, কেন-বা, প্রসাধন, নিশাস তোমার সেই তো পরিমল।
তোমায় পেয়ে প্রভাত-আলোর ঘুচেছে আজ তিমির-সংশয়,
বর্ণ তোমার সূর্য তনু হতে — গন্ধ তাহার অক্ষয় সঞ্চয়।

['মৃত্তিকা', বসন্ত ১৩৪৯]

ফররুখের পুত্র-কন্যা : সৈয়দা শামারুখ বানু (মরহুমা), সৈয়দা লালারুখ বানু, সৈয়দ আবদুল্লাহেল মাহমুদ (মরহুম), সৈয়দ আবদুল্লাহেল মাসুদ (মরহুম), সৈয়দ মনজুরে এলাহী, সৈয়দা ইয়াসমিন বানু, সৈয়দ মুহম্মদ আখতারুজ্জামান [আহমদ আখতার], সৈয়দ মুহম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, সৈয়দ মুখলিসুর রহমান, সৈয়দ খলিলুর রহমান ও সৈয়দ মুহম্মদ আবদুহু।

দেশবিভাগের পর ১৯৪৮ সালে কবি কলকাতা ছেড়ে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চ'লে আসেন। ঢাকায় ওঠেন কবি বেনজীর আহমদের আগামসিহ্ লেনের বাসায়। তবে ঢাকায় প্রথম সপরিবারে বাসা বাঁধেন কমলাপুরে — এখানে একটানা বারো বছর ছিলেন। এখানকার ঠিকানা : ১নং হুসনে আলম ভিলা, পো: ওয়ারী, ঢাকা। তারপর শান্তিনগরে বছর খানেক, বছর পাঁচেক ২২০ মালীবাগে। এরপর ৭/৫ ইস্কাটন গার্ডেন কলোনীতে মৃত্যুকাল অবধি। সংসারী ফররুখ আহমদ সম্পর্কে তাঁর স্ত্রী সৈয়দা তৈয়বা খাতুন লিখেছেন :

> কবি হিশাব-নিকাশের কোন ধার না ধারলেও সংসারবিমুখ ছিলেন না। পিতা হিসাবে তিনি ছিলেন দায়িত্বশীল। ছেলেমেয়েদের প্রতি কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র অমনোযোগী ছিলেন না। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন খুবই যত্নশীল। সংসারী তিনি যতটা ছিলেন তার চেয়ে বেশি ছিলেন ছেলে-মেয়ের শিক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী। ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ভাল ফল করলে তিনি ভীষণ খুশি হতেন। আনন্দে তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করতো। আর তিনি

www.pathagar.com

আনন্দিত হতেন যখন একটি কবিতা লেখা শেষ করতেন। কবিতা ও কবিতার বই প্রকাশিত হলে তিনি আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে উঠতেন।

['সংসারে ফররুখ আহমদ', "ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি" : শাহাবুদ্দীন আহমদ-সম্পাদিত, ১৯৮৪]

কবিকন্যা সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু লিখেছেন :

আব্বা বলতেন, 'দাম্ভিক পরহেজগারের চাইতে অনুতপ্ত পাপী ভালো।' ব্যক্তিজীবনে আব্বা ছিলেন পরহেজগার। জীবনে জ্ঞান থাকা অবস্থায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে সাধারণত নামায কাযা করেননি তিনি। শরীর ভীষণ অসুস্থ থাকা অবস্থায় ত্রিশ রোজাই রেখেছেন। আব্বা ধার্মিক ছিলেন। কিন্তু গোঁড়া ছিলেন না ; সাম্প্রদায়িক তো ছিলেনই না। . . . আব্বার পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে দুটো পায়জামা, দুটো পাঞ্জাবী, একটি গেঞ্জী, একটি শেরওয়ানী, এক জোড়া স্পঞ্জের স্যান্ডেল, একজোড়া জুতো, শীতের সময় একটি পুলোভার এবং একটি আলোয়ানই যথেষ্ট ছিল। নবীজীর সুন্নতকে ভালবাসতেন বলে আব্বা কাপড়ে তালি দিয়ে পরতেন।

['আব্বাকে যেমন দেখেছি', ঐ]

কর্মজীবন

কলকাতা-জীবনে ফররুখ অনেকগুলি চাকরি করেন—কিন্তু সবগুলিই স্বল্পস্থায়ী। ১৯৪৩-এ আই. জি. প্রিজন অফিসে, ১৯৪৪এ সিভিল সাপ্লাইতে, ১৯৪৫এ 'মাসিক মোহাম্মদী'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিশেবে, ১৯৪৬-এ জলপাইগুড়িতে একটি ফার্মে।

এসব কোনো চাকরিই বেশি দিন করেননি, পরিস্কার বোঝা যায় : তাঁর কবি-মানসের সঙ্গে খাপ খায়নি, 'মোহাম্মদী'র চাকরিটি ছিলো একমাত্র তাঁর উপযোগী, কিন্তু একটি ঘটনায় তার পথ রুদ্ধ হয়। সম্ভবত ১৯৪৫-এর মার্চ মাসে ফররুখ 'মোহাম্মদী'র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন — লেখক হিশেবে অনেক আগে থেকেই যুক্ত ছিলেন। তাঁর একটি কবিতা 'মোহাম্মদী' ও 'আজাদ'-সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ নিজের নামে ছাপায় ১৯৪৫-এর ডিসেম্বরে তিনি 'মোহাম্মদী'র চাকরি ছেড়ে দেন।

ঢাকা বেতারেই ফররুখ দীর্ঘস্থায়ী চাকরি করেন। ১৯৪৮-এর শেষ দিকে তিনি কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন, ঢাকা বেতারে প্রথমে অনিয়মিত পরে নিয়মিত স্টাফ আর্টিস্ট বা নিজস্ব শিল্পী হিশেবে কাজ করতে থাকেন। মৃত্যুকালেও তিনি এই চাকরিতেই

www.pathagar.com

বহাল ছিলেন। বছর-বছর নতুন ক'রে চুক্তি হ'তো, পরে সে-রেওয়াজ উঠে যায়। ফররুখের কাগজপত্রের মধ্যে এরকম একটি চুক্তিনামা — সম্ভবত এটিই প্রথম — পাওয়া যায়।

চুক্তিনামাটি এই :

RADIO PAKISTAN
cortract form for staff/artists
No. PF/52-4762
Dated the 31.3.1952

Dear sir

Madam

We offer you an engagement to produce/compose/write/broad-cast and/ or perform for Radio Pakistan the conditions noted on the reverse, for a monthly fee of Rupees 295/- (Rupees two hundred & ninety-five only) as producer (Educational) broad-cast W. e. b. 1st April, 1952. (F. N.)

Yours faithfully
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
Station Director
for and Behalf of the
Governer-General of Pakistan

To
Mr. Farrukh Ahmed

বেতারে স্টাফ আর্টিস্ট হিশেবে ফররুখ আহমদ দীর্ঘকাল 'কিশোর মজলিশ' পরিচালনা করেছেন। বেতারের প্রয়োজনে অসংখ্য গান, কথিকা, নাটিকা, শিশুতোষ রচনা, গীতিনাট্য, গীতিবিচিত্রা ইত্যাদি লিখেছেন। নিজের ও অন্যদের কবিতা আবৃত্তি করেছেন। পুঁথি পাঠও করেছেন মাঝে-মাঝে। বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ প্রযোজনা করেছেন। বেতারে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন কবি শাহাদাৎ হোসেন, কবি সৈয়দ আলী আহসান, কবি আবুল হোসেন, কবি সিকান্দার আবু জাফর, কবি শামসুর রাহমান, কবি হেমায়েত হোসেন, গীতিকার নাজির আহমদ, কথাশিল্পী আশরাফ-উজ-জামান খান, কথাশিল্পী নাজমুল আলম প্রমুখ।

www.pathagar.com

ফররুখ আমৃত্যু ঢাকা বেতারে স্টাফ আর্টিস্ট হিশেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর চাকরি কখনো যায়নি, কিন্তু দুবার বিপন্ন হয়েছিলো – ১৯৫৩ সালে একবার, ১৯৭১–এর ডিসেম্বরে আরেকবার।

১৯৫৩ সালের ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন সরলানন্দ সেন তাঁর "ঢাকার চিঠি" (১৯৭১) গ্রন্থে। কলকাতার 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রেরিত তাঁর প্রতিবেদন থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি :

ঢাকা বেতারকেন্দ্রের শিল্পী ছাঁটাই

> ঢাকা ৩১শে মার্চ। — ইতিপূর্বে আমরা ঢাকা বেতারকেন্দ্রের শিল্পী ছাঁটাইয়ের আশঙ্কার কথা এক চিঠিতে বলেছিলাম। . . . গতকাল পাকিস্তান বেতার বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল জনাব জেড. এ. বোখারী ঢাকা বেতারকেন্দ্রের প্রায় পঞ্চাশ জন স্টাফ আর্টিস্টের মধ্যে পনের জনকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দিয়েছেন। নোটিশ অনুসারে ১লা এপ্রিল থেকে এঁরা ছাঁটাই হবেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে খ্যাতনামা কবি ও ঢাকা বেতার কেন্দ্রের লিপি-লেখক জনাব সৈয়দ শাহ্‌দাৎ হোসেন, তরুণ কবি ও বাংলা লিপি-লেখক জনাব ফররুখ আহমদ, এবং পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত গায়ক ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার জনাব আবদুল আহাদও এই ছাঁটাইয়ের কবল থেকে রেহাই পাননি। . . . ছাঁটাইয়ের নোটিশ এবং বেতার শিল্পীদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে শহরের বুদ্ধিজীবী, বিশেষ করে ছাত্র মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
>
> [দৈনিক 'যুগান্তর', ২০শে চৈত্র ১৯৫৯, ৩রা এপ্রিল ১৯৫৩]

উল্লিখিত ধর্মঘট চলেছিলো সতেরো দিনব্যাপী। তারপর কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটীদের সব দাবিদাওয়া মেনে নিয়েছিলেন, অন্যান্যদের সঙ্গে ফররুখও কাজে বহাল হন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ফররুখ আহমদের বেতন সংক্রান্ত কিছু ঝামেলা হয়, কিন্তু অনেকে যেমন মনে করেন তেমন নয় — চাকরি যায়নি। এই সময় দৈনিক 'গণকণ্ঠে' প্রকাশিত আহমদ ছফার একটি তীব্র-তীক্ষ্ণ প্রতিবেদন ফররুখ আহমদের চাকরিতে পুনর্বহাল হওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছিলো। ঐ প্রতিবেদনের একটুখানি অংশ :

> অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক, যাঁদের কোনো রকমের আদর্শবোধ নেই, চরিত্র নেই, সুবিধাবাদিতাই নীতি, আমরা জানি তাঁরা আজ ফররুখ আহমদের নামে দুটো সমবেদনার কথা কইতেও কুণ্ঠাবোধ করবেন। তারপরেও আমরা মনে করি, ফররুখ আহমদ একজন বীর চরিত্রের মানুষ। একজন শক্তিমন্ত কবি।

www.pathagar.com

আমাদের সাহিত্য থেকে তাঁর নাম কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। এই সরকারের কাছে কবি ফররুখ আহমদের রুটি-রোজগারের পথ খুলে দিতে আবেদন করার কোনো সার্থকতা নেই। . . . তাদের যদি বিবেক থাকতো, যদি সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রতি প্রেম থাকতো,কবিকে বৃদ্ধ বয়সে উপোস করতে হতো না।

আমরা কবি ফররুখ আহমদকে বাঁচাবার জন্যে, তাঁর পরিবারকে বাঁচাবার জন্যে 'ফররুখ আহমদ সাহায্য তহবিল' গঠন করতে কবির অনুরাগীজন এবং দেশপ্রেমিক ও সংস্কৃতিপ্রেমিক জনগণের কাছে আবেদন রাখছি।

[দৈনিক 'গণকন্ঠ', ১লা আষাঢ় ১৩৮০, ১৯৭৩]

১৯৭৩-এর জুন-জুলাই মাসে ফররুখ বেতারের কাজে পুনর্বহাল হন, তখন থেকে বেতারের কমার্শিয়াল সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

সাহিত্যজীবন

এক

ফররুখের সাহিত্যজীবনের দু'টো ভাগ : প্রথমাংশ কলকাতায়, দ্বিতীয়াংশ ঢাকায়। তাঁর সাহিত্যের বীজ অবশ্য শৈশবেই তাঁর মধ্যে প্রোথিত হয়েছিলো।

শৈশবে দাদীর কাছে ফররুখ শুনতেন পুঁথির কাহিনী, 'তাজকিরাতুল আউলিয়া' এবং 'কাসাসুল আম্বিয়া'। ছোটোবেলায় ফররুখ দুরন্ত ছিলেন, কিন্তু আবার একই সঙ্গে ভাবুকতা ও উদাসীনতা তাঁর মধ্যে কাজ করতো। মাঠে কিংবা মধুমতী নদীতীরে একা-একা ঘুরে বেড়াতেন। জ্যোৎস্নারাতে বাঁশঝাড়ের পাশে গিয়ে ডাহুকের ডাক শুনতেন। এই সবই তাঁর মধ্যে কবিতার প্রেরণা সঞ্চার করেছিলো, মনে হয়।

কিন্তু গ্রামে যা পাননি, তা পেলেন কলকাতায় গিয়ে। সাহিত্যের জগতের দুয়ার খুলে গেলো। স্কুলে পড়তেই কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। বালিগঞ্জ স্কুলে যখন পড়ছেন, দিলকুশা স্ট্রীটে থাকছেন, রোজ সন্ধ্যার পরে দিলকুশা পাবলিক লাইব্রেরিতে বইপত্র পড়তে যেতেন। সমবয়সী, পরবর্তীকালের বিখ্যাত কথাশিল্পী আবু রুশদও ঐ লাইব্রেরিতে নিত্য যেতেন। দু'জনে সাহিত্যালোচনা করতেন। কখনো লাইব্রেরিতে ব'সে, কখনো পার্ক সার্কাস ময়দানের কোনো নিরালা কোনায়, কখনো বা হাঁটতে-হাঁটতে গড়িয়াহাট লেক পর্যন্ত গিয়ে। কবিতার দ্বারা তিনি তখনই অধিকৃত হচ্ছেন। নিরালায় দরাজ গলায় আবৃত্তি করতেন শেলী, কীটস, নজরুলের কবিতা।

www.pathagar.com

এর পর ফররুখ বালিগঞ্জ স্কুল থেকে খুলনা জেলা স্কুলে এসে ভর্তি হন। এই খুলনা জেলা স্কুল ম্যাগাজিনেই সম্ভবত তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর স্কুল-শিক্ষক সাহিত্যিক আবুল হাশেম লিখেছেন :

> ছেলেটাকে দেখতাম স্কুলের অন্য ছেলেরা যখন মাস্টার সাহেবদের জব্দ করার জন্য ফন্দি আঁটতে থাকতো, তখন সে বসে থাকতো নির্বাক মুখে, বই মেলে, তার ডাগর চোখ দু'টি ঢেকে। [ফররুখের দেওয়া] লেখাটা পড়ে দেখলাম। চমৎকার লাগলো। একটু ঘষামাজা করে সেটা প্রেসে পাঠিয়ে দিলাম।
>
> ['আমার ছাত্র ফররুখ', "ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি"]

খুলনা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে ফররুখ কলকাতায় পড়তে যান। এখানে থাকতেই ফররুখের সত্যিকার সাহিত্যিক উন্মেষ ঘটে।

সাল-তারিখ মিলিয়ে মনে হচ্ছে, বাংলা ১৩৪৪ বা ইংরেজি ১৯৩৭এই ফররুখ প্রথম সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। এই বছরেই 'বুলবুল' ও 'মোহাম্মদী'তে তাঁর প্রথম রচনাবলি প্রকাশিত হয়। এখন-পর্যন্ত-প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনে হয়, 'বুলবুলে' প্রকাশিত 'রাত্রি' সনেটটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা (শ্রাবণ ১৩৪৪)।

প্রথমদিকে ফররুখ গল্পও লিখতেন। যেমন, 'মৃত বসুধা' ('সওগাত', কার্তিক ১৩৪৪), 'যে পুতুল ডলির মা' ('বুলবুল', বৈশাখ ১৩৪৫), 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' ('মোহাম্মদী', কার্তিক ১৩৪৬) ইত্যাদি। এমনকি 'সিকান্দার শা-র ঘোড়া' নামে 'মৃত্তিকা' পত্রিকায় একটি উপন্যাসও শুরু করেছিলেন (শ্রাবণ ১৩৫৩) — কিন্তু তা শেষ করেননি। ফররুখের কথাসাহিত্য বেশিদূর অগ্রসর হয়নি।

কিন্তু অঝোরে কবিতা লিখতে থাকেন, এবং তা নিয়মিত প্রকাশিতও হ'তে থাকে। সেকালে কলকাতার প্রথম শ্রেণীর বহু পত্র-পত্রিকায় তিনি লিখেছেন — বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায়, অজিত দত্ত-সম্পাদিত 'দিগন্ত' বার্ষিকীতে ; মুসলমান-সম্পাদিত 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'বুলবুল', 'মৃত্তিকা' প্রভৃতি পত্রিকায় ; বাম বলয়ের 'অরণি', 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকায়।

এখানেই বাম বলয়ের সঙ্গে ফররুখ আহমদের চলাফেরার বিবরণ দিই। কবিকন্যা লিখেছেন :

> প্রথম জীবনে আব্বা ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত মানবতাবাদী কমরেড এম. এন. রায়ের শিষ্য। যিনি আটটি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন।

www.pathagar.com

ফররুখ তখন অরণি-পরিচয়-স্বাধীনতা পত্রিকায় লিখছেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য-সম্পাদিত "আকাল" সংকলনে তাঁর কবিতা গৃহীত হচ্ছে। ধনঞ্জয় দাশ জানাচ্ছেন, 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সংঘে' তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, গোলাম কুদ্দুস, সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকের সঙ্গে ফররুখ আহমদও যোগ দিয়েছিলেন।' (পৃ.তেত্রিশ, "মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক", প্রথম খণ্ড, ধনঞ্জয় দাশ-সম্পাদিত, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৭৯) কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক অন্তঃপরিবর্তন ঘটে। ধনঞ্জয় দাশ লিখেছেন :

> . . . বার্লিন-দিবসে প্রগতি লেখক সংঘ-র ফেস্টুন নিয়ে অংশ গ্রহণ করাকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমোদন করতে পারেননি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি লেখক সংঘ থেকে পদত্যাগের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন। ফররুখ আহমদ প্রগতির শিবির বর্জন করে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীগের আদর্শকেই ক্রমান্বয়ে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।
>
> [পৃ. সাতান্ন, "মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক", প্রথম খণ্ড, ধনঞ্জয় দাশ-সম্পাদিত, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৭৯]

"সিরাজুস সালেকীন" ও "সাইয়েদুল মুরসালীন" গ্রন্থদ্বয়ের লেখক মওলানা অধ্যাপক আবদুল খালেকের সংস্পর্শেই ফররুখ আহমদের অন্তঃপরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে এঁকেই কবি তাঁর তৃতীয় কবিতা-গ্রন্থ "সিরাজাম মুনীরা" (১৯৫২) উৎসর্গ করেন। ফররুখের কাগজপত্রের মধ্যেই প্রাপ্ত ১৯৪১ সালে লেখা তাঁর একটি চিঠি উদ্ধৃত করবো, যেটি সম্ভবত মওলানা আবদুল খালেককে লেখা, এটা তো স্পষ্টতই পোস্ট করা হয়নি, সম্বোধনের 'জনাব' ও উপসংহারের 'আপনার স্নেহের ফররুখ' লিখে কেটে-দেওয়া। চিঠির কোনায় ইংরেজিতে লেখা : 1941। তাতে মনে হয়, মোটামুটি এরকম সময়েই খালেক শাহেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিলো, যা শেষ-পর্যন্ত আসলে তাঁর আত্মসাক্ষাৎ ঘটায়। এখানেই স্মরণীয় : অল্প সময়ের পরিসরেই, ১৯৪৩-৪৪ সালে, "সাত সাগরের মাঝি"র কবিতাগুচ্ছ লেখা হয়েছিলো, যা তাঁর পূর্ববর্তী কয়েক বছরের কবিতা-চর্চা থেকে আত্মিকভাবে আলাদা।—যা হোক, ফররুখের পত্রটি এই :

> অনেক দিন আপনার কোন সংবাদ পাইনি। আশা করি ভালো আছেন। আমি সিটি কলেজে ভর্তি হয়েছি। অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম যেতে পারিনি—সুবিধা হ'লেই একদিন আপনাকে দেখে আসব।
>
> আমার শরীর এখনো দুর্বল—খাটুনি বেশী পড়েছে তবু মানসিক অবস্থা অত্যন্ত ভালো। আল্লার রহমতে—আমি যে বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়েছি—তার মধ্যে আপনাকে জেনেছি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্করূপে—

www.pathagar.com

হজরতের, উমর ফারুকের মহান আদর্শ আপনার বুকে সুপ্ত আছে . . . সেই আনন্দের সংবাদ আপনাকে জানালাম।

আমার ছালাম নেবেন।

পুনশ্চ—

'মাসিক মোহাম্মদী'র জন্য দুটি সুরা পাঠালাম। অবসর মত একদিন দেখে 'মোহাম্মদী'তে পাঠিয়ে দেবেন।

ফররুখ আহমদের কবিতা প্রথম থেকেই সুধী পাঠক-সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবু সাঈদ চৌধুরী-সম্পাদিত 'রূপায়ন' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (শীত ১৩৪৭) ফররুখের বিখ্যাত 'কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি' কবিতাটি মুদ্রিত হয়। এই পত্রিকা প্রাসঙ্গিক একটি স্মৃতি-ও-তথ্যনির্ভর রচনায় মফিজ চৌধুরী লিখেছেন :

ফররুখ আহমদের 'কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি' শীর্ষক সনেট যার প্রথম লাইন 'কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি। ডিপোতলে এঞ্জিন বিকল।' উচ্চারিত হ'তো বেকার হোস্টেলের তরুণ কন্ঠে।

['বই', বৈশাখ ১৩৮৯]

১৯৪৪ সালে "সাত সাগরের মাঝি" প্রকাশিত হ'লে সওগাত-মোহাম্মদী প্রভৃতি পত্রিকায় তার দীর্ঘ আলোচনা ছাপা হয়। ওয়াকিফহাল সমসাময়িক কথাশিল্পী আবু রুশদ জানিয়েছেন :

"সাত সাগরের মাঝি" লিখে ফররুখ যাকে বলে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলো। দেশবিভাগের কয়েক বছর আগে বইটা যখন বেরুলো তখন বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র উভয়েই সে বইএর কয়েকটি কবিতার প্রশংসা করেছিলেন।

[পৃ. ১১৯, 'উত্তরাধিকার', জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৭]

Central Muslim Sahitya Sangsad, Dargah Mahalla, Sylhet থেকে ১৮.১১.৪৪ তারিখে উত্তরকালের বিখ্যাত কথাশিল্পী শাহেদ আলী ফররুখ আহমদের একটি চিঠির জবাব দিতে গিয়ে লেখেন :

ঘটনাক্রমে বর্তমান মুসলিম বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে সুখী হলাম।

— এসব থেকেই ফররুখ আহমদের বিভাগপূর্বকালেই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা আন্দাজ করা যায়।

১৯৪২ সালে ফররুখ তাঁর নিজের বিবাহ উপলক্ষে 'উপহার' নামে কবিতা লেখেন।

www.pathagar.com

১৯৪৪-এর ২২শে সেপ্টেম্বর আবু রুশদ বিয়ে করেন খুলনা শহরে। এই উপলক্ষে ফররুখ '৬ই আশ্বিন' নামে একটি কবিতা লেখেন। আবু রুশদ তাঁর 'জীবন ক্রমশ' স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

> . . . আমার বিবাহ উপলক্ষে নাম-করা মুসলিম কবিদের মধ্যে পাঁচজন — হুমায়ুন কবির, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও গোলাম কুদ্দুস — তাঁদের স্বরচিত কবিতা উপহার দিয়েছিলেন। তা সোনা রূপার উপহার থেকে আমার কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল।
>
> ['উত্তরাধিকার' , জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৭]

'মৃত্তিকা'-সম্পাদক, বন্ধু কাজি আফসারউদ্দিন আহমদের বিবাহেও ফররুখ কবিতা রচনা ও সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কলকাতা রেডিও-তে এবং কোনো-কোনো সভা-সমিতিতে ফররুখ তাঁর নিজস্ব কবিতা আবৃত্তি করেন। ১৯৪৩ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে'র সপ্তম অধিবেশনে ফররুখ তাঁর 'দল-বাঁধা বুলবুলি' ও 'বিদায়' কবিতাদ্বয় পাঠ করেন ('মোহাম্মদী' পত্রিকার ১৩৫০-এর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়)। একটি সাক্ষাৎকারে আশরাফ সিদ্দিকী জানিয়েছেন :

> . . . ১৯৪৬-এ ইসলামিয়া কলেজের এক সম্মেলনে তিনি 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটি পড়েন। সভায় এমন একটি ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়, যা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। প্রধান কবি কায়কোবাদ তার বুকে জড়িয়ে ধরেন, সম্ভবত ইব্রাহীম খাঁও।
>
> ['বিবর্তন', ফররুখ স্মরণ-সংখ্যা, ১৯৮৬]

১৩৫০ বা ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে ফররুখ আহমদ যেমন 'লাশ', 'আউলাদ' প্রভৃতি কবিতা লিখেছিলেন, ১৯৪৬-এ তেমনি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় আর্ত কবি লিখেছিলেন 'বন্ধু' ('স্বাধীনতা', ২৩শে নভেম্বর ১৯৪৬), 'নিজের রক্ত' (২৭শে অক্টোবর ১৯৪৬) প্রভৃতি কবিতা। 'নিজের রক্ত' কবিতাটি অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্র থেকে কবিকন্ঠে প্রচারিত।

দেশবিভাগের আগেই ফররুখ আহমদের কবি-প্রতিপত্তি কতোখানি ছিলো তা বোঝা যায়, যখন কলকাতা বেতার থেকে তাঁর বিষয়ে একক একটি কথিকা প্রচার করেন আবদুল কাদির – যা পরে 'নবীন কবি ফররুখ আহমদ' নামে 'সওগাতে' প্রকাশিত হয় (বৈশাখ ১৩৫৪)। ইতিপূর্বে ১৯৪৫ সালে আবদুল কাদির ও রেজাউল করীম-সম্পাদিত "কাব্য-মালঞ্চে" তরুণ কবিদের মধ্যে ফররুখ আহমদেরই সর্বাধিক (তিনটি : 'শিকার',

www.pathagar.com

'হে নিশানবাহী', 'সাত সাগরের মাঝি') কবিতা গৃহীত হয়, এবং ভূমিকায় তিনি বিশদভাবে বিশ্লেষিত হন।

কলকাতা-জীবনে ফররুখ আহমদের দুটি মাত্র কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো : "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪) ও "আজাদ করো পাকিস্তান" (১৯৪৬)। কিন্তু কলকাতা-জীবনে রচিত কবিতার সংখ্যা অজস্র, "সিরাজাম মুনীরা"র (১৯৫২) রচনাকাল কবি নিজেই জানিয়েছেন : ১৯৪৩-৪৬। কবির পাণ্ডুলিপির একটি ছেঁড়া ম্লান পৃষ্ঠায় কবির হস্তাক্ষরে একটি মহার্ঘ সময়পঞ্জি পাওয়া গেছে :

১. সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৩-৪৪) পরবর্তী কবিতা নাম, অশ্রু, ঈদের স্বপ্ন ১৯৪৫-এ লেখা

২. কাফেলা : রচনাকাল (১৯৪৩-৫৮)

৩. হে বন্য স্বপ্নেরা : রচনাকাল (১৯৩৬-৫০)

৪. অনুস্বার : রচনাকাল (১৯৪৪-৪৬)

৫. বিসর্গ : রচনাকাল (১৯৪৬-এর ডিসেম্বর-৪৮)

এ থেকেও স্পষ্ট যে, কলকাতা-জীবনে তাঁর রচনার পরিমাণ বিপুল। পরবর্তীকালে প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য কয়েকটি বই-এর সূচনাও এখান থেকে হয়।

কিন্তু কী অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে — কিন্তু তাকেও জয় ক'রে — তিনি সাহিত্য-চর্চা করেছেন সেকালে (ইতিমধ্যে পিতৃআশ্রয় ছেড়েছেন : 'হাতে সেতার, পরণে শৌখিন ধুতি পাঞ্জাবি' — জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী-বর্ণিত যুবাপুরুষ ফররুখের অন্তর্লোকও বদলে গেছে আমূল) ফররুখের সেই দারিদ্র্য ও দারিদ্র্যজয়ী ছবি ধরা আছে আবদুল হক-কে লেখা একটি চিঠিতে :

দুর্গাপুর

৫-১-৪৭

বন্ধুবরেষু,

বহুদিন পর আপনার উৎসাহব্যঞ্জক চিঠি পেয়ে উল্লসিত হয়েছি। কারণ আমার অবস্থা বর্তমানে সেই রূপকথার শেয়ালের মত যাকে প্রহারান্তে আধ-মরা অবস্থায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। অবশ্য শেয়ালের সঙ্গে আমার পার্থক্য এইটুকু যে শেয়ালের অন্নচিন্তা ও বস্ত্রসমস্যা ছিল না। আমার ও দুটো ত আছেই তার উপর আছে পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ চিন্তা।

www.pathagar.com

ঐ চিন্তাতেই বিশেষ বিব্রত এবং প্রয়োজনমতো চেষ্টিত ছিলাম বলে সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কছেদ করতে হয়েছিলো। আপনি যে আত্মবিলোপের কথা লিখেছেন তা অনেকাংশে ভুল, কারণ আত্মরক্ষার সংগ্রামে আমাকে কালাতিপাত করতে হচ্ছে।

লেখার দিক থেকে অবশ্য এই কয়মাস একেবারে ফাঁকা যায়নি। ক'দিনের মধ্যেই অনেকগুলো Satire ব্যঙ্গকবিতা (ধনতন্ত্র ও অন্যান্য সামাজিক বিস্ফোটকের পক্ষে যা মূল্যবান ওষুধ হতে পারে) এবং দুই-চারটি সামান্য সিরিয়াস কবিতা লিখেছি। কাগজের অভাবে এতদিন প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এইবার প্রকাশ করার সুযোগ এসেছে। ট্যাঁকের অসচ্ছলতার দরুন আমাকে বাধ্য হয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পত্রালাপ অথবা সংস্রব বর্জন করতে হয়েছিল (কারণ পোস্টকার্ড কেনার মত পয়সা প্রচুর সংখ্যায় হামেসাই থাকতো না)। ঐ একই কারণে আপনাকে একখানা অর্ধব্যবহৃত কাগজে ক্ষুদ্র বর্জাইস অক্ষরে চিঠি লিখছি, কারণ পরিস্কার কাগজ আমার তহবিলে নাই।

যাই হোক, কলকাতা যাওয়ার পাথেয় জোগাড় করেছি, কয়েকদিন আহারের বন্দোবস্ত করতে পারলেই আমি অনতিবিলম্বে কলকাতা অভিমুখে পদচালনা করব। হয়তো এ চিঠি পাওয়ার কয়েকদিন পরেই আপনারা এই মহাকবির মুখচন্দ্র (দাড়ি আবৃত) দর্শন করে কৃতার্থ হবেন। এই উপলক্ষে প্রাথমিক আয়োজন শেষ করে ফেলেছি। নগদ আট আনা খরচ করে জুতো সেলাই এবং কয়েকটি পট্টি সংযোগ করা হয়েছে। এমনকি একটা নতুন কামিজের যোগাড়ও হয়ে যেতে পারে। পুরানো শীতবস্ত্রগুলো বর্তমানে খুব কাজে লাগছে। . . . সুতরাং যতদিন ধনতন্ত্রের কবর খোঁড়া না হচ্ছে ততদিন বাধ্য হয়ে বলতে হবে ধনতন্ত্র জিন্দাবাদ।

প্রীতিমুগ্ধ

ফররুখ আহমদ

দুই

১৯৪৮ সালে ফররুখ ঢাকায় চ'লে আসেন স্থায়ীভাবে, ঢাকা বেতারে প্রথমে অনিয়মিত পরে নিয়মিত স্টাফ আর্টিস্ট হিশেবে যুক্ত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঢাকাই ছিলো তাঁর সাহিত্যক্ষেত্র। ১৯৪৮–৭৪—এই প্রায় তিন দশক তিনি অবিরত সাহিত্য-চর্চা করেছেন। এই বছরগুলোতে তাঁর চারটি কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, প্রথম কবিতাগ্রন্থের দ্বিতীয়

www.pathagar.com

সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, চারটি শিশুকিশোরতোষ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া অনেকগুলো পাণ্ডুলিপির পরিকল্পনাও প্রস্তুত করেছেন, যার কয়েকটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর পরিকল্পিত গ্রন্থগুলোর একটি তালিকা নিচে দেওয়া হ'লো :

কবিতা

১. হে বন্য স্বপ্নেরা, ২. ইকবালের নির্বাচিত কবিতা, ৩. কাফেলা, ৪. হাবেদা মরুর কাহিনী, ৫. দিলরুবা, ৬. কুরআন-মঞ্জুষা, ৭. নির্বাচিত কবিতা।

নাটক

১. রাজ-রাজড়া (গদ্য ব্যঙ্গনাটিকা)।

ব্যঙ্গকবিতা

১. বিসর্গ, ২. ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য, ৩. হাল্কা লেখা, ৪. তসবিরনামা, ৫. রসরঙ্গ।

গান

১. রক্ত-গোলাব, ২. মাহফিল (হাম্‌দ-নাত), ৩. কাব্য-গীতি।

শিশু-কিশোরতোষ

১. চিড়িয়াখানা, ২. ফুলের জলসা, ৩. কিস্‌সা-কাহিনী, ৪. সাঁঝ সকালের কিস্‌সা, ৫. ছড়ার আসর (২), ৬.ছড়ার আসর (৩), ৭. আলোকলতা, ৮. খুশীর ছড়া, ৯. মজার ছড়া, ১০. পাখীর ছড়া, ১১.রংমশাল, ১২. জোড় হরফের খেলা, ১৩. পড়ার শুরু, ১৪. পোকামাকড়।

এর বাইরেও তাঁর অনেক কবিতা, গান, গদ্যরচনা ইত্যাদি রয়েছে।

বিভাগপরবর্তীকালে তিনি মূলত লিখেছেন 'সওগাত', 'আজাদ', 'মোহাম্মদী', 'মাহে-নও', 'দিলরুবা', 'সৈনিক', 'আজ', 'মদিনা', 'তাহজীব' ইত্যাদি পত্রিকায়, অসংখ্য ছোটো পত্রিকায় ও সংকলনে। ফররুখ কয়েকটি গদ্য-ও-কাব্য-নাট্য লিখেছিলেন। এর মধ্যে 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' ("সাত সাগরের মাঝি" গ্রন্থভূর্ত), 'তৈমুর' ও "নৌফেল ও হাতেম" রেডিও-তে প্রচারিত হয়েছে। ১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমীর উদ্‌যাপিত নাট্য-সপ্তাহে "নৌফেল ও হাতেম" মঞ্চস্থ হয়েছে। ডক্টর রফিকুল ইসলাম লিখেছেন :

www.pathagar.com

ফররুখ ভাই পাকিস্তান ও ইসলামী আদর্শের অনুরাগী ও অনুসারী বরাবর, কিন্তু তদানীন্তন পাকিস্তানী ও পূর্ব পাকিস্তানী শাসকেরা ইসলামের নামে যা করছিলেন, তাতে তাঁদের ওপরে সবচেয়ে বেশী ক্রুদ্ধ ছিলেন ফররুখ ভাই। তিনি ঐ শাসকদের ব্যঙ্গ করে 'রাজ-রাজড়া' নামে একটা নাটক লিখেছিলেন এবং তা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনীত হয়েছিলো।

['অনন্য পুরস্কার', "ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি"।]

ফররুখ আহমদ আরেকটি একাঙ্ক কাব্যনাট্য লিখেছিলেন। 'নয়া জিন্দেগী' নামে এটি 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়, পুনর্লিখিত হ'য়ে 'ইবলিস ও বনিআদম' ("কাফেলা" গ্রন্থভুক্ত) নামে 'পৃথিবী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। এটি কোথাও অভিনীত হয়েছিলো ব'লে জানা যায়নি।

ঢাকা বেতারে যুক্ত হওয়ার পর ফররুখ লেখেন অনেক আধুনিক, দেশ-প্রেমিক, ইসলামী ও উদ্দীপনামূলক গান, গজল, হাম্‌দ ও নাত্‌। এর সূচনা হয়েছিলো অবশ্য কলকাতাতেই। ফররুখ আহমদের প্রথম প্রকাশিত গান 'আহমদ আবদুল্লাহ' ছদ্মনামে 'কথা' শীর্ষে মাসিক 'মোহাম্মদী'র আষাঢ় ১৩৫২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গানটির প্রথমাংশ ছিলো এরকম : 'মোর গোপন কাহিনী জান/যে কথা জানে না নিশুত রাতের ছায়া'। পরবর্তীকালে ফররুখের কোনো-কোনো গান ও গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে — তবে এখনো তাঁর কোনো গীতিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। ফররুখের গানে যাঁরা সুর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন আবদুল হালিম চৌধুরী, আবদুল আহাদ, আবদুল লতিফ, সমর দাস, মোশাররফ হোসেন ফরিদ, ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু, শেখ লুৎফর রহমান, বেদারউদ্দিন আহমদ, কাদের জামেরী প্রমুখ ; তাঁর গানের স্বরলিপি করেছেন আবদুল লতিফ, মোশাররফ হোসেন ফরিদ, আবেদ হোসেন খান, মুনশী রইসউদ্দিন, বেদারউদ্দিন আহমদ, ধীর আলী মিঞা প্রমুখ ; তাঁর গান গেয়েছেন শামসুন্নাহার করিম, মাহবুবা রহমান, আবদুল লতিফ, নীরু শামসুননাহার, আফসারী খানম, লায়লা আরজুমান্দ বানু, বেদারউদ্দিন আহমদ, আলিমুজ্জামান (সাচ্চা), ফৌজিয়া খান প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রেডিও-র প্রয়োজনে বেশ কিছু গীতি-বিচিত্রাও ফররুখ লিখেছিলেন ; যেমন : 'সাকীনামা', 'সিন্ধু-তরঙ্গ'। গীতিনাট্যও লিখেছিলেন ; যেমন, 'আনারকলি'।

ফররুখ আহমদ কয়েকটি মাত্র গদ্য-প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এগুলি হচ্ছে : 'ইকবাল প্রসঙ্গ', 'নজরুল-সাহিত্যের পটভূমি', 'নজরুল প্রসঙ্গ', 'পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য', 'তাজকেরাতুল আউলিয়া'। তাঁর একটি অসম্পূর্ণ অপ্রকাশিত প্রবন্ধ তাঁর

www.pathagar.com

কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে। সম্ভবত এটি পঞ্চাশের দশকে রচিত। তাঁর সমকালীন কবিদের সম্পর্কে অসম্পূর্ণ এই বিবেচনাটি কৌতূহলজনক ব'লে উদ্ধৃত করছি :

> আহসান হাবীবের শিল্পানুরাগ উল্লেখযোগ্য। এদিক দিয়ে তিনি সফলতা অর্জন করেছেন। হাবীবের প্রেমের কবিতায় শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়, সমাজ সচেতনভাবে যখন তিনি কবিতা লেখেন তখনও প্রকৃত বিপ্লবীর চাইতে অনুশীলনরত শিল্পীমনের পরিচয় বেশি পাওয়া যায়।
>
> হাবীবের মত আবুল হোসেন ও মতিউল ইসলাম শিল্পানুরাগের পরিচয় দিয়েছেন, অবশ্য এই দুজন কবির মধ্যে প্রভেদও সুস্পষ্ট, আবুল হোসেনের সাম্প্রতিক কবিতায় সমাজ যেখানে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত মতিউল ইসলাম সেখানে সমাজের প্রাধান্য দিয়েছেন পরিপূর্ণভাবে। সমাজসচেতন হতে যেয়ে মতিউল ইসলামের কাব্যের স্খলন ঘটেছে।
>
> ফররুখ আহমদ ও হাবীবের জনপ্রিয় কবিতাগুলিই এ পর্যন্ত আলী আহসানের আদর্শ হয়ে আছে, যতদিন তিনি এই নির্মোকে আবদ্ধ হয়ে থাকবেন ততদিন তাঁর কাছ থেকে আমরা মৌলিক সৃষ্টি আশা করতে পারি না।

১৯৫২-র রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন ফররুখ আহমদকে যথার্থই উদ্দীপ্ত করেছিলো। ভাষা বিষয়ে তাঁর সচেতনতা অনেক আগেই দেখা গিয়েছিলো। 'উর্দু বনাম বাংলা' নামক ব্যঙ্গকবিতায় ('মোহাম্মদী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২) ১৯৪৫ সালেই তিনি আতীব্র বিদ্রূপ হেনে লিখেছিলেন, 'দুই শো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন/বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা'। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রকাশিত তাঁর 'পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' ('সওগাত', আশ্বিন ১৩৫৪) তিনি দ্বিধাহীন জানিয়েছিলেন :

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলছে। আর সবচাইতে আশার কথা এই যে, আলোচনা হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, জনগণ ও ছাত্রসমাজ অকুণ্ঠভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছে। সুতরাং এটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচিত হবে।
>
> যদি তাই হয়, তাহলে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।

"মুহূর্তের কবিতা"য় (স্মরণীয় : এই গ্রন্থের কবিতাগুচ্ছের রচনাকাল ১৯৫১-৫৯) ভাষাভিত্তিক অন্তত দুটি কবিতা আছে : 'অশেষ ঐশ্বর্য' ও 'বাংলা ভাষার প্রতি'। "ধোলাই কাব্যে"র (ফারুক মাহমুদ-সম্পাদিত) দ্বিতীয় সংস্করণে সংকলিত হয়েছে 'বাংলা ভাষা :

www.pathagar.com

অথ মানিক পীরের গান' ; এটি প্রথমে 'মানিক পীর' ছদ্মনামে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। এখন উদ্ধৃত করবো তাঁর বিশাল পাণ্ডুলিপির ভাণ্ডারের মধ্যে পাওয়া অপ্রকাশিত একটি ছোট্টো কবিতা :

ভাষা-আন্দোলনে নিহত আত্মার প্রতি

যাদের বুকের রক্তে মাতৃভাষা পেয়েছে সম্মান,
সংগিনের মুখে যারা দাঁড়ায়েছে নিস্কম্প, অম্লান,
মানে নাই কোন বাধা, মৃত্যুভয় মানে নাই যারা
তাদের স্মরণচিহ্ন এ মিনার — কালের পাহারা।
এখানে দাঁড়াও এসে মনে করো তাদের সে-দান
যাদের বুকের রক্তে মাতৃভাষা পেয়েছে সম্মান।

[৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৬৪]

এছাড়া ভাষাপ্রাসঙ্গিক কিছু গানও লিখেছিলেন। যেমন, 'মাতৃভাষা বাংলা ভাষা খোদার সেরা দান' কিংবা 'মধুর চেয়ে মধুর যে ভাই আমার দেশের ভাষা'।

ফররুখ আহমদের ব্যঙ্গকবিতা লেখার সূচনা বিভাগপূর্ব কালেই, কলকাতা পর্যায়ে। তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাঁর যে-স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিলো, সমাজের সর্বত্র ও রাজনীতিতে যে-চতুর ধূর্ত ব্যক্তিদের তিনি দেখেছিলেন, অজস্র ব্যঙ্গকবিতায় তিনি তাদের ছবি ধ'রে রেখেছেন। এ এক বিশাল আশ্চর্য চরিত্রচিত্রশালা। জীবদ্দশায় তাঁর কোনো ব্যঙ্গকবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু তাঁর অনেক ব্যঙ্গকবিতার পঙক্তি সাহিত্যামোদীদের মুখে আজো শোনা যায়, "তসবিরনামা", "নসীহতনামা", "ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্যে"র উল্লেখ অনেকেই করেছেন। ব্যঙ্গকবিতা পত্রিকায় প্রকাশকালে ফররুখ অনেকগুলো ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। সেগুলো এই :

> হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী, ইয়ারবাজ খান, মুনশী তেলেসমাত, কোরবান বয়াতী, গদাই পেটা হাজারী, আবদুল্লা বয়াতী, জাহেদ আলী ঘরামী, মানিক পীর, শাহ বেয়াড়া বাউল, ঘুঘুবাজ খান, সরফরাজ খান, মোহাম্মদ আবদুল জলিল, আহমদ আবদুল্লা, মাহবুব আবদুল্লা প্রভৃতি।

১৯৫৭ সালে তাঁর ব্যঙ্গকবিতা নিয়ে সরকারি উপর-মহলে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, এমনকি তাঁকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছে কিছুদিন, এজন্যে তিনি কয়েকদিন নিজ বাসা ছেড়ে কমলাপুরে মামার বাসায় থাকেন।

www.pathagar.com

বাঙালি-মুসলমানের ঐতিহ্যিক স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন ফররুখ। এই ঐতিহ্যিক স্বাতন্ত্র্য সন্ধানেই চল্লিশের দশকে পুঁথিসাহিত্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন একদল শিক্ষিত লেখক ও কবি। ফররুখ আহমদ পুঁথিসাহিত্যের পুনর্নির্মাণে মনোনিবেশ করেন। এদিক থেকে তিনি একটি ব্যাপক প্রভাবও সৃষ্টি করেন। সৈয়দ আলী আহসান, মুফাখখারুল ইসলাম, আবদুর রশীদ খান, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, এবং আরো অনেকেই ফররুখের অনুসরণে পুঁথির ধারানুবর্তী হয়েছিলেন ; কিন্তু ফররুখের সাফল্য তাঁরা কেউই উপার্জন করতে পারেননি। ফররুখ যে-কোনো বিশ্বাসের মতো এই ক্ষেত্রেও ছিলেন সৎ, বলিষ্ঠ, গভীর। ১৯৫২ সালে অনুজ কবি আবদুর রশীদ খানকে একটি চিঠিতে কবি লিখেছিলেন :

> সবশেষে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও পুঁথিসাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুলতানা রিজিয়ার কাহিনী একদা মাইকেলের মত মহাকবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। এরকম অসংখ্য কাহিনী আছে যা আধুনিক কবিতার আংগিকে চমৎকারভাবে রসোত্তীর্ণ হতে পারে। চেষ্টা করো।

এই চিঠি লেখা 'রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা' থেকে। 'মোহাম্মদী' অফিস, কলকাতা থেকে ১৯৪৫ সালে অন্যএক অনুজ কবি আশরাফ সিদ্দিকীকে লিখেছিলেন :

> আদমউদ্দীন সাহেবকে আমার সালাম দেবেন। তাঁর পুঁথিসাহিত্যের ইতিহাস ইতিমধ্যেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ফররুখের "হাতেম তা'য়ী" পুঁথির পুনর্নির্মাণের শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা।

ছাপ্পান্ন বছরের স্বল্পজীবী জীবনেও ফররুখ সুপ্রচুর লিখেছেলেন। কবিপত্নী লিখেছেন :

> কবি প্রচুর লেখাপড়া করতেন। লেখাপড়ার ব্যাপারে তাঁর কোনো ধরা-বাঁধা সময় ছিল না। যখন মন চাইতো বসে যেতেন কাগজ-কলম নিয়ে।

"ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা"র ভূমিকায় বলা হয়েছে :

> কবি লিখতেন দ্রুত, অনায়াস ও আবেগতাড়িত অবস্থায় ; প্রকাশের তাড়না পেয়ে বসলে পেন্সিলেও ; মোটা শিসের নীল পেন্সিলেও একটি লেখা দেখেছি আমরা ; ভাঁজ-করা একটি কাগজের এপিঠে-ওপিঠে ছড়ানো-ছিটোনো একরাশ সনেট দেখেছি।

আর অবিরল পরিমার্জনার অভ্যাস ছিলো। বস্তুত ফররুখ পাণ্ডুলিপিতে তো পরিশোধন করতেনই, পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতারও পরিশোধন করতেন। এমনকি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পরও অনেক সময় তাঁর কবিতা পরিমার্জনার হাত থেকে নিস্তার পেতো না। এরকম

www.pathagar.com

ক্রমাগত পরিশোধিত-পরিমার্জিত হ'তে-হ'তে তাঁর কবিতা তাঁর আরাধ্যের ও স্বপ্নের নিকটবর্তী হ'তো। "হাতেম তা'য়ী" কাব্যের রচনাকাল কবির একটি পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেছে, ১৯৫৩-৫৫ ; অনেক বছর ধ'রে অবিশ্রাম সংযোজন-বিয়োজনের পর কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রেমের জটিল পথে' (শ্রাবণ ১৩৫৩) সনেটটি অনেক পরিমার্জিত হ'য়ে 'প্রেম-পন্থী' নামে "সিরাজাম মুনীরা" কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়। 'নয়া জিন্দেগী' কাব্যনাট্যটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিলো 'মোহাম্মদী'-তে (কার্তিক ১৩৫৯) ; দশ বছর পরে বহু পরিবর্তিত হ'য়ে কাব্যনাট্যটি 'ইবলিস ও বনিআদম' নামে 'পৃথিবী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৩৬৯)। "দিলরুবা" কাব্যগ্রন্থটি 'দিলরুবা' পত্রিকার সাতটি সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩৫৬ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭) ধারাবাহিক মুদ্রিত হয়েছিলো ; পরে প্রকাশের জন্য কবি যে-পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, তা বিপুলভাবে পরিশোধিত ও পুনর্বিন্যস্ত হয়। আমরা "দিলরুবা" কাব্যের পঞ্চম স্তবকের ৬-সংখ্যক সনেটটি উদ্ধৃত করছি — উদ্ধৃত হচ্ছে পরিমার্জিত চূড়ান্ত পাঠ ("ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা"-র প্রথম সংস্করণে এই পাঠই পাওয়া যাবে), পাদটীকায় পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ ('দিলরুবা', অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) :

দিও না নতুন তথ্য বলিও না তত্ত্বকথা কোন
(পণ্ডিতজনের মুখে তত্ত্বকথা শুনিয়াছি ঢের,
পাইনি প্রশান্তি আমি[১] পাই নাই সান্ত্বনা কখনো
তৃষ্ণার সঞ্চয় তা'তে[২] মেলেনি অতৃপ্ত হৃদয়ের)
তার চেয়ে কাছে এসো, আরো কাছে, একাগ্র উন্মুখ
উত্তপ্ত ঊষর এক প্রাণহীন জীবনের তীরে,
আমার কঠিন বক্ষে রাখি স্বপ্ন সুরভিত বুক[৩]
সুরের[৪] মুহূর্ত মোর সুষমায় দাও তুমি ঘিরে।
আকাশের রহস্য বা সামুদ্রিক ঐশ্বর্যের কথা
নতুন নহে তো[৫] আর (পৃথিবী হ'য়েছে পুরাতন) ;
তোমার না বলা কথা, চাঞ্চল্য অথবা নীরবতা
অজ্ঞাত রহস্যে ঘেরা চিরদিন রহিবে নূতন।

---

১ কভু
২ কভু
৩ আমার কঠিন বক্ষে রাখো তব সুকোমল বুক
৪ স্বপ্নের
৫ নহে কো

www.pathagar.com

কথা বলিও না কোন, রাখো বক্ষ এ বুকে আমার
স্পর্শে, গন্ধে, বর্ণে মিশে দুই সত্তা হোক একাকার।।

গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতার পাঠও যে তিনি কী-বিপুলভাবে পরিবর্তন করতেন, তার উদাহরণ প্রাপ্তব্য "মুহূর্তের কবিতা"-র প্রথম সংস্করণ (১৯৬৩) এবং জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৭৬) থেকে। এই বইয়ের এমনকি উৎসর্গ-কবিতাও কবি পরিশোধন করেছিলেন (এটি অবশ্য দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদক বর্জন করেছেন)।

কঠোর আদর্শবাদী হ'লেও ফররুখ ছিলেন প্রাণ-চঞ্চল মানুষ, সমসাময়িক কবি ও বন্ধু তালিম হোসেনের ভাষায়, 'অন্তরঙ্গ মউজী চরিত্রে'র ('ফররুখ আহমদ ও আমি', সাহিত্যপৃষ্ঠা, দৈনিক ইনকিলাব, ২৮-১১-৮৬)। ১৯৫২ সালে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে সংকট' নামক প্রবন্ধের একটি শানিত জবাব দেওয়ায়, তালিম হোসেন পেলেন ফররুখের একটি সোল্লাস পত্র :

কমলাপুর
১৬-১২-৫২

আস্-সালামু আলায়কুম—

মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

খাঁচাটা অচল হয়ে পড়েছে।

নড়নচড়ন রহিত।

নৈলে নিজেই যেতাম মোবারকবাদ জানাতে।

কয়েকবার পড়েছি তোর লেখাটা।

আমি নিজেই প্রেরণা পেয়েছি, পদ্যও লিখে ফেলেছি একটা 'কৈফিয়ৎ' নাম দিয়ে।

আমাদের কথা এবার তোকেই বলতে হবে।

আশা করি মুজাহিদের কলম শেষ পর্যন্ত লড়বে।

এনোফিলিস নয় — রুমী-ইকবালের খান্দানে শাহীন এবার পাখা মেলবে।

এগিয়ে যাও। আমরা তোমার অনুবর্তী হবো। শরীরটা সুস্থ হলেই আশা করি দেখা হবে।

ইতি

ফররুখ আহমদ

www.pathagar.com

পুনশ্চ : গদ্যের স্টাইল দেখে একটা লোভ হচ্ছে, কিন্তু এখন নয় পরে জানাবো। বাসায় ওদেরকে আমার স্নেহ জানিও। মিল্লাতের রহিমুদ্দিন সিদ্দিকী ও হাসান জামানের সঙ্গে সুবিধামতন একটু আলাপ কোরো।

ঐ 'অন্তরঙ্গ মউজী চরিত্র' যেমন ফররুখের অসংখ্য ব্যঙ্গকবিতায়, দারিদ্র্যজয়ী সংগ্রামজয়ী শিল্পতন্ময়তায় অভিব্যক্ত হয়েছে তেম্নি হয়েছে সপ্রাণ আড্ডায়। রেডিওর 'আবন মিঞা'র রেস্তোরাঁয় তাঁকে ঘিরে সমকালীন শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-সংস্কৃতিসেবীদের তুলকালাম আড্ডা বসতো।

ফররুখ আহমদ তাঁর জীবৎকালে চারটি পুরস্কার পান : প্রেসিডেন্ট পুরস্কার, 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' (১৯৬০) ; বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬০) ; "হাতেম তায়ী" গ্রন্থের জন্য আদমজী পুরস্কার (১৯৬৬) ; "পাখীর বাসা" গ্রন্থের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৬)। 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' পাওয়ার পর ১৯৬১ সালে ঢাকার সাহিত্যিক ও শিল্পী-সংস্কৃতিসেবীরা ফররুখ আহমদের সম্মানে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সভাপতিত্বে ঢাকা হলে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধনা-বাসরে ফররুখ আহমদের সাহিত্যকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন সৈয়দ আলী আহসান, মুনীর চৌধুরী, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, শামসুল হুদা চৌধুরী প্রমুখ। ফররুখ আহমদের কবিতা আবৃত্তি করেন শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বদরুল হাসান, সালমা চৌধুরী, শবনম মুশতারী প্রমুখ। আবদুল আহাদ-পরিচালিত ও ফররুখ আহমদ-রচিত সংগীত-বিচিত্রায় অংশ নেন আবদুল লতিফ, ফরিদা ইয়াসমিন, আফসারী খানম, বিলকিস নাসিরুদ্দিন, রওশন আরা বেগম, ফজলে নিজামী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কবিকে ফুলের তোড়া ও একটি মানপত্র উপহার দেওয়া হয়। মানপত্রটি পাঠ করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। মানপত্রে লেখা হয় :

কবি ফররুখ আহমদ

আপনাকে সংবর্ধনা জানানোর সুযোগ পেয়ে আজ আমরা একাধিক কারণে আনন্দবোধ করছি।

আপনি সে-ই মুষ্টিমেয় সাহিত্যসেবীদের একজন, যাঁদের সাহিত্যিক অভিনিবেশ ঐকান্তিক নিষ্ঠায় বিশিষ্ট। সমকালীন সাহিত্যের পাঠক-মাত্রই জানেন, সেখানে

www.pathagar.com

যার রাজত্ব তার নাম নৈরাজ্য। নিরাসক্ত সাহিত্যসেবীর সংখ্যা অল্প। নিরংকুশ আদর্শবাদ সর্বত্র সংকুচিত। সাহিত্যিক মূল্যবোধে আস্থা আজ ক্ষীয়মান। কোলাহল হয়ত বা আছে কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সাধনা নেই। আসলের সঙ্গে নকলের, খাঁটির সঙ্গে মেকীর মিশ্রণে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে অল্প ক'জন সাহিত্যসেবী — যাঁরা মূলাবোধের বুনিয়াদকে দৃঢ় করার সাধনায় অবিচলিত থেকেছেন, যাঁদের নিষ্ঠায় আমরা আমাদের ভবিষ্যতের আশাকে আলোকিত দেখেছি, আপনি তাঁদের একজন। শুধু একজনই নন, আপনি তাঁদের অগ্রপথিক।

আমাদের সংস্কৃতিক রুচিকে আর যা-ই হোক, পরিশীলিত বলা কঠিন। সে রুচি একদিকে স্থবির গ্রাম্যতায় আচ্ছন্ন, অন্যদিকে উৎকেন্দ্রিক স্থূলতায় উৎকট। রুচিকে সংস্কৃত করার দায়িত্ব সাহিত্যসেবীর। সে দায়িত্ব পালনে সকল সাহিত্যিক সক্ষম হননি, অনেকে হয়ত তাকে দায়িত্ব বলেই মনে করেননি। আপনার সাধনায় আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক রুচিকে পরিশীলিত তীক্ষ্ণতায় উজ্জ্বল করে তোলার আন্তরিক প্রয়াস দেখেছি। যে পথে এ সংস্কার সম্ভব বলে আপনি মনে করেছেন, যে পথে আপনি আলো ধরে চলেছেন, তার বৈশিষ্ট্য বুঝি সকল সাহিত্যসেবীর পক্ষে প্রণিধানযোগ্য। ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞানের, উত্তরাধিকারের সঙ্গে নতুন অর্জনের সমন্বয়ে সে পথটি গঠিত। প্রবহমান ঐতিহ্যধারাকে উপাদান হিশেবে গ্রহণ করে আপনার সাহিত্যচর্চা নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিগন্ত খুঁজছে।

স্থবিরতা নয়, উৎকেন্দ্রিকতাও নয়, আপনার সাহিত্য যা শেখায় তা আত্মস্থ হয়ে নিজেকে ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করে যাওয়ার শিক্ষা। গ্রাম্যতা ও উৎকেন্দ্রিকতার দুঃসহ দাহে যারা পীড়িত তাদের কাছে এ আত্মস্থ অন্বেষা এক আশার খবর।

এ দেশের মননশীল পাঠকমহলে আপনার প্রতিভার স্বীকৃতি নতুন নয় ; তার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির সমন্বয় নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। আপনাকে সংবর্ধনা জানাতে এসে আজ আমরা গৌরব বোধ করছি। কেননা, আপনার সম্মান তো আমাদের আশার সম্মান ; আপনার সংবর্ধনা তো আসলে আমাদের অগ্রসর চেতনারই সংবর্ধনা।

আপনার জীবন দীর্ঘ হোক, নতুন নতুন সাফল্যে সমৃদ্ধ হোক — এই আমাদের কামনা।

—আপনার

শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ও গুণগ্রাহীজন।

ঢাকা ২রা বৈশাখ, ১৩৬৮

www.pathagar.com

১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সরকার ফররুখ আহমদকে 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাবে ভূষিত করলে তিনি তা প্রত্যাখান করেছিলেন।

মরণোত্তর কালে ফররুখ আহমদকে তিনটি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে : 'একুশে পদক' (১৯৭৭), 'স্বাধীনতা পুরস্কার' (১৯৮০) ও 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার' (১৯৮৪)।

১৯৭১ সালের শেষে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ফররুখ আহমদ একান্ত গৃহবাসী হ'য়ে পড়েন। কিন্তু তখনো নিভৃতে সাহিত্যচর্চা করেছেন। কোরআন-শরীফের পূর্বকৃত তরজমা পরিমার্জনা করেছেন ; হাম্‌দ্‌ ও নাত্‌ নতুন লিখেছেন ও প্রাক্তন লেখা পরিমার্জনা করেছেন ; গাদ্দাফি প্রাসঙ্গিক একগুচ্ছ কবিতা লিখেছেন ; 'নজ্‌রে আকিদাত' নামে একটি উর্দু দীর্ঘ কবিতার তরজমা করেছেন ইস্কাটন মসজিদের ইমামের সহযোগিতায় ; হিটলারের সঙ্গে সংলাপ — এমন একটি বিষয় নিয়ে পেন্সিলে একটি গদ্যরচনা লিখেছেন ; আর লিখেছেন মৃত্যুর দু'মাস আগে অসামান্য একটি সনেট :

১৯৭৪

(একটি আলেখ্য)

স্বপ্নের অধ্যায় শেষ। দুঃস্বপ্নের এ বন্দী শিবির
সাত কোটি মানুষের বধ্যভূমি। দেখ এ বাংলার
প্রতি গৃহে অপমৃত্যু ফেলে ছায়া তিক্ত হতাশার,
দুর্ভিক্ষের বার্তা আসে, আসে মৃত্যু নিরন্ধ্র রাত্রির।

বাষট্টি হাজার গ্রাম উৎকণ্ঠিত, নিভৃত পল্লীর
প্রতি পথে ওঠে আজ হাহাকার তীব্র বুভুক্ষার
চোখে ভাসে চারদিকে অন্ধকার — কালো অন্ধকার ;
ক্ষুধা, মৃত্যু ভাগ্য আজ স্তিমিত এ ভ্রান্ত জাতির।

এ মুহূর্তে কী উজ্জ্বল রাজধানী ! — নতুন শহর
অত্যুগ্র যৌবন-মদে মত্তা যেন নটিনী চঞ্চল,
কাটায় উল্লাসে তার জীবনের উদ্দাম প্রহর।
উপচিয়া প'ড়ে যায় পানপাত্র ফেনিল ; উচ্ছল ;

www.pathagar.com

নির্লজ্জের রঙ্গমঞ্চে অকল্পিত বিলাসের ঘর,
দুচোখ-ধাঁধানো রূপে ; নগ্ন, মেকী ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল।।

[১লা আষাঢ় ১৩৮৯, ২৩শে জমাদিয়ল আউয়াল ১৩৯৪]

সাময়িকপত্র সম্পাদনা

ফররুখ আহমদ স্বনামে কোনো পত্রিকা সম্পাদনা করেননি। তবে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-সম্পাদিত 'মাসিক মোহাম্মদী'-তে কয়েক মাস ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিশেবে কাজ করেন। সম্ভবত ১৯৪৫-এর মার্চ মাসে তিনি 'মোহাম্মদী'তে যোগ দিয়েছিলেন ; ঐ বছরেই ডিসেম্বর মাসে কাজে ইস্তফা দেন। সম্পাদক হিশেবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। নতুন ও সমসাময়িক লেখক ও শিল্পীদের প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন, ভালোভাবেই পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন কিন্তু একটি ঘটনায় পট পরিবর্তিত হ'য়ে গেলো।

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪৫ সালে কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সাফল্যের জন্যে শুকরিয়া দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রায় অন্যান্য স্লোগানের মধ্যে 'লড়াক লেঙ্গে পাকিস্তান' ধ্বনিত হচ্ছিলো। এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ্ লিখেছেন :

> . . . বহু সংখ্যক সাংবাদিকের সহিত নানা গালগল্প করিতে করিতে ধর্মতলা স্ট্রীট ধরিয়া আমরা পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকি। কবি ফররুখ আহমদও আমাদের সঙ্গে অনেক দূর রাস্তা অতিক্রম করিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাকে ১৯৪৫ সালের পূর্ব হইতে চিনিতেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার সহিত একমত হইবেন, এই আদর্শনিষ্ঠ লোকটির কথাবার্তায়, বেশভূষায়, চালচলনে গত প্রায় দুই যুগের মধ্যে অতি সামান্যই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পান ভর্তি মুখে পথ চলিতে চলিতে তিনি ঘাড় নাড়িয়া আমাদিগকে তখন বলিতে থাকেন, তিনি একটি সুন্দর কবিতা রচনার মালমশলা পাইলেন।
>
> [পৃ . ৪৭৮, "যুগ-বিচিত্রা"]

এভাবেই ফররুখের 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' কবিতাটি লেখা হয়। ফররুখ দৈনিক 'আজাদ' অফিসে গিয়ে কবিতাটি 'আজাদে' ছাপার জন্য আবুল কালাম শামসুদ্দীনের হাতে দেন। কিন্তু পরদিন কবিতাটি ঈষৎ পরিবর্তিত হ'য়ে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-র নামে ছাপা হয়।

www.pathagar.com

দুঃখের বিষয়, আবুল কালাম শামসুদ্দীন এই ঘটনা যে-সুরে বর্ণনা করেছেন, তাতে মনে হয় মোহাম্মদ আকরম খাঁ তেমন অপরাধ করেননি। তিনি লিখেছেন :

> পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি 'আজাদে'র সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কবিতাটি ছাপা হয়েছে — কিন্তু মওলানা সাহেবের নামে। দেখলাম, কবিতাটির অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। অনেক শব্দ বদল করা হয়েছে এবং কয়েক পংক্তি বাড়ানো হয়েছে। বস্তুত তখন আর সে কবিতাটিকে ফররুখ আহমদের বলে চিনবার উপায় ছিল না। কারণ শব্দের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটির ছন্দও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।
>
> [পৃ . ২১২, "অতীত দিনের স্মৃতি"]

কিন্তু একটি স্লোগানকে কবিতায় রূপান্তরের সম্ভাবনার চিন্তা ও মূল রূপান্তরটি তো ফররুখেরই , অন্য-কেউ ঈষৎ পরিবর্তন ক'রে তার রচয়িতার দাবি করতে পারেন না। মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ লিখেছেন :

> পর দিবসের 'আজাদে' কবিতাটি মওলানা সাহেবের নামে প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আশ্চর্যান্বিত হইয়া পড়ি। এতদসত্ত্বেও আমাদের ধারণা হয়, ভুলক্রমেই হয়ত উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার একটু পরে আমরা জানিতে পারি, জনাব ফররুখ আহমদ পদত্যাগ করিয়া অফিস হইতে চলিয়া গিয়াছেন। কারণ, 'আজাদ' সম্পাদক জনাব শামসুদ্দীন নাকি তাঁহার অনুরোধ সত্ত্বেও উক্ত ভ্রম সংশোধন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। তৃতীয় দিন জনাব ফররুখ আহমদ 'মিল্লাত' অফিসে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে জানান, তিনি 'আজাদ', মওলানা সাহেব এবং জনাব শামসুদ্দীনের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা আনয়ন করিতে যাইতেছেন। আমরা তাঁহাকে এই কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ জানাই। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই ব্যাপারে কলিকাতার মুসলমান শিক্ষিত সমাজে মওলানা সাহেব এবং জনাব শামসুদ্দীনকে লইয়া বেশ কিছু কাল বিরূপ সমালোচনা চলিয়াছিল।
>
> [পৃ . ৪৭৯, "যুগ-বিচিত্রা"]

ফররুখ আহমদের সাময়িকপত্র সম্পাদনার ইতি এখানেই ঘটে।

কতিপয় চরিত্রবৈশিষ্ট্য

ফররুখ আহমদ অনমনীয় ও নিরাপোষ আদর্শবাদী, তোষামোদবিমুখ, সত্যবাদী, স্পষ্টবাদী, নির্লোভ, অবৈষয়িক, উদার, অতিথিবৎসল, আত্মপ্রত্যয়ী ও আনন্দময় ছিলেন।

www.pathagar.com

শেষ জীবন, মৃত্যু, মৃত্যূত্তর প্রতিক্রিয়া

১৯৭১-এর পর ফররুখ আহমদ নিঃসঙ্গ ও গৃহবাসী হ'য়ে পড়েন। চাকরি সংক্রান্ত কিছু জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিলো, তা অপসারিত হ'য়ে ১৯৭৩-এর মধ্যভাগে তাঁর বেতারের চাকরিতে পুনর্বহালও হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর শরীর ও মন ক্রমাগত ভেঙে পড়তে থাকে। কিছু সাহিত্যচর্চা করেছিলেন, কিন্তু তা অনেকখানি অভ্যাসবশত। তবু তখনো তাঁর মধ্যে একটি অপরাজিত সত্তা শেষ-পর্যন্ত কাজ ক'রে গেছে। দু-একটি সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। কবির প্রকাশক তৈয়েবুর রহমান লিখেছেন :

> যখন জানতে পেরেছি কবির বড় মেয়ে মারা গেছেন, কবিও অর্থকষ্টে আছেন, তাঁর কাছে ছুটে গেছি। ফররুখ আহমদ তখনও নিজের অভাব-অভিযোগের কথা বলতে নারাজ। বলেছেন ভিন্নপ্রসঙ্গে কথা বলতে। বাংলাদেশ হবার পর যখন প্রথম তাঁকে দেখতে গিয়েছি, তখনও তিনি আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। ভাবীকে ডেকে বলেছেন, 'দ্যাখো, তৈয়ব ভাই এসেছেন।' জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও তাঁকে হতাশ হতে দেখিনি। মৃত্যুর মাসখানেক আগে তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা। ওলী-আউলিয়াদের কথার উদ্ধৃতি টেনে বললেন, 'তাঁরা বলছেন, ভয় নেই। পরিস্থিতি বদলাবে।'
>
> ['অন্তরঙ্গ আলোকে ফররুখ', "ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি"]

সমকালীন কবি মুফাখ্খারুল ইসলাম লিখেছেন :

> বাংলাদেশ হওয়ার পরেও কাওরান বাজারে বাজার করে ফিরে আসার সময় অনেকদিন দেখা হয়েছে। পথে দাঁড়িয়ে অনেক আলাপ হয়েছে দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিল্প নিয়ে। মনের কথা বেশী প্রকাশ করা তিনি পছন্দ করতেন না। আগেকার মত উৎসাহ না থাকলেও কথায় তিনি নৈরাশ্য প্রকাশ করেননি। জীবনে তাঁর নৈরাশ্য থাকলেও তাঁর লেখায় নৈরাশ্য ছায়াপাত করেছিল বলে আমার জানা নেই।
>
> ['ফররুখ স্মরণে' , ঐ]

ফররুখের মৃত্যুর আগে জ্বর হয়েছিলো। শেষ ক'বছর অসম্ভব অর্থাভাব ছিলো, ফলে যথাযথ চিকিৎসা হয়নি। ১৯শে অক্টোবর ১৯৭৪, সন্ধ্যাবেলা, ইস্কাটন গার্ডেনের ফ্ল্যাটে কবি ইন্তেকাল করেন। শেষ মুহূর্তগুলির বর্ণনা আছে একজন স্বজনের রচনায় :

www.pathagar.com

ঈদের পরদিন (১৯ অক্টোবর) বিকেলবেলা আমি সস্ত্রীক ফররুখ ভাইএর বাসায় গেলাম। সামনের কামরার দোরগোড়ায় পা দিতেই একটি ছেলে ব্যস্তভাবে এসে খবর দিল : চাচা, আপনি এসে ভালো করেছেন। আব্বার শরীর খুব খারাপ। আমি কালবিলম্ব না করে ফররুখ ভাইয়ের দিকে নজর পড়তেই আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। তাঁর বাকশক্তি তখন সম্পূর্ণ রুদ্ধ, স্মৃতিশক্তিও লুপ্ত। গোটা শরীর যেন একটা জীবন্ত কঙ্কাল, বিছানায় শুয়ে তিনি অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ করছেন। কখনো কখনো উঠে বসার চেষ্টা করছেন। একবার তাঁকে ধরে বসিয়ে দিলামও কিছুক্ষণের জন্যে। কিন্তু কিছুতেই তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। এক পর্যায়ে তিনি বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চাইলেন। চোখ-মুখের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো, হঠাৎ যেন তিনি আমার চেহারা শনাক্ত করে ফেলেছেন। তাই ব্যগ্র হয়ে কিছু বলতে চাইছেন। কিন্তু না, কিছুই তিনি বলতে পারলেন না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর মুখের ভাবভঙ্গি আবার পাল্টে গেল।/. . . ইতিমধ্যে মাগরিবের আযান হলো। আমি এবং ড. জামান একত্রে নামাজ পড়লাম। সালাম ফিরানোর সাথে সাথে হঠাৎ ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ শোনা গেল। একটি ছেলে ছুটে এসে আমাদের খবর দিল, 'আব্বা আর নেই।'

['শেষ মুহূর্ত', মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ঐ]

কবির ইন্তেকালের পরে তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কবি-সাহিত্যিক, রেডিওর সহকর্মীবৃন্দ, গায়ক-গায়িকা কবির বাসভবনে উপস্থিত হন। রেডিও ও টেলিভিশনে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ প্রচারিত হয়। পরদিন অনেক দৈনিক পত্রিকা সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এরকম কয়েকটি সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় এখানে সংকলিত হ'লো :

অকস্মাৎ শরতের সুনীল আকাশের বুক চিরে বজ্রপাত হল। আমরা জানলাম বাংলার কাব্যাঙ্গন থেকে সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রদীপটি নিভে গেল। কবি ফররুখ আহমদ চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। সাত সাগরের মাঝি বহু ক্লান্তির সমুদ্র পার হয়ে এসে অনন্ত বিশ্রামের নিবিড়ে আচ্ছন্ন হলেন। হয়তো একদিন 'আবার' পর্দা পেরিয়ে ভোর হবে, নারাংগী বনে সবুজ পাতা কাঁপবে প্রাণরসে থিরথির করে। সাত সাগরের উত্তাল কলরোল এসে আঘাত হানবে দুয়ারে, কিন্তু মাঝির ঘুম আর ভাঙবে না । ফররুখ আহমদ আজ নেই। অন্ধকার এসে

www.pathagar.com

গ্রাস করেছে আলোকের উদ্দাম বিহঙ্গকে। যে বিহঙ্গের কন্ঠে নিয়ত ধ্বনিত হয়েছে গান কবিতা ছড়া আর সনেট, যে কন্ঠে শুনেছি শিশুর মত সরল হাসি, সে কন্ঠ আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে। আর কোনদিনও কাকলীমুখর হয়ে উঠবে না।

একথা সবাই জানেন, কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন ইসলামী রেনেসাঁর প্রবক্তা। সত্যি বলতে কি কাজী নজরুল ইসলামের পর মুসলিম কবি হিসাবে ফররুখ আহমদই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার দাবীদার। তিনি ইসলামিক ভাবধারার অনুসারী হ'লেও তাঁর মতাদর্শ কখনই তাঁর কবিসত্তাকে সংকীর্ণতায় আবদ্ধ করতে পারেনি। সেই জন্যেই তাঁর কবিতায় মানবতার বাণী হয়েছিল সোচ্চার। দুর্ভিক্ষের বছর তেরশো পঞ্চাশ, সেই মহামন্বন্তরের পটে লেখা তাঁর 'লাশ' কবিতা আজকের এই চুয়াত্তরের বাংলার পটে উচ্চারিত হয়ে উঠেছে পুনর্বার —

পৃথিবী চষিছে কারা শোষণে, শাসনে
সাক্ষ্য তার রাজপথে জমিনের 'পর
সাড়ে তিন হাত হাড় রচিতেছে মানুষের অন্তিম কবর।
পড়ে আছে মৃত মানবতা
তারি সাথে পথে মুখ গুঁজে।
আকাশ অদৃশ্য হলো দাম্ভিকের খিলানে গম্বুজে
নিত্য স্ফীতোদর
এখানে মাটিতে এরা মুখ গুঁজে মরিতেছে ধরণীর 'পর।

পঞ্চাশের মন্বন্তর আর চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের শবের মিছিলে সেই কবির বাণীই মূর্ত হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ এবং অনাচারের বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদস্বরূপ।

কবির 'সিন্দবাদ', 'ডাহুক', 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'পাঞ্জেরী' এগুলো বাংলা সাহিত্যের প্রথম পঙক্তির অনুপম কবিতাগুলিরই মাঝে আসীন আপন কাব্যগুণ ও সৌন্দর্যে।

ছাত্রজীবন থেকেই এই কবি পাঠকসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'পরিচয়', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাময়িকীগুলোতে একনাগাড়ে তাঁর

www.pathagar.com

জন্ম : ১৯১৮ ফররুখ আহমদ মৃত্যু : ১৯৭৪

www.pathagar.com

সৈয়দ হাতেম আলী : ফররুখ আহমদের পিতা

www.pathagar.com

সিরাজাম মুনীরা — মুহম্মদ মুস্তফা (দঃ)

(মুহম্মদ সাদেক)

পূর্বাচলের সমুদ্র হতে যে আমার সাধনসাগরে
তার সুমধুর বাতাসে ওড়ে নীলাম্বু নেনকত।
ঘুম ভাঙলো কি? হে উদাস পাখী মম নীলিমায় ভাসমান
কাদের কণ্ঠ হতে কহিছে বাণী এবং কিসের গান?
এরা কি সুর ঘন অন্ধকার জগতের মেঘে প্রশান্তি?
এবং সুরভি সুরে তবে কি তাহারে মুগ্ধ প্রণয় নীড়?
ও বধির বোধ আমার এবং তুলিছে কি তার নীলাকাশে
যে গহনবাণী আনন্দের সুগভীর সুরে ডাকে?

ও আমে আমে যে কিরণ সাতরঙা তার নীল পাখায়,
আমাদের বুক ঘন হয়ে ওঠে নীল সুরভি সুষ্টায়।
সোনালি আলোয় সুগন্ধ পাতি আসে পুষ্প শিশির মলয়।
স্থির কিরণে আজো উদ্ভাস আলোকের সুর আকাশে পাতা।

হে অচেনা পাখী! কোন আকাশের গভীরতা হতে উদ্ভিন্ন উষা?
তোমার পক্ষ সঞ্চারে তাহা উষ্ণ উষ্ণ উদ্ভিন্ন ফুটি
তোমার ডানার ধ্বনি কি ছিলায় শিথিল মানস কাঁপে কবিল
কত অজ্ঞাত সাগরে সহসা ভেসে ওঠে ওই সোনার দ্বীপ।
তাহা সুমধুর তোমার সুরের সাগরের অন্তরতল
তোমার ছায়াতে চুমুন করে উন্ন মানস শতদল
আলো কিরণ! মুক্ত নীলের সকল বাণী বরণের হেন,

www.pathagar.com

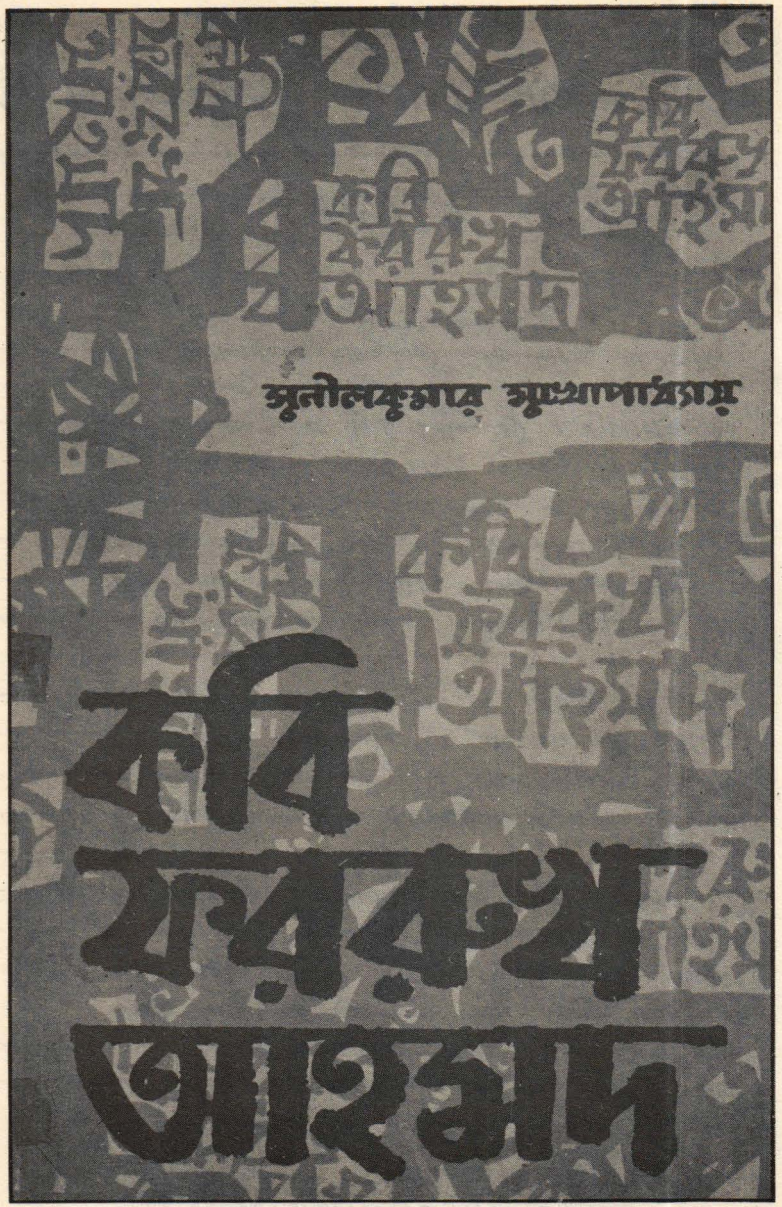

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় – রচিত "কবি ফররুখ আহমদ" (জুন ১৯৬৯) গ্রন্থের প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদশিল্পী : কালাম মাহমুদ। এই বইটিই ফররুখ আহমদের সাহিত্যকর্ম বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

www.pathagar.com

কবিপত্নী বেগম ফররুখ আহমদ (১৯৭৬)।

www.pathagar.com

Durgapur
11.8.43.

My Dear Jamaiyah,

I was in receipt of your letter. I was glad to learn that you & Siddiqun nisa were fit well. We are thank Allah pretty well here. Expecting your [illegible] the same. Please let me know how you are getting on with your office work and whether you are trying for the post in the A.P.'s office. As the present post is [illegible] temporary I think you should be on the look out for a permanent post. Shamsunnahar, your daughter, is keeping well.

With my best wishes.

Your affd
Nurul Huda

কবির শ্বশুর জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা দুর্গাপুর থেকে ১১-৮-৪৩এ কলকাতায় কবিকে এই পত্র লিখেছিলেন। কবি তখন কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিঙে বেঙ্গল গর্ভনমেন্টের 'অফিস অফ ইনসপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশে'র এ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার হিশেবে কর্মরত।

www.pathagar.com

প্রচ্ছদ : সাত সাগরের মাঝি (দ্বিতীয় সংস্করণ)। শিল্পী : কামরুল হাসান।

www.pathagar.com

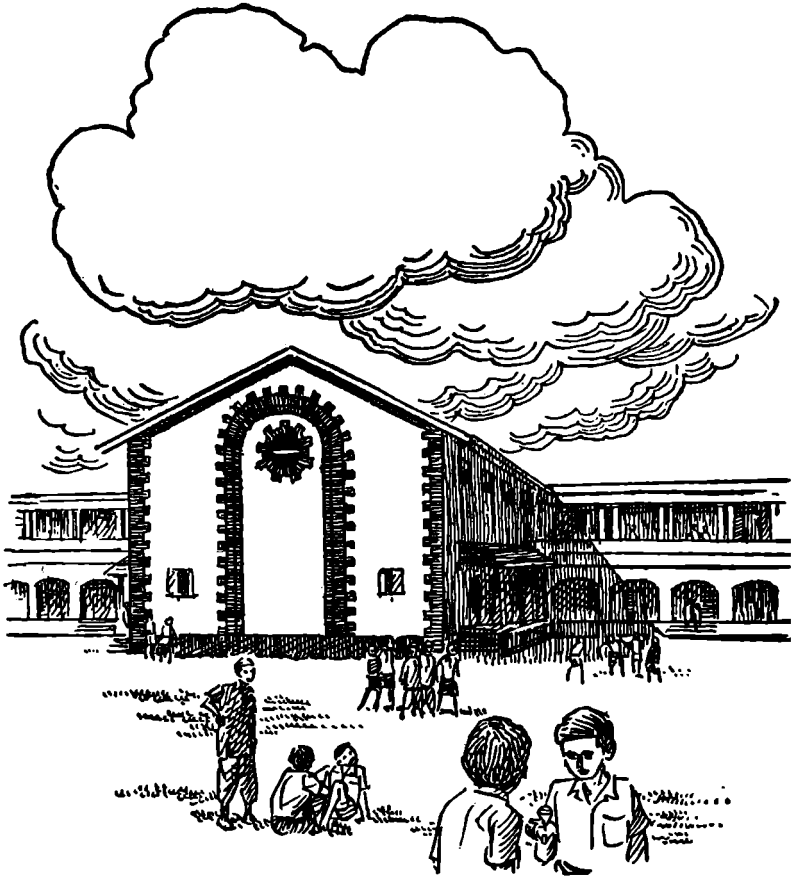

বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল : সত্যজিৎ রায় – অঙ্কিত। বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায় "যখন ছোট ছিলাম" (১৩৮৯) গ্রন্থে তাঁর সহপাঠী ফররুখের প্রসঙ্গটি এভাবে অবতারণা করেন : 'আমাদের ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে অনিলের কথাটা আলাদা করে বলা দরকার, কারণ তার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ছিল। অনিল খুব অল্প বয়সে বেশ কিছুদিন সুইজারল্যান্ডে ছিল একটা কঠিন ব্যারাম সারানোর জন্য। সেরে উঠে দেশে ফিরে ১৯৩৩-এ ভর্তি হয় আমাদের ক্লাসে। তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। সঞ্জয়ের যেমন ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, অনিলেরও পূর্বপুরুষের মধ্যে একজন বিখ্যাত বাঙালী ছিলেন। একবার বি. টি. র এক ছাত্র আমাদের ক্লাস নিচ্ছেন, রোমান ইতিহাস পড়াতে গিয়ে এট্রুরিয়ার রাজা লার্স পোরসিনার নাম উল্লেখ করা মাত্র মিচ্‌কে ফররুখ বলে উঠেছে, 'কী বললেন স্যার, লর্ড সিন্‌হা?' পিছনেই বসেছিল অনিল। সে ফররুখের মাথায় মারল এক গাঁট্টা। কারণ আর কিছুই না, এই লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ ছিলেন অনিলের দাদামশাই।' — ফররুখের মধ্যে এই রসিকতাবোধ সব সময়ই জাগ্রত ছিলো।

www.pathagar.com

অজস্র কবিতা ও সনেট প্রকাশিত হয়ে চলেছিল। প্রায় এক হাজারেরও বেশী সনেট তিনি রচনা করেছেন।

উভয় বাংলায় এই একটি ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু সংখ্যাতেই নয় কাব্যগুণেও তাঁর সনেট তুলনাহীন। সর্বোপরি রচনাভঙ্গী অত্যন্ত মৌলিক ও সৃজনশীলতার পরিচয়ে সমৃদ্ধ। নতুন নতুন শব্দ উপমার ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয়। গেটের মহাকাব্যের আঙ্গিকশৈলীতে সজ্জিত করে তিনি রচনা করলেন 'হাতেম তায়ী'। শিশু-সাহিত্যেও তাঁর দান রয়েছে অসীম। তিনি লিখেছেন এবং লিখেই চলেছিলেন। এখনও তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে বাইশখানা।

ফররুখ আহমদ একজন বড় কবি একথা যেমন সত্য, তার চেয়েও অধিকতর সত্য তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। সেই ব্যক্তিত্ব এবং আত্মমর্যাদা বোধকে অক্ষুণ্ন রাখতে গিয়ে তাঁকে আমৃত্যু দুঃসহ দারিদ্র্যে হতে হয়েছে নিষ্পেষিত। কিন্তু কখনও ওপরতলার দাক্ষিণ্যের দুয়ারে হাত পেতে নিজেকে তিনি খাটো করেননি এতটুকু। ১৯৫৮ সালে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখে ক্ষমতার রোষানলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তিনি। আবার আইয়ুব শাহীর শেষ পর্যায়ে একটি সরকারি খেতাবও তাঁকে দেওয়া হয়েছিলো। সে পারিতোষক তিনি গ্রহণ করেননি, কিন্তু কি আশ্চর্য আমরা তাঁর এই মহৎ ত্যাগকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে তাঁকে রেখেছিলাম কোনঠাসা করে। চরম অবমাননা ও দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর আবর্তের মধ্যে নিপতিত কবি বুঝি সেই অভিমানেই এমন নীরবে বিদায় নিলেন। দারিদ্র্যক্লিষ্ট কবি দীর্ঘকাল রোগে অনাহারে জর্জরিত হলেন কিন্তু আমরা নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে দূরে সরে রইলাম। আর আত্মমর্যাদাশীল কবি তিলে তিলে এগিয়ে গেলেন মৃত্যুর দিকে। সবার অলক্ষ্যে খসে পড়লেন জীবনের বৃন্ত থেকে। আজ আমরা ক্ষমা চাইব কি সেই মহান ব্যক্তিত্বের কাছে? কিন্তু কোন মুখে? মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়সে যে অনন্য প্রতিভা হারিয়ে গেলেন আমাদেরই সবার অবহেলা ও সহানুভূতিহীনতার বিষ কন্ঠে ধারণ করে। কিন্তু সেই নীলকন্ঠনিঃসৃত অমৃত আমরা প্রতিনিয়ত পান করে চলেছি অঞ্জলিভরে?

আর একবার ধৃষ্ট স্পর্ধায় তবু ক্ষমা চাই, আর একবার বলি শানিত হোক তোমার লেখনী। ধ্বনিত হোক তোমার কন্ঠে—

www.pathagar.com

হে জড় সভ্যতা।
মৃত-সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ।
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ ;
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি' ;
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যুদীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও :
ধ্বংস হও।
তুমি ধ্বংস হও।।

[দৈনিক আজাদ, ২২শে অক্টোবর ১৯৭৪]

ফররুখ আহমদ আর নেই। কবিতার আকাশ থেকে ঝরে পড়ল উজ্জ্বল একটি জ্যোতিষ্ক। তমিস্রা হনন করল আলোর সেই শিখাকে, বাঁকা তলোয়ারের মত ছিল যাঁর তেজ এবং প্রভা। আলোর সেই বিহঙ্গ আর গান গাইবে না, যার সুর, ছন্দ এবং কবিতা আনন্দের আপন একটি ভুবন সৃষ্টি করেছিল বাংলা সাহিত্যের বাগানে। হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হলেন "সাত সাগরের মাঝি"র সেই অসামান্য শক্তিমান কবি, যাঁর অন্বিষ্ট ছিল মুক্তির আলোকিত একটি বন্দর। যেখানে ক্ষুধিত কোন মুখ হানবে না নীরব ভ্রুকুটি। যেখানে কালো পীচ-ঢালা পথে পড়ে থাকবে না ক্ষয়িত কোন লাশ। মানুষের অন্তিম কবর রচনা করবে না যেখানে ধনিকের গর্বিত সম্পদ। দারিদ্র্য এবং মনুষ্যত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে যে কবি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ, তারই নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় ক্ষয়িত হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন তিনি নিঃশব্দে। এ দুঃখ অনিবার। এই শ্রেষ্ঠ কবির মৃত্যু গোটা বাংলা সাহিত্যকেই দরিদ্র ক'রে দিয়ে গেল না, সেই সঙ্গে এই সাহিত্যের কবিকুল, লেখক আর পাঠকদের আকীর্ণ করল এমন এক আত্মগ্লানিতে যা কখনো স্খালন করা যাবে না।

একথা সত্য, কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন ইসলামী রেনেসাঁর প্রবক্তা। কিন্তু তাহলেও তাঁর মতাদর্শ তাঁর কবিসত্তাকে আবদ্ধ করেনি ক্ষুদ্রতর গণ্ডিতে। গ্রাস করেনি তাঁর কাব্যলোকের সৌন্দর্য এবং শিল্পচেতনাকে। সবকিছুর উপরে তিনি ছিলেন একজন কবি। মহৎ এবং খাঁটি সৃজনশীল কবি। তাঁর কবিতার বাণী ছিল

www.pathagar.com

মানবতার বাণী। পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর লেখা তাঁর 'লাশ' কবিতা পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ এবং অনাচারের বিরুদ্ধে একটি প্রকাণ্ড প্রতিবাদ। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষতাড়িত শহরের রাজপথে মৃত শিশুর লাশ এবং ক্ষুধিত মুখের নিরব যন্ত্রণা রক্তাক্ত করেছিলো কবির মানবিক বোধ আর বিবেককে। কবির 'ডাহুক' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে প্রথম পঙক্তির উচ্চারিত অনুপম কবিতাগুলির একটি। তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' , 'পাঞ্জেরী', 'শতাব্দী', 'রাত্রিশেষের কাহিনী', 'ফেরদৌসী' প্রভৃতি কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে একজন সমাজ-সচেতন কবির প্রবল প্রত্যয় আর সুগভীর মানবিক মূল্যবোধ।

ছাত্রজীবনেই একজন প্রতিভাধর কবি হিশেবে অবিভক্ত বাংলায় প্রখ্যাত হয়েছিলেন ফররুখ আহমদ। বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা' মাসিকপত্র, প্রগতিশীল সাহিত্যপত্রিকা 'পরিচয়', হুমায়ুন কবির-সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাময়িকীতে একনাগাড়ে প্রকাশিত হচ্ছিল তাঁর সনেট এবং উচ্চাঙ্গের কবিতাগুচ্ছ। তাঁর সনেটের সংখ্যা একহাজারের বেশী। উভয় বাংলায় এই একটি ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কবিতার আঙ্গিনায় নতুন নতুন শব্দের এবং শৈল্পিক প্রয়োগ নিরীক্ষা ফররুখ চিহ্নিত অবদান। পুঁথিসাহিত্যের জগত এবং গ্রাম্য কথকতা থেকে সুনির্বাচিত শব্দমালা উদ্ধার করে অসাধারণ পারঙ্গমতার সঙ্গে ব্যবহার করেন তিনি কবিতায়। উপমার ব্যবহারেও তিনি পরিচয় দিয়েছেন অসামান্য সৃজনশীলতার এবং মৌলিকত্বের। গ্যেটের মহাকাব্য "ফাউস্টে"র আঙ্গিকশৈলীতে বাংলা ভাষাকে তিনি উপহার দিলেন "হাতেম তা'য়ী' মহাকাব্য। ব্যঙ্গকবিতা, সঙ্গীত, ছড়া, রূপক নাটক এবং শিশু-সাহিত্যেও এই কবির অবদান সুপ্রচুর। তাঁর বাইশখানি পাণ্ডুলিপি এখনো প্রকাশের অপেক্ষায়।

ফররুখ আহমদের কবি-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর অনমনীয় ব্যক্তিত্ব এবং প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ। আমৃত্যু তিনি বাস করেছেন দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে। কিন্তু কখনো তিনি ওপরতলার দাক্ষিণ্য, লোভ কিংবা প্রাপ্তিযোগের মোহের কাছে নিজের কবিসত্তাকে খাটো করেননি। ১৯৫৮ সালে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখে ক্ষমতার রোষানলে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। একষট্টি সাল পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল তাঁর পাণ্ডুলিপির প্রকাশনা। ওই সময় ছদ্মনাম নিয়ে কাব্যচর্চা করতে হয় কবিকে। আইয়ুবী আমলের শেষ পর্যায়ে একটি সরকারি খেতাব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু সেই পারিতোষিক নিতে

www.pathagar.com

অস্বীকার করেন তিনি। ভাষা আন্দোলনের সময়ে তাঁর কবিসত্তায় সঞ্চারিত হয়েছিল বিদ্রোহ। চল্লিশের দশকের শেষদিকে পরিবর্তন আসে ফররুখ আহমদের চিন্তার বলয়ে। তিনি হন ধর্মনিষ্ঠ এবং একান্ত আদর্শব্রতী। তাঁর ভাবনার সঙ্গে অনেক কবিরই স্পষ্ট মতপার্থক্য ঘটে। কিন্তু তাহলেও কোন সুবিধা লাভের মোহে নিজের অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি তিনি। ইচ্ছা করলে ঋতুর পাখির মতো ভোল পাল্টিয়ে সুখের নিরাপদ নীড় রচনা করতে পারতেন কবি। কিন্তু এ সুখের বদলে নিত্যসঙ্গী দারিদ্র্যকেই তিনি নিলেন বরণ করে। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। এমন চরিত্রবান কবি এ যুগে বিরল। এই একটি কারণে মতনির্বিশেষে সকল মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায় নন্দিত হবেন কবি।

আমাদের সবচেয়ে বড় দুঃখ, এমন একজন ব্যক্তিত্বশালী শ্রেষ্ঠ কবিকে বাংলা সাহিত্য হারাল অকালে। মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়সে। রোগশয্যায় মাইকেল মধুসূদনের মতো আমাদের সবার অলক্ষ্যে চরম দুর্গতির মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সারা বাংলার এমন একজন মহান কবিশিল্পী। এ দুঃখ রাখবার ঠাঁই নেই কারো। নিজের জীবনে কবি আমাদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হলেও এ অনুদারতার কিছুমাত্র স্খালন হতে পারে তাঁর পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালনে।

কবি বলেছেন শেষ আছে সকলের ; শুধু একা অন্তহীন কাল, তিনি নিজে আজ সে অনন্ত লোকের যাত্রী। কিন্তু তাঁর কবিতাকে স্পর্শ করতে পারবে না মৃত্যু— এটাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। অনন্ত শান্তি লাভ করুক তাঁর আত্মা (ইন্নালিল্লাহে . . . . .রাজেউন)।

[দৈনিক বাংলা, ২১শে অক্টোবর ১৯৭৪]

বিশিষ্ট কবি ফররুখ আহমদ লোকান্তরিত হয়েছেন।

চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকের প্রথমে একজন প্রখর আধুনিকতাবাদীরূপে এবং পরে ইসলামী জীবনদর্শনের প্রবক্তারূপে কবি ফররুখ আহমদ বাংলা কবিতায় আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। এই সময় তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অনেককেই ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন যশে এবং কৃতিত্বে। তাঁর বক্তব্যে ছিল দুই পর্যায়েই তীব্রতা, শক্তি এবং প্রবলতা। ষাটের দশকে তিনি বয়সে এবং লেখার ধারায় প্রবীণদের মধ্যে গণ্য হতে শুরু করেন। তবে সমসাময়িক জীবনের পটে

www.pathagar.com

তাঁর উপস্থিতির তীক্ষ্ণতা হ্রাস পেলেও তাঁর লেখনী থামেনি। প্রায় চার দশক ধরে লেখা তাঁর কবিতা একে একে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছিল ষাটের দশকে। কবির কাজের এটা অংশ মাত্র। কবির মৃত্যুর পরে জানা গেল, তিনি যে পাণ্ডুলিপি রেখে গিয়েছেন তাতে ২২টি কবিতাগ্রন্থ হতে পারে।

দ্বন্দ্বাত্মক গতিময় জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বেরিয়ে আসা যে বাংলা কবিতার ধারা, তার মধ্যে কবি ফররুখ আহমদ যে বিতর্কমূলক অবস্থান নিয়েছিলেন, আমরা সেটিকে দেখবো জঙ্গম বিচার পদ্ধতিতে। এভাবে তাঁর সৃষ্টিকে আমাদের কাব্য-জগতে মণিমঞ্জুষার মধ্যে রাখতে হবে তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মূল্যায়ন দ্বারা। কবি ফররুখ আহমদ মহাকালের প্রতীককে শেষের দিকে বেশী ব্যবহার করতেন।

আমরা আমাদের দৃষ্টিতে একে বলবো অগ্রসরকাল। আজ লোকান্তরিত কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমরা বলবো, অগ্রসরকালের কষ্টিপাথরে তাঁর প্রথম জীবনের কবিতাই বহমান জীবনের কবিতা হিশেবে চিহ্নিত হবে।

এই প্রসঙ্গে আজ যে কথা অনেকেই বলছেন, আমরাও সেই কথাই বলবো। প্রথম যৌবনের আধুনিকতাবাদী কবি হিশেবে তিনি যা লিখেছিলেন, তাই আমাদের অগ্রসরকালের কাছাকাছি।

এই ধারাটিকে তাঁর পরিণত জীবনেও ফল্গুধারারূপে পাওয়া যেতে পারে। এই ফল্গুধারাকে বার করে আনার জন্যেও প্রয়োজন হবে সামগ্রিক মূল্যায়নের।

আমরা কবির বিয়োগবিধুর পরিবার-পরিজনকে জানাই সমবেদনা ও সান্ত্বনা।

[দৈনিক সংবাদ, ২২শে অক্টোবর ১৯৭৪]

Poet Farrukh Ahmed prematurely bade farewell to his ownself. The end came unexpectedly at the age of 56 creating a void which will not be filled.

It is not a jonrney to oblivion'. A major poet, the warm glow of his poetic genius will continue to shine long after the brief glitter of negligible poetry has faded away.

He first attracted attention with the publication of his poems in such highbrow magazines like Kabita' edited by Buddhadev Basu, 'Arani' edited by Premndra Mitra, 'Chaturanga', edited by Humayn Kabir and Parichoy' edited by Sudhin Dutta. Widely respected as a

www.pathagar.com

poet of Muslim renaissance in the post-Nazrul period, he was also a prolific writer of songs and nursery rhymes and composed the largest number of sonnets in Bengali. Never content with the prevailing way of seeing and expressing ideas he tried innovations with the result that his language and form of expression gave the impression of something entering literature.

He did not seem to believe in art for art's sake. He let it serve a great purpose -- regeneration of values.

['দি বাংলাদেশ অবজার্ভার', ২১শে অক্টোবর ১৯৭৪]

ফররুখ আহমদ স্মরণে তৎকালীন ইসলামিক একাডেমী মিলনায়তনে কবি জসীম উদ্‌দীনের সভাপতিত্বে ২৫শে অক্টোবর এক আবেগঘন শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, কবি-গবেষক আবদুল কাদির, কবি বেগম সুফিয়া কামাল, শামসুল হুদা চৌধুরী, ব্যরিস্টার মোস্তফা কামাল, আসাফউদৌল্লা রেজা, আশরাফ সিদ্দিকী, আহমদ ছফা প্রমুখ।

বাংলা একাডেমীতেও এক স্মরণসভা মহাপরিচালিকা নীলিমা ইব্রাহীমের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া লেখক শিবির কবি ফররুখ আহমদ স্মরণে এক সভার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন কবি আবুল হোসেন।

কবি ফররুখ আহমদের ইন্তেকালে শোকবাণী প্রদানকারীদের মধ্যে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান (ভাসানী), ডক্টর আলীম আল রাজী প্রমুখ রয়েছেন। কবি ফররুখের অকালপ্রয়াণ কবি-সাহিত্যিক মহলে এক বেদনাবহ পরিবেশ রচনা করে। তারই সাক্ষ্য কবিপত্নীকে লেখা কথাশিল্পী-শিক্ষাবিদ আবুল ফজলের একটি ব্যক্তিগত পত্র। চিঠিটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হ'লো :

ফররুখ স্মৃতি তহবিল
একাউন্ট নং ৩৬৮৭
অগ্রণী ব্যাংক
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ শাখা
চট্টগ্রাম।

www.pathagar.com

সাহিত্য নিকেতন
১১০, নূর আহমদ সড়ক,
চট্টগ্রাম।
২২ . ১১ . ৭৪

বেগম কবি ফররুখ আহমদ
জনাবা,

আপনার স্বামী মরহুম কবি ফররুখ আহমদের অকাল-মৃত্যুর জন্য দেশের আরো বহুজনের মতো আমরাও অত্যন্ত মর্মাহত। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয়নি — এ অপরাধে আমরাও অপরাধী। তার জন্য আর এখন দুঃখ আর অনুশোচনা করে লাভ নেই। কবি আজ এসবের অতীত। আমাদের বর্তমান দুর্ভাবনা আমরা কি করে আপনার ও আপনার ছেলেমেয়েদের কিছুটা অন্ততঃ দুঃখ লাঘব করতে পারি। এ উদ্দেশ্যে আমরা চট্টগ্রামে 'ফররুখ স্মৃতি তহবিল' নামে কিছু অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছি, আমরা কতখানি সফল হবো বলতে পারছি না। আপাতত হাজার পাঁচেক টাকা আমাদের তহবিলে সংগৃহীত হয়েছে। সে টাকাটার একটা ড্রাফট এ সঙ্গে পাঠাচ্ছি। প্রাপ্তি স্বীকার করলে বাধিত হবো। ব্যক্তিগতভাবে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকেও আপনাদের জন্য কিছু সরকারী সাহায্য বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে একখানা চিঠি লিখেছিলাম। তারা কিছু করছেন কিনা আজো জানতে পারি নাই। আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমরা আমাদের এ সাহায্যের কথা কাগজে প্রকাশ করতে চাই। তাহলে আমাদের বিশ্বাস এ অবহেলিত কবির অবদানের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে।

আপনার আর কবি-পরিবারের সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আল্লাহ্ আপনাদের মনোবল দিন।

বিনীত
আবুল ফজল

পরবর্তী দুই দশক ধ'রে যেমন ফররুখের অনেক অপ্রকাশিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, পুরোনো বইএর নতুন সংস্করণ হয়েছে, "শ্রেষ্ঠ কবিতা", "নির্বাচিত কবিতা" ও "ফররুখ রচনাবলী"র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, তেম্নি রেডিও-টেলিভিশনে, পত্রপত্রিকায় তাঁর আলোচনার ধারা প্রবহমান, অনেক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছে। মোট কথা, ফররুখ আহমদ মৃত্যুর আগে যেমন তেমনি মৃত্যুর পরেও বহুল আলোচিত-সমালোচিত এক কবি-ব্যক্তিত্ব রূপেই আজো বিরাজমান।।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাহিত্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১–১৯৪১) পৃথিবী থেকে আলাদা এক পৃথিবী নির্মাণ করেছিলেন নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬)। নজরুলের পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্র আর-এক পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন তিরিশের কবিরা। প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা (১৯১৪) থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি (১৯৪৫) পর্যন্ত বছর তিরিশের সময়পরিসরে আমাদের এই বস্তুপৃথিবী যেমন তেম্নি আমাদের কাব্যপৃথিবীও আমূল বদলে গিয়েছিলো। দুই পাথরের সংঘর্ষে যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তেম্নি দুই মহাযুদ্ধের দুঃসময় বাংলা কবিতায় কিছু আশ্চর্য ফসল ফলিয়েছিলো। বৈষয়িক পৃথিবীর দুঃসময় অনেক সময় শিল্পের জন্যে সুসময় হ'য়ে দেখা দ্যায়। তাই এই সময়েই আমরা পেলাম নবীভূত রবীন্দ্রনাথকে, নজরুলকে, জীবনানন্দকে, সুধীন্দ্রনাথকে, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে-কে। ঐ তিরিশ বছরের পরিসর জুড়ে এতোজন প্রধান কবি কাজ করেছেন, এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। এর তুলনা কেবল পাওয়া যাবে এই শতাব্দীর প্রধান-মহান হিস্পানী কবিদের একসঙ্গে কাজ করার ভিতরে। আমাদের কবিতার জন্য বিশের ও তিরিশের দুটি দশক আশ্চর্য জ্যোতিষ্মান দুটি দশক।

ঐ দুটি আশ্চর্য জ্যোতিষ্মান দশকের পরে আসে চল্লিশের দশক, যে-দশকের অর্ধেক জুড়ে পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের ঝোড়ো হাওয়া বয়েছে, আর বাংলা ভাষাভাষীর জন্যে যে-দশকের পুরোটাই দুর্ভিক্ষে-দাঙ্গায়-দেশবিভাগে সংরক্ত। বাংলা কবিতাও এলোমেলো হ'য়ে গেলো : পর-পর দুটি বিশাল স্তম্ভের পতন—১৯৪১ সালে অস্ত গেলেন রবীন্দ্রনাথ, ১৯৪২ সালে নজরুলের হাত থেকে ঝ'রে পড়লো কলম। কিন্তু মৃত্যু বা নিস্তব্ধতার আগে তাঁরাও কি বিপর্যস্ত বোধ করেননি? তাঁর শেষ জন্মদিনে, ১৯৪১ সালে, রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সংকট' শিরোনামে যে-ভাষণটি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে উন্মোচিত হয়েছিলো তাঁর ঐ বিপর্যয়ের বোধ। আর নজরুল-যে ক্রমাগত সংগীতে নিমজ্জিত হচ্ছিলেন, লিপ্ত হচ্ছিলেন আধ্যাত্মিকতায়, তা কি নেহাৎই ব্যক্তিগত ঝোঁক? বস্তুপৃথিবীর মোকাবিলা করতে না-পেরে এক ছদ্মবেশী পলায়ন নয় তো? চতুর্দিকে মৃত্যু, হতাশা, পতন ও ধ্বংস। ব্যাপক আশাভঙ্গের এই কালো দিনগুলোতে কবিরা যে-কোনো একটি বিশ্বাসের স্তম্ভের দিকে ছুটবেন, এটাই ছিলো স্বাভাবিক। সমাজতন্ত্র ছিলো সেদিনকার সেই ধ্বংসশীল পরিবেশে বিশ্বাসের প্রধানতম মিনার। ঝাঁক-ঝাঁক কবিদের সেটাই ছিলো সেদিনের গন্তব্য। ঐ সময় সেদিনকার আত্মবৃত প্রধান কবিদেরও অন্তঃপরিবর্তন ঘটিয়েছিলো। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯–১৯৫৪) লেখেন "সাতটি তারার তিমির" (১৯৪৮), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০০–৬০)

www.pathagar.com

"সংবর্ত" (১৯৫৩), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৩) 'অন্ন দাও' , 'অন্নদাতা', '১৩৫০' প্রভৃতি পাঁচটি কবিতার ফোল্ডার প্রকাশ করেন 'অন্নার্থীর সাহায্যকল্পে'। এদিকে বিশের, তিরিশের, চল্লিশের দশকগুলোতে বাঙালি সমাজের একটি বৃহৎ কিন্তু অনাত্মচেতন অংশের – বাঙালি-মুসলমানের আত্মসম্বিৎ ফিরছিলো, ক্রমশ একটি বিলম্বিত, ক্ষীণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জাগরণ ঘটছিলো। বাঙালি-মুসলমান কবিদের একাংশকে তা সংগত কারণেই উদ্বোধিত করেছিলো। পাশাপাশি এতো সব ধ্বংসের মধ্যে কবিতার অচ্ছেদ্য ও অমর রোমান্টিকতাও যাচ্ছিলো তার কাজ ক'রে।

চল্লিশের দশকের প্রথমে অখণ্ড, ও পরে খণ্ডিত, দুই বাংলার কবিতার প্রধান ধারা ছিলো এই তিনটি : ১. সমাজ-চেতন কবিতার ধারা ; ২. স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতন কবিতার ধারা ; ৩. রোমান্টিক কবিতার ধারা।

সমাজ-চেতন কবিতার ধারাটি ছিলো এই সময়ের প্রবলতম কবিতার ধারা। এর আগে, এবং পরে, আর-কখনো বাংলা কবিতা এতো বেশি সমাজচেতনায় স্পৃষ্ট হয়নি। কথাটিকে অন্যভাবে বলা যায়, ঝাঁক বেঁধে এতো বেশি সমাজ-চেতন কবি বাংলা সাহিত্যে আর-কখনো আসেননি। এঁদের অব্যবহিত-অগ্রজ ছিলেন বিষ্ণু দে এবং দূর-অগ্রজ ছিলেন নজরুল ইসলাম। এঁদের প্রধান মুখপত্র ছিলো সুধীন্দ্রনাথ-পরিত্যক্ত নবীভূত 'পরিচয়' এবং 'পরিচয়'-বিস্পৃষ্ট 'সাহিত্যপত্র'। এই ধারার প্রধান দুজন — সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় — ছিলেন 'কবিতা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত (তখনো পত্রিকাগুলি শিবিরে বিভক্ত হয়নি)। এই কবিসংঘের অন্যান্যদের মধ্যে আছেন বিমলচন্দ্র ঘোষ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, দিনেশ দাস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ ধর, গোলাম কুদ্দুস, মণীন্দ্র রায়, চিত্ত ঘোষ, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, সিকান্দার আবু জাফর, আবুল হোসেন, সানাউল হক, আহসান হাবীব প্রমুখ।

স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতন কবিতার ধারাটির কেন্দ্রীয় উৎস ছিলেন নজরুল ইসলাম। আধ্যাত্মিকতা নয় — ইসলাম ধর্মের বহিরাচারগুলি, ইতিহাস ও ভূগোল মূলত মুগ্ধ করেছিলো এঁদের। এঁদের প্রধান পত্রিকা ছিলো 'সওগাত' ও 'মোহাম্মদী'। এই কবিগোষ্ঠীতে ছিলেন ফররুখ আহমদ, প্রথম পর্যায়ের সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ আলী আশরাফ, তালিম হোসেন, মুফাখ্খারুল ইসলাম প্রমুখ।

চল্লিশের রোমান্টিক কবিদের মধ্যমণি ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, প্রধান মাধ্যম ছিলো তাঁর 'কবিতা' পত্রিকা। অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহ, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই বলয়ের কবি – বুদ্ধদেব গোষ্ঠীর বাইরে রোমান্টিক মানবতাবাদী কবি অশোকবিজয় রাহা, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

www.pathagar.com

ঠিক কোনো দলে ফেলা যায় না এরকম দ্বিধাগ্রস্ত, অনিশ্চিত ও নিশ্চরিত্র কবিদের মধ্যে আছেন হরপ্রসাদ মিত্র, গোবিন্দ চক্রবর্তী, অরুণ ভট্টাচার্য, দিলীপ রায়, আ. না. ম. বজলুর রশীদ, ইমাউল হক, মতিউল ইসলাম প্রমুখ।

ফররুখ আহমদের উত্থান এই চল্লিশের দশকেই। তাঁর প্রথম পদচারণভূমি, সেকালের প্রায় সব কবির মতোই, ছিলো কলকাতা। বছর দশেক বয়সে কলকাতা গিয়েছিলেন, বছর তিরিশেক বয়সে দেশবিভাগের পরে ঢাকায় চ'লে আসেন, মধ্যবর্তী যে-বিশ বছর তা মানুষের জীবনের সবচেয়ে অনুভবনশীল বছর, ঐ সুবেদী বছরগুলি তাঁর কাটে স্কুলে, কলেজে, চাকরিতে, আর নিরন্তর বিকশমান রচনায়। তাঁর মনোপ্যাটার্ণ তখনই তৈরি হ'য়ে গিয়েছিলো। চল্লিশের কবিতার যে-প্রধান তিনটি ধারা আমি চিহ্নিত করেছি, তার সবগুলি লক্ষণই দল বেঁধেছিলো ফররুখের কবিপ্রকৃতিতে : সমাজচেতনার সঙ্গে মিশেছিলো অমর রোমান্টিকতা, অমর রোমান্টিকতার সঙ্গে মিশেছিলো স্বতন্ত্র সংস্কৃতি-চেতনা। ১৩৫০ (১৯৪৩)-এর দুর্ভিক্ষের উপর অনেকগুলি কবিতা লিখেছিলেন, তার দুটি 'লাশ' ও 'আউলাদ' তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি"র অন্তর্ভুক্ত, 'লাশ' কবিতাটি সুকান্ত ভট্টাচার্য-সম্পাদিত "আকাল"(১৯৪৪) সংকলনে গ্রথিত হয়। ঐ সময়ে তিনি বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গেও কিছুটা জড়িয়ে পড়েন।[১] তাঁর তখনকার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।[২] ফররুখের আরো অজস্র কবিতায় শোষণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। ফররুখের সমাজচেতন কোনো-কোনো কবিতা direct, কিন্তু ওরকম প্রায় সব কবিতাতেই কোনো-না-কোনোভাবে রোমান্টিকতার অফুরান সংক্রাম ঘ'টে গেছে। হয়তো-বা খানিকটা প্রেমেন্দ্র মিত্রের রোমান্টিকতা-স্পৃষ্ট সমাজচেতনার সঙ্গে এর তুলনা চলে।[৩] আমার ধারণা, ফররুখ আহমদের প্রাথমিক সমাজচেতন কবিতা তাঁর স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতন কবিতার সমান সাফল্য রোজগার ক'রে নিতে পারেনি।

প্রায় পাশাপাশিই চলেছিলো ফররুখের স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতন কবিতার ধারা। কিছুকাল আগেও আমি এ ধরনের কবিতা বলতে 'ইসলামচেতন' শব্দ ব্যবহার করেছি।[৪] এখন ব্যবহার করছি 'স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতন' কথাটি। আমার বিবেচনায়, এই শব্দগুচ্ছ প্রয়োগ করলে সত্যের নিকটতর হওয়া যায়। কেননা ফররুখ ব্যবহৃত ইসলামী ঐতিহ্য সর্বক্ষণই বাঙালি-মুসলমানের স্বাতন্ত্রিক ধর্ম-সাংস্কৃতিক পটে স্থাপিত।

ফররুখের প্রথম কবিতাগুচ্ছ লেখা হয়েছিলো বাঙালি-মুসলমানের এক স্বতন্ত্র আবাসভূমি স্থাপনার ভিত্তিতে,[৫] তাঁর অধুনালুপ্ত একটি কবিতা-পুস্তিকার কেন্দ্রীয় বক্তব্যও ছিলো তা-ই[৬], এই দিক থেকে তিনি যে প্রাক-ইসলামী হাতেম তা'য়ী চরিত্র ব্যবহার করেছিলেন কেন তারও ব্যাখ্যা বোধগম্য হয়।[৭] হাতেম তা'য়ীর নিজে মুসলমান নন, কিন্তু

www.pathagar.com

তিনি ইসলামিক–সংস্কৃতির অংশ। ফররুখ আহমদের অতিপ্রিয় "আরব্য উপন্যাস"–এর আশ্চর্য রহস্যময় কথকতা ইসলাম ধর্মের নয়, ইসলামী সংস্কৃতির অংশ। এদিক থেকেই বোঝা যায় কেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর, ১৯৪৭ সালেই 'সওগাত' পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন, '. . . .এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বাঙলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।' এই প্রবন্ধ শেষ করা হয়েছিলো এরকমভাবে, 'বাংলা ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করলে এই দেশে ইসলামী সংস্কৃতিকে হত্যা করা হবে।[৮] আরো দু বছর আগে, ১৯৪৫ সালে, 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'উর্দু বনাম বাংলা' কবিতায় তৎকালীন বাঙালি–মুসলমানের একাংশের উর্দুপ্রীতিকে তীব্র বিদ্রূপ হেনেছিলেন।[৯] আমি পরিষ্কার বলতে চাই, ফররুখ আহমদকে ধর্ম যতোখানি উদ্বুদ্ধ করেছিলো, ততোখানি প্রেরণা জুগিয়েছিলো দেশ। লক্ষণীয়, প্রথম পর্যায়ে ফররুখ আহমদের জনজাগরণমূলক কবিতার চেয়ে স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতন কবিতা অনেক পরিণত। জনজাগরণমূলক কবিতায় তিনি স্পষ্ট ও সোচ্চার কিন্তু স্বতন্ত্র সংস্কৃতি–চেতন কবিতায় প্রচ্ছন্ন ও মুখচ্ছদ–ব্যবহারকারী, অর্থাৎ কবিতার অস্ত্রগুলি সেখানেই তিনি অনেক নিপুণভাবে ব্যবহার করেন। নজরুলের মতো ইসলামী পুরাণের খণ্ড ব্যবহার বা allusion প্রয়োগ করলেন না তিনি, তিনি করলেন বরং (তাঁর প্রিয় কবি) মাইকেলের মতো ইসলামী পুরাণের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ। নজরুল–অব্যবহৃত আরব্য–উপন্যাসের কাহিনীকে তিনি নিজের অর্থে ও অন্তরাখ্যানে প্রয়োগ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতন কবিতার উদগাতা নজরুল ইসলাম। এই ধারার পরবর্তী কবি হ'য়েও, আশ্চর্য, ফররুখ আহমদ প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্নপথে অগ্রসর হয়েছেন। শুধু নজরুল নয়, মোহিতলাল বা জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে কি প্রেমেন্দ্র মিত্র — এঁদের সঙ্গে ফররুখের মিল কেবল একটি দূরশ্রুত রণনের মতো, প্রত্যক্ষ মিল প্রায় নেই বললেই চলে।

ফররুখ আহমদের রচনার কাল ১৯৩৬–৭৪ — মোট এই আটতিরিশ বছর, প্রায় চার দশক। এমনিতে ফররুখ তাঁর রাশি–রাশি পাণ্ডুলিপি ও পত্রকর্তিকা সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন ; কিন্তু রচনার তিথি–তারিখ লিখে রাখার অভ্যাস ছিলো না তাঁর, "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" (১৯৭৫) সম্পাদনার সময় ফররুখেরই হস্তলিখিত এই মূল্যবান সময়পঞ্জিটি উদ্ধার করেছিলাম :

১. সাত সাগরের মাঝি : রচনা ১৯৪৩–৪৪।
২. কাফেলা : রচনাকাল ১৯৪৩–৫৮।
৩. হে বন্য স্বপ্নেরা : রচনাকাল ১৯৩৬–৫০।

www.pathagar.com

৪. অনুস্বার : রচনাকাল ১৯৪৪–৪৬।
৫. বিসর্গ : রচনাকাল ১৯৪৬–৪৮।

এই হিশেব থেকেই আমরা তাঁর রচনার সূচনা ধরেছি ১৯৩৬ সাল থেকে। প্রাথমিক কবিতাপর্যায় বাদ দিলে দেখা যাবে তাঁর পরিকল্পিত এই পাঁচটি কবিতাগ্রন্থই চল্লিশের দশক জুড়ে লেখা হয়েছে। আরো বহু কবিতাই লেখা হয়েছিলো সে-সময়, যেমন ১৯৫২ সালে প্রকাশিত "সিরাজাম মুনীরা"র কবিতাগুচ্ছ। তাঁর পরিকল্পিত ঐ পাঁচটি কবিতাগ্রন্থের মধ্যে "সাত সাগরের মাঝি"ই একমাত্র তখন প্রকাশিত হয়েছিলো, ১৯৪৪ সালে। এবং ঐ কাব্যের বহুমুখী গুণের মধ্যে চল্লিশের দশকের প্রধান তিনটি চারিত্রলক্ষণই ধরা পড়েছিলো — সমাজচেতনা, স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতনা এবং রোমান্টিকতা। অচিরকালের মধ্যে ফররুখের কবিতার প্রধান চারিত্রলক্ষণ হিশেবে দাঁড়িয়ে যায় ঐ স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতনা, কিন্তু সমাজচেতনা ও রোমান্টিকতা কোনো সময়ই তাঁর কবিতা থেকে অপসৃত হ'য়ে যায়নি একেবারে। তাঁর রোমান্টিকতা চূড়া স্পর্শ করেছে "সাত সাগরের মাঝি" এবং "হে বন্য স্বপ্নেরা" কবিতাগ্রন্থের কোনো-কোনো কবিতায় এবং অগ্রন্থিত আরো অনেক কবিতায়। তাঁর সমাজচেতনা পাত্র বদল ক'রে একটি আদর্শে শিখায়িত হয় অজস্র কবিতায়, বিশেষত "নৌফেল ও হাতেম" (১৯৬১) কাব্যনাট্যে। ব্যঙ্গকবিতাও লেখা শুরু করেছিলেন ফররুখ ঐ চল্লিশের দশকেই। তারপর তাঁর কবিতা একটি কেন্দ্রীয় বক্তব্যে স্থির থেকেও নানারকম পালা-বদলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। আর প্রকরণে কবিতা-পৃথিবীর প্রায় সব দেশগুলি যেন তিনি সফর ক'রে এলেন — লিরিক ও দীর্ঘকবিতা, সনেট ও সনেট-সিকোয়েন্স, ছোটো কবিতানাট্য ও পূর্ণাঙ্গ কাব্য-নাট্য, এমনকি গদ্যকবিতা, এমনকি মহাকাব্য, এমনকি গদ্যনাটক। চল্লিশের আর-কোনো কবি এতো বিচিত্র প্রাকরণিক এলাকা ভ্রমণ করেননি।

এ বছর, ১৯৮১ সালে, সময়ের হিশেবে চল্লিশের কবিদের চল্লিশ বছর পূর্ণ হ'লো। অর্থাৎ চল্লিশের দশকের কবিরা কম-বেশি এই চারটি দশক জুড়ে কবিতাচর্চা করেছেন। এঁদের মধ্যে সুকান্ত ভট্টাচার্য তো বহু পূর্বেই অকালমৃত ; কয়েক বছর হ'লো মারা গিয়েছেন বিমলচন্দ্র ঘোষ, ফররুখ আহমদ, সিকান্দার আবু জাফর, অরুণকুমার সরকার, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সমর সেন,[১০] নরেশ গুহ এবং আর কেউ-কেউ কবিতার মায়াবী পাশ ছিঁড়ে স্তব্ধ হ'য়ে আছেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়[১১] এখনো প্রায় তারুণ্যের উন্মাদনায় অবিরল সৃষ্টি ক'রে চলেছেন। এতোকাল পরে সিদ্ধেশ্বর সেনের কাজগুলি গ্রন্থবদ্ধ হচ্ছে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও মণীন্দ্র রায় এখনো নতুন পরীক্ষাশীল — নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অক্ষরবৃত্ত ও গদ্যছন্দের দোলাচলে এক নতুন বাকছন্দ নির্মাণে, আর মণীন্দ্র রায় দীর্ঘকবিতায়, অর্থাৎ চল্লিশের কবিতা আজো অগ্রসরমান। তবু চল্লিশের

www.pathagar.com

দশকের এই মোটামুটি বছর চল্লিশেক অগ্রসরণের পর আমরা বোধ হয় ফলশ্রুতির একটি হিশেব ক'রে নিতে পারি। হয়তো সময়ের দিক থেকে এঁরা ছিলেন প্রধান সব কবিদের বড়ো বেশি কাছাকাছি — হয়তো সেজন্যেই এঁরা খানিকটা ছায়াচ্ছন্ন, এঁদের কবি-জন্মের ঠিক আগে পর্যন্ত বাংলা কবিতায় রাজত্ব ক'রে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ; এঁদের উত্থানের সময় তিরিশের পাঁচজন কবিপ্রধান পূর্ণতাপে প্রজ্বলিত। চল্লিশের দশকের কবিরা অনেকেই পূর্বজ প্রধানদের রশ্মিস্নাত, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রভাব তিরিশের কবিরা শোষণ ক'রে নিয়েছিলেন, তিরিশের কবিদের একক বা মিশোল প্রভাব পড়ে চল্লিশের কবিদের উপরে। আবার অনেক সময় প্রভাবহীন কিন্তু ছন্দহীন কল্পনাহীন আবিষ্কারহীন একটি জগৎ তাঁরা নির্মাণ করেছিলেন। এঁদেরই লক্ষ্য ক'রে অমিয় চক্রবর্তী 'গদা হাতে গদ্যকবিতা'র প্রসঙ্গ তুলেছিলেন — জীবনানন্দ বলেছিলেন আধুনিক পৃথিবীর শব বাহনের কাজ চলেছে তাঁদের রচনায়, গদ্যকবিতার চর্চা এই দশকেই চূড়ান্তে উঠেছিলো — পঞ্চাশে আবার ফিরে আসে অক্ষরবৃত্তের সনাতন আবহ। যাই হোক, ওরই মধ্যে চল্লিশের যে দু-একজনের কাব্য-পৃথিবী বিশাল ও বিচিত্র ও গভীর, ফররুখ তাঁদের একজন। শেষ-পর্যন্ত স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতন কবিতার তিনি হ'য়ে উঠেছিলেন অবিসংবাদী নায়ক ; চল্লিশের কবিদের মধ্যে প্রাকরণিক পরীক্ষায় তিনিই সর্বাগ্রগণ্য ; একক কবিতাগ্রন্থ হিশেবে 'সাত সাগরের মাঝি'র মতো বহুগুণসম্পন্ন কবিতাগ্রন্থ চল্লিশের আর-কোনো কবির হাত থেকে বেরোয়নি — সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অতিপ্রচারিত "পদাতিক"(১৯৪০) আমাদের বিবেচনায় "সাত সাগরের মাঝি"র তুলনায় ম্লান[১২]; ফররুখ স্নাত ছিলেন রোমান্টিকতার বর্ণালিতে, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিলো ধ্রুপদী সুমিতি উপার্জন ; আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগের বিচিত্র পরীক্ষা ; কবিতাকে আত্মব্যক্তিত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে একটি জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন, আদর্শ ও আকাঙ্খায় উত্তীর্ণ করা — এইসব গুণ ও লক্ষণে ফররুখ আহমদ চল্লিশের কবিদের মধ্যে শুধু বিশিষ্ট নন্, একক ও তুলনারহিত। শেষ-বিচারে, সম্ভবত ফররুখ আহমদই চল্লিশের দশকের দুই বাংলার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।।

---

১ ফররুখ আহমদ একসময় বামপন্থীদের পত্রিকা 'অরণি'-'স্বাধীনতা'-'পরিচয়' ইত্যাদিতে কবিতা লিখেছেন। কবিবন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে,ফররুখ তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য 'স্বাধীনতা' অফিসে যেতেন। "মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক" (প্রথম-তৃতীয় খণ্ড) গ্রন্থপ্রণেতা কবি-সমালোচক ধনঞ্জয় দাশ জানিয়েছেন, ফররুখ 'ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সংঘে' যোগ দিয়েছিলেন, এবং পরে তা ছেড়ে দেন। কবিকন্যা সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু লিখেছেন :

www.pathagar.com

প্রথম জীবনে আব্বা ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত মানবতাবাদী কমরেড এম. এন. রায়ের শিষ্য।

কবিবন্ধু তালিম হোসেন 'ফররুখ আহমদ ও আমি' নামে একটি স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

> আমার কলকাতা জীবনের যে বন্ধুসহচরদের কথা আগে বলেছি [আবদুল গনি হাজারী, কামরুল হাসান, সরদার জয়েনউদ্দীন প্রমুখ], ইতিমধ্যে নানা কারণে তাদের মধ্যে পাকিস্তানী জোশ-জজ্‌বা মিইয়ে এসেছে। তাদের উপর তখন ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্যবাদ, মানবতাবাদ প্রভৃতির আছর পড়তে শুরু করেছে। কাছাকাছি সময়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'মানবতাবাদী' সমাজচিন্তাবিদ এম. এন. রায় ঢাকা সফর করে গেছেন। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ ছিল ; আমি জানি ফররুখেরও ছিল। শ্রী রায় 'পাকিস্তান' সমর্থন করেছিলেন। সম্ভবত সেজন্যেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সেই উষাকালে তাঁর সফরে পাক-সরকারের তরফ থেকে কোন বাধা হয়নি এবং শ্রী রায়ও উৎসাহ বোধ করেছিলেন এখানকার বুদ্ধিজীবীমহলের সঙ্গে পরিচয় ও ভাব-বিনিময় করতে। শ্রী রায় বর্তমান গুলিস্তান সিনেমার পিছনে সরকারি রেস্ট হাউসে উঠেছিলেন। যে কয়দিন ঢাকায় ছিলেন, শিল্পী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক অনেকেই প্রতিদিন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তী, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, অজিত গুহ, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, আবদুল গনি হাজারী, সরদার জয়েনউদ্দীন, কামরুল হাসান, হাবীবুর রহমান — আরো অনেকেই। ফররুখ আহমদ যাননি। আমি গিয়েছি একাধিকবার।
>
> [দৈনিক ইনকিলাব, ২১ নভেম্বর ১৯৮৬]

স্মরণীয় : মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) ইসলাম বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন ইংরেজিতে। বইটি বাংলায় তরজমা করেন মুহম্মদ আবদুল হাই। এই তরজমাটি পরীক্ষা ক'রে দিয়েছিলেন কবি তালিম হোসেন। সম্ভবত ১৯৫০ বা ৫১ সালে মানবেন্দ্রনাথ ঢাকায় এসেছিলেন। ১৯৫২ সালে আবদুল গনি হাজারী ও মাহবুব জামাল জাহেদী-সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'মুক্তি' প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির মাত্র চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় (আষাঢ় ১৩৫৭, শ্রাবণ ১৩৫৭, ভাদ্র ১৩৫৭ ও আশ্বিন ১৩৫৭)। পত্রিকাটি ছিলো মানবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 'মানবতাবাদী' মতের সম্প্রচারক। এই পত্রিকার প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় ফররুখ আহমদের তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয় ; 'বুদ্ধির শানিত দীপ্তি', 'নতুন দিনের কবির প্রতি' ও 'হে আত্মবিস্মৃত সূর্য'। অগ্রন্থিত এই কবিতা তিনটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

বুদ্ধির শানিত দীপ্তি

বুদ্ধির শানিত দীপ্তি যে মুহূর্তে হ'ল উগ্র উদ্যত নখর
স্বার্থান্ধ, তখনি আমি, চেয়েছি তোমাকে
হে হৃদয়! ঘুমন্ত হৃদয়!
চেয়েছি তোমার স্পর্শ (শীত-রাত্রে পদ্ম-লোভী মন
ছিঁড়িতে চেয়েছে এই অনাত্মীয় শর্বরীর ক্লিষ্ট পরিবেশ)

www.pathagar.com

স্নিগ্ধ এক প্রভাতের ক্লান্ত প্রত্যাশায়।
যেখানে শৃংখলমুক্ত স্বার্থান্ধ বুদ্ধির
নখরে লাগেনি ছোপ আতপ্ত রক্তের
চির লুব্ধ আমার হৃদয় সেখানে সন্ধান করে পাথেয় আত্মার।
শুধু এক বিমুক্ত প্রশ্বাস
মধ্যরাত্রে কেঁদে খোঁজে অলিন্দ শান্তির
(এখনো তো ফুল ফোটে, পাখী গায়, প্রজাপতি পাখা মেলে তার
চাঁদের আলোর নীচে তবু শান্তি নাই)
মন তবু খুঁজে ফেরে সুষমা শান্তির।।

['মুক্তি', আষাঢ় ১৩৫৭]

নতুন দিনের কবির প্রতি

শতাব্দীর নিরুদ্ধ প্রাকার পার হ'য়ে
তোমার সংগীতধ্বনি ভেসে যাবে
ভেসে যাবে দূর- -
সুদূর দিগন্ত পানে।

অন্ধ স্রোতে পথহারা জন
তোমার গানের সুরে খুঁজে পাবে পথের ইশারা,
তোমার বাঁশীর সুরে হতাশ্বাস ব্যাকুল হৃদয়
নূতন সূর্য্যের দীপ্তি কৃষ্ণ পূর্ব্বাশার তীরে

আজ তুমি ক্লান্ত, তবু এ ক্লান্তির ধূসর স্বাক্ষর
রূপায়িত হবে নীল আকাশের বর্ণসুষমায়।
স্বর্ণসমুজ্জ্বল বিভা যে উষার সেই তো তোমার
সুরের সঞ্চয়
কালের গণ্ডীকে ছেড়ে মহাকাল পানে
রেখে যাও প্রাণের পাথেয়।।

['মুক্তি', শ্রাবণ ১৩৫৭]

www.pathagar.com

হে আত্মবিস্মৃত সূর্য

শর্বরীর মেঘ স্তর অন্ধকারে ফেরে মত্ত দৈত্যের সমান,
হে আত্মবিস্মৃত সূর্য! এখনো কি প্রভাতের হয়নি সময়?
এখনো কি সুষুপ্তির অন্তরালে টানি যবনিকা
হে মোর প্রভাত সূর্য! তমিস্রার খুঁজিবে আশ্রয়?
কত যুগান্তের বহ্নি বক্ষতলে হয়েছে সঞ্চিত,
আকাশে বাতাসে কত আর্তস্বর করে হাহাকার
হে সূর্য! বঞ্চিত সেই বিষতিক্ত প্রাণের প্রদাহ
এখনো কি হবে না প্রকাশ?
এখনো কি হয়নি সময়?

অসাম্যের ঘূর্ণাবর্তে যে লুণ্ঠিত জনতা এখনো
তোমাকে ফিরিছে খুঁজে ব্যাকুল শতাব্দী তীরে এসে
তোমার আলোক থেকে হে সূর্য! এখনো তারা রবে কি বঞ্চিত?
তোমার উদার দীপ্তি মুক্তি কি পাবে না আর এ অন্ধ নিশীথে?

•

দেখ লুব্ধ কারুণের লোভ-হিংস্র দৃষ্টিতলে জনতা উন্মাদ,
দিশেহারা হয়ে ফেরে আঁধার জিন্দান থেকে অন্ধ মৃত্যুকূপে,
তিমিরপিপাসু যত শবভুক পিশাচেরা করে আনাগোনা
অন্ধ ক্ষমতায় মত্ত ভাবে তারা প্রভাতের রুধিবে দুয়ার।

কত কাল স'য়ে যাবে এই অপমান?
আত্মঘাতী বঞ্চনার এই অভিশাপ,
এই অর্থহীন কুণ্ঠা দৌর্বল্যের এ ভীরু আড়াল,
কৃত্রিম কুয়াশা ঘেরা শতাব্দীর এই মধ্যক্ষণে
হে আত্মবিস্মৃত সূর্য! মেনে নেবে আর কতদিন?
পদানত জীবনের সীমারেখা দিগন্তে কি যায়নি মিলায়ে?
তবু কেন

www.pathagar.com

তবু কেন দেখা যায় স্খলনের মসীকৃষ্ণ রেখা
কুঞ্চিত ললাটে তবু সংশয় ঘনায়মান
কেন?
কেন নিশাচর হিংস্র পিশাচেরা করে আনাগোনা?
জীবনের এ ব্যর্থতা (জানি তুমি) পারো মুছে দিতে
পিশাচের জয়ধ্বনি নিমেষে আমারে দিতে পারো;
আকাশ জ্বালাতে পারো প্রলয়ের শিখা দিয়ে তুমি
পৃথিবী গড়িতে পারো মরণের উন্মত্ত পাথারে।
তবু কেন স'য়ে যাও নিয়মের এই ব্যভিচার?

কত কাল আর স'য়ে যাবে?
হে আত্মবিস্মৃত সূর্য। সংগোপনে রবে কতকাল?

['মুক্তি', আশ্বিন ১৩৫৭]

স্মরণীয় : আবদুল গনি হাজারী তাঁর দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ "সূর্যের সিঁড়ি" (১৯৬৫) উৎসর্গ করেন 'কবি ফররুখ আহমদকে'। বলা বাহুল্য, কলকাতায় থাকতেই ফররুখ বাম-সংসর্গ ছেড়েছিলেন, কিন্তু শোষিত-নির্যাতিতদের পক্ষে কথা বলা তিনি কখনো থামাননি।

২ সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'কলেজে ফররুখ হয়ে গেল আমার সবচেয়ে প্রাণের বন্ধু।'('আমার বন্ধু ফররুখ', 'প্রতিক্ষণ'। পুনর্মুদ্রণ : "ফররুখ আহমদ", ১৯৮৭, সেবা-কর্তৃক প্রকাশিত।)

৩ ফররুখ আহমদের প্রথম কবিতা-সমালোচক আবু রুশদ লিখেছেন, 'আধুনিক কোন কবির প্রভাব ফররুখ আহমদের যদি থেকে থাকে তো তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র।' ('আধুনিক কবিতা ও মুসলিম কবিগণ', 'সওগাত', ভাদ্র ১৩৪৮) কয়েক বছর পরে আবদুল কাদির এর প্রতিবাদ ক'রে লিখেছিলেন, 'সুসাহিত্যিক আবু রুশদ বলেছেন — 'আধুনিক কোন কবির প্রভাব ফররুখ আহমদের উপর যদি থেকে থাকে তো তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র।' কিন্তু এ উক্তির সঙ্গে আমি একমত হতে পারছিনে। আমার বরং মনে হয়, ফররুখের উপর যদি কোন আধুনিক কবির প্রভাব থাকে তো তিনি নজরুল ইসলাম। তবে উভয়ের মধ্যকার স্বাতন্ত্র্যও সুস্পষ্ট।' ('নবীন কবি ফররুখ আহমদ', 'সওগাত', বৈশাখ ১৩৫৪)—এসব উক্তি করা হয়েছে ফররুখের একেবারে প্রথম পর্যায়ে। আমাদের বিশ্বাস, ফররুখ-কাব্যে নজরুল ও প্রেমেন্দ্র মিত্র দুজনেরই অনুরণন আছে। তিরিশের কবিদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই সর্বাধিক প্রভাব ছিলো আমাদের কবিদের — ফররুখ আহমদ-আহসান হাবীব-সৈয়দ আলী আহসানের — উপরে।

৪ 'বাংলাদেশের কবিতা' : আবদুল মান্নান সৈয়দ। 'কাফেলা', বৈশাখ ১৩৮৮।

www.pathagar.com

৫ এই কথাটি – মনে হচ্ছে — এখন একটু শোধনসাপেক্ষ, ফররুখ আহমদের সমকালীন কবিবন্ধু তালিম হোসেনের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে :

> . . . বিশুদ্ধ রোমান্টিক কবিতা দিয়ে আমার কাব্যচর্চার শৈশব-কৈশোর চিহ্নিত হলেও রোমান্টিকতা সম্ভবত হতাশ হয়েই আমাকে ছাড়তে শুরু করে — যখন আমি শেষ কৈশোরেই বিশুদ্ধ মানবিক আদর্শবাদী ধ্যান-ধারণায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। পরে সেই মূল প্রবণতাই প্রথমে ইসলামী মূল্যবোধ এবং আরো পরে পাকিস্তানী লক্ষ্যাদর্শ অঙ্গীকার করে। আমাদের আজকের তরুণ বংশধররা জানে না বা তাদের জানাবার কোনো ব্যবস্থা হয়নি যে এদেশে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন পাকিস্তান আন্দোলনের ফলশ্রুতি নয়, বরং তার ঠিক উল্টোটাই ঐতিহাসিক সত্য।
>
> [দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ অক্টোবর ১৯৮৬]

৬ "আজাদ করো পাকিস্তান"। প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৬। প্রকাশক : মৃত্তিকা গ্রন্থনী বিভাগ, কলকাতা। "ফররুখ-রচনাবলী" প্রথম খণ্ডের (১৯৭৯) অন্তর্ভুক্ত।

৭ হাতেম তায়ী ফররুখের দুটি গ্রন্থের নায়ক : "নৌফেল ও হাতেম" (১৯৬১) ও "হাতেম তায়ী" (১৯৬৬)।

৮ 'পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য', 'সওগাত', আশ্বিন ১৩৫৪। "ফররুখ-রচনাবলী" প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

৯ 'উর্দু বনাম বাংলা', 'মোহাম্মদী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২। "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" (১৯৭৫) গ্রন্থভুক্ত। কবিতাটি পুনরুদ্ধৃত করছি। —

উর্দু বনাম বাংলা

দুইশো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন
বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা,
বাপান্ত শ্রমের ফলে উড়েছে আশার চামচিকা
উর্দু নীল আভিজাত্য (জানে তা নিকট বন্ধুগণ)।
আতরাফ রক্তের গন্ধে দেখি আজ কে করে বমন?
খাঁটি শরাফতি নিতে ধরিয়াছি যে অজানা বুলি
তার দাপে চমকাবে একসাথে বেয়ারা ও কুলি
সঠিক পশ্চিমী ধাঁচে যে মুহূর্তে করিব তর্জন।

পূর্ণ মোগলাই ভাব, তার সাথে দু'পুরুষ পরে
বাবরের বংশ দাবী — (জানি তা অবশ্য সুকঠিন
কিন্তু কোন লাভ বলো হাল ছেড়ে দিলে এ প্রহরে)
আমার আবাদী গন্ধ নাকে পায় আজো অর্বাচীন
পূর্বোক্ত তালাক সূত্রে শরাফতি করিব অর্জন ;
নবাবী রক্তের ঝাঁজ আশা করি পাবে পুত্রগণ।।

['মোহাম্মদী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২]

www.pathagar.com

১০ সমর সেন ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন, ১৯৮৭ সালে।

১১ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যে প্রয়াত হয়েছেন, ১৯৮৫ সালে।

১২ আসলে "পদাতিক"-এর তথা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতি রটান অনেকটাই বুদ্ধদেব বসু, ১৯৪০ সালে প্রকাশিত 'কবিতা' পত্রিকায়, ঐ বইয়ের বিস্তারিত সমালোচনায়। আধুনিক বাংলা কবিতার অবিসংবাদী নায়ক বুদ্ধদেব-যে সব প্রশস্তি সত্ত্বেও সন্দিহানও ছিলেন, তারও সাক্ষ্য আছে "কালের পুতুল"-এর (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯) বিভিন্ন অংশে : "পদাতিক"এর সমালোচনা বুদ্ধদেব শেষ করেছিলেন এই ব'লে, 'হয় তাঁকে [সুভাষকে] কর্মী হ'তে হবে, নয়তো কবি। তিনি কোন দিক ছাড়বেন?' সুভাষ কোনো দিক ছাড়েননি, দু'নৌকায় পা রেখেছিলেন, এবং ফলাফল যা ঘটবার তা-ই ঘটেছে। "কালের পুতুল"-এর 'নতুন সংস্করণের ভূমিকা'য় ১৯৫৮ সালে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন, 'লজ্জিত হয়েছি নিজের অমনোযোগে, যখন দেখেছি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কুয়াশা-কঠিন বাসর যে সম্মুখে' পংক্তিটিতে 'কুয়াশা'র সঙ্গে 'কঠিনে'র ও পূর্বোক্ত 'কমরেডে'র সঙ্গে 'বাসরে'র অসংগতি আমি লক্ষই করিনি . . .।' সত্যি ততোদিনে দেরি হয়ে গিয়েছিলো।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বুদ্ধদেবকে প্রতিদান দেন তাঁর সম্পাদিত বাংলা কবিতার সংগ্রহ থেকে বুদ্ধদেব বসু ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটিও কবিতা গ্রহণ না-ক'রে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই আবার ১৯৫৪ সালে শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলায় রূঢ় আক্রমণ করেছিলেন, এমনকি বলা যায় খারিজই করতে চেয়েছিলেন, জীবনানন্দ দাশ ও অমিয় চক্রবর্তীকে। ইতিমধ্যে, আশির দশকের প্রান্তে এসে, একজন কাব্যবোদ্ধাও কি বলবে সুভাষ যাঁদের খারিজ করতে চেয়েছেন সেই জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রবর্তী-বুদ্ধদেবের চেয়ে বাংলা কবিতায় সুভাষের অবদান বেশি?

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশিত কবিতা

বছর পনেরো আগে আমি যখন "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" (১৯৭৫) সম্পাদনা করি, তখন ফররুখ আহমদের প্রকাশিত প্রথম কবিতা ও রচিত সর্বশেষ কবিতা চিহ্নিত করা যায়নি। সময়ের দিক থেকে তখন আমরা ছিলাম খুব কাছে। এখন, কবির প্রথম ও সর্বশেষ কবিতা শনাক্ত করা গেছে। এই তথ্য ততোক্ষণ পর্যন্ত অটুট থাকছে, যতোক্ষণ না নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। এখন-পর্যন্ত-প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতা দুটি : 'রাত্রি' ও 'পাপ-জন্ম' আর সর্বশেষ কবিতা '১৯৭৪'। ১৯৮৮ সালে আমি লিখেছিলাম :

> সাল-তারিখ মিলিয়ে মনে হচ্ছে বাংলা ১৩৪৪ বা ইংরেজি ১৯৩৭-এই ফররুখ প্রথম সাহিত্য-জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। এই বছরই 'বুলবুল' ও 'মোহাম্মদী'তে তাঁর প্রথম রচনাবলি প্রকাশিত হয়। এখন-পর্যন্ত-প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনে হয়, 'বুলবুলে' প্রকাশিত 'রাত্রি' সনেটটি তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা (শ্রাবণ১৩৪৪)।[১]

সম্প্রতি 'মাসিক মোহাম্মদী'তে একই মাসে (শ্রাবণ ১৩৪৪) প্রকাশিত আরেকটি কবিতা পাওয়া গেছে — 'পাপ-জন্ম'।[২] তাহ'লে দেখা যাচ্ছে : 'রাত্রি' ও 'পাপ-জন্ম' কবিতা দুটি ফররুখের প্রথম প্রকাশিত কবিতা। ফররুখের সমসাময়িক লেখক-বন্ধু আবু রুশদ তাঁর একটি আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

> ১৯৩৭ সালে মরহুম হাবিবুল্লাহ বাহার সম্পাদিত মাসিক 'বুলবুল' পত্রিকায় আমার প্রথম ছোটগল্প 'অথর্ব' মুদ্রিত হওয়ার পরে আমি বাঙালি মুসলিম সমাজে পরিচিত হতে শুরু করলাম, আর 'বুলবুলে' এর পরের সংখ্যাতেই ছাপাবার জন্যে আমি বাহার সাহেবের কাছে ফররুখের লেখা 'ঝড়' কবিতাটি নিজের হাতে নিয়ে গেলাম। যথাসময়ে সে কবিতা ছাপাও হলো এবং পাঠক-সমাজে বেশ চমকের সৃষ্টি করলো।[৩]

কিন্তু 'ঝড়' নামে ফররুখের কোনো কবিতা 'বুলবুলে' প্রকাশিত হয়নি। সম্ভবত আবু রুশদ কবিতার নাম ভুলে গেছেন অথবা সম্পাদক 'ঝড়' শব্দ পরিবর্তন ক'রে 'রাত্রি' নামকরণ করেন ('রাত্রি' কবিতার মধ্যেই 'ঝড়' শব্দটি আছে।) যদি 'রাত্রি' কবিতাটিই তাঁর উদ্দিষ্ট কবিতা হয়, তাহ'লে বলতে হবে, ফররুখ প্রথম কবিতা লিখেই সাড়া জাগিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

১৩৪৪ সালে ফররুখ সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। (স্কুল-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লেখা এখানে ধরা হচ্ছে না)।[৪] ১৩৪৪ সালে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় এই লেখাগুলি :

১. রাত্রি (সনেট)। কবিতা। 'বুলবুল', শ্রাবণ ১৩৪৪।

২. পাপ-জন্ম (সনেট)। কবিতা। 'মাসিক মোহাম্মদী', শ্রাবণ ১৩৪৪।

৩. অপ্রয়োজন। কবিতা। 'বুলবুল', ভাদ্র ১৩৪৪।

৪. অন্তর্লীন। গল্প। 'মাসিক মোহাম্মদী', ভাদ্র ১৩৪৪।

৫. মৃত বসুধা। গল্প। 'মাসিক মোহাম্মদী', কার্তিক ১৩৪৪।

৬. মৃত্যুরূপা। কবিতা। 'বুলবুল', পৌষ ১৩৪৪।

৭. নগর-পথ। কবিতা। 'বুলবুল', ফাল্গুন ১৩৪৪।

৮. অন্যায়। কবিতা। 'বুলবুল', চৈত্র ১৩৪৪।

প্রথম পর্যায়ে ফররুখ কবিতা ও গল্প দুই-ই লিখছিলেন। ১৩৪৪-৪৬ অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৯ এই বছর তিনেক ফররুখ গল্প লেখেন।[৫] বলা বাহুল্য, কবিতা লেখা তো চলছিলোই। এর পর তিরিশ বছরের অধিক কাল ধ'রে তিনি কবিতাতেই সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন। একই সময়-পরিসরে লেখা তাঁর গল্পগুচ্ছের সঙ্গে তাঁর 'পাপ-জন্ম' কবিতার একটি সাদৃশ্য আছে। কবিতাটি এই :

পাপ-জন্ম

আমি পাপী, তুমি পাপী — আমাদের জন্ম পাপ-দহে।
এ বিশ্ব কলুষ পংকে কলঙ্কিত তবু যাহাদের
আমরা তাদের সৃষ্টি। শুনিয়াছি নিত্য তাহাদের
বেদনা পীড়িত মনে মুহূর্তের মিলনে বিরহে
সীমাহীন জন্মধারা-সুরধ্বনি। হেথা কেহ নহে
নির্ম্মল বিরল আত্মা। আমরা সে পথিক নিখোঁজ
অজ্ঞাতে এসেছি হেথা ফুটিয়াছি কামনা সরোজ —
আমাদের পাপ-দেহ — আবর্জনা পাপী বিশ্ব বহে।

নিশীথে জাগিয়া দেখি চারিদিকে সৃজনের মেলা
জন্ম লভে মহাশিশু অজ্ঞতার কৃষ্ণ অন্ধকারে

www.pathagar.com

কখন রজনী কাটে, চারিদিকে চলে মুক্ত খেলা —
কংকালের বুকে জাগে শিশু-আত্মা হেরি চারিধারে
আলিঙ্গনে অন্ধকার কারাবন্ধে জাগে শিশু-নর
কামনার রক্তরাগে আকাঙ্খিত মানব সুন্দর।।

ফররুখের গলপগুচ্ছে যে-যৌনচেতনা অন্তঃশীল, তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে যা প্রথম ও শেষবারের মতো ঝলক দিয়ে গেছে, এই কবিতাতেও আছে তারই একটি স্বাক্ষর। পরবর্তীকালে ফররুখের কবিতা ঘুরে গেছে সম্পূর্ণ অন্যদিকে। কিন্তু এরই ফলে — আজ মনে হয় — ফররুখের জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে। ফররুখের এই কবিতা প'ড়ে বাঙালি কাব্যপাঠকের মনে পড়বে বুদ্ধদেব বসু-প্রেমেন্দ্র মিত্র-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-জীবনানন্দ দাশের প্রাথমিক সংরক্ত কবিতাপর্যায়ের কথা। আর ফররুখ আহমদ কোনো আকস্মিক উদ্‌গম নন — তিনিও ধারাবাহী ; অসচেতন প্রত্নচর্যা তিনি করেননি — তিনি পরম্পরাক্রমে প্রস্ফুটিত। তার সাক্ষ্য দিয়েছেন আবু রুশদ ঠিক এই কবিতা-গল্প রচনার পূর্ববর্তী ফররুখের জীবন-ও-সাহিত্য-চর্যায় :

> আমার ঝোঁক ছিলো উপন্যাস ও ছোটগল্পের দিকে, ফররুখ কথাসাহিত্যের সঙ্গে কবিতাও পড়তো। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাস নিয়ে আমাদের দুজনার মধ্যে উদ্দীপনামূলক আলোচনা হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের সাহিত্যিক রুচি একইরকম ছিলো। কীটস, শেলী ও নজরুলের কাব্য থেকে ফররুখ নিজের গোসলখানায় নিভৃতে আবৃত্তি করতো।[৬]

তিরিশের কবি-লেখকদের হাত ধ'রেই আমাদের এই চল্লিশের কবি-লেখকেরা উঠে এসেছিলেন। 'পাপ-জন্ম' কবিতার সূত্রে বিশেষভাবে মনে পড়বে বুদ্ধদেব বসুর "বন্দীর বন্দনা" (১৯৩০) কাব্যখানির কথা। কিন্তু বুদ্ধদেব ও ফররুখের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যও পরিষ্কার : বুদ্ধদেব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন আর প্রবৃত্তি-প্রদাতা বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন ; আর ফররুখ দিয়েছেন নফ্‌স্‌-এর সহজ স্বাভাবিক স্বীকৃতি। এই কবিতাতেও — প্রথম কবিতাতেই — ফররুখ পরিণত মানসতার পরিচয় দিয়েছেন। কবিতার শেষ পঙক্তিটি স্মরণীয় : 'কামনার রক্তরাগে আকাঙ্খিত মানব সুন্দর।' বুদ্ধদেব সারা-জীবন আবৃত্ত হয়েছেন প্রকৃতি ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্বসমাসে, ফররুখ বিষয়টিকে স্পর্শ ক'রে তখনই চুকিয়ে-মিটিয়ে দিয়েছেন। বরং তাঁর প্রথম প্রকাশিত আরেকটি কবিতা — 'রাত্রি' — তাঁর আবহমান কবিতার একটি কেন্দ্রীয় স্বর হিশেবে কাজ

www.pathagar.com

ক'রে গেছে। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে লেখা এই কবিতায় ফররুখের চিরকালের একটি চারিত্রলক্ষণ চিহ্নিত হ'য়ে গেছে। কবিতাটি উদ্ধৃত হ'লো :

রাত্রি

ওরে পাখী, জেগে ওঠ জেগে ওঠ রাত্রি এল বুঝি
ঘুমাবার কাল এল, জাগিবার সময় যে যায়
ওরে জাগ্ জাগ্ তবু অকারণে। রাত্রির ভেলায়
কোন অন্ধ তিমিরের স্রোতে আসা নিরুদ্দেশে যুঝি
হে বিহঙ্গ, দিকভ্রষ্ট নাহি হোয়ো যেন পথ খুঁজি
অবেলায়। এখনো সম্মুখে আছে ঝড়, আছে ভয়
এখনো আনন্দ আছে খুঁজিবার দুরন্ত বিস্ময়
তবু অন্ধকার এল দেখিলাম রিক্ত মোর পুঁজী।

এখনো যায়নি অস্ত সূর্য মোর ব্যথা আকুলিয়া
এখনো রয়েছে তার শেষ রশ্মি পাতায় পাতায়
তবু অন্ধকার এল, এল মোর আনন্দ ভুলিয়া
অনন্ত বেদনা সম রিক্ততার কঠোর ব্যথায় ;
প্রতি পল্লবের বুকে জাগিল তিমির শ্যামলিমা
এ আমার স্বপ্ন নহে, এই কালো মোর মৃত্যুসীমা।।

'পাপ-জন্ম' কবিতার বিষয় ফররুখ-কাব্যে বা সাহিত্যে আর বাহিত হয়নি, কিন্তু তাঁর প্রথম প্রকাশিত আরেকটি কবিতা 'রাত্রি'র অন্তর্বিষয় ফররুখ-কাব্যে চিরকাল অনুসৃত। দিনের উজ্জ্বলতা ও একাগ্রতা নয়, কবি মাত্রকেই উজ্জীবিত করে রাত্রির রহস্যময়তা। রোমান্টিক কবির কাছে রাত্রি এক আশ্চর্য রহস্যের দরোজা আধো-উন্মোচন করে। ফররুখ আহমদের কবিকল্পনাকে রাত্রি সব সময়ই উদ্বুদ্ধ করেছে। "সাত সাগরের মাঝি"র প্রধান চারিত্রলক্ষণ তার রোমান্টিকতা। কবি ফররুখ আহমদ রোমান্টিকতা থেকে যাত্রা ক'রে আদর্শবাদিতায় পৌঁছেছিলেন — প্রথম পর্যায়ের আদর্শবাদিতা ছিলো প্রচ্ছন্ন, পরবর্তী পর্যায়ে রোমান্টিকতা আড়ালে গিয়েছে। রাত্রি ফররুখ আহমদের একটি কেন্দ্রীয় থীম। তাঁর চিরকালের কবিতা থেকেই রাত্রি-কেন্দ্রিক কবিতাগুলোকে নির্বাচন ক'রে নেওয়া যায় — 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি', 'এইসব রাত্রি', 'বন্দরে সন্ধ্যা', 'বর্ষার বিষণ্ণ চাঁদ', 'সন্ধ্যাতারা', 'কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি', 'ওয়েলেসলি স্কোয়ারে পূর্ণিমা', 'রাত্রির অগাধ বনে', 'সন্ধ্যা', 'ইরানী

www.pathagar.com

হাওয়ার রাত' ইত্যাদি। শেলী ও কীটসের অনুসরণ ক'রে পাখি-সম্বোধিত তাঁর বেশ-কিছু কবিতা আছে। 'রাত্রি' কবিতাকে তার সূচনাবিন্দু হিশেবে ধরা যায়। পাখি-কেন্দ্রী তাঁর দুটি বিখ্যাত কবিতা 'ডাহুক' ("সাত সাগরের মাঝি") ও 'দোয়েলের শিস' ('হে বন্য স্বপ্নেরা', "শ্রেষ্ঠ কবিতা")। দুটি কবিতারই পটভূমি রাত্রি। রাত্রিকালই পাখির ডাকের ব্যঞ্জনা ঘন ক'রে আনে, পক্ষীশ্বরকে অন্য অর্থে উত্তীর্ণ করে। দুটি কবিতারই আরম্ভে বিস্তীর্ণ হয়েছে রাত্রির পটভূমিকা :

১. রাত্রিভর ডাহুকের ডাক —
এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধদীঘি অতল সুপ্তির।
দীর্ঘ রাত্রি এক জেগে আছি।

[ডাহুক]

২ দুর্ভেদ্য তিমির ঘন, রাত্রির তোরণ হতে ভেসে আসে দোয়েলের শিস
সন্ধ্যার বালুতে জ্বলে দিবসের শেষ সূর্য বিচিত্র ভূষায়
অজ্ঞাত রাত্রির তীরে শোনা গেল শেষবার দোয়েলের শিস
তীক্ষ্ণ সুর সুতীব্র সংগীত।

[দোয়েলের শিস]

ফররুখের কবিতায় রাত্রিকাল দিনের উজ্জ্বলতার চেয়ে অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তাঁর অনেক কবিতায় ভোর বা সকালের ব্যবহারও আছে। রাত্রি তাঁর রোমান্টিক কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, আর ভোর দেখা দিয়েছে তাঁর সৌন্দর্যবাদিতার সঙ্গে আদর্শবাদিতার যোগসূত্রকারী এক প্রহর হিশেবে।।

---

১ "ফররুখ আহমদ" : আবদুল মান্নান সৈয়দ। ১৯৮৮। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ১৭।

২ 'উষালোকে' , ফররুখ-সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৯। সম্পাদক : মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ। পৃ. ৫৭।

৩ "জীবন ক্রমশ" : আবু রুশদ। ১৯৮৯। হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা। পৃ. ৬৬।

৪ প্রকৃতার্থে খুলনা জেলা স্কুল ম্যাগাজিনে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো ফররুখের প্রথম প্রকাশিত কবিতা। 'বুলবুল' ও 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত কবিতাটিকে আমরা প্রথম কবিতা ধরেছি বৃহত্তর

www.pathagar.com

সাহিত্য-জগতে প্রবেশী কবিতা হিশেবে। ফররুখ আহমদের স্কুলশিক্ষক, কবি ও লেখক আবুল হাশেম ঐ স্কুল-ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছিলেন।

৫ "ফররুখ আহমদের গল্প" : আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত। ১৯৯০। সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ঢাকা।

৬ "জীবন ক্রমশ" : আবু রুশদ। পৃ. ৬৬।

www.pathagar.com

সাত সাগরের মাঝি

উত্তর-রৈবিক উত্তর-নজরুলী বাংলা কবিতার ধারায় যে-ক'টি কাব্যগ্রন্থ বিশিষ্ট, ফররুখ আহমদের "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪) তাদেরই সঙ্গে তুলনীয়। বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-৭৪) "বন্দীর বন্দনা" (১৯৩০), অজিত দত্তের (১৯০৭-৭৯) "কুসুমের মাস" (১৯৩০), প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-৮৮) "প্রথমা" (১৯৩২), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-৭৬) "অমাবস্যা" (১৯২৯), জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) "বনলতা সেন" (১৯৪২), বিষ্ণু দে-র (১৯০৮-৮২) "চোরাবালি" (১৯৩৭), অমিয় চক্রবর্তীর (১৯০১-৮৬) "খসড়া" (১৯৩৮), সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-৬০) "অর্কেস্ট্রা" (১৯৩৫) এইসব উত্তর-রৈবিক উত্তর-নজরুলী গ্রন্থের আত্মচারিত্রগুণের সঙ্গেই তুলনা হ'তে পারে "সাত সাগরের মাঝি"র। লক্ষণীয়, এই তালিকায় আমি কোনো চল্লিশের কবির কাব্যগ্রন্থকে অন্তর্ভুক্ত করিনি। তার কারণ, আমার বিশ্বাস, চল্লিশের কবিদের মধ্যে একমাত্র ফররুখের "সাত সাগরের মাঝি"র মধ্যেই আতীব্র মৌলিকত্ব সান্দ্রীভূত হয়েছিলো।[১] বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে একটি দ্রুত রেখালেখ্যে আমরা এই কেন্দ্রীয় চারিত্রলক্ষণগুলি সন্ন্যস্ত করবো।

১ : শব্দ। — শব্দ কবিতার প্রধান অস্ত্র। গদ্যও শব্দ ব্যবহার করে ; কিন্তু গদ্যের শব্দ অভিধান-নির্ভর অর্থাৎ শব্দার্থ সেখানে সুনির্দিষ্ট। কবিতার শব্দ অভিধানোত্তর। শিল্প হিশেবে গদ্য ও কবিতা দুই-ই সুলিখিত হওয়া দরকার কিন্তু গদ্যের সুলিখন নির্ভরশীল যথাযথ শব্দযোজনায়, আর কবিতার সুলিখন স্বাশ্রিত বহুস্তর অনুষঙ্গময় শব্দবিন্যাসে। গদ্যে সম্ভব কিন্তু কবিতায় সমার্থক শব্দ ব'লে কিছু নেই, আছে কেবল অ-বিকল্প একক অনন্য শব্দ। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, কবিতা কেবল প্রচলিত শব্দকে ধারণ করে, কবিতায় শব্দ প্রয়োগও সতত পরীক্ষাশীল। একালের পাঠক মাত্রই জ্ঞাত আছেন জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব ও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের মাত্রাবিতরণ, সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র কবিতায় অপ্রচলিত আভিধানিক ও পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ। "সাত সাগরের মাঝি"তে ফররুখ আহমদের শব্দসমীক্ষা ঈষৎ ভিন্নতর। প্রচলিত বাংলা শব্দের সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দের মাত্রাবিতরণের সমীক্ষা "সাত সাগরের মাঝি"র মূল শব্দস্বভাব। এই শব্দসমীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এদিক থেকে যে, কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) যুগান্তকারী কাব্যগ্রন্থ "অগ্নি-বীণা"য় (১৯২২) একবার এই পরীক্ষা

www.pathagar.com

হয়েছিলো, কিন্তু তা আর দ্বিতীয়বার উদযাপিত হয়নি। তিরিশের প্রধান কবিদের মধ্যে বাঙালি-মুসলমান পরিবার থেকে কেউ আসেননি (জসীমউদ্‌দীনের কাজের ও সাফল্যের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র)। ফলে বাংলা কবিতায় বাঙালি-মুসলমানের যে-স্ব-স্বভাবী অংশগ্রহণ, তার ধারাবাহিকতা তখন অন্তত নিশ্চিত হয়নি। কিন্তু বাঙালি সমাজের অর্ধেক অংশের সাহিত্যিক প্রকাশ তো অনিবার্য ছিলোই। "সাত সাগরের মাঝি" সেই অনিবার্য পরিণাম। ফররুখ আহমদ তাঁর প্রতিভা ও স্বজ্ঞার বলে বাঙালি-মুসলমানের এই স্বভাব তাঁর কাব্যস্বভাবে স্বাঙ্গীকৃত ক'রে নিয়েছিলেন। ফলে, "অগ্নি-বীণা"র ধারাবাহিকতায় পরবর্তী বই যেমন একদিকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (জন্ম ১৯১৯) "পদাতিক" (১৯৪০), তেম্নি অন্যদিকে ফররুখের "সাত সাগরের মাঝি"। কিন্তু বাংলা কবিতা-যে "অগ্নি-বীণা"য় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দগুচ্ছকে অঙ্গীকৃত ক'রে নিয়েছিলো, তার প্রমাণ : "অগ্নি-বীণা"য় আরবি-ফারসি শব্দাবলির বাংলা অর্থ ফুটনোটে যোগ করা হয়, কিন্তু "সাত সাগরের মাঝি"র অন্যবিধ সাযুজ্য-বৈযুজ্য এখানেই চিহ্নিত করা দরকার : দুটি গ্রন্থই জাগরণমূলক[২], ছন্দদোদুল[৩], আরবি-ফারসি শব্দময় ; কিন্তু ফররুখ ইসলাম-কেন্দ্রী, আর ইসলাম বাদে অন্য বিষয়েও নজরুল স্পর্শ করেছেন।[৪] ফররুখের কৃতিত্ব এখানে যে, এক 'খেয়াপারের তরণী'র স্মৃতি-চিহ্নিত 'পাঞ্জেরী' বাদে অন্যত্র তিনি স্বাধীন ও স্বরাট্। শব্দপ্রয়োগে ফররুখ প্রথম গ্রন্থে সমসাময়িক হিন্দু কবিদের তো বটেই, মুসলমান কবিদের থেকেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; কেননা চল্লিশের আর-কোনো কবি অন্তত তখন-পর্যন্ত - (ফররুখের প্রভাব উত্তরকালে বিস্তৃত হয়) — আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা কবিতায় প্রবাহিত করার কোনো চেষ্টা করেননি। "সাত সাগরের মাঝি"র শাব্দিক সাফল্য ফররুখের সমকালীন ও পরবর্তী কবিদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। আর তা ফররুখের নিজের তাবৎ কবিতার অনিবারণ চারিত্র হ'য়ে দাঁড়ায়।

২ : ছন্দ। — "সাত সাগরের মাঝি"তে মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত এই দুটি ছন্দ প্রযুক্ত হয়েছে। এ বইয়ের কেন্দ্রীয় ছন্দ মাত্রাবৃত্ত — মুক্তক মাত্রাবৃত্ত। 'সিন্দবাদ', 'বা'র দরিয়ায়', 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি', 'সাত সাগরের মাঝি' প্রভৃতি সমুদ্রকেন্দ্রিক কবিতাগুচ্ছ — যা এ কবিতাগ্রন্থের প্রাণকবিতা — মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, আরো সুনির্দিষ্ট ক'রে বললে হয় ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা। ফররুখের অসামান্য কৃতিত্ব এই :

ক. মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত এই দুই প্রায়-বিপরীত ছন্দকে একই কাব্যভাষায় গ্রথিত ও সঞ্চালিত করেছেন।

www.pathagar.com

খ. কবিতার এক চিরন্তন গুণ আবৃত্তিযোগ্যতা। "সাত সাগরের মাঝি"র কবিতাগুচ্ছের আবৃত্তিগুণ অসাধারণ।

গ. গম্ভীর ধ্বনিময়তা "সাত সাগরের মাঝি"র ছন্দের বিশিষ্টতা (উদাহরণ : 'সিন্দবাদ', 'সাত সাগরের মাঝি', 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' ইত্যাদি) ; কিন্তু অনির্বচনীয় মৃদু রণনশীলতাও সৃষ্টি করেছেন ফররুখ এই গ্রন্থেই (উদাহরণ : 'এইসব রাত্রি')।

ঘ. সাংগীতিক জগচ্চিত্র নির্মাণের জন্যে কবি ব্যবহার করেছেন জীবনানন্দ-বুদ্ধদেব আবিষ্কৃত শব্দ, পঙক্তি ও স্তবক বা তাদের অংশের আবৃত্তি-পুনরাবৃত্তি (উদাহরণ : 'আকাশ-নাবিক', 'পাঞ্জেরী', 'সাত সাগরের মাঝি' ইত্যাদি)।

ঙ. মাত্রাবৃত্তের মতো রাবীন্দ্রিক ছন্দকে নিজের মতো ক'রে চালিয়েছেন ব'লে বিষ্ণু দে-র প্রশংসা করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত[৫] ; ফররুখে আর-একবার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ পায় নতুন রণন ও আয়তন।

৩ : প্রতীক। — "সাত সাগরের মাঝি" বিরল কয়েকটি বাংলা প্রতীকী কাব্যগ্রন্থের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) "খেয়া", জীবনানন্দ দাশের "বনলতা সেন" (১৯৪২), সুধীন্দ্রনাথ দত্তের "দশমী" (১৯৫৬) — বাংলা সাহিত্যের প্রতীকী কাব্যগ্রন্থ এরকম কয়েকটি মাত্র। প্রতীক কথাটি এখানে প্রচলিত অর্থেই ব্যবহার করা হচ্ছে — ফরাশি প্রতীকী কাব্যের বিশিষ্টতা আলাদা।[৬] সমুদ্র[৭], জাহাজ, নাবিক[৮], সিন্দবাদ, মাঝি, পাখি (ডাহুক বা ঈগল), শাহরিয়ার — এইসব প্রতীকে ফররুখ এক নীল উত্তাল জাগরণের গায়ক। স্মরণীয় : বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দে সমুদ্র প্রসঙ্গ উপর্যুপরি ; কিন্তু এঁদের উত্তরবর্তী ফররুখ সমুদ্র-জাহাজ-নাবিকের এমন-এক স্বতন্ত্র প্রতীকী মহিমা দান করেন, যেখানে সমুদ্র চিত্র ও চিত্রকল্পে যেমন বাস্তব হ'য়ে ওঠে তেমনি এক কল্পজগৎকে মেলে ধরে।

৪ : প্রকরণ। — 'কবিতার ইতিহাস তার টেকনিকের ইতিহাস।' — বলেছিলেন লুই আরাগঁ।[৯] ফররুখ আহমদ ক্রমাগত টেকনিকের এক এলাকা থেকে অন্য এলাকা সফর করেছিলেন — লিরিক ("সাত সাগরের মাঝি" ও অন্যান্য), সনেট ("মুহূর্তের কবিতা" ও অন্যান্য), কাব্যনাট্য ("নৌফেল ও হাতেম" ও অন্যান্য), মহাকাব্য ("হাতেম তায়ী") প্রভৃতি। তাঁর প্রথম গ্রন্থেও প্রাকরণিক বিচিত্রিতা কম নেই। আছে সনেট ('বন্দরে সন্ধ্যা', 'পুরানো মাজারে', 'স্বর্ণ-ঈগল', 'তুফান'), আছে কবিতানাট্য ('দরিয়ায় শেষ

www.pathagar.com

রাত্রি'), আছে একই কবিতাধারে গাঢ়বদ্ধ আঠারো মাত্রার অক্ষরবৃত্তিক সনেট ও মুক্তক অক্ষরবৃত্তের প্রয়োগ ('আউলাদ')। 'স্বর্ণ-ঈগল' ও 'তুফান' সনেটে নিসর্গের দুইরূপ, বিহঙ্গে ও ঝড়ে, জাগরণের আহ্বান বেজেছে — যা এই কাব্যগ্রন্থের মূল সুর। সনেটগুলো পেত্রার্কান। 'অন্ধকার ধনু হাতে তীর ছোঁড়ে রাত্রির নিষাদ' ('বন্দরে সন্ধ্যা') — এই চিত্রকল্প ফররুখের কবিতায় উত্তরকালেও বারবার দেখা গেছে। 'পুরানো মাজারে' কবিতায় 'এইসব রাত্রি' কবিতার প্রথম পঙক্তিটি 'এইসব রাত্রি শুধু একমনে কথা কহিবার/নিজেদের সাথে' পুনঃপ্রবিষ্ট হ'য়ে গেছে। 'স্বর্ণ-ঈগল' সনেটের শেষ পঙক্তি 'সোহরাবের লাশ নিয়ে জেগে আছে নিঃসঙ্গ রুস্তম' প্রাচীন পুরাণোক্ত একটি অদ্ভুত প্রতিমা, 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' কবিতানাট্যে ফররুখের অনেকগুলি বিশিষ্টতা একত্রিত হয়েছে — তাঁর নাট্যগুণ, শব্দ-উপমা-ইমেজ কুশলতার সঙ্গে তাঁর বিষয়ের পুনর্নির্মাণ।[১০] একই কবিতায় বিভিন্ন ছন্দের ও স্তবকবন্ধের কাজ শুরু করেন বিষ্ণু দে। 'আউলাদ' কবিতায় ফররুখ ঐ কুশলতাই ব্যবহার করেছেন।

৫: পুরাণের পুনর্ব্যবহার ।— আধুনিক বিশ্বসাহিত্যেরই একটি বহুখ্যাত কৌশল হচ্ছে, পুরাণের পুনর্ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অতীতকালের সঙ্গে বর্তমানকালের সেতু সংরচন। মাইকেল, নজরুল, বিষ্ণু দে — আমাদের কবিদের মধ্যে এঁরাই সর্বাধিক পুরাণ ব্যবহার করেছেন। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, গ্রীক ইত্যাদি পুরাণ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত। মুসলিম পুরাণের প্রথম প্রকৃত কাব্যিক ব্যবহার করেছেন নজরুল। উত্তরকালে সর্বাধিক এবং সবচেয়ে যোগ্যতায় ফররুখ আহমদ। "নৌফেল ও হাতেম", "হাতেম তা'য়ী" — এসবের মধ্যেও ফররুখ মুসলিম পুরাণের উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। (হাতেম তা'য়ীকে অমুসলিম এবং প্রাক-ইসলাম যুগের ব'লে কেউ-কেউ ফররুখের ভুল ধরেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মুসলমানদের কাছে হাতেম আমাদেরই একজন পূর্বসূরী হিশেবে চিহ্নিত, বাংলার পুঁথিসাহিত্যেও সেভাবেই তিনি গৃহীত। সুতরাং পাণ্ডিতিক ব্যাখ্যা যা-ই হোক, কবিতার সাধারণ্যে স্বীকৃতিই আসল। আর মুসলিম পুরাণ যেহেতু সুবিস্তৃত নয়, এবং কিছুটা অস্পষ্ট, কাজেই একজন মুসলমান কবি ব্যবহার করতে পারেন কল্প-পুরাণ। আমাদের বিচারে ,হাতেম তা'য়ীর পুনর্ব্যবহার ফররুখে সম্পূর্ণ সংগত এবং তা কাব্যন্যায়কে কখনো এবং কিছুতেই উল্লঙ্ঘন করেনি।) ফররুখের অসামান্য কৃতিত্ব এই যে, তিনি ইতিপূর্বে অব্যবহৃত আরব্যোপন্যাসকে[১১] মুসলিম পুরাণ হিশেবে প্রয়োগ করেন। আরব্যোপন্যাসের নায়ক সিন্দাবাদ ফররুখেরও কাব্য-নায়ক। আরব্যোপন্যাসের কাহিনী

www.pathagar.com

ফররুখেকে প্রায় চিরকালই বিমুগ্ধ রেখেছে। "সাত সাগরের মাঝি"র বাইরেও তাঁর অনেক কবিতার উৎস আরব্যোপন্যাস। ফররুখ আহমদ এদেশের কবিতায় পুরাণপ্রয়োগের (মুসলিম পুরাণপ্রয়োগের) দুয়ার খুলে দিয়েছেন। ফররুখ আহমদের যে-সব বিস্ময়কর মৌলিকতার জন্যে এদেশের সাহিত্যে তিনি চিরকাল স্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন, মুসলিম পুরাণের পুনর্জন্ম দান তার অন্যতম।

৬ : সমকালীনতা ।— "সাত সাগরের মাঝি" বেরিয়েছিলো মধ্য-চল্লিশে, যখন বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের রলরোল চলছে ; ১৩৫০এর দুর্ভিক্ষ এক বছর আগে পেরিয়ে এসেছে (এই গ্রন্থের প্রায় সমস্ত কবিতাতেই সেই মুসলিম প্রাধান্যের চেতনা কাজ ক'রে গেছে)। বিশের দশকে কাজী নজরুলের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান মিলনের যে-বাণী বেজে উঠেছিলো, তিরিশের দশকে বিষ্ণু দে-সুধীন্দ্রনাথের হিন্দু পুরাণ প্রয়োগে আর চল্লিশের দশকে ফররুখের মুসলিম পুরাণের ব্যবহারে তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হ'লো। যে-কোনো কারণেই হোক, দেখা গেলো নজরুল ইসলাম ব্যর্থ হয়েছেন : কেবল রাষ্ট্রিকভাবেই নয়, সাংস্কৃতিকভাবেই বাঙালি-হিন্দু ও বাঙালি-মুসলমান স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে এসেছে। "সাত সাগরের মাঝি" এই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষ্যবহ। এদিকে, বাঙালি-মুসলমানের বিলম্বিত রেনেসাঁস সূচিত হয় এই শতাব্দীর বিশের দশকে — মূলত নজরুলের নেতৃত্বে। নজরুল যদিও হিন্দু-মুসলমান মিলনের শ্রেষ্ঠ অগ্রদূত ছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে ছিলেন বাংলা সাহিত্যের মুসলিম সংস্কৃতিরও প্রথম নির্মাতা (এখানে কেবল স্মরণীয় : নজরুলের কবিতায় ও গদ্যে প্রথমবারের মতো মুসলিম পুরাণ, ইতিহাস, শব্দ, উপমা, ইমেজের প্রয়োগ এবং ইসলামী গানের স্রষ্টা হিশেবে তাঁর ভূমিকা।) ফররুখ বিষয়ের দিক থেকে নজরুলের অনুবর্তন করেছেন — কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন বিন্যাসে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলামের মতো ফররুখ আহমদেরও আরাধ্য হ'লো পুরাণের পুনর্জন্ম — কেবল এমন একটি বিষয় তিনি বেছে নিলেন, যা তাঁরই আবিষ্কার : আরব্যোপন্যাস। বাঙালি-মুসলমানের অনচ্ছ পুরাণচেতনাকে ফররুখ সমৃদ্ধ করেছেন পুঁথির দ্বারা। পুঁথির মাধ্যমেই প্রবেশ করালেন আধুনিক অন্তরাখ্যান। আমরা সকলেই জানি : পুরাণের মাধ্যমে সমকালীনতার উদ্বোধন ঘটানোতেই একমাত্র পুরাণ মূল্যবান হ'য়ে উঠতে পারে আধুনিক মানসের কাছে — তা নাহ'লে তা মূল্যহীন।

চল্লিশের দশকে যখন গদ্যকবিতার স্রোত বইছে, জীবনও গদ্যময়, যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশবিভাগে সংরক্ত, তখন ফররুখ মুক্তক মাত্রাবৃত্তের উত্তাল ঝড়ে যেন সেই পৃথিবীকে পরাহত ক'রে এক আশাশীল জগৎ নির্মাণ করলেন। (ফররুখও গদ্যকবিতা লিখেছেন, "হাবেদা মরুর কাহিনী" (১৯৮১) গ্রন্থে ধৃত, কিন্তু তা অনেক পরে লেখা, এবং

www.pathagar.com

তা ফররুখীয় মুদ্রা-চিহ্নিত নয়।) ঐ চল্লিশের দশকেই প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশের "সাতটি তারার তিমির" (১৯৪৮) ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের "সংবর্তে" (১৯৫৩) সমকালীন জগচ্চিত্র তীব্রভাবে দেখা দ্যায়। "সাতটি তারার তিমির" ও "সংবর্ত"এর জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথের মতো "সাত সাগরের মাঝি"র ফররুখ জাতিগত ভাবনা-বেদনায় উজ্জীবিত। শুধু পার্থক্য এই : যুদ্ধপীড়িত মানুষের সঙ্গে মুসলমানের পুনর্জাগরণ তাঁর আরাধ্য। "সাত সাগরের মাঝি" সমকালীন দুদিক থেকে : একদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষ-প্রাসঙ্গিক কবিতা ('লাশ[১২] ও 'আউলাদ[১৩]),অন্যদিকে মুসলিম পুনর্জাগরণমূলক কবিতা ('সিন্দবাদ', 'সাত সাগরের মাঝি', 'হে নিশানবাহী', 'নিশান', 'নিশান বরদার[১৪] প্রভৃতি) সমকালীন পত্রপত্রিকায় অবিরল উপস্থিত । ফররুখে একটি বিষয় লক্ষণীয় : আধ্যাত্মিকতা নেই, আছে ধার্মিকতা। "সাত সাগরের মাঝি"তে ধার্মিকতাও নেই, যা তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ "সিরাজাম মুনীরা" (১৯৫২) কাব্যগ্রন্থে বিকশিত। "সাত সাগরের মাঝি"তে আছে রোমান্টিকতার তথা কাব্যিকতারই অমোঘ অনন্য অবিরল উৎসারণ।[১৫]

৭: রোমান্টিক ও ক্লাসিক প্রতিসাম্য । — "সাত সাগরের মাঝি" মর্মে-মর্মে রোমান্টিক। জীবনানন্দ-কথিত 'কল্পনাপ্রতিভা' এই গ্রন্থের মূলধন। আরব্যোপন্যাসের কাহিনী কবিমনে যে-ঢেউ তুলেছে তা-ই আছড়ে পড়েছে এই গ্রন্থের কবিতায়-কবিতায়। তাই মাত্রাবৃত্তের মতো মাপা-বাঁধা ছন্দ প্রয়োগ করলেও ফররুখ স্বাধীনতা নিয়েছেন মুক্তকের প্রমুক্তিতে — পঙক্তিগুলি সমান সংখ্যক পর্বে বিভক্ত হ'লেই এই স্বাধীনতা খর্বিত হ'তো। বাংলা-সংস্কৃত শব্দের পাশেই আরবি-ফারসি শব্দ ব'সে (যেমন : 'নওল উষা') সৃষ্টি করেছে একটি নতুন কাব্য-ভাষা, ভারতচন্দ্র-কথিত 'যাবনী-মিশাল' কাব্যভাষা। আসলে সুন্দরতা নির্মিত হয়েছে এই কাব্যের আবহের জন্য। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতায় বিদেশযাত্রার এক ধ্বনি বেজে উঠেছিলো — একদিকে মোহিতলাল-নজরুলের হাতে (মূলত মধ্যপ্রাচ্য সুরভিস্নাত), অন্যদিকে সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে'র কলমে (মূলত য়োরোপীয়)[১৬]। বাংলা কবিতার ইতিহাস ও ভূগোলে সম্প্রসার (মোহিতলাল, নজরুল, জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র) শেষবারের মতো সফল হ'য়ে উঠেছে "সাত সাগরের মাঝি"তে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি কবিদের মধ্যে সর্বাধিক বিদেশ সফর করলেও তাঁর কবিতায় বৈদেশিক আবহ প্রায় অনুপস্থিত।[১৭] ফররুখ নিজে কখনো স্বদেশের বাইরে যাননি। যে-দেশ তিনি রচনা করেছিলেন, তা গ্রন্থ-সংস্পর্শে জ্ঞাত তাঁর কল্পনার। সেই কল্প-পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো তাঁর আদর্শচেতনা।

www.pathagar.com

ফররুখের এই রোমান্টিকতায় একটি ধ্রুপদী জগৎ ছিলো। সনেটে তাঁর প্রবল আগ্রহ তাঁর আত্মশাসনের একটি সাক্ষ্য। অন্যত্রও ফররুখ আবেগোত্তাল হ'লেও নিজের কল্পনা ও বক্তব্যকে একটি শব্দ-ছন্দ-ইমেজের শাসিত আয়তনে বাঁধতে চাইতেন।

৮ : নৈর্ব্যক্তিকতা । — "সাত সাগরের মাঝি" তো বটেই, অন্যত্রও, ফররুখ ব্যক্তিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা নয় — জাতিগত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বাণীবাহক। ফররুখের কবিতায় ব্যক্তিগত বিষাদ, আনন্দ, প্রেম, কামের প্রকাশ লক্ষণীয়রকমে কম। এদিক থেকে চল্লিশের কবিদের গোষ্ঠীস্বভাব তাঁর মধ্যেও বিকীর্ণ ।[১৮] "সংবর্ত" ও "সাতটি তারার তিমিরে", চল্লিশের দশকে রচিত ও প্রকাশিত এই দুই কাব্যগ্রন্থেও, সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ জাতিগত ভাবনা-বেদনায় উজ্জীবিত। ফররুখের "সাত সাগরের মাঝি" ভবিষ্য-প্রভাবী কালের দর্পণ, যার মধ্যে একটি জাতির অতীত ও ভবিষ্যৎ বাঁধা পড়েছে।।

---

১ চল্লিশের কবিদের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : দিনেশ দাসের "ভুখ মিছিল", সমর সেনের "কয়েকটি কবিতা", সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "পদাতিক", মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের "মেঘ বৃষ্টি ঝড়", অরুণকুমার সরকারের "দূরের আকাশ", নরেশ গুহর "দুরন্ত দুপুর", নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর "নীল নির্জন", জগন্নাথ চক্রবর্তীর "নগর-সন্ধ্যা", বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "রানুর জন্যে", রাম বসুর "যখন যন্ত্রণা", অরবিন্দ গুহের "দক্ষিণ নায়ক", আবুল হোসেনের "নব বসন্ত", আহসান হাবীবের "রাত্রিশেষ", সানাউল হকের "নদী ও মানুষের কবিতা", সৈয়দ আলী আহসানের "অনেক আকাশ" প্রভৃতি।

২ নজরুলের "অগ্নি-বীণা" (১৯২২) ও "জিঞ্জীর" (১৯২৮)এর মতো ফররুখের "সাত সাগরের মাঝি" গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতা শেষ হচ্ছে জাগরণকামিতায় :

(ক) ভেঙে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ
ছিঁড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও হে মাঝি সিন্দবাদ।

[সিন্দবাদ]

(খ) এসেছি এখন তুফান-বিজয়ী খিজিরের এলাকায়
এবারের ঝড় পাড়ি দিয়ে মোরা ফিরেছি বিজয়ী মাঝি।
দেখ আমাদের নিশান উড়ছে নীল আকাশের গায়
কেশর ফোলানো পাল নিয়ে ফের ছুটছে সফেদ তাজী।

[বা'র দরিয়ায়]

www.pathagar.com

(গ) জুলমাত-ম্লান ডেরায় চেরাগ জ্বালাও শাহেরজাদী।
আমার মাটিতে ছড়াও আনার দানা,
হে উজীরজাদী! আজ তুমি আর শুনো না কারুর মানা,
হাজার নাজুক কমনীয় মুখ, যেখানে ভাসছে, আর
আতশী দাহনে খুনের তুফানে জ্বলছে শাহরিয়ার।

[শাহরিয়ার]

(ঘ) আবার আতশী গান,
আবার জাগুক দিগন্ত সন্ধান,
আরক্ত আভা তোমার তূতীর কণ্ঠে রবে না ঢাকা,
আবার মেলবে রক্তিম আঙরাখা
নীল আকাশের তারার বনের স্বপ্নমুখর মনে
আখরোট বনে
বাদাম, খুবানি বনে।

[আকাশ-নাবিক]

(ঙ) তুমি আনো ফের হেজাজ মাঠের মরু সাইমুম
ভাঙো আঁধারের শিখর, ওড়াও জড়তার ঘুম,
তুমি আনো সাথে মানবতার সে নির্ভীক ঝড়
প্রলয়াকাশের বুকে জীবনের দাও স্বাক্ষর,
আউশ ধানের দেশে মদিনার সৌরভ ভার
ঝড় বৈশাখে জাগো নির্ভীক, জাগো নিশংক হেলাল আবার।
হও প্রতিষ্ঠ আকাশে আকাশে নিশান আমার নিশান আমার।

[নিশান]

(চ) আর যেন ক্লিষ্ট নাহি হয়,
আর যেন ত্রস্ত নাহি হয়,
পথে দেখি পীড়নের ফাঁদ,
আর যেন ভ্রষ্ট নাহি হয়
মানুষের ভবিষ্যৎ দিনের আউলাদ।

[আউলাদ]

(ছ) তবে পাল খোলো, তবে নোঙ্গর তোলো,
এবার অনেক পথশেষে সন্ধানী।

www.pathagar.com

হেরার তোরণ মিলবে সমুখে জানি।
তবে নোঙ্গর তোলো,
তবে তুমি পাল খোলো,
তবে তুমি পাল খোলো।

[সাত সাগরের মাঝি]

৩ "অগ্নি-বীণা"য় একটি কবিতাও ছিলো না, যা অক্ষরবৃত্তে লেখা ; আর "সাত সাগরের মাঝি"তে মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত দুই ছন্দই ছিলো — কিন্তু সুগম্ভীর রণনশীলতা এই দুই ছন্দেই সৃষ্টি করেছিলেন ফররুখ। "সাত সাগরের মাঝি"র সাংগীতিক সুষমায় ফররুখ যেন শোষণ ক'রে নিয়েছিলেন মোহিতলাল, নজরুল, শাহাদাৎ হোসেন, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের এক বিচিত্র শ্রবণশক্তি।

৪ এজন্যেই কি কবি নজরুল ইসলাম বিষয়ে ফররুখ আহমদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো একটু সমালোচনাত্মক ? —

(ক) পলাশীর আম্রকাননে মুসলমানের যে সৌভাগ্য-সূর্য পরাজয়ের যবনিকায় ঢাকা পড়েছিল, ওহাবী আন্দোলন ও সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতায় মুসলমানের বহ্নি-যৌবনে যে তুহিন পাথর নেমেছিলো সেই স্থবিরত্বে অধীর গতিবেগ সঞ্চার করলেন কবি নজরুল ইসলাম। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে মহাকবি ইকবাল অবশ্য অনেক আগেই সন্ধান দিয়েছিলেন আবে-হায়াতের। তাঁর দেশকালজয়ী প্রতিভার সঙ্গে নজরুলের তুলনা করতে যাওয়া বাতুলতা।

(খ) নজরুল ইসলামের কবিতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলতে পারে। নজরুলের শক্তি যেমন বিস্ময়কর তাঁর কাব্যিক স্খলনও তেমনি বিস্ময়কর। অদম্য ভাবাবেগের জন্য তাঁর অধিকাংশ দীর্ঘ কবিতাই নিখুঁতভাবে জমাট বাঁধতে পারেনি, শব্দচয়নের দিক দিয়েও তাঁর দুর্বলতা আছে যথেষ্ট। অগভীর জীবনবোধ এবং দার্শনিক দৃষ্টিশক্তির অভাব তাঁর সবচাইতে বড় ত্রুটি। শুধু এই একটি কারণেই তিনি সর্বকালের কবি হতে পারেননি। নজরুল নিজেও তা বুঝতেন এবং সেকথা স্বীকার করে গেছেন ; কিন্তু নজরুলের সহজ স্বীকৃতি ও অবহেলা বাঙালী মুসলমান সমাজের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে, কারণ তারা আরও চেয়েছিল নজরুলের কাছে, তারা তাদের নিজের দর্শন, জীবনবোধ ও ইতিহাসের অভিব্যক্তি চেয়েছিল কবি নজরুলের কবিতায়।

['নজরুল-প্রসঙ্গ', "ফররুখ-রচনাবলী", প্রথম খণ্ড, ১৯৭৯]

৫ 'চোরাবালি', "কুলায় ও কালপুরুষ" (১৩৬৪) : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বিষ্ণু দে-র "চোরাবালি" (১৩৪৪) কবিতাগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই লেখাটি ভূমিকা হিশেবে প্রকাশিত হয়েছিলো।

৬ বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্র. 'প্রতীকী কবিতা', "করতলে মহাদেশ" : আবদুল মান্নান সৈয়দ। দ্বি সং ১৯৯৩। শিল্পতরু, ঢাকা।

৭ "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" (১৯৭৫) সম্পাদনা করতে গিয়ে ফররুখের অজস্র পাণ্ডুলিপি ও পত্র-পত্রিকায় লক্ষ্য করেছিলাম সমুদ্রের প্রসঙ্গ উপর্যুপরি। মাইকেল-ভক্ত ফররুখের ভিতরে একটি মহাকাব্যিক সমুন্নতি ছিলো। সমুদ্র — মনে হয় — তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপিত করতো বিশেষভাবে।

৮ নাবিক প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) একাধিক কবিতা আছে।

www.pathagar.com

৯ বাঙালি পাঠককে একথা প্রথম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কবি বিষ্ণু দে (১৯০৯–৮২)।

১০ 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের বিস্তারিত আলোচনা এই বইএর অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

১১ আরব্যোপন্যাস বা আরব্য রজনী আরবি ভাষায় লেখা মধ্যযুগের এক মহান গ্রন্থ। দশম শতাব্দীর দিকে আরব্যোপন্যাসের কাহিনীগুচ্ছ মুখে-মুখে ফিরতো, আরো কাহিনী যুক্ত হ'য়ে ১৪৫০ সালের দিকে বর্তমান আকার পায়, — প্রাচ্য ধরনের একটি বিশাল Frame-Tale বা কাহিনীবৃত্তে। আরব্যোপন্যাসের কোনো একক কাহিনীকার নেই, এক প্রবাহিত জনগোষ্ঠী এর কাহিনীরচয়িতা। প্রথম ইউরোপীয় অনুবাদ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। স্যার রিচার্ড বার্টন আরব্যোপন্যাসের খ্যাততম অনুবাদক। আরব্যোপন্যাস পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

১২ সুকান্ত ভট্টাচার্য-সম্পাদিত দুর্ভিক্ষ বিষয়ক কবিতাসংকলন "আকালে" (১৯৪৪) ফররুখ আহমদের 'লাশ' কবিতাটি গৃহীত হয়। এই সংকলনের 'কথামুখে' সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছিলেন : 'সাহিত্য যে সমাজেরই প্রতিচ্ছায়া, জীবনেরই প্রতিভূ — তেরোশো পঞ্চাশ সালে প্রগতিশীল লেখকরা অন্তত এই কথাই প্রমাণ করেছেন তাঁদের গল্পে তাঁদের উপন্যাসে কবিতায়।' এই সংকলনের সম্পূর্ণ সূচিপত্র উদ্ধৃত হ'লো :

১. অরুণ মিত্র : 'জঠর'।
২. বিষ্ণু দে : 'চালের কাতারে'।
৩. সুকান্ত ভট্টাচার্য : 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি'।
৪. বুদ্ধদেব বসু : 'শ্রাবণ'।
৫. বিমলচন্দ্র ঘোষ : '১৩৫০'।
৬. প্রেমেন্দ্র মিত্র : 'ফ্যান'।
৭. নবেন্দু রায় : 'নরক'।
৮. মণীন্দ্র রায় : 'অনুভব'।
৯. ফররুখ আহমদ : 'লাশ'।
১০. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র : 'আমাদের গান'।
১১. দিনেশ দাস : 'মন্বন্তর'।
১২. সুভাষ মুখোপাধ্যায় : 'স্বাগত'।
১৩. অমিয় চক্রবর্তী : 'অন্নদাতা'।
১৪. কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : 'অভিশাপ'।
১৫. সমর সেন : 'গৃহহ্ বিলাপ'।
১৬. অবন্তী সান্যাল : 'কাহিনী'।
১৭. গোলাম কুদ্দুস : 'দ্বৈরথ'।
১৮. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : 'মেঘমুক্ত'।

www.pathagar.com

"আকাল" অনেক বছর পরে কলকাতার সারস্বত লাইব্রেরী প্রকাশ করেন পুনর্বার (প্রথম সারস্বত সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৭৩) : পুনর্মুদ্রিতও হয় (অগ্রহায়ণ ১৩৭৮)। এই শেষ সংস্করণটিই আছে আমার কাছে। এতে দেখছি 'নতুন আকাল' নামে ভূমিকা লিখেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (ভূমিকার তারিখ ২২-৪-৬৬)। ভূমিকায় সুভাষবাবু লিখেছেন, 'দেশ জুড়ে নিরন্নের হাহাকারে শোনা যাচ্ছে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি।' কিন্তু ১৯৬৬ সালে কলকাতা তথা পশ্চিম বঙ্গে দুর্ভিক্ষ হয়েছে ব'লে শুনিনি। সুভাষবাবু লিখেছেন, 'এ সংকলনে যাঁদের কবিতা আছে, তাঁরা নানা মতের নানা পথের কবি।' সুভাষবাবু — মনে হয় — কবিদের ব্যক্তিগত মত-পথ নিয়েই মাথা ঘামান বেশি ; সংকলয়িতা সুকান্ত ভট্টাচার্য কিন্তু কবিতারই বিচার করেছিলেন। আর সংকলনটি সম্পর্কে 'স্মরণীয় ইতিহাস হয়ে থাকবে' বললেও সুভাষবাবু সংকলয়িতা সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭) সম্পর্কে একটি লাইনও লেখেননি।

১৩ দুর্ভিক্ষ প্রাসঙ্গিক আরো বেশ-কিছু কবিতা লিখেছিলেন ফররুখ।

১৪ 'হে নিশান-বাহী', 'নিশান', 'নিশান-বরদার' — এই তিনটি কবিতা, আমাদের বিবেচনায়, "সাত সাগরের মাঝি"র কেন্দ্রীয় চারিত্রচ্যুত। "সাত সাগরের মাঝি" কাব্যগ্রন্থের নামকবিতার ও অন্যান্য প্রধান কবিতার কাব্যশক্তি তাদের পরোক্ষতায় — প্রতীকে, উপমায়, মুখচ্ছদে। ঐ ত্রয়ী কবিতার সরাসরি ও নির্দিষ্ট উচ্চারণ, মনে হয়, এদের কাব্যগুণ খানিকটা হলেও হরণ করেছে। 'রূপনারাণের কূলে জেগে উঠিলাম' (রবীন্দ্রনাথ), 'লাথি মার ভাঙরে তালা/যত সব বন্দীশালায় আগুন জ্বালা' (নজরুল) বা 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ' (জীবনানন্দ) — এইসব নগ্ন, নির্বসন ও নিরলংকার কবিতার চূড়াস্পর্শী সাফল্য ফররুখের 'নিশান'-গুচ্ছের কবিতায় অধরাই র'য়ে গেছে।

১৫ "সাত সাগরের মাঝি"র উনিশটি কবিতা রচিত হয়েছিলো — কবি নিজেই জানিয়েছেন — ১৯৪৩-৪৪ সালে। একটি ঘননিবিষ্ট সময়পরিসরে রচিত ব'লেই হয়তো এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে একটি আবহ নির্মিত হয়েছিলো। ১৯৪৩-৪৪এর কয়েক বছর আগেই ফররুখ বাংলা কাব্যজগাত প্রবেশ করেছেন। ১৩৪৪ বা ১৯৩৭ সালে তিনি কাব্যজগতে প্রবেশ করেছেন। কাব্যজগতে প্রবেশের দ্বিতীয় বছরেই অর্থাৎ ১৩৪৫ সালে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধানতম মুখপত্র বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা' (প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৫) পত্রিকায় তিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন। 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো ফররুখের এই পাঁচটি কবিতা :

১. মুহূর্ত। পৌষ ১৩৪৫।
২. পরিক্রমা। ঐ
৩. যৌবসেনা। আষাঢ় ১৩৪৬।
৪. বন্ধন। আশ্বিন ১৩৪৬।
৫. স্মরণ। ঐ।

(কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৩-৮৪ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিষয়ে গবেষণা করার সময় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত পুরোনো 'কবিতা' পত্রিকা থেকে

www.pathagar.com

কবিতাগুলো উদ্ধার করেছিলাম। 'যৌবসেনা' বাদে ঐ পাঁচটি কবিতার চারটিই সনেট। ঐ সনেটগুলি 'কবিতা' পত্রিকা থেকে এখানে উদ্ধৃত করছি :

মুহূর্ত

এ মুহূর্ত দীর্ঘ হোক, জনতার প্রমত্ত কল্লোল
দোলা দিক, তৃপ্তিহীন অনির্বাণ কামনার মুখে,
নগ্ন মুমূর্ষুর বুকে শেষবার দিক শেষ দোলা,
দীর্ঘ হোক এ মুহূর্ত — পথপ্রান্তে পাথরের বুকে
(দেবতার মূর্তি বুঝি) সাড়া জাগে নাই কোনো দিন,
জাগে নাই জনতার মত্ততায় সর্বগ্রাসী ঝড়,
মুহূর্তবিজয়ী সেই পাষাণদেবতা স্পন্দহীন
কান পেতে শোনে নাই জীবনের অতৃপ্ত মর্মর।

আমি শুনিয়াছি গান, ভুলের মুহূর্তে কতবার
উঠেছি চঞ্চল হয়ে ; —ব্যবধান দীর্ঘ সময়ের
সে গান নিয়েছে মুছি। তবু মুখ তোলো শেষবার,
সব কথা বলে যাব দেখে যাব সব শেষ এর ;
আমি তো দেবতা নই — পাষাণ দেবতা নির্বিকার ;
তাই তো এখনো আমি স্বপ্ন দেখি শেষ মুহূর্তের।।

['কবিতা', পৌষ ১৩৪৫]

পরিক্রমা

পরীর মর্মরমূর্তি তুলে আছে অঞ্জলি প্রার্থনা
নীরব সমাধি ক্ষেত্রে কতকাল তার নাই ঠিক
এ প্রার্থনা কোন দিন ভেসে যাবে দূরে আনমনা।
মৃত্যুর মর্মরমূর্তি নত হবে স্থির অনিমিখ
স্তব্ধ দূর-দৃষ্টি-হারা। তরল গলিত উষ্ণসুরা
জীবনের পানপাত্রে কত হ'ল শীতল পাথর।
পাষাণ তাকাল উর্দ্ধে — পরীমূর্তি বিরহ-বিধুরা।
কতদিন এ প্রার্থনা, কতকাল? ব'ল তারপর,

www.pathagar.com

তারপর প্রার্থনার শেষ? প্রার্থনার শেষরাতে
এ মূর্তি পড়িবে ভেঙে ঘুমঘোরে পরম ভ্রান্তিতে
হালকা রঙের মেঘ আঁধারের পায়ে হব নত।
সেদিন উৎসবশেষে ভেঙে-পড়া পুরানো বাসাতে
আসিবে নতুন সাথী, নবতর সুরার যাত্রীতে
মৃত্যুর তিমির বুক সূর্য্যস্পর্শে করিবে আহত।

['কবিতা', পৌষ ১৩৪৫]

বন্ধন

যে সন্ধ্যামণির রূপ বেলাশেষে নিভৃত রহসি
ওঠে ফুটি অগ্নিবর্ণ অঙ্গনের ধূসর ছায়ায়
তারে চেনে হংসদল, তারে চেনে বসুধা, উষসী।
নিখিলের সাথে যারা বাঁধা আছে নিবিড় মায়ায় —
সেই বিহঙ্গমদল উড়ে যায় যখন আকাশে
কত স্পর্শহীন রঙে গোধূলির ধূসর আলোতে
পক্ষপুট বিস্তারিয়া কখনো বা দুরন্ত বাতাসে
ভেসে যায় অবহেলে পশ্চিমের ঝোড়ো-হাওয়া-স্রোতে,

তখন বুঝিতে পারে তাহাদের ভ্রাম্যমাণ মন
বাঁধা আছে মৃত্তিকায়, শ্যাম স্পর্শে তাহারা আবার
ডুবে যাবে — আলোর বিহঙ্গ-শিশু ঘুমাবে যখন
মাতা তিমিরের বুকে। মনে হয় আজ বারবার
বসুধার প্রাণছন্দ আমারে করেছে অধিকার,
দিয়েছে শোনিতে মোর জীবনের নিবিড় বন্ধন।

['কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৬]

স্মরণ

সহজ সত্যের মতো কতবার মৃত্যু এল, আর
কতবার মৃত্যু গেল চ'লে। — কত ফুল ঘুমাল ধূলায়,
কত ফুলে গাঁথা হ'ল বাসরশয্যার উপহার।
মৃত্যু এল কত গৃহে। ভেঙে দিয়ে পুরানো কুলায়।

www.pathagar.com

মৃত্যু এল নতুনের বুকে। তুমি যারে ভালোবাসো
মৃত্যু তার বুকে বসি' পান করে সব ভালোবাসা।
এও তো সহজ সত্য। কত ভোলো আর কত হাসো

তোমার বুকের কোলে ঘুমাল যে তার শেষ আশা
সমাধির বুকে ঢাকো। দিন আসে — সেদিন ফুরায়।
তবু তিমিরের বুকে তারকা-স্মরণ-স্বয়ম্বর
— বিগত দিনের স্মৃতি। হারানো সুরের বীথিকায়
গানের সন্ধান করো, ভেঙে যায় সুরের নির্ভর
তবুও স্মরণে জাগে। কত গান আসে আর যায়
কত পথ ভোলা গান রেখে যায় অটুট স্বাক্ষর।

['কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৬]

ফররুখ আহমদের এই প্রাথমিক কবিতাগুচ্ছে বোঝা যায়নি কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর কবিতায় ঘটবে এক বিরাট বিস্ফোরণ ; কিন্তু এসব কবিতা পেরিয়েই তাঁকে সেখানে আসতে হয়েছিলো।

১৬ বিষ্ণু দে-র কবিতা : 'তারপরে এল রণমন্থনে দূর বিদেশের নারী/ কালো সন্ধ্যায় দিলে শ্বেত বাহু দুটি।' সুধীন্দ্রনাথের নায়িকারাও বিদেশিনী : তাদের দেহত্বকে দ্রাক্ষার সিতাংশু কান্তি, কেশ পিঙ্গল বা স্বর্ণিল।

১৭ রবীন্দ্রনাথের পর অমিয় চক্রবর্তী সর্বাধিক বাঙালি কবি-ভ্রামণিক হ'লেও এবং তিনি বিদেশে বাস করলেও, তাঁর কাব্যবহে মার্কিনী বা ভিন্‌দেশি প্রতিবেশী এসেছে, কিন্তু তাঁর নাতিস্পষ্ট নায়িকারা বিদেশিনী নন।

১৮ সুকান্ত ভট্টাচার্য ও ফররুখ আহমদ — প্রায়-সমকালীন এই দুই কবির রচনাসংগ্রহে প্রেমের কবিতা প্রায় নেই বললেই চলে।

www.pathagar.com

মন্বন্তরের কবি

. . . তেরো শো পঞ্চাশ কেবল ইতিহাসের একটা সাল নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘরভাঙা, গ্রাম ছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস।

'কথামুখ', "আকাল" : সুকান্ত ভট্টাচার্য

এক

প্রায় সওয়া দুশো বছর আগে বাংলাদেশে একটি মন্বন্তর হয়েছিলো (বঙ্গাব্দ ১১৭৬-এ), তা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে চিহ্নিত। ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে এদেশে আর-একটি মন্বন্তর হয়েছিলো (বঙ্গাব্দ ১৩৫০-এ, খ্রিস্টাব্দ ১৯৪২-৪৩-এ), তাকে বলা হয় 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'। এ বছর পঞ্চাশের মন্বন্তরের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হচ্ছে। দুঃখের বিষয়, এ নিয়ে এখনো কোনো লেখা চোখে পড়েনি আমার। অথচ আমাদের চিত্রকলার পিতৃপ্রতিম শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের (১৯১৭-৭৬) প্রধানতম পরিচয়ই 'মন্বন্তরের শিল্পী' হিশেবে। প্রথমে তাঁর আঁকার বিষয়বস্তু ছিলো প্রধানত রোমান্টিক ল্যাণ্ডস্কেপ ও বর্ণাঢ্য উপজাতি মহিলা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ খ্রি. সারা বাংলাদেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষের যে-বিভীষিকা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা তাঁর শিল্পকর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। দুর্ভিক্ষের শিকার কংকালসার মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের সদ্যমৃত মায়ের বুক থেকে সুধা টেনে নেবার ঐকান্তিক চেষ্টার নির্মম দৃশ্যকে তিনি সকলের সামনে তুলে ধরেন তাঁর 'ম্যাডোনা-১৯৪৩' ছবিতে। দুর্ভিক্ষ পর্যায়ের এই প্রথম ছবিতেই তিনি বিখ্যাত হ'য়ে যান।[১] প্রাণকৃষ্ণ পাল, সোমনাথ হোর, চিত্তপ্রসাদও দুর্ভিক্ষের অনেক ছবি এঁকেছেন – কিন্তু সকলেই স্বীকার করবেন, জয়নুল আবেদিনই মন্বন্তরের শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু কবি ফররুখ আহমদ যে বাংলার দুর্ভিক্ষের দুই শ্রেষ্ঠ কবির একজন, ফররুখের অন্য পরিচয়ের আড়ালে তা ঢাকা প'ড়ে গেছে। এই তথ্যটিও এখানে স্মরণযোগ্য যে, 'লাশ', 'আউলাদ' প্রভৃতি দুর্ভিক্ষের কবিতা সংবলিত ফররুখের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি"-র (১৯৪৪) প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।

দুই

কবিকিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্যই (১৯২৬-৪৭) ফররুখ আহমদের কবিতার প্রথম সংকলক। দুর্ভিক্ষের পরের বছর দুর্ভিক্ষের বছরে (১৩৫০) রচিত তিরিশ ও চল্লিশের দশকের

www.pathagar.com

আঠারোজন কবির আঠারোটি কবিতা নিয়ে সুকান্ত ভট্টাচার্য-সম্পাদিত একটি কবিতা-সংকলন "আকাল" প্রকাশিত হয়।[২] কবিতাগুলির প্রকাশকাল ও প্রকাশস্থান সমেত এই সংকলনের পূর্ণাঙ্গ সূচি এরকম :

১. 'জঠর' : অরুণ মিত্র। 'জনযুদ্ধ', ১৪ই বৈশাখ ১৩৫০।
২. 'চালের কাতারে' : বিষ্ণু দে। 'অরণি', ৬ই শ্রাবণ ১৩৫০।
৩. 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' : সুকান্ত ভট্টাচার্য। 'অরণি', শ্রাবণ ১৩৫০।
৪. 'শ্রাবণ' : বুদ্ধদেব বসু। বার্ষিক 'দিগন্ত', আশ্বিন ১৩৫০।
৫. '১৩৫০' : বিমলচন্দ্র ঘোষ। বার্ষিক 'দিগন্ত', আশ্বিন ১৩৫০।
৬. 'ফ্যান' : প্রেমেন্দ্র মিত্র। শারদীয় 'যুগান্তর', আশ্বিন ১৩৫০।
৭. 'নরক' : নবেন্দু রায়। শারদীয় 'অরণি' , ১৩৫০।
৮. 'অনুভব' : মণীন্দ্র রায়। বার্ষিক 'দিগন্ত', ১৩৫০।
৯. 'লাশ' : ফররুখ আহমদ। 'মোহাম্মদী', আশ্বিন ১৩৫০।
১০. 'আমাদের গান' : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। শারদীয় 'যুগান্তর' , ১৩৫০।
১১. 'মন্বন্তর' : দিনেশ দাস। বার্ষিক 'দিগন্ত', ১৩৫০।
১২ 'স্বাগত' : সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'জনযুদ্ধ', ২৪শে কার্তিক ১৩৫০।
১৩. 'অন্নদাতা' : অমিয় চক্রবর্তী। অন্নার্থীর সাহায্যকল্পে, কার্তিক ১৩৫০।
১৪. 'অভিশাপ' : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। 'রাজধানীর তন্দ্রা', অগ্রহায়ণ ১৩৫০।
১৫. 'গৃহস্থ বিলাপ' : সমর সেন। 'কবিতা' পৌষ ১৩৫০।
১৬ 'কাহিনী' : অবন্তী সান্যাল। 'জনযুদ্ধ', ১২ই মাঘ ১৩৫০।
১৭. 'দ্বৈরথ' : গোলাম কুদ্দুস। ভাদ্র ১৩৫০।
১৮. 'মেঘমুক্ত' : কিরণশংকর সেনগুপ্ত। 'প্রতিরোধ', ফাল্গুন ১৩৫০।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবৎকালে তাঁর কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি – কেবল এই সম্পাদিত সংকলন "আকাল" বেরিয়েছিলো। আজ, প্রথম প্রকাশের বছর পঞ্চাশ পরে, দেখা যাচ্ছে, এক নবেন্দু রায় ছাড়া সংকলিত কবিবৃন্দ সকলেই খ্যাতিমান এবং কবিতায় আপন-আপন কণ্ঠস্বর যোজনা করেছেন। তিরিশের তিনজন কবি এতে অন্তর্ভুক্ত : বিষ্ণু

www.pathagar.com

দে, বুদ্ধদেব বসু ও অমিয় চক্রবর্তী। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা আলাদা ফোল্ডার আকারে 'অন্নার্থীর সাহায্যকল্পে' প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, এঁদের সংকলিত কবিতা আজ দূরবর্তী মনে হয় – ঠিক স্পর্শ করতে পারে না। এর হয়তো একটি কারণ, তিরিশের কবিরা চল্লিশের কবিদের তুলনায় অনেক বেশি ব্যক্তিবৃত্তে আবদ্ধ। চল্লিশের কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণকে এ প্রসঙ্গে উড়িয়ে দেওয়া যায় না :

> . . . তাঁরা [চল্লিশের দশকের কবিরা] তিরিশ দশকের কবিতার আত্মকেন্দ্র রোমান্টিকতা ও মননচর্চার আতিশয্য পরিহার করে দেশের ব্যাপ্ত জনসমষ্টির ভাবনা-চিন্তা ও আবেগের ভিত্তিভূমির কাছাকাছি পৌঁছনোর তাগিদে বাংলা কবিতাকে সামাজিক-মানবিক আবেগের পটে পুন:প্রোথিত করে মনুষ্য-আদর্শে আস্থা ও মানুষের ভবিষ্যতে প্রায়-লুপ্ত বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় রত হন। . . .চল্লিশের কবিতা তাই মডেল হিশেবে অক্লেশে গ্রহণ করে নিল রবীন্দ্রনাথের প্রত্যন্ত বয়সের গভীরতর বোধদীপ্ত উচ্চারণ, নজরুলের আবেগদৃপ্ত গণমুখিনতা, তিরিশের কবিতার যুগবর্তী মনোভাব প্রকাশের উপযোগী আধুনিক প্রকরণ, কৃৎকৌশল। আবার একই সঙ্গে তা ছিলো রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ভাবমণ্ডলে উত্তরণের, নজরুলের বিখ্যাত 'আমি'র পরিধি আরো প্রসারিত করে শ্রমিক-কৃষককে তার আত্মীকরণ ও রোমান্টিক উচ্ছ্বাসকে সংহত আবেগে রূপান্তরকরণের, তাকে ক্ষণিকযুক্তিসিদ্ধ করে তোলায় এবং তিরিশের কবিতার প্রকরণগত অগ্রগতিকে আত্মস্থ করে সে কবিতার মর্মগত বিচ্ছিন্নতার বোধকে পরিহার ও বাংলা কবিতাকে নবতর চেষ্টা ও চর্চার পটে সমাজ-সাযুজ্য দেয়ার এক অভিনব সংকল্পে স্থিতা।[৩]

ফলত, সমগ্রভাবে চল্লিশের কবিরাই মন্বন্তরের কালবেলাকে উজ্জ্বলতর-গভীরতররূপে অংকন করেন তাঁদের কবিতায়। আবার তার মধ্যে ঐ সংকলন প্রকাশের বছর পঞ্চাশ পরে সংকলনধৃত কবিতাগুচ্ছের মধ্যে সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' আর ফররুখ আহমদের 'লাশ' কবিতা দুটিকেই আমরা শ্রেষ্ঠ কবিতা বলতে বাধ্য হই। যেমন আজ পরিষ্কার বলা উচিত : পঞ্চাশের মন্বন্তরের দুই শ্রেষ্ঠ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ও ফররুখ আহমদ। সুকান্ত সম্পর্কে এই উক্তিকে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত বলা যায়,[৪] কিন্তু মন্বন্তরের কবি হিশেবে, অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিশেবে ফররুখের প্রতিষ্ঠা এখনো অপেক্ষা ক'রে আছে। তবে, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, ফররুখেরই কলেজ-পড়ুয়া সতীর্থ কবি সুভাষ

www.pathagar.com

মুখোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্য-সম্পাদিত "আকাল"-এর যে-ভূমিকাটি লিখেছেন তা একেবারে তাৎপর্যহীন তো বটেই এমনকি রুচিহীন। আমরা আশা করবো, প্রকাশক পরবর্তীকালে উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা এই ভূমিকাটি বর্জন ক'রে সুরুচির পরিচয় দেবেন। সুমনা পাঠকের জন্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কৃত ভূমিকার একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করবো :

> মধ্যে দু-দুটো যুগ। অথচ পড়ে দেখুন, আজও মনে হবে এর কাব্যবস্তু একেবারে টাটকা তরতাজা। অমরত্বলোভী কবিদের আত্মা এই কালাতিক্রম্যতায় খুশি হবে কিনা – জানি না, দেশকালের মানুষ হিসেবে এতে আমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যাবার কথা।

এর প্রথমাংশ কাব্যসমালোচনা নয়, বিশুদ্ধ বিজ্ঞাপনের মতো শোনায়। আর দ্বিতীয়াংশে সুভাষ দুর্ভিক্ষ নিয়ে যে-কবিরা কবিতা লিখেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে অপমান করেছেন। সুকান্ত-সম্পাদিত "আকাল" সংকলনের গাম্ভীর্য ও বেদনা ও প্রতিবাদকে এই নাবালক উক্তিতে নষ্ট করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

'লাশ' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৫০ সংখ্যায়। সেখান থেকে কবিতাটি সংকলিত হয় সুকান্তের "আকাল" (১৯৪৪) সংকলনে। কবিতাটি যখন ফররুখের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি"তে (ডিসেম্বর ১৯৪৪) অন্তর্ভুক্ত হ'লো, তখন দেখা গেলো অপরিতৃপ্ত শিল্পী ফররুখ কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছেন। 'লাশ' কবিতার "আকাল" ও "সাত সাগরের মাঝি"র পাঠ মেলালে এই পরিবর্তনগুলি ধরা পড়বে :

> ক) কবিতার তৃতীয় স্তবকের নবম লাইনে "আকালে" আছে 'শাশ্বত মানব-সত্তা মানুষের মুক্তি-অধিকার', "সাত সাগরের মাঝি"তে আছে 'শাশ্বত মানব-সত্তা মানুষের প্রাপ্য অধিকার'।
>
> খ) তৃতীয় স্তবকের একাদশ পঙক্তিতে "আকালে" আছে "মানুষের হাড় দিয়ে গড়ে খেলাঘর " , "সাত সাগরের মাঝি"তে আছে 'মানুষের হাড় দিয়ে তারা আজ গড়ে খেলাঘর'।
>
> গ) "আকালে" চতুর্থ স্তবকীয় পঙক্তির সংখ্যা এগারো। কিন্তু "সাত সাগরের মাঝি"তে চতুর্থ পঙক্তির পরে আরো আটটি পঙক্তি যোগ করা হয়েছে।
>
> ঘ) "আকালে" পঞ্চম স্তবকের দ্বিতীয় পঙক্তি এরকম – 'তারি শোধ তুলে নাও হে ক্রূর সভ্যতা শয়তান'। "সাত সাগরের মাঝি"তে এই পঙক্তির 'ক্রূর' শব্দটির পরিবর্তে বসানো হয়েছে 'জড়'।

www.pathagar.com

ঙ) "আকাল"-এ পঞ্চম স্তবকে কবিতাটি সম্পূর্ণ হয়েছে। "সাত সাগরের মাঝি"তে এই স্তবকের আগে আরো একুশটি পঙক্তির তিনটি স্তবক যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ শেষ-পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে "আকালে" 'লাশ' কবিতাটি পাঁচ স্তবকে সম্পূর্ণ , আর "সাত সাগরের মাঝি"তে আট স্তবকে।

চ) "আকাল"এর পঞ্চম স্তবক এবং "সাত সাগরের মাঝি"-র 'লাশ' কবিতার অষ্টম স্তবক, অর্থাৎ দুটি কবিতারই সর্বশেষ পঙক্তির আগের পঙক্তিতে কিছু রদবদল করা হয়েছে। "আকাল"এ : 'আজ এই ক্লেদাচ্ছন্ন, উৎপীড়িত নিখিলের অভিশাপ বও' এবং "সাত সাগরের মাঝি"তে : 'আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও'।

শেষ-চল্লিশের কবি আবদুল গনি হাজারী (১৯২১-৭৬), ফররুখ আহমদকে যিনি তাঁর "সূর্যের সিঁড়ি" (১৯৬৫) কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁর একটি প্রবন্ধে সুকান্ত-মঙ্গলাচরণ-কথিত সামাজিক পরিস্থিতিতে বাঙালি-মুসলমানের তদানীন্তন দুর্দশার চিত্রণের পটভূমিকায় ফররুখের 'লাশ' কবিতার বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের তদানীন্তন মনোভাবনা বুঝবার জন্য তাঁর প্রবন্ধাংশ উদ্ধৃত করছি ('লাশ' কবিতার ইংরেজি অনুবাদ হাজারী-কৃত) :

> সাহিত্যিকদের কথা বলি। দেশ বিভাগের আগের কথা। আমরা তখন একদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ, জমিদারমহাজনের হাতে শোষিত অগণিত মুসলিম কৃষকের মানবেতর জীবনে বিক্ষুব্ধ এবং শহর সমাজের জীবিকার প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জর্জরিত উদীয়মান মুসলমান মধ্যবিত্ত এবং সমগ্র অবস্থাটাকে পাশ্চাত্য জড় সভ্যতার দান বলে তার বিরুদ্ধে মারমুখী। এর মধ্যে আবার মুসলিম সমাজেও উপরতলার সীমিত সংখ্যক সার্থককাম ব্যক্তির স্বার্থপরতায় বিভ্রান্ত। ব্যক্তিগত সম্পদ ও ক্ষমতা সংগ্রহের যে বস্তুনিষ্ঠ সংগ্রাম উপরতলায় চলছিলো তা থেকে আমাদের উঠতি বুর্জোয়ারা ও বাদ যায়নি। এর সব যে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিণাম তা অতটা স্পষ্টভাবে আমরা বুঝতে না পারলেও এ যে পাশ্চাত্য মেটেরিয়ালিস্ট অর্থনীতি ও দর্শনতত্ত্বের ফল তা আমাদের কেউ কেউ মোটামুটি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিবেক যাঁদের সংগ্রামবিমুখ নয় - তাঁরা আর্তনাদ করে উঠেছিলেন এমন এক অবস্থার বিরুদ্ধে :

www.pathagar.com

Ye, materialist civilisation !
The slaves of a dead culture, the bloated-exploting class
Take the denouncement of Man to today,
Then when time comes
We will kick at the lump of your betterered flesh
And drag you to the threshold of Hell,
of this tormeoted death-torn World today
you carry the curse ;
Perish
And be damned.

(ফররুখ আহমদ। ইংরেজি অনুবাদ লেখকের)

কেন? কারণ :

Men and Women
The stone house
The prison of death
The clever garishly whore has opened her
porlour door with sweet greetings,
Someones are ravishing the Earth
With exploitation and power
of which the witness is in the dust of
The royal road where
The three and holf cubit bone guilds
The last sepulchre of Humanity.

(ফররুখ আহমদ। ইংরেজি অনুবাদ লেখকের)

কবিতাগুলো ইচ্ছে করেই আমি ইংরেজিতে বললাম, কারণ আমার নমে হয়েছে আজকের পৃথিবীর সকল শোষিত মানুষেরই আর্তনাদ এ।[৪]

তিন

'লাশ' ফররুখ আহমদের খ্যাততম কবিতা এবং তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। কিন্তু ফররুখ দুর্ভিক্ষকেন্দ্রিক এই একটিমাত্র কবিতা লেখেননি। ১৩৫০–৫১–এ বেশ-কিছু দুর্ভিক্ষের

www.pathagar.com

কবিতা তিনি লিখেছেন – পরবর্তীকালেও তাঁর কবিতায় ঐ দুর্ভিক্ষের রণন শোনা যায়। জয়নুল আবেদিন যেমন দুর্ভিক্ষের সিরিজ-চিত্র এঁকেছেন, তেম্নি ফররুখের এই সিরিজ-কবিতা। কেবল ফররুখের দুর্ভিক্ষকেন্দ্রিক কবিতা দিয়েই একটি ছোটো সংকলন তৈরি করা যায়। আমরা এখানে ফররুখের দুর্ভিক্ষ-কেন্দ্রিক কবিতার একটি প্রাথমিক তালিকা নির্মাণ করেছি (ফররুখের কবিতা এখনো নিঃশেষে সংকলিত হয়নি – হ'লে আরো কিছু কবিতা এর সঙ্গে যুক্ত হবে) :

১. লাশ। 'মাসিক মোহাম্মদী', আশ্বিন ১৩৫০।

২. আউলাদ। ঐ, ভাদ্র ১৩৫০।

৩. তুফান।

৪. পদ্মার ফাটল।

৫. পদ্মার ভাঙন।

৬. কালো দাগ।

৭. প্রেক্ষণ। 'সওগাত', বৈশাখ ১৩৫০।

৮. পরিপ্রেক্ষিত। ঐ, ভাদ্র ১৩৫০।

৯. ব্যক্তিগত।

১০. হে বন্য স্বপ্নেরা। 'সওগাত', চৈত্র ১৩৪৯।

১১. মুমূর্ষু শাল।[৫] 'সওগাত', মাঘ ১৩৫১।

১২. লক্ষ ধ্বংসস্তূপ। 'নবযুগ'।

১৩. দুর্ভিক্ষের সন্ততি 'অরণি', অগ্রহায়ণ ১৩৫০।

১৪. আসন্ন শীতে। 'মাসিক মোহাম্মদী', অগ্রহায়ণ ১৩৫০।

১৫. সন্ধ্যার জনতা। বার্ষিক 'দিগন্ত'।

১৬. দিন। 'সওগাত', আষাঢ় ১৩৫২।

১৭. কবন্ধ রাত্রি। 'পরিচয়'।

১৮. অনুরণন।

১৯. শকুনেরা। 'সওগাত',কার্তিক ১৩৫০।

২০. বিরান সড়কের গান।

২১. অভিজাত তন্দ্রা।

www.pathagar.com

এর মধ্যে 'লাশ', 'আউলাদ' ও 'তুফান' কবিতাত্রয় "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪) গ্রন্থভূর্ত ; 'বিরান শড়কের গান' ও 'অভিজাত তন্দ্রা' কবিতাদ্বয় "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" (১৯৭৫)[৬] গ্রন্থভূর্ত ; মধ্যবর্তী অধিকাংশ কবিতা পাওয়া যাবে "ফররুখ-রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড, ১৯৭৯)[৭] গ্রন্থভূর্ত 'হে বন্য স্বপ্নেরা' নামাঙ্কিত অংশে। দেখা যাচ্ছে : দুর্ভিক্ষের কবিতা তিনি লিখেছেন 'মাসিক মোহাম্মদী', 'সওগাত', 'নবযুগ', 'অরণি', বার্ষিক 'দিগন্ত', 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকায়। অর্থাৎ সমকালীন শ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলিতে। আমরা এ-ও লক্ষ্য করেছি, "আকাল" সংকলনের কয়েকটি কবিতা এসব পত্রিকা থেকে গৃহীত। পাঠক লক্ষ্য করবেন ফররুখের মন্বন্তরের অধিকাংশ কবিতা মন্বন্তর চলাকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৩৫০-এই লেখা। কিন্তু পাঠককে ফররুখ-মানসের অন্য পাশটিও অবহিত করতে চাই – ঐ ১৩৫০-এ ফররুখ ছিলেন অসম্ভব ফলবান, ঐ বছরেই তিনি মন্বন্তরের কবিতার সঙ্গে-সঙ্গে রোমান্টিক-ঐতিহ্যিক কবিতাও লিখেছেন। মন্বন্তরের অন্য শ্রেষ্ঠ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে ফররুখ আহমদের তফাৎ এখানে : সুকান্ত সম্পূর্ণরূপে দেশ-কাল-সমাজে আত্মনিবেদিত, ফররুখ দেশ-কাল-সমাজ-সচেতন হ'য়েও রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনার ডানায় উড্ডীন। ফলত দেখা যাচ্ছে, ১৩৫০ সালেই ফররুখ ঐতিহ্যিক-রোমান্টিক কবিতাও লিখে চলেছেন। যেমন :

> ১. পারফিউম ('সওগাত', জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০) ; ২. সাড়া (ঐ,আষাঢ় ১৩৫০) ; ৩. তায়েফের পথে (ঐ, শ্রাবণ ১৩৫০) ; ৪. সিন্দবাদ (ঐ, পৌষ, ১৩৫০) ; ৫. বা'র দরিয়ায় (ঐ, ভাদ্র ১৩৫০) ; ৬. সাত সাগরের মাঝি ('মাসিক মোহাম্মদী', বৈশাখ ১৩৫০) ; ৭. দল-বাঁধা বুলবুলি (ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০) ; ৮. বিদায় (ঐ, আষাঢ় ১৩৫০) ; ৯. ইশারা (ঐ, শ্রাবণ ১৩৫০) ; ১০. হাজার বছর পরে হয়ে (ঐ, ভাদ্র ১৩৫০) ; ১১. শবে-বরাত (ঐ, ভাদ্র ১৩৫০) – ইত্যাদি।

প্রকৃত সমৃদ্ধ মানসের মতো ফররুখ-মানসও ছিলো বহু বিপরীতের আধার – এই তালিকাই তা প্রমাণ করবে। আবার এও ঠিক, কবি বা সমালোচকরাও সব সময় যথার্থ বিচার করতে পারেন না ; ফলে 'সিন্দবাদ', 'বা'র দরিয়ায়' বা 'সাত সাগরের মাঝি' যিনি লিখেছেন তিনি একই সময়ে 'লাশ', 'আউলাদ' বা 'দুর্ভিক্ষের সন্ততি' লিখেছেন, এ তথ্য আমরা বিস্মৃত হই। আবার এই দুই যে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসের রচনা তা-ও তো নয়। তার সাক্ষ্য দেবে 'হে বন্য স্বপ্নেরা' – যে-নামে কবি বহুকাল ধ'রে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ

www.pathagar.com

করতে চেয়েছেন, কবির মৃত্যুর বহু বছর পরে যা প্রকাশিত হয়। 'হে বন্য স্বপ্নেরা' সেই সংযোগবিন্দু – বাস্তব ও স্বপ্নের যেখান থেকে সংঘর্ষে অগ্নি প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়-কবিতায়। স্বপ্নের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন কবি : ফসলের শূন্য শুষ্ক মাঠ পেতে চায় সোনালি আশ্বাস। বন্য স্বপ্ন – কিন্তু তার পটভূমি মন্বন্তরের কালো দিনগুলি :

এখানে শিশুর কান্না – ক্ষুধাতুর আগ্নেয় প্রান্তরে,
মানুষের অপমৃত্যু এ রাত্রির শংকিত প্রহরে।
আজিকে কবন্ধ ওরা ভারবাহী বহে সে খবর ;
বাঁকা শিরদাঁড়া, ম্লান, মানুষের শিয়রে পাথর।

'পদ্মার ফাটল' কবিতায় দুর্ভিক্ষকে কবি বলেছেন 'শাসন-সৃজিত সর্বনাশ'। এই মন্বন্তর এক দিনের সৃষ্টি নয় – ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর রোষ এখানে চাপা থাকেনি : 'দুশো বছরের খেলা। বলে গেল হাড়ের মিছিল/দুশো বছরের মারীরোগ সম্পূর্ণ রাখিয়াছিলো/অন্তঃসারশূন্য করি।' এইসব কবিতায় বারবার উচ্চারিত-উদ্‌গীরিত হয়েছে শোষকের প্রতি ঘৃণা : 'দশদিক ঘিরে গড়ে মেদস্ফীত শোষকের উর্ণনাভ-জাল।' ('প্রেক্ষণ') 'লাশ' কবিতা শেষ হয়েছে অপসভ্যতার ধ্বংস কামনায়। কিন্তু ফররুখের অধিকাংশ মন্বন্তরের কবিতায় তাবৎ হতাশার পরে একটি অস্তিবাদ ধ্বনিত-রণিত। 'প্রেক্ষণ' কবিতা তাই শেষ হচ্ছে 'জীবনের স্বপ্ন চাই' এই ঘোষণায়। 'পরিপ্রেক্ষিত' কবিতায় 'বাতাসে মৃত্যুর হাহাকার' পেরিয়ে কবির স্বপ্ন রচনা করে 'দিকে দিকে সম্পূর্ণ চাষ/স্তরে স্তরে ফেটে-পড়া, আকাঙ্খিত আগ্নেয়-কাপাস।' মন্বন্তরের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় ফররুখের কবিতায়। 'দুর্ভিক্ষের সন্ততি' কবিতা শেষ হয় নিরাশ্বাস হাহাকারে :

দুর্ভিক্ষের সন্ততিরা মরিতেছে প্রতি তিলে তিলে।
কোন বাধা জাগিল না কোন দাগ লাগিল না
এ পাশব প্রস্তর নিখিলে
প্রতিকার হল না তো তার
যাত্রীদল কৃষ্ণ বুভুক্ষার।
আজ মৃত্যু অন্ধকার দিগন্ত-বিস্তার।
তীর কোথা তার
হায় তীব্র ক্ষুধা শীর্ণ সন্তান বুভুক্ষার।

www.pathagar.com

'দিন' কবিতা কিন্তু শেষ হচ্ছে আতীব্র প্রতিবাদে, দ্রোহের ঘোষণায় :

বিবস্ত্রের লজ্জা আজ ভরাক আকাশ,
শোষিতের কান্না আজ হোক নিঃসংশয়
পথে দেখি আসন্ন প্রলয় –
মৃত্যুর সংগিন পাশে আর এক মুক্তির সংগিন
বিদ্রোহের দিন।

'শকুনেরা' কবিতায় 'লাশ' কবিতার শেষাংশের মতো অভিশাপ-বর্ষণ। মন্বন্তরের কারণ যারা ঘটিয়েছে, সেই শোষকদেরই বলা হয়েছে শকুন।

পঞ্চাশের মন্বন্তরকে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন কবি – অভিশাপে, প্রতিবাদে, দ্রোহে, পরবর্তী স্বপ্নের স্বাক্ষরে। তাঁর ঐ মানবতাবাদী দৃষ্টি শেষ-পর্যন্ত, সর্বশেষ অধ্যায় পর্যন্ত অচ্যুত অক্ষুণ্ন ছিলো। "সাত সাগরের মাঝি"র প্রায় সব কবিতাই ১৩৫০–৫১ সালে রচিত। কিন্তু আমরা কবির এই সময়ের স্বাপ্নিক ও ইসলামী দিকটাই লক্ষ্য ক'রে গেছি অনেক সময়ে তাঁর বাস্তবতার আরাধনা সব সময় নজরে পড়েনি। তাহ'লে আমরা চিহ্নিত করতে পারতাম সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতোই ফররুখ আহমদ বাংলা ভাষার আর-একজন মন্বন্তরের শ্রেষ্ঠ কবি।

কিন্তু জীবন বড়ো আশ্চর্য। আর কবিতাও এক আশ্চর্য সৃষ্টি। ফররুখের জীবনবৃত্তের শেষ কবিতাটিও ছিলো দুর্ভিক্ষকেন্দ্রিক। বাংলাদেশে ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের পরে মন্বন্তরের কবি ফররুখ লিখলেন তাঁর সর্বশেষ কবিতা '১৯৭৪ (একটি আলেখ্য)'[১], রচনাকাল ১লা আষাঢ় ১৩৮৯, ২৩শে জমাদিয়াল আউয়াল ১৩৯৪। 'লাশে'র কবির শেষ কবিতায় আবার দেখা দিলো এরকম পঙক্তি : 'দুর্ভিক্ষের বার্তা আসে, আসে মৃত্যু নিরন্ধ্র রাত্রির।' ফররুখ আহমদের আধুনিকতা অব্যক্তিকতায়। অব্যক্তিক কবি ফররুখ তাঁর সর্বশেষ অব্যক্তিক কবিতা রচনার কয়েক মাস পরেই চিরদিনের জন্যে অন্তর্হিত হলেন। থেকে গেলো তাঁর অপরাজেয় আশার নিশান : মন্বন্তর উপলক্ষ ক'রে মানবপ্রেমের একগুচ্ছ কবিতা।।

---

১ অঞ্জলি বসু (সম্পাদিত) : "সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান"। দ্বি,. সং ডিসেম্বর ১৯৮৮। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

www.pathagar.com

২ সুকান্ত ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) : "আকাল" । প্রথম প্রকাশ : ১৩৫১। প্রথম সারস্বত সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৭৩। পুনর্মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ ১৩৭৮। সারস্বত লাইব্রেরী কলকাতা। আমাদের ব্যবহৃত এই সংস্করণের ভূমিকা ('নতুন আকাল' নামে) লেখেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (ভূমিকার তারিখ : ২৯-৪-৫৫)। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৮।

৩ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় : 'বাংলা প্রগতি-কাব্য : আদি-মধ্য-বর্তমান' ('ঐকতান', প্রগতি কবিতা সংখ্যা, ১৯৮৯।

৪ আবদুল গনি হাজারী : 'বন্দী বিবেক সমাজ ও কবিমানস'। 'সমকাল', কবিতা-সংখ্যা ১৩৭১। আবদুল মান্নান সৈয়দের "আবদুল গনি হাজারী" (১৯৮৯) গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত।

৫ 'মুমূর্ষ শাল' কবিতাটি 'সওগাত' পত্রিকার মাঘ ১৩৫১ সংখ্যায় 'জীবনসমুদ্র' নামে প্রকাশিত হয়েছিলো।

৬ আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত) : "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা"। জুন ১৯৭৫। ফররুখ স্মৃতি তহবিল, চট্টগ্রাম।

৭ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত) : "ফররুখ-রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড)। অক্টোবর ১৯৭৯। আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

৮ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (সম্পাদিত) : "হে বন্য স্বপ্নেরা"। নবেম্বর ১৯৭৬।

৯ আবদুল মান্নান সৈয়দ : "ফররুখ আহমদ"। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রোত্তর কাব্যনাট্য ও "নৌফেল ও হাতেম"

এক

কাব্যনাট্যের ইতিহাসপ্রণেতা একজন লিখেছেন, 'ষাটের দশকেই কাব্যনাট্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধি।'[১] আসলে কাব্যনাট্য প্রায় একটি আন্দোলনের আকার নেয় ষাটের দশকে। এর সূচনা হয় আরেকটু আগে। একজন কাব্যনাট্যকার, দিলীপ রায়, লিখেছেন :

> কবিতামেলার পটভূমিতে ১৯৫৭ সালে, যখন অনেক বিরুদ্ধ ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আধুনিক সমস্যামূলক কাব্যনাট্য 'একটি নায়ক' উৎসাহী কবিবন্ধুদের ও কয়েকজন বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় রবীন্দ্রভারতী রঙ্গমঞ্চে অশেষ যত্নে ও অনেক পরীক্ষার পর, মাথা খাটিয়ে, নিজেদের পকেটের অর্থ ও কপালের স্বেদবিন্দু অকাতরে ঢেলে মঞ্চস্থ করেছিলাম, তখন বোধহয় অনেকেই ভাবতে পারেননি যে, অদূর ভবিষতে বাংলা সাহিত্যজগতেও 'কাব্যনাট্য' কথাটি ঘষা পয়সার মতো চালু হয়ে যাবে।[২]

'একটি নায়ক' দিলীপ রায়েরই লেখা কাব্যনাট্য। তিনি ছাড়া পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে নতুন কাব্যআন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন অনেক কবি : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২১), গিরিশংকর (১৯২১), অরুণকুমার সরকার (১৯২১-৮০), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪), জগন্নাথ চক্রবর্তী (১৯২৪-৯২), রাম বসু (১৯২৫), কৃষ্ণ ধর (১৯২৬), আলোক সরকার (১৯৩২), তরুণ সান্যাল (১৯৩২), অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩) প্রমুখ। মূলত এঁদের হাতেই কাব্যনাট্য মাধ্যমটি একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছিলো — এই চল্লিশ ও পঞ্চাশের কবিদের হাতে। যাঁদের দ্বারা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা সংগঠিত হয়েছিলো, সেই তিরিশের কবিবৃন্দ কিন্তু কাব্যনাট্যে উৎসাহী হননি। কিন্তু এ তথ্য স্মরণীয় যে, তিরিশের প্রধানতম কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) ভবিষ্যদ্বাণীর মতো কয়েকটি পঙক্তি উচ্চারণ করেছিলেন :

> একালের কবিতার কোনো-কোনো অভাব ও অস্পষ্টতার দিক এভাবে টিকে থাকবে না ; বাংলা কবিতার আধুনিক সময় যদি তা দান না করতে পারে ভবিষ্যৎকালে (খুব দেরি না করেও) দীর্ঘ কবিতা ও শ্লেষে লিখিত মহাকবিতা আসতে পারে ; এবং কবিতায় নাট্য। ইতিপূর্বে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তার চেয়ে বেশি দেশী ও গ্রীক (কারো হাতে) ও বেশি শেক্সপীয়রীয়

www.pathagar.com

> (অপরদের হাতে — কিন্তু নতুন, জটিল সময়ের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রী ধারণ করে) বাঙলাদেশে খুব শিগগির না হলেও সৃষ্টি হবে একদিন ; কেবলই খণ্ড কবিতার সিদ্ধি নিয়ে দূরতর ভবিষ্যৎ তৃপ্ত হয়ে থাকবে বলে মনে হয় না।[৩]

জীবনানন্দের যে-প্রবন্ধে এই কথাগুলো বলা হয়েছিলো তার নাম 'বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ', আর প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিলো ১৯৫০ সালে। আশ্চর্য যে, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে জীবনানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী ফ'লে গিয়েছিলো। তিরিশের একজন কবি, বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮–৭৪) কয়েকটি কাব্যনাট্য (তাঁর বিবেচনায়) লিখেছিলেন — "তপস্বী ও তরঙ্গিনী", "কালসন্ধ্যা", "অনাম্নী অঙ্গনা", "প্রথম পার্থ", "সংক্রান্তি" ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসুরও কাব্যনাট্য লেখার শুরু কার্যত ষাটের দশকেই। খুব সম্ভবত পূর্বোক্তদের দ্বারা প্রাণিত হ'য়েই — এবং অনুরূপ ঘটনা বুদ্ধদেবের সাহিত্যজীবনে উপর্যুপরি। ওয়াকিফহাল কবি আলোক সরকার তাঁর 'অগ্রজ কবিরা ও কাব্যনাটক' (রচনাকাল : ১৯৬১) প্রবন্ধের গ্রন্থর্ভূত পাদটীকায় লিখছেন :

> এই প্রবন্ধ রচনার কিছুদিন পর বুদ্ধদেব বসু অনেকগুলি নাটক রচনা করেন যাকে তিনি নিজে কাব্যনাটক বলে মনে করতেন। বর্তমান লেখক তার কোনটাকেই কাব্যনাটক বলে স্বীকার করতে রাজি নয়।[৪]

সে যাই হোক, দেখা যাচ্ছে : পঞ্চাশ ও ষাটের দশকেই আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য রচনার সুসময়।

বিস্ময়কর এই যে, মূল প্রবাহের বাইরে থেকেও ফররুখ আহমদের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্য, "নৌফেল ও হাতেম" , এই সময়েই রচিত ও প্রকাশিত। "নৌফেল ও হাতেম" প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো 'মাহে-নও' পত্রিকায় ১৯৫৬ সালে (কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৬৩)। এই কাব্যনাট্য ফররুখ তাঁর স্বভাবসুলভ পরিমার্জনা করেননি আর — ১৯৬১ সালে বই যখন বেরুলো, তখন অপরিবর্তিতভাবেই প্রকাশিত হ'লো। বইটি প্রথম প্রকাশ করে পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা। পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ায় বইটির আরো অন্তত তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় (১৯৬৫, ১৯৬৭, ১৯৬৯)। বেতারনাট্য-রূপেও সম্প্রচারিত হয়। স্মরণীয় যে, চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকের কবিবৃন্দ কাব্যনাট্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন ; ফররুখ আহমদও চল্লিশেরই একজন কবি।

এখন, ফররুখ আহমদ কেন একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্য রচনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন? — ফররুখ আহমদের প্রিয় কবি ছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪–৭৩)। মাইকেল কোনো কাব্যনাট্য লেখেননি অবশ্য। কিন্তু "মেঘনাদবধ কাব্য" (১৮৬১) ও "বীরাঙ্গনা" কাব্যের (১৮৬২) রচয়িতার তো কাব্যনাট্য

www.pathagar.com

রচনার সমস্ত মালমশলা ছিলোই। "বীরাঙ্গনা" তো প্রথম বাংলা মনোনাট্যের (dramatic monologue) প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ফররুখ ছিলেন মাইকেলের মতোই কবিতার নব-নব রূপকল্পের প্রেমিক। এবং একই সঙ্গে পুরাণ ও ইতিহাসের পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। অনুজ একজন কবিকে ২৩শে জুলাই ১৯৫২ সালের একটি পত্রে ফররুখ লিখেছেন :

> . . . আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও পুঁথিসাহিত্যের দিকে বিশেষভবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুলতানা রিজিয়ার কাহিনী একদা মাইকেলের মতো মহাকবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। এরকম অসংখ্য কাহিনী আছে যা আধুনিক কবিতার আঙ্গিকে চমৎকারভাবে রসোত্তীর্ণ হতে পারে।[৫]

এই উক্তির কয়েক বছরের মধ্যেই ফররুখ নিজেই "নৌফেল ও হাতেম" (১৯৫৬) এবং "হাতেম তায়ী" (১৯৬৬) দুটি অসামান্য শিল্পসৃষ্টি করেন। — ফররুখ তাঁর অপরূপ স্বজ্ঞাবলে তাঁর গতিশীল শিল্পজীবনে কাব্যনাট্য রচনার বিষয়টি শোষণ ক'রে নিয়েছিলেন। তাঁর অস্থির শিল্পেষণা কেবল খণ্ডকবিতার সিদ্ধিতেই তৃপ্ত থাকেনি — কাব্যনাট্য ও মহাকাব্য রচনার দুঃসাহসিকতাকেও অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছে।

হ্যাঁ, "নৌফেল ও হাতেম" প্রকাশের পর সেদিনকার তরুণ সুচেতন সমালোচক আবদুল হাফিজ তাকে 'একটি দুঃসাহসিক কবিকর্ম' রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন। তিনি যথার্থই চিহ্নিত করেছিলেন :

> "নৌফেল ও হাতেম" ফররুখ আহমদের একটি দুঃসাহসিক কবিকর্ম। তার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত, পূর্ব বাংলার সাহিত্য নাটক রচনার ব্যাপারটি এমনিতেও খানিকটা দুঃসাহসের কাজ। সার্থক নাটক এ পর্যন্ত আমরা পাইনি, যার মধ্যে একাধারে মঞ্চধর্মিতা ও অন্যদিকে সাহিত্যিক উৎকর্ষতার সমাবেশ ঘটেছে।[৬]

যেমন তরুণ সমালোচক, তেমনি প্রবীণ-প্রাজ্ঞ সমালোচকও এই কাব্যনাট্যের সাফল্য স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন :

> শুধু মনুষ্যপ্রীতি নয়, মনুষ্যত্বপ্রীতিও এই কাব্যনাটিকার অন্তর্নিহিত আদর্শ। এই মহৎ আদর্শের প্রচারণা কাব্যসৌন্দর্যের আবহে ও নাটকীয় ঘটনার আবর্তে এমন রসমহিমামণ্ডিত হয়েছে যে, আমাদের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তার স্থান হবে সংশয়াতীত।[৭]

তরুণ ও প্রবীণ তদানীন্তন দুই সমালোচকই "নৌফেল ও হাতেম"কে সার্থক কাব্যনাট্য হিশেবে গণনা করেছিলেন, তিন দশক পরে আমাদের বিবেচনা আজ উপস্থিত করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

শিল্পমাধ্যম হিশেবে কাব্যনাট্য এবং তার চারিত্রলক্ষণ খুব সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা যায়নি, এবং তা প্রচুর আত্মবিরোধের সম্মুখীন। কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী যদি বলেন :

> কবিতাও নয়, নাটকও নয়, — কাব্যনাট্য একটি পৃথক শিল্পমাধ্যম। নাটকীয় কবিতায় ভাবাবেগের উত্তালতা অন্যনিরপেক্ষ ; কিন্তু কাব্যনাট্যে একটি চরিত্রের ভাবাবেগ অন্য-একটি চরিত্রের ভাবাবেগের সঙ্গে নির্মমভাবে সংলগ্ন, প্রহার-প্রত্যাশী।[৮]

তাহ'লে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার বিপরীতে কাব্যনাট্য মাধ্যমটিকেই একেবারে নাকচ ক'রে দেন :

> আমি কাব্যনাটক রচনার কোনো মর্মই বুঝতে পারি না। এটা কবিদের নিজের রচনা মঞ্চে উপস্থাপিত দেখার লোভ ছাড়া আর কিছুই না। তাছাড়া, আর একটা প্রশ্ন। কাব্যনাটক কি পড়ার জন্য? পড়তে যত খারাপ লাগে দেখতে খারাপ লাগে তার চেয়েও বেশি। এ এক ধরনের অত্যাচার প্রায় বলা যায়।[৯]

আবার, পূর্ণেন্দু পত্রী লিখছেন রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) "ডাকঘর" (১৯১২) সম্পর্কে :

> আমার যেন মনে হয়, "ডাকঘর" কাব্যনাটক। . . . "ডাকঘরে" অমলের অসুখ আগাগোড়া জীবনের মতই যন্ত্রণাময়। কিন্তু সেই অসুখের উৎস অবিকল জীবন নয়, জীবনের ভিতরকার কবিতা।[১০]

অন্যদিকে, আলোক সরকার "ডাকঘর"কে কাব্যনাট্য হিশেবে নাকচ ক'রে দিচ্ছেন :

> আমার বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথের লোকমান্য কাব্যনাটক "চিত্রাঙ্গদা" অথবা 'বিদায়-অভিশাপ' ব্যতীত একটিও নেই। "ডাকঘর"কে কাব্যনাটকের অন্তর্ভুক্ত করতে আমার দ্বিধা আছে ; "ডাকঘরে"র প্রত্যাশা অতীন্দ্রিয় অভিক্ষেপে কুয়াশাবিলীন, তা একধরনের উদ্ভাসন।[১১]

কাব্যনাট্য সম্পর্কে এরকম পরস্পরবিরোধী মন্তব্য অনেক। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফররুখ আহমদের "নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাট্যের বিচার করতে হবে।

এই কাব্যনাট্যের কাহিনীসূত্র খুব সামান্যই। — ইয়েমেনের শাহ্‌জাদা হাতেম তা'য়ীর দানশীলতার বিপুল খ্যাতিতে আরবের নৌফেল শাহ্ ঈর্ষান্বিত। অনেক কৌশল ক'রেও নৌফেল শাহ্ যখন হাতেম তা'য়ীর মতো যশ অর্জন করতে পারলেন না, তখন ঘোষণা করলেন : যে হাতেমকে ধ'রে আনতে পারবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে। হাতেম এক গরিব কাঠুরেকে সহায়তা করার জন্যে স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন। বৃদ্ধ কাঠুরে নিজেই যখন

www.pathagar.com

রাজদরবারে হাতেমের এই স্বেচ্ছাবন্দিত্বের সংবাদ ফাঁস ক'রে দিলো, তখন হাতেমের মহত্ত্বে অভিভূত নৌফেল ইয়েমেনের শাহজাদা হাতেমের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন নিজ কৃতকর্মের জন্য — এবং নিজের মাথার তাজ পরিয়ে দিলেন হাতেম তা'য়ীর মাথায়। — এই তো কাহিনীসূত্র : খুব তুচ্ছ, একেবারেই সামান্য। কিন্তু এই কাহিনী ঘিরেই নৌফেল, হাতেম, উজীর, আমির, শায়ের, কোতোয়াল, গুপ্তচর, মুর্শিদ, ভাঁড়, মোসাহেব, বেগম, কাঠুরিয়া, কাঠুরিয়ার স্ত্রী, কাঠুরিয়ার সন্তান ও অন্যান্যরা আবর্তিত হয়েছে। এবং সব-মিলিয়ে নাটকের আবশ্যিক গতিও সচল থেকেছে আনুপূর্ব : নাটক শুরু হয়েছে নৌফেলের রাজ্যের একটি প্রাচীন মেলায় আর শেষ হয়েছে নৌফেলের রাজদরবারে। ফররুখ আহমদের রচনার প্রধান গুণ তাঁর সাবলীল সচ্ছলতা — "নৌফেল ও হাতেম" নাটকের তিনটি অঙ্কে তা বজায় থেকেছে — ফররুখের যে-কোনো রচনার মতোই এ অনাড়ষ্ট, গতিবান, অনাহত — একটি নদীর মতো প্রবহমান।

আর-কোনো পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্য ফররুখ লেখেননি। প্রথম জীবনে 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' (প্রথম প্রকাশ : 'মোহাম্মদী' মাঘ ১৩৫০। ১৯৪৪এ প্রকাশিত "সাত সাগরের মাঝি" গ্রন্থভুক্ত) নামে যে-ক্ষুদ্র কবিতানাট্য লিখেছিলেন তা যতোখানি স্বপ্নাক্রান্ত ও রোমান্টিক, "নৌফেল ও হাতেম" তা নয়। তার কারণ চল্লিশের দশকের ফররুখ অনেকখানি রোমান্টিক, পঞ্চাশের দশকের ফররুখ অনেকখানি আদর্শবাদী।

মাইকেলের চোদ্দ মাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দ ফররুখের "নৌফেল ও হাতেমে" হয়েছে আঠারো মাত্রার অমিত্রাক্ষর। কাব্যনাটকের শর্ত এই যে সংলাপ স্বাভাবিক হ'তে হবে — বাস্তবসম্মত হ'তে হবে। সংলাপের স্বাভাবিকতার জন্যে "নৌফেল ও হাতেম" অনেক বেশি দিনাদুদিনের ভাষার কাছাকাছি — এমনকি ফররুখের স্বাভাবিক কাব্যভাষার থেকে আলাদা : সহজ। অবশ্য, আবার, কাব্যনাট্যের স্বভাব অনুযায়ী এ ভাষা যেমন প্রাত্যহিক ধূলি-মলিনতাকে স্বীকার করেছে — যেমন, ভাঁড়ের উক্তি (২ : ৪) :

> যেমন সুযোগ-প্রার্থী ছোট মিঞা থাকেন তাকিয়ে
> দাওয়াতের ইন্তেজারে, যদি পান দাওয়াত তা'হলে
> মুহূর্তে রওয়ানা হন দ্বিরুক্তি না করে।

তেম্নি প্রাত্যহিকতা-অতিক্রমী উচ্চারণ — যেমন শায়েরের উক্তি (৩ : ৫) :

> এ মাটিতে,
> হীন স্বার্থে কলঙ্কিত জুলমাতের হিংস্র অন্ধকারে
> যেখানে দুর্লভ জানি মনুষ্যত্ব, মর্দমী, সেখানে

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ীর ত্যাগ অন্তহীন দরিয়ার মত,
হাতেম তা'য়ীর শির পর্বতের মত মহীয়ান,
সুব্‌হে উম্মীদের মত মুখ তার উজ্জ্বল রওশন।

জীবনের এই দুই স্তরকেই স্পর্শ করেছে ফররুখের কাব্যভাষা। এবং এ সম্ভব হয়েছে এজন্যে যে, ফররুখ কেবল "সাত সাগরের মাঝি"র কবি নন্ — মধ্য-চল্লিশ থেকেই ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লেখা শুরু করেন। ফলত জীবনের কবিতা আর জীবনের গদ্য দুই স্তরকেই ফররুখ ছুঁয়ে-ছেনে গেছেন। আর এজন্যেই কাব্যনাট্য রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

সাহিত্যের রূপকল্পেও ফররুখ তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতা অটুট রেখেছেন। এর ফলেই তাঁর কবিতা যান্ত্রিক হয়নি কখনো, জীবন্ত থেকেছে সবসময়। এর একটি দৃষ্টান্ত এই যে "নৌফেল ও হাতেম" পুরো বইটি ১৮-মাত্রার অমিত্রাক্ষরে রচিত হ'লেও গ্রন্থের শেষ ছয় পঙক্তি — শায়েরের সর্বশেষ উক্তি (৩ : ৫) অন্তমিলসম্পন্ন :

কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়, —শুধু সে মানুষ
নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী — পারে যে জাগাতে
সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ, — ঘুমঘোরে যখন বেঁহুশ
জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে ;
যার সাথে শুরু হয় পথ চলা জাগ্রত যাত্রীর
দিল সে ইশারা আজ আত্মত্যাগ হাতেম তায়ীর।

এই অন্তমিল সমগ্র কাব্যের ছন্দবিন্যাসের দিক থেকে প্রক্ষিপ্ত, কিন্তু এ কাব্যনাট্যের অন্তর্গত ঐক্য ও উদ্ভাসের সহযোগী। প্রসঙ্গত, শিল্পশেষে এরকম ঘোষণা শিল্পসম্মত কিনা এই প্রশ্ন ওঠে। শায়ের অর্থাৎ সভাকবির উক্তি হিশেবে, সমগ্র কাব্যনাট্যের আন্তরিক তাৎপর্যের দিক থেকে একে আকস্মিক ঘোষণা মনে হয় না — মনে হয়, সমগ্র কাব্যনাট্যের নিষিক্ত বাণীই এখানে রূপ পরিগ্রহ করেছে। — একটু আগেই বলেছি : চল্লিশের ফররুখ রোমান্টিক আর পঞ্চাশের দশকের ফররুখ আদর্শবাদী। কথাটিকে পরিশোধন ক'রে এখনি বলা দরকার : রোমান্টিক পর্যায়ের ফররুখও প্রবলভাবে আদর্শবাদী — কেবল আদর্শ সেখানে রোমান্টিকতার আচ্ছাদন প'রে নিয়েছে। আর এও

www.pathagar.com

সত্য, আদর্শবাদী-পর্যায়েও ফররুখের রোমান্টিকতা প্রচ্ছন্নভাবে র'য়েই গিয়েছে। আর এই প্রচ্ছন্নতা কাব্যনাট্য জননের দিক থেকে উপকারীই হয়েছে।

মাইকেলের দূর-প্রভাব ফররুখের উপর স্থায়ীভাবেই ছিলো। যেমন, মাইকেলী ধরনে দীর্ঘ উপমা রচনা করেছেন ফররুখ। উদাহরণ :

১. জিন্দেগীতে শুধু তার দেখা পাবে ব'লে
থাকে এরা ইন্তেজারে, রমজানের দিন গণে যেন
রোজাদার।

[১ : ২]

২ কখনো আরণ্য-অন্ধকারে
ডুবে গেছে এ পৃথিবী, যেন শ্রান্ত ইউনুস নবীকে
সামুদ্রিক মৎস্য গ্রাস করেছে সহজে, কখনো বা
রাত্রির জিন্দান থেকে মুক্ত সূর্য দেখেছি ভোরের
মৃত্যু অন্ধকূপ থেকে মুক্ত নবী ইউসুফ যেমন
উজ্জ্বল, ঐশ্বর্যময়। আদিগন্ত দেখেছি দরিয়া
প্রাণোচ্ছল। দেখেছি পাহাড় — দৃঢ় মেরুদণ্ড যেন
মর্দে মুমিনের।

[২ : ২]

মাইকেলী ধরনেই উপমা প্রয়োগ করেছেন 'কিংবা' শব্দ সহযোগে :

মানুষ-শিকারী পশু
ইনসানের ছায়া দেখে অকারণে বাড়াও হিংস্রতা,
লুব্ধ হও চিতা কিম্বা আজদাহার মত।

[৩ : ৪]

মাইকেলী-ধরনে উপমা ব্যবহার করলেও লক্ষণীয়, এসব উপমা সবসময় ফররুখ আহরণ করেছেন নিজস্ব ঐতিহ্য থেকে। এবং এ তথ্য এখানে স্মরণীয় যে, "নৌফেল ও হাতেম"

www.pathagar.com

কাব্যনাট্যে বেশি উপমা নেই — আর সেটাই সংগত হয়েছে। (ফররুখের প্রিয়তম চিত্রকল্পটিকে এখানেও একবার দেখা গেলো : 'অন্ধকার তাজীতে সওয়ার/নির্জন রাত্রির চাঁদ দেখা দেবে — স্বপ্নের শাজাদী/প্রশান্তি-সুষমা-ঘেরা'। — ৩ : ৩। কিন্তু চিত্রকল্প-যে বেশি নেই, সেটাও এই বইএর জন্যে ভালো হয়েছে।)

এলিয়টের নির্দেশ হ'লো এই যে, কাব্যনাটকের কবিতা হবে এমন প্রচ্ছন্ন-যে সাধারণ পাঠক তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হবেন না — শুধু অচেতনভাবে বা অর্ধচেতনভাবে 'প্রচ্ছন্ন কবিতা'র ফলশ্রুতি উপভোগ করবেন।[১২] — এই নিরিখে ফররুখ আহমদের "নৌফেল ও হাতেম" সফল। এই নাটকে বর্ণনার বাস্তবতা ও সংলাপের বাস্তবতা পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে। চরিত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে বাক্যালাপে 'প্রহার-প্রত্যাশী' অর্থাৎ বাকবিনিময় যথাযথই হয়েছে — আপনাপন ভাবাবেগে বা গীতময়তায় প্লাবিত হ'য়ে যায়নি। "নৌফেল ও হাতেম" রচনাকালে ফররুখ আহমদের প্রাক্তন রোমান্টিকতা ঝ'রে গেছে। উপমা, রূপক, চিত্রকল্প, প্রতীক, পুনরাবৃত্তি — ফররুখের এইসব শিল্পকুশলতা লক্ষণীয়ভাবে কম। নজরুল-প্রেমেন্দ্র-জীবনানন্দ-সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মধ্যে ইতিহাস-ভূগোলের যে-দূরবিহার শুরু হয়েছিলো — ফররুখ সেই ইতিহাসচেতনাকে যুক্ত করেছিলেন ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে। কিন্তু স্থান-কালের যে-দূরত্ব, তা-ই "নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাট্যে একটি 'প্রচ্ছন্ন কবিতা'র আবহ সৃষ্টি করেছে। "নৌফেল ও হাতেম" শেষ-বিচারে ইয়েটসীয় ধরনের কাব্যনাট্য নয় — এলিয়টীয় ধরনে রকাব্যনাট্য। নিজে কবি-শিল্পী হ'য়েও কবিতা ও শিল্পের উর্দ্ধে-যে মানুষকে স্থাপন করেছেন ফররুখ, এখানেই তাঁর মহত্ত্ব।।

---

১ "বাংলা কাব্যনাট্য" : উত্তম দাশ। ১৯৮৯। মহাদিগন্ত, কলকাতা।

২ 'কাব্যনাট্যের স্বপক্ষে' : দিলীপ রায়। 'দৈনিক কবিতা', কাব্যনাট্য সংকলন, ১৯৭২।

৩ 'বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ', "কবিতার কথা" : জীবনানন্দ দাশ। দ্বি সং ১৩৭০। সিগনেট প্রেস, কলকাতা।

৪ 'অগ্রজ কবিরা ও কাব্যনাটক', "প্রবহমান সাহিত্য" : আলোক সরকার। ১৯৮৭। নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।

৫ 'ব্যক্তি ফররুখ' : আবদুর রশীদ খান। "ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি" : শাহাবুদ্দীন আহমদ-সম্পাদিত। ১৯৮৪। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

৬ রাজশাহী থেকে প্রকাশিত 'পূর্বমেঘ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। পরে "ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি" সংকলনে পুনর্মুদ্রিত।

৭ ১৯৬৪ সালে 'পূবালী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। পরে "ফররুখ আহমদ" (১৯৮৭, সেবা, ঢাকা) সংকলনে পুনর্মুদ্রিত।

www.pathagar.com

৮ 'কাব্যনাটক বিষয়ে দু-একটা কথা' : কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী। 'দৈনিক কবিতা', কাব্যনাট্য সংকলন, ১৯৭২।

৯ 'কাব্যনাটকের বিরুদ্ধে' : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ঐ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য উত্তরকালে "প্রাণের প্রহরী" নামে একটি কাব্যনাট্য রচনা করেন।

১০ 'কবিতা + নাটক, কাব্যনাটক নয়' : পূর্ণেন্দু পত্রী। ঐ।

১১ 'অগ্রজ কবিরা ও কাব্যনাটক', "প্রবহমান সাহিত্য" : আলোক সরকার।

১২ 'কাব্যনাটকের বিপক্ষে' : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। 'দৈনিক কবিতা', কাব্যনাট্য সংকলন ১৯৭২।

www.pathagar.com

একটি কাব্যনাট্য : দুই লেখন

এক

ফররুখ আহমদ একই সঙ্গে রোমান্টিক ও আদর্শবাদী কবি। রোমান্টিকতা ও আদর্শবাদিতার মধ্যে একটি শব্দহীন সংঘর্ষ আছে। কেননা আপাতভাবে মনে হয় : রোমান্টিকতা বুঝি বস্তুবিশ্বকে রঙিন করে আর আদর্শবাদিতা চাঁচাছোলা বাস্তবতার পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু কার্যত তা নয় : আদর্শও এক রঙিন অর্থাৎ স্বপ্নাক্রান্ত গন্তব্য। রোমান্টিকতা বাস্তবতাকে রঙিন আবরণ পরায়। আদর্শবাদিতাও বাস্তবতাকে চিত্রিত প্রচ্ছদ পরায়। আসল কথা : কবি মাত্রই রোমান্টিক, রোমান্টিক নাহ'লে কবি হওয়াই সম্ভব নয়। তবে দেখা যাবে, রোমান্টিক কবির আদর্শবাদী হ'তে বাধা নেই। রোমান্টিকতার দুই ধরন : ব্যক্তিগত-রোমান্টিকতা ; আর সামাজিক-রোমান্টিকতা। চল্লিশের বাঙালি কবিদের একাংশ ব্যক্তি-রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন, কিন্তু অধিকাংশ সামাজিক-রোমান্টিকতায় উদ্বোধিত। ফররুখ আহমদ এই সামাজিক-রোমান্টিকদের একজন। সামাজিক-রোমান্টিকদের এক বিশাল অংশ প্রাণিত হয়েছে মার্কসবাদে, কিছু অংশ ইসলামে ; কিন্তু এই দুই ধরনের কবিই সামাজিক-রোমান্টিক। সমর সেনের পুনর্বিচারে বুদ্ধদেব বসুর মনে হয়েছিলো : '. . . রোমান্টিক হবার ভরপুর ইচ্ছে নিয়েও রোমান্টিক হতে পারেননি ব'লে সমর সেন যে-দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন তারই নাম "কয়েকটি কবিতা"।' ('নতুন সংস্করণের ভূমিকা', ডিসেম্বর ১৯৫৮, "কালের পুতুল") দিনেশ দাস চিত্রকল্প ছাড়া তাঁর বক্তব্য উচ্চারণই করেন না। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় আশ্চর্য ছন্দধ্বনিময়তায় যেন রোমান্টিকতাকে আমন্ত্রণ ক'রে আনেন। এমন-যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি সংখ্যাহীন তাৎক্ষণিক সামাজিক পদ্য-রচনাকেও দায়িত্ব হিশেবে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন, হঠাৎ-হঠাৎ লিখে ফেলেছেন 'ভুবনেশ্বরী'র মতো ত্রিকাল-ভাসিয়ে নেওয়া কবিতা। চল্লিশের কয়েকজন মাত্র কবির উদাহরণ দিলাম : এঁরা সকলেই সামাজিক-রোমান্টিক কবি, আদর্শবাদী কবি। ফররুখ আহমদ এঁদেরই সহযাত্রী কবি, এঁদেরই মতো সময়স্বভাবী, সামাজিক-রোমান্টিক ও আদর্শবাদী। শেষ-পর্যন্ত সমর সেন, দিনেশ দাস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ফররুখ আহমদ সকলেই মানবতাবাদী। সাধারণভাবে সব কবি-শিল্পীই তাই ; কিন্তু এঁরা বিশেষ-অর্থে মানবতাবাদী -- আতীব্র-প্রত্যয়ে মানবতাবাদী। এঁদের পরস্পরের পথের ফারাক আছে ; কিন্তু গন্তব্য অবিকল্প এক : মানবতাবাদ। এদিক থেকে চল্লিশের বাঙালি কবিরা বাংলা কবিতাকেই এক নতুন আয়তন দান করেছিলেন। তিরিশের কবিরা, শেষবিচারে, ব্যক্তিগত : চল্লিশের কবিরা, অন্তিম বিবেচনায়, সামাজিক। তিরিশের ও চল্লিশের কবিদের মৌল পার্থক্য এখানে। আর এই পৃথক গরিমা যাঁরা চল্লিশের কবিতাকে দান করেছেন, তাঁদের মধ্যে ফররুখের স্থান একটি শিখরে। কেন একটি জামানার তাবৎ কবি তীব্র-

www.pathagar.com

মানবতাবাদী হ'য়ে উঠেছেন, তার জবাব পাওয়া যাবে সমকালীন সময়স্বভাবে : মহাযুদ্ধে-দুর্ভিক্ষে-দাঙ্গায় মানবতা বিপন্ন হয়েছিলো ব'লেই এঁরা তীব্র মানবতাবাদী হ'য়ে উঠেছেন ; মৃত্যুর কাছে এসে পড়লে জীবনের মহিমা যেমন উপলব্ধ হয়, তেম্নি মানবতার মৃত্যু-আশংকাই এঁদের করেছে মানবতাবাদী।

দুই

তাঁর নিজের আরাধ্য মানবতাবাদের এক সুচিহ্নিত উদাহরণ ফররুখ আহমদের কাব্যনাট্য 'নয়া জিন্দেগী' তথা তার পরিণত দ্বিতীয় লেখন 'ইবলিস ও বনি আদম'।

অন্তত চোদ্দটি ছদ্মনামে ফররুখ আহমদ ব্যঙ্গকবিতা লিখতেন। এর মধ্যে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ছদ্মনাম 'হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী'। এই নামে প্রকাশিত তাঁর সব কবিতাই-যে ব্যঙ্গাত্মক নয়, তার প্রমাণ দেবে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার কার্তিক ১৩৫৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'নয়া জিন্দেগী' নামে কাব্যনাট্যটি। ফররুখ নিজের রচনার অবিশ্রাম পরিমার্জনা-পুনর্মার্জনা করতেন। 'নয়া জিন্দেগী' কাব্যনাট্যটি পরিশোধন ক'রে ফররুখ প্রথম প্রকাশের সতেরো বছর পরে, ১৯৬৯ সালে, 'ইবলিস ও বনি আদম' নামে 'পৃথিবী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই লেখনটি কবির মরণোত্তর প্রকাশিত "কাফেলা" (১৯৮০) গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

ফররুখের গহন কবিমানস উজ্জীবিত হয় প্রশান্তিতে নয় – সংঘর্ষে। একথা মিথ্যে নয় যে তিনি অনেক তুচ্ছ ও তাৎক্ষণিকে চঞ্চল-ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃত কবিমানস মানবজীবনের অতলান্ত রহস্যেই মুগ্ধ-সচকিত-আনন্দিত হয়। কিন্তু শুধু রাহসিকতায় আনন্দিত-সচকিত-মোহিত হয় না — একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানও পেতে চায়। এই সন্ধিমুহূর্ত থেকে ফররুখ রোমান্টিকতার রাজ্য ছেড়ে আদর্শবাদের অঞ্চলে প্রবেশ করলেন। ফররুখ যদি নির্মনন হতেন, তাহ'লে বিশুদ্ধ-রোমান্টিকদের মতো ঐ মানবজীবনের রহস্যেই তিনি মোহিত-স্নাত থেকে যেতেন। কিন্তু ফররুখ আত্মচেতন। আর আত্মচেতন ব'লেই উত্তরণপ্রয়াসী, রহস্যভেদে উৎসাহী, মানবজীবনের দিকনির্ণয় পেতে চান। ফররুখ কবি ছাড়া আর-কিছু ছিলেন না, কবিতাই ছিলো তাঁর আত্মমোচনের একমাত্র উপায়, কিন্তু ঐ আত্মমোচনের মধ্যেই তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন সবার জন্যে, তার মধ্যেই মিশেছে তাঁর সামাজিক আত্মতা। এই কবি নির্জন কিন্তু উতরোল। তাঁর উতরোল-নির্জনতার সাক্ষ্য তাঁর কাব্যনাট্যগুচ্ছ।

তিরিশের কবিবৃন্দ, যাঁরা ছিলেন ফররুখের অব্যবহিত পূর্বসূরী, কাব্যনাট্য লেখেননি। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন বটে, কিন্তু তা ফররুখের পরবর্তীকালে — এবং তার সঙ্গে ফররুখের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। বরং এঁদের ঠিক আগের জামানার দুই কবি,

www.pathagar.com

মোহিতলাল মজুমদার ও শাহাদাৎ হোসেন, যাঁদের সঙ্গে ফররুখের একটি সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়, ঐ দুই কবির সঙ্গে ফররুখের কাব্যনাট্য তুলনীয়। মোহিতলাল মজুমদার ও শাহাদাৎ হোসেনের কাব্যনাট্য ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ; ফররুখ আহমদের কাব্যনাট্য কল্পিত ও পুরাণসম্মত। ফররুখের মতো পূর্বসূরীদ্বয় কোনো পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্য প্রণয়ন করেননি।

তিনটি কাব্যনাট্য লিখেছেন ফররুখ : 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' ("সাত সাগরের মাঝি", ১৯৪৪, গ্রন্থর্ভূত), "নৌফেল ও হাতেম" (১৯৬১) এবং 'ইবলিস ও বনি আদম' ("কাফেলা", ১৯৮০, গ্রন্থর্ভূত)। লক্ষণীয়, 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' লিখিত হয়েছে ফররুখের কাব্যসাধনার প্রথম পর্যায়ে, যখন তিনি পরম রোমান্টিক ; আর "নৌফেল ও হাতেম" এবং 'ইবলিস ও বনি আদম' কাব্যনাট্যদ্বয় পরবর্তীকালে। 'ইবলিস ও বনি আদমে'র প্রথম লেখন 'নয়া জিন্দেগী' ১৯৫২ সালে লেখা ; "নৌফেল ও হাতেম" গ্রন্থাকারে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হ'লেও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৭ সালে ('মাহে-নও', কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৬৩) ; ১৯৬৯ সালে বেরোয় 'নয়া জিন্দেগী'র পরিশুদ্ধ পরিবর্ধিত লেখন 'ইবলিস ও বনি আদম'। 'ইবলিস ও বনি আদম'ই ফররুখের সর্বশেষ কাব্যনাট্যিক প্রচেষ্টা। 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্তে রচিত, কিন্তু বাকি দুটি আঠারো মাত্রার অক্ষরবৃত্তে তথা অমিত্রাক্ষরে। এই ছন্দপ্রয়োগও বিষয়ানুসারী : 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' অসম্ভব রোমান্টিক ; কিন্তু বক্তব্যপ্রধান বাকি দুটি কাব্যনাট্যে অমিল আঠারো মাত্রার অক্ষরবৃত্ত বক্তব্যকে সঘন ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু "নৌফেল ও হাতেম"এর চেয়ে 'ইবলিস ও বনি আদমে' ফররুখের স্বভাবী উত্তালতা অনেক-বেশি দীপ্যমান।

কাব্যনাট্যটির প্রথম লেখন ('নয়া জিন্দেগী') ও দ্বিতীয় লেখনে ('ইবলিস ও বনি আদম') যে পৃথকতা ঘটেছে, তা কেবল নামেই নয় – অন্তঃসারেও অনেকখানি। কেন্দ্রীয় বক্তব্য সতেরো বছর আগে-পরের দুই লেখনে একই আছে ; কিন্তু প্রধান দুটি পার্থক্য ঘটেছে : এক. নাট্যটিকে ব্যক্তির উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ায় সর্বজনীনতা বেড়েছে (প্রথম লেখনে রঙ্গভূমি 'হায়াত দারাজ খানের কুঠুরি' আর দ্বিতীয় লেখনে 'মানুষের বস্তি' ; প্রথম লেখনে 'হায়াত দারাজ' দ্বিতীয় লেখনে হয়েছে 'বনি আদম') ; দুই. পরিশোধিত-পরিবর্ধিত দ্বিতীয় লেখনে ফররুখ ধর্মকে সম্প্রসারিত-প্রতিষ্ঠিত করেছেন আগের চেয়ে প্রবলভাবে, কিন্তু বলা বাহুল্য — নাটকের কেন্দ্রমর্মকে একতিল জখম না-ক'রে। দ্বিতীয় লেখনে নতুন-সংযুক্ত দু'একটি অংশ পরীক্ষা করলেই তা প্রমাণিত হবে : উক্তিগুলি বনি আদমের :

১. মহান প্রকৃতি এই মানুষের।
আল্লাহ ছাড়া কারু কাছে হয় না যে আনত, অথবা

www.pathagar.com

জিন্দেগীতে নতশির ; — মাটি, পানি, আগুন, হাওয়ার
বিশাল, বিচিত্র বিশ্বে, অফুরন্ত কর্মের প্রবাহে
প্রতিনিধি জেনো সে আল্লার। আত্মসচেতন, দৃঢ়
সংগ্রাম-সংঘাতে তিক্ত চিরদিন সে অপরাজেয়
বিরাট দায়িত্বভার নিয়ে চলে পূর্ণতার পথে ;
মানে না সে পরাজয় জীবনে কখনো। হতোদ্যম
হয় না সে কোন দিন দ্বন্দ্বে ইবলিসের।

২ সে মাটিতে
দেখি বিশ্ব মানুষের পূর্ণ সম্ভাবনা। জানি আমি
স্খলনের এ অধ্যায় তিক্ত, তিক্ততম ; জানি আমি
মুষ্টিমেয় নারী-নর নিম্নস্তরে পাশবিকতার
মানুষের সত্তা ভুলে জীবনের খোঁজে সার্থকতা
স্বার্থপরতার চক্রে, ছায়াচ্ছন্ন রাত্রির পর্দায়
ইবলিসের অনুগামী চলে আজও বিচিত্র মুখোশে
নর রক্তপায়ী কিংবা রক্ত-লোভাতুর। তবু জানি
বিকৃতির এ অধ্যায় বিভ্রান্তির প্রতিচ্ছায়া শুধু।
বিকৃত 'সভ্যতা' আর মৃত্যুমুখী পঙ্কিল বৃষ্টি
ঘূর্ণাবর্তে তবু আমি নই হতাশ্বাস। এ বিকৃতি
অতিক্রম ক'রে যাব আমি। প্রাণস্পর্শ দেব আমি
প্রাণহীন জনপদে। নব কৃষ্টি, সভ্যতা নূতন ;
নূতন পৃথিবী আমি গড়ে যাব রাসুলের রাহে।

৩. মৃত্যু নাই আদর্শের। মৃত্যুহীন
শহীদের অনুসারী যে মুমিন, পায় সে প্রেরণা
মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদের প্রাণবন্ত সে আদর্শ থেকে

www.pathagar.com

চিরদিন। এজিদী খঞ্জরে তার শংকা নাই কোন।
ফেরাউনী অত্যাচারে সে দাঁড়ায় জালীমের সাথে
ভয়শূন্য নীল নদীতীরে। নমরুদের জিন্দানে সে
নির্ভীক সংগ্রামী সত্তা ইব্রাহিম খলিলের মত
চায় শুধু মদদ খোদার। তাই বিশ্ব মানুষের
নব সম্ভাবনা দেখি দুনিয়া জাহানে। দেখি আমি
খিলাফতে রাশেদার পূর্ণ সম্ভাবনা।

বলেছি : ফররুখ রোমান্টিক। এও বলেছি : তাঁর রোমান্টিকতা ব্যক্তিকতার চেয়ে সামাজিক ভূমি থেকে উৎসারিত। এখন যোগ করবো : ফররুখ ধ্রুপদী। ধ্রুপদী – শুধু রূপকল্পের দিক থেকে নয়, বিষয়ের দিক থেকেও। মানব ও শয়তানের দ্বন্দ্ব কোনো তাৎক্ষণিক ব্যাপার নয়, চিরকাল সব মানুষের জীবনেই তা অভিনীত হচ্ছে। সে-অভিনয় বুঝতে হয় রক্ত দিয়ে। জানতে হয় : শয়তান কোনো বহির্লোকবাসী জীব নয়, সে আছে আমাদেরই ভিতরে, আমাদের অদম্য নফ্‌স্‌-এর বেপরোয়া চরিতার্থতার মধ্যে। নফ্‌স্‌এর উচ্ছেদে নয়, শাসনেই মনুষ্যত্ব। তার বলেই সে মানুষ, 'সকল দিগন্ত জুড়ে যে পারে জ্বালাতে ['নয়া জিন্দেগী' কাব্যনাট্যে 'জাগাতে']/ সকল ঘুমন্ত সূর্য।' তার ফলেই 'ঘুমের অরণ্য জ্বলে চেতনার স্বর্ণাভ আগুনে।' ('নয়া জিন্দেগী') লক্ষণীয় : নাটকটি শুরু হয়েছে 'গভীর রাত্রিতে ; আর শেষ হয়েছে 'ভোরের আজানে'র আওয়াজে। এই রাত্রি থেকে ভোর হওয়া শয়তানের বিরুদ্ধে মানুষের জয় ঘোষণাই করছে। আর কবি তো নিজেই বনি আদমের মুখে এই বাক্যটি বসিয়েছেন : 'প্রভাতের/দুয়ারে সঞ্চিত যত হোক না সে কুহেলি নিবিড়/দীর্ণ করে তবু তাকে শক্তিমান ভোরের শিকারী/আফতাব'।

তিন

কাব্যকলার নানারকম রূপবন্ধে সফর করেছেন ফররুখ। কবিতায় নাট্যমুহূর্ত সঞ্চারের দিকে তাঁর সব সময় নজর ও প্রবণতা ছিলো। এই নাট্যমুহূর্ত সৃজনে স্বভাব-দক্ষতা ছিলো বাঙালি কবিদের মধ্যে ফররুখেরই প্রিয়তম কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভিতরে। যাকে বলে কাব্যনাট্য, মাইকেল তা ঠিক লেখেননি। কিন্তু "বীরাঙ্গনা" কাব্যের মনোনাট্যসমূহ এবং অন্য-সমস্ত কবিতাসৃষ্টিতেই মাইকেলের নাট্য-স্বভাব স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ – উল্টোভাবে – কাব্যনাট্য লিখলেও মূলত লিরিকস্বভাবী : তাঁর অনেক কাব্যনাট্যের মধ্যে "বিসর্জন"-এর মতো দুএকটি কাব্যনাট্যেই নাট্যসঙ্ঘাত ফুটেছে : "ডাকঘর" (একে আমি কাব্যনাট্য

www.pathagar.com

হিশেবেই বিবেচনা করি)–এর সাফল্য থিমের অনবদ্য মর্মস্পর্শিতার সাফল্য। বুদ্ধদেব বসুও লিরিকস্বভাবী, অন্তর্জীবনে কয়েকটি কাব্যনাট্য লিখলেও তা তাঁর স্বক্ষেত্র নয় ব'লেই মনে হয়, "তপস্বী ও তরঙ্গিনী"তে তাঁর সাফল্য বিষয়ের ঐশ্বর্যের সাফল্য। অন্যপক্ষে, বাঙালি কবিদের মধ্যে মাইকেল, সুধীন্দ্রনাথ, অংশত–নজরুল, মোহিতলাল, শাহাদাৎ, ফররুখ নাট্যস্বভাবী। ফলত তিনটিমাত্র কাব্যনাট্য লিখলেও ফররুখ অসংখ্য কবিতায় সংলাপের ধরন ও অন্যান্য নাট্যকুশলতার প্রয়োগ করেছেন।

এদিকে, 'নয়া জিন্দেগী' তথা 'ইবলিস ও বনি আদম' কাব্যনাট্যে উর্দু–ও–ফারসি ভাষার কবি মুহম্মদ ইকবালের একটি প্রেরণা কাজ করেছে মনে হয়। স্মরণীয়, ফররুখ–কাব্যে সর্বাধিক প্রভাবসঞ্চারী ভূমিকা ছিলো কবি ইকবালের। ফররুখ তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থই "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪) ইকবালকে উৎসর্গ করেন একটি সনেট লিখে, ঐ সনেটের আগে এক–টুকরো গদ্যবাক্য ছিলো এরকম : 'বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ তামদ্দুনিক রূপকার,/দার্শনিক মহাকবি, আল্লামা ইকবালের/ অমর স্মৃতির উদ্দেশে—'। ফররুখ ইকবালের অনেক কবিতার তরজমা করেন, তাঁর স্বল্প প্রবন্ধাবলির একটি ইকবাল–সম্পর্কিত। তাঁর নিজস্ব কোনো–কোনো কবিতাতেও ইকবালকে তিনি শোষণ ক'রে নিয়েছেন। 'নয়া জিন্দেগী' তথা 'ইবলিস ও বনি আদম' কাবানাট্যের অব্যবহিত প্রেরণা ইকবাল ব'লেই মনে হয়। 'নয়া জিন্দেগী' লেখা হয়েছিলো ১৯৫২ সালে। ঐ ১৯৫২ সালেই প্রকাশিত হয়েছিলো সৈয়দ আলী আহসান–সম্পাদিত "ইকবালের কবিতা" — যার মধ্যে ফররুখ–অনূদিত ইকবালের বারোটি কবিতা স্থান পায়। এই বারোটি কবিতার অন্তত দুটি — 'আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন' এবং 'জিব্রাইল ও শয়তান' — ফররুখকে প্রাথমিকভাবে প্রণোদিত করেছিলো। প্রথম কবিতাটি মানববন্দনা, দ্বিতীয় কবিতাটি কাব্যনাট্যের ধাঁচে অর্থাৎ কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা। ফররুখ এই দুটি কবিতার সারাৎসার নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন ; নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তাঁর নিজের জগতে। 'আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন' কবিতার পঞ্চম ও শেষ স্তবকটি এরকম :

রোজ–ই–আজল থেকে প্রতি বীণাতন্ত্রী তব অহর্নিশি ক্রন্দনমুখর,
রোজ–ই–আজল থেকে প্রেমের বিপণী মাঝে তুমি এক এনেছো খবর,
রোজ–ই–আজল থেকে ধ্যানী তুমি খুঁজিয়াছ চিরদিন রহস্যের ঘর।
শ্রমশীল।
রক্তক্ষয়ী।
শান্তিকামী।

www.pathagar.com

উষালোক হ'তে অস্তিত্বের

দেখ চেয়ে, — বল আজ কোন্ অন্তহীন পথে

নিয়ে যাবে অফুরন্ত ভাগ্য এ বিশ্বের।

ইকবালের 'জিব্রাইল ও শয়তান' কবিতায় শয়তানকে মহিমান্বিত করা হয়েছে — কবিতার শেষ স্তবকে জিবরাইলের কাছে শয়তানের প্রশ্নটি লক্ষণীয় :

তবু তুমি এই প্রশ্ন শুধায়ো আল্লার কাছে পাবে তাঁর যখন দিদার,

মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বল হয়েছে আজ অফুরান প্রাণরক্তে কার?

ফররুখ একে গ্রহণ করেননি, তিনি সর্বাংশে মানুষের সপক্ষে। 'ইবলিস ও বনি আদম' কাব্যনাট্যের কেন্দ্রীয় উক্তি ('নয়া জিন্দেগী' থেকে এই লাইনগুলি ঈষৎ-পরিবর্তিত) উৎকলন করলেই তা স্পষ্ট হবে :

যে পৃথিবী কাঁদে আজ কারুণের লুব্ধ বেষ্টনীতে,

যে সমাজ বিকলাঙ্গ শাদ্দাদের চক্রান্তে, — যেখানে

নমরুদের ব্যভিচারে শ্বাসরুদ্ধ হয় প্রতিক্ষণে

জাগে দর্পী ফেরাউন ক্ষমতা-লোলুপ অন্ধকারে ;

সেখানে, বিভ্রান্ত সেই মানুষের পৃথিবীতে আজ

আমি চলি জালিমের মৃত্যু-বার্তা নিয়ে। সে মাটিতে,

সব শৃংখলিত মাঠে করি মুক্ত আলোক-সম্পাত,

ব্যক্তি আর সমাজের পূর্ণতার বাণী ব'য়ে চলি

নবীর উম্মত আমি ; . . . ইনসানের উত্তরাধিকারে।

আমি চলি ইনসানের শেষহীন সম্ভাবনা নিয়ে।

তোমার সুতিক্ত দ্বন্দ্ব তীব্রতম হোক, তবু জেনো

এখানে মাটির বুকে সর্বশেষ জয় মানুষেরি।

ফররুখের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্য "নৌফেল ও হাতেম"এর সর্বশেষ উচ্চারণেও মানুষের জয়ধ্বনিই বেজেছে :

কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়, — শুধু সে মানুষ

নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী — পারে যে জাগাতে

সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ, — ঘুমঘোরে যখন বেহুঁশ

www.pathagar.com

জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে ;
যার সাথে শুরু হয় পথ চলা জাগ্রত যাত্রীর
দিল সে ইশারা আজ আত্মত্যাগ হাতেম তা'য়ীর।

কোনো রূপবন্ধ পুরোনো হ'য়ে যায় না, অব্যবহার্য হয়ে যায় না। শিল্পীকে শুধু জানতে হয় তাকে-ফিরে-ফিরতি উদ্ধার করার জাদুমন্ত্র — নিবে-যাওয়া ছাইয়ের গাদা থেকে একফোঁটা আঙার খুঁজে অসীম প্রযত্নে তাকে পুনঃপ্রজ্বলিত করার মতো। কোনো সত্য পুরোনো ও অব্যবহার্য হ'য়ে যায় না। শিল্পীকে শুধু জানতে হয় তার পুনরুদ্ধারের উপায়। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অবিশ্রাম চলেছে নফ্‌স্‌এর টান আর নফ্‌স্‌-উর্ধ্ব মনুষ্যত্বের টান — শয়তান ও ফেরেশতার দোলাচল। কিন্তু তাই ব'লে নফ্‌স্‌ শয়তান নয়, নফ্‌স্‌ অবিচ্ছেদ্য ও প্রয়োজনীয়। শয়তান শুধু নফ্‌স্‌কে ওয়াস্‌ওয়াসা দিয়ে অগ্নিকুণ্ড জ্বালে। তবে, শেষ-পর্যন্ত, শয়তান তো পরাজিত হয়ই, তা নাহ'লে মানবজাতি এখনো প্রবহমান থাকছে কি ক'রে? — কিন্তু এ কোনো প'ড়ে-পাওয়া সত্য নয়, এ অর্জনযোগ্য উপলব্ধিযোগ্য সত্য, প্রত্যেকের জীবন দিয়েই একে রোজগার করতে হয়। আস্তিত্বিক বিরামহীন দ্বন্দ্বমুখর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে রওনা হ'য়ে গিয়ে এই সত্য রক্তের ভিতরে অনুভূত হয় একদিন : 'এখানে মাটির বুকে সর্বশেষ জয় মানুষেরি।' আর এই সত্যোচ্চারণের সাহসে-দীপ্তিতে, ফররুখের তিনটি কাব্যনাট্যের মধ্যে 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি'কে মনে হয় অতিরোমান্টিক ; "নৌফেল ও হাতেম"কে মনে হয় ঈষৎ-শিথিল ; 'ইবলিস ও বনি আদম'কে (কেন্দ্রীয় ফররুখচারিত্র উদ্বোধনে, বাচনের ফররুখীয় সমুদ্র-নিস্বনিত বলিষ্ঠতায়, দৃঢ়বদ্ধতায়, মানবজীবনের শাশ্বত দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বোত্তরণে, ধ্রুপদ-ধরনে), আমাদের বিবেচনায়, 'শ্রেষ্ঠ' শিরোপা দিতে চাই।।

www.pathagar.com

কবি কি বহিঃপৃথিবীর, বা বস্তুপৃথিবীর বাসিন্দা? শারীরিকভাবে তো তাই-ই, একটি বিশেষ দেশ বা সময়খণ্ডে কবি বাস করেন, সেই বিশেষ দেশ ও সময়ের হাওয়া তাঁর রচনায় অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু একই সঙ্গে কবি দেশোত্তর ও সময়োত্তর। সেই দেশোত্তর দেশ ও সময়োত্তর সময় একান্তভাবেই কবির মনোপৃথিবীর, যেটুকু বস্তুদেশ ও বস্তুসময় কবির মনোপৃথিবীতে জায়গা ক'রে নেয়, তা-ও তাঁরই বিশিষ্ট মনের প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও ধাতুজগতের এক স্বতন্ত্র পৃথিবী।

"সাত সাগরের মাঝি" ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়, এর কবিতাগুলি লেখা ১৯৪৩-৪৪ সালে ; ফররুখ আহ্‌মদের বয়স তখন চব্বিশ-পঁচিশ। পৃথিবীতে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘনঘোর সচল তমসা, বাংলাদেশে তখন দুর্ভিক্ষ। ফররুখ আহমদের মনোপৃথিবী তখন কোথায়? তিনি লিখলেন 'লাশ' ও 'আউলাদ'-এর মতো কবিতা, এবং অগ্রন্থিত আরো কিছু কবিতা, যা সরাসরি দুর্ভিক্ষের নীল কষ্ট আর লাল রাগ থেকে বেরিয়ে এসেছে। ফররুখ আহমদের সমসাময়িক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য 'লাশ' কবিতাটি তখনই তাঁর সম্পাদিত মন্বন্তর বিষয়ক কবিতা সংকলন "আকাল"-এ গ্রহণ ক'রে ফররুখকে সম্মানিত করলেন। কিন্তু মূল ফররুখ আহমদ তখন কোথায়? এক সমুদ্রযাত্রী নাবিকের মতো বেরিয়ে পড়েছেন তিনি কলকাতার মানুষী জঙ্গল থেকে। লিখছেন 'সিন্দবাদ', 'বা'র দরিয়ায়', 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি', 'বন্দরে সন্ধ্যা', 'পাঞ্জেরী', 'সাত সাগরের মাঝি' এবং আর একগুচ্ছ কবিতা, যা সমুদ্র-প্রাসঙ্গিক।

হ্যাঁ, 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' একটি কবিতা-পর্যায়েরই স্তম্ভের মতো, যার মধ্যে কবির অনেকগুলি বিশিষ্টতা গুচ্ছীকৃত হয়েছে। একটি বিশেষ সময়ের ও মনের ফসল এই কবিতাটি। উত্তরকালে ফররুখ চ'লে এসেছিলেন অন্য জগতে, তখন আর এ ধরনের কবিতা তাঁর হাত থেকে আমার আশা করতে পারি না। একটি প্রাসাদের বহির্মহল থেকে অন্দরমহলে যাবার মতো ক'রে আমরা এই কবিতার বহিঃকারুকাজ থেকে ক্রমশ এর হৃদয়ে প্রবেশ করতে চাই।

এক : ছন্দ। মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা এই কবিতাটি। অমিত্রাক্ষর যদি হয় ছন্দোজগতে প্রথম বিপ্লব, তাহ'লে মুক্তক ছন্দকে বলতে হয় দ্বিতীয় বিপ্লব। অমিত্রাক্ষর ও মুক্তক কোনো ছন্দ নয়, এক-একটি ছন্দের বিশিষ্ট কুশলতা। "মেঘনাদবধ কাব্য" প্রথম বিপ্লবের বাহন, দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যম রবীন্দ্রনাথের "বলাকা" কবিতাগ্রন্থ ও নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি। মুক্তক অক্ষরবৃত্তে লেখা "বলাকা"-র প্রধান কবিতাগুচ্ছ, আর মুক্তক

www.pathagar.com

মাত্রাবৃত্তে লেখা 'বিদ্রোহী'। সেই হিশেবে 'বিদ্রোহী'র প্রকাশসাল ১৯২২ মুক্তক মাত্রাবৃত্তেরই জন্মমুহূর্ত। আধুনিককালে মুক্তক অক্ষরবৃত্তের বহুব্যাপ্ত পরিচর্চার মধ্যে দু-একটি চাবি-কবিতা মুক্তক মাত্রাবৃত্তেও লেখা হয়েছে। এই মুহূর্তে আমার কয়েকটি কবিতার কথা মনে পড়ছে : বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' (রচনাকাল : ১৯২৯), বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার' (রচনাকাল : ১৯৩৫), প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সুদূরের আহবান' (রচনাকাল : বিশের দশক) প্রভৃতি। একথাও এখানে মনে করা যেতে পারে, এসব কবিতার আধার-গ্রন্থগুলিতে — বুদ্ধদের বসুর "কঙ্কাবতী", বিষ্ণু দে-র "চোরাবালি", প্রেমেন্দ্র মিত্রের "প্রথমা"-য় মুক্তক মাত্রাবৃত্তের ব্যাপক ব্যবহার ঘটেছিলো। সাধারণভাবে বলা যায়, বিশের দশকেই মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিশদ পরিচর্চা হয়েছিলো — এবং এর পিছনে যে নজরুলের উদ্বোধনা কাজ করেছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জীবনানন্দ দাশের ভিতরসন্ধানী আলো এসে পড়েছিলো ছন্দেরও গভীর মর্ম-পৃথিবীতে। সেজন্যেই মুক্তক মাত্রাবৃত্ত সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, 'মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের উদাহরণ বাংলা কবিতায় বেশি নেই — এ যুগের অবাধ উচ্ছৃংখলতা দমন করার জন্যে সর্বব্যাপী নিপীড়নের যে পরিচয় পাওয়া যায় রাষ্ট্রে ও সমাজে সেইটে কাব্যের ছন্দালোকে নিঃসংশয়রূপে প্রতিফলিত হলে মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের জন্ম হয় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। যদি হয় এবং কবিতার ছন্দ যদি যুগের নাড়ী-মূলের নির্দেশ দান করে, তাহলে এরকম মুক্তকে প্রচুর কবিতা আশা করা যায়। কিন্তু কোথায় তা?'

জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরের জেনারেশনের কবি ফররুখ মুক্তক মাত্রাবৃত্তে একসময় প্রচুর কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক চল্লিশের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুক্তক মাত্রাবৃত্ত-প্রধান "কঙ্কাবতী", "চোরাবালি", "প্রথমা", "অমাবস্যা"-র সঙ্গে উত্তরকালের মুক্তক মাত্রাবৃত্ত-প্রধান "সাত সাগরের মাঝি"-র উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী। 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' কবিতায় মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ব্যবহারের অন্য দু'টো দিক লক্ষণীয় : প্রথমত, দীর্ঘ বা ছোটো কাব্যনাট্যে মুক্তক মাত্রাবৃত্ত খুব কম প্রযুক্ত হয়েছে বাংলা কবিতায়, হয়তো ছোটো নাটকেই মুক্তক মাত্রাবৃত্ত বেশি সফল — দীর্ঘ নাটকে একঘেয়ে লাগতে পারে ; আর দ্বিতীয়ত, জীবনানন্দ-কথিত 'যুগের অবাধ উচ্ছৃংখলতা দমন করবার জন্যে' মুক্তক মাত্রাবৃত্তের-যে ব্যবহার, ফররুখের 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' কবিতাতেও ভিতর থেকে তা সত্যি।

দুই : শব্দ, উপমা, ইমেজ। আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে ফররুখ আহমদের বিখ্যাত কুশলতা এই কবিতাতেও পরিপূর্ণ উপস্থিত। আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের যে-ঐতিহ্য সূচিত হয়েছিলো সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলালের হাতে, যাকে নজরুল একটি

www.pathagar.com

অসামান্য ঐশ্বর্যে ভ'রে দিয়েছিলেন এবং একটি ঐতিহ্যচেতনায় যুক্ত করেছিলেন, ফররুখ তাকে সম্প্রসারিত করেছেন আরো। ফররুখের আরবি-ফারসি শব্দের ভাঁড়ার নজরুলের কাছে বহুলাংশে ঋণী, কিন্তু তাঁর পরেও তিনি নতুন , অনুচ্ছিষ্ট ; কিন্তু তাঁর কাব্যাবহে সুপ্রযুক্ত শব্দাবলি সংযোজন করেছেন : এই কবিতা থেকেই চয়ন করা চলে এরকম একগুচ্ছ শব্দ :

> সী-মোরগ (বিশাল পাখি, পুঁথিসাহিত্য ব্যবহৃত, সী-গালের অনুষঙ্গ জাগিয়েই দ্যায়) ; খিমা (তাঁবু) ; কাবাব-চিনি (এক জাতীয় মশলা) ; আলমাস (এক জাতীয় মূল্যবান পাথর) ; গওহর (এক জাতীয় মূল্যবান পাথর) ; খিজির (হযরত খিজির, ত্রিকালদর্শী মহা-পুরুষ, অন্য অর্থ : সবুজ ;) ; ওজুদ (শরীর) ; জওহর (এক প্রকার মূল্যবান পাথর) ; আলম (বিশ্ব-চরাচর) ; আকীক (এক জাতীয় পাথর) ; সন্দল (চন্দন) ।

এই শব্দগুচ্ছ নজরুল ব্যবহার করেননি, এর পরিবেশও এর নিজস্ব ; ফলে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার ক'রে ফররখ অ-নজরুলীয় এক নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সেই সঙ্গে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ইমেজের একটি ফররুখীয় বৃষ্টি সৃষ্টি হ'য়ে গেছে এই কবিতায় :

উৎপ্রেক্ষা:

১. বুঝি সী-মোরগ সাথীহারা তার দরিয়ায় শেষ রাতে
ঝড় বুকে পুরে বসেছিল মাস্তুলে।

২ যেন সুলেমান নবীর শিকলে বন্দী বিশাল জিন
ছাতি চাপড়ায়ে কেঁদেছিল কাল সারারাত — সারারাত,

৩. আল্লার এই অশেষ আলমে অফুরান রূপ, রস
জমে গাঢ় হয়ে দূর সফরের আশা যেন হীরাকষ।

উপমা :

১. কাফেলার বাঁশি বয়ে এনেছিল জহরের মত ব্যথা।

২ হালের মুঠির মত আমাদের কব্জা সিন্দবাদ।
দরিয়ার মত দারাজ সিনায় আজ নামে পেরেশানি,

www.pathagar.com

ইমেজ :

১. বুঝি সী-মোরগ সাথীহারা তার দরিয়ায় শেষ রাতে
ঝড় বুকে পুরে বসেছিল মাস্তুলে।

২ ডাকে বাগ্‌দাদী খেজুর শাখার শুক্লা রাতের চাঁদ
মাহগির বুঝি দজলার বুকে ফেলে জ্যোৎস্নার জাল

৩. কাল ঝোড়ো রাতে দাঁড়ের আঘাতে দামী জেওরের মত
হীরা জওহর ফুটেছিল বার দরিয়ার নীল ছাঁচে

৪. আহা ভুলে গেলে আকীকে গড়া এ দরিয়া নীল-মহল,
নামে জিল্‌কদ রাতের শাহ্‌জাদী তের তবকের চাঁদ।

৫. জাজিমের বুকে ছড়ানো পাথর-দানা।

আরো লক্ষণীয়, জীবনানন্দশোভন এলোমেলো অন্তমিলের বিন্যাস, ক্রিয়াপদের বিচিত্রতা সমস্ত ছবিটাকে সচল-উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে :

আমার বুকের সকল পর্দা উঠেছিল দুলে দুলে
এসেছিল এক সী-মোরগ তার চঞ্চুতে মাটি ব'য়ে
আমার আতশী রগের রক্ত গলেছিল আঁসু হয়ে —
দুলে উঠেছিল আবছা আলোয় দরিয়ার নোনা পানি
নাড়ী-ছেঁড়া ব্যথা মউজের মুখে জেগেছিল কাতরানি ;

[সাত সাগরের মাঝি]

তিন : পুনর্নির্মাণ ও প্রতীক। ফররুখ আহমদ প্রকৃত কবি ব'লেই তাঁর বক্তব্যকে সব সময় কবিতার জামা-কাপড় পরিয়েই উপস্থিত করেছেন। 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' এবং "সাত সাগরের মাঝি"-র অন্যান্য কবিতাও জাগরণেরই কবিতা, কিন্তু তা কখনোই নগ্ন ও Direct নয়, তাঁর নিজের ভাষাকে একটু বদলে বলতে পারি, তাঁর বিশ্বাসের নীল ছাঁচে তাঁর কবিতার এইসব হীরা-জওহর ফুটে উঠেছে। এ যুগের অনেক কবির মতো ফররুখেরও প্রধান একটি আশ্রয় — প্রাচীন গ্রন্থ। নজরুল ইসলামের একটি প্রধান নির্ভর ছিলো ইসলামিক পুরাণ। ফররুখ আশ্রয় করলেন বিশ্বসাহিত্যের একটি অত্যুল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, আরব্যোপন্যাস, ইসলামিক ঐতিহ্যের এক আলোকোজ্জ্বল আধার। (আরব্যোপন্যাস

www.pathagar.com

বা আরব্য রজনী, আরবি ভাষায় লেখা মধ্যযুগের এক মহান গ্রন্থ। দশম শতাব্দীর দিকে আরব্যোপন্যাসের কাহিনীগুচ্ছ মুখে-মুখে ফিরতো, আরো কাহিনী যুক্ত হ'য়ে ১৪৫০ সালের দিকে বর্তমান আকার পায় ; প্রাচ্য ধরনের একটি বিশাল Frame-Tale বা কাহিনীবৃত্তে। প্রথম ইয়োরোপীয় অনুবাদ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে।) সিন্দাবাদ নাবিকের কাহিনী আরব্যোপন্যাসের পরিচিততম কাহিনীর একটি। ফররুখ আহমদের নায়ক হ'য়ে উঠলো এক সমুদ্রের দুঃসাহসী অভিযাত্রী, সিন্দাবাদ — যার মহিমা পৌরাণিক নায়কেরই তুল্য। ফররুখ আহমদ একালের কবি-শিল্পী, সিন্দাবাদকে অবিকল ব্যবহার করলেন না তিনি, ভ'রে দিলেন তার ভিতরে নিজের আশা, সিন্দাবাদের কাহিনীকে পুনর্নির্মাণ ক'রে নিলেন নিজের অর্থে ও তাৎপর্যে। পথ-সন্ধানী এ যুগের মুসলমানের নেতা হ'য়ে উঠলো তাঁর কবিতার সিন্দাবাদ। আবার তাঁর এক-একটি কবিতা, 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' একটি নির্নিমেষ প্রতীকে শিখায়িত। সমুদ্র, সিন্দাবাদ, মাল্লারা, জাহাজ, বাগদাদ - সবই সেই কেন্দ্রপ্রতীকে স্থির।

চার : কবিতা-নাট্য। কবিতার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে ফররুখ চিরকালই দুঃসাহসী, অভিযাত্রিক, ক্রমাগত নতুন-নতুন দেশ সফর করেছেন। পরবর্তীকালে যিনি পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্য লিখবেন, 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' তাঁর উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা। তাঁর অগ্রজ কবি জসীমউদ্‌দীন তাঁর কবিতায় নাট্যগুণ লক্ষ্য করেছিলেন ; সম্ভবত সত্যের আরো কাছাকাছি পৌঁছোনো যায় ফররুখের কবিতায় লিরিক ও নাট্যের সমীভবনের শনাক্তিকরণে। তাঁর প্রিয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো কিংবা অগ্রজ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো তাঁরও লক্ষ্য শব্দ ও কাব্যের ধ্বনিময়তা। নাট্যগুণ, আবৃত্তিযোগ্যতা তাঁরও অন্বিষ্ট। কিন্তু ঐ দুই কবির মতো তিনিও মর্মে-মর্মে রোমান্টিক। তাঁর নাটকীয়তার ভিতরে-ভিতরে তাই গাঁথা হ'য়ে যায় উধাও কল্পনা, অবাধ কল্পনা। তাই ফররুখের কবিতার শুধুমাত্র ন্যাট্যগুণের দিকে তাকালে তাঁর কাব্যগুণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যে-ক'টি কবিতায় ফররুখ এই দুই আপাতপ্রতীপ গুণকে মিলিয়েছেন, 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' তার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

পাঁচ : দূরযাত্রিকতা। তিরিশের কবিতায় যে-দূরযাত্রিকতা সূচিত হয়েছিলো প্রেমেন্দ্র মিত্র-জীবনানন্দের কবিতায়, যে-আরব্য-পারস্য সন্দীপন শুরু হয়েছিলো নজরুল-মোহিতলালের কবিতায়, চল্লিশের কবিতায় ফররুখ তার শ্রেষ্ঠ ধারক। 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' কবিতায় আশ্চর্য সামুদ্রিক পরিবেশ সৃষ্ট হ'য়ে এক বিদেশি স্বায়দ্যায়।

সব-মিলিয়ে 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' ফররুখের একটি প্রতিভূ-কবিতা, যার মধ্যে তাঁর অনেকগুলি বিশিষ্টতা পুষ্পিত হ'য়ে উঠেছে।।

www.pathagar.com

তিরিশ বছর আগে সাহিত্যের ক্লাসে কথাশিল্পী শওকত ওসমান আমাদের শিখিয়েছিলেন, 'রোমান্টিকতা' মানে 'চৈতন্যের উচ্ছলতা'। জীবনযাপনের ধারাবাহিকতা এম্নিতে মসৃণ গড়িয়ে চলে, তারই মধ্যে প্রকৃতি কি মানুষের কোনো সংস্পর্শে-সংঘাতে চেতনা সহসা উছলে ওঠে, পাত্র ভ'রে উপচে পড়ে, প্রাত্যহিকতায় তখন নতুন রঙ লাগে, নতুন রেখার জন্ম হয়। আমরা রোমান্টিক হ'য়ে উঠি। দিন তখন হয়তো একটি উজ্জ্বল উড়ন্ত আঁচলে রূপান্তরিত হয়, রাত্রি তখন হয়তো ময়ূরীতে পরিবর্তিত হ'য়ে যায়, একটি মানবীর মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে অপরূপ আনন্দ-বেদনা। 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ/চুনি উঠলো রাঙা হয়ে' — রবীন্দ্রনাথের এই উচ্চারণে ভর করেছে রোমান্টিকতার সারাৎসার। আসলে তো প্রকৃতিতে কিছু নেই, মানুষে কিছু নেই যতোক্ষণ-না তারা আমার চেতনার রঙে দীপ্যমান হ'য়ে উঠলো।

সময়-সময় যে-কোনো মানব-মানবীর চৈতন্য উচ্ছল হ'য়ে ওঠে। কবি তথা শিল্পী যিনি, তাঁর চৈতন্য তো ক্ষণে-ক্ষণে দেদীপ্য হ'য়ে উঠবে – তা নাহ'লে তিনি কবি বা শিল্পী কেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এখানে যে, তিনি সেই উচ্ছলতাকে শব্দে-ছন্দে, উপমায়-চিত্রকল্পে, পুরাণে-প্রতীকে ধারণ করতে চান। তাঁর ব্যক্তিগত চেতনার উচ্ছলতা শেষ-পর্যন্ত পরিণত হয় একটি কবিতায়। আসলে তো কবি মাত্রেই রোমান্টিক। বাস্তববাদী কবি কথাটি সোনার পাথরবাটি। 'কবি' অভিধাটি যার প্রাপ্য হ'লো, দেখা যাবে বাস্তবকে তিনি রং লাগাচ্ছেনই লাগাচ্ছেন – সে শব্দের রং হোক, ছন্দের রং হোক, উপমার রং হোক, প্রতীকের রং হোক, যে-কোনো রং হোক। কিন্তু কবি তো মানুষ, শুধু রোমান্টিকতা নিয়ে তো মানুষের চলে না, কবিকেও বাস্তব জীবন যাপন করতে হয়, ফলে তাঁর রোমান্টিকতার সঙ্গে-সঙ্গে আরেকটি জিনিশ তাঁর মধ্যে কাজ করে, সে হ'লো মনন, সে হ'লো চিন্তা। এই চিন্তা বা মননই তাঁকে নিয়ে যায় একটি বিশ্বাসে – যে-কোনো বিশ্বাসে অর্থাৎ আদর্শে। কবি ক্রমশ একটি আদর্শে স্থিত হন। কেবল বর্ণলেপ ক'রে কবির চলে না, একটি বক্তব্য তাঁর থাকে, অনেক সময় বর্ণ ও বক্তব্য মিলেমিশে যায়।

ফররুখ আহমদের মধ্যে এই রোমান্টিকতা ও আদর্শবাদের যে-সংঘর্ষ-সমন্বয় হয়েছে, তা খুব স্পষ্টতই চোখে পড়ে। ফররুখ তাঁর কাব্যযাত্রা শুরু করেছেন এক রোমান্টিক হিশেবে, আর শেষ করেছেন এক আদর্শবাদী রূপে। ফররুখ কাব্যযাত্রা শুরু করেছেন মোটামুটি মধ্য তিরিশের দশকে – ১৯৩৫ নাগাদ। প্রথম থেকেই তাঁর নিজস্বতা ছিলো, অগ্রজ কবিদের তিনি শোষণ ক'রে নিয়েছিলেন — মোহিতলাল-নজরুল-জীবনানন্দ-প্রেমেন্দ্র মিত্র-বিষ্ণু দে-অজিত দত্তের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি কোথাও নেই, কিন্তু

www.pathagar.com

দূররণন ঝংকৃত হয়েছে। তাঁর সমসাময়িক লেখক, কথাশিল্পী আবু রুশদের একটি অসামান্য সমালোচনাত্মক উক্তি মনে হয় সে-সময়ে তাঁকে একটি দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলো : 'ফররুখ আহমদের যা সবচেয়ে বেশি জানা দরকার তা এই যে, বলিষ্ঠ রোমান্টিসিজম বাস্তবিকই নিন্দার কিছু নয়' ('আধুনিক কবিতা ও মুসলিম কবিগণ' : আবু রুশদ, 'সওগাত' , ভাদ্র ১৩৪৮)। এই উক্তির পরে ১৯৪৩-৪৪ সালে লিখিত ফররুখের যে-কবিতাগুচ্ছ "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪) কাব্যে সংকলিত হ'লো, তাতে দেখা দিলো অকুণ্ঠ অরুগ্ন 'বলিষ্ঠ রোমান্টিসিজম'। এমনকি পূর্বজ জীবনানন্দ বা বুদ্ধদেবের রোমান্টিকতায় কখনো কেউ 'মর্বিডিটি' খুঁজে পেতে পারেন, কিন্তু ফররুখ সদাসর্বদা বলিষ্ঠ রোমান্টিক। "সাত সাগরের মাঝি" ফররুখের রোমান্টিকতার চূড়া – উত্তরকালে ফররুখ আর অমন রোমান্টিক থাকেননি, তাঁর রোমান্টিকতায় ক্রমাগত মিশেছে আদর্শিকতা। আদর্শিকতা তাঁর কবিতাকে একই সঙ্গে সমৃদ্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

"সাত সাগরের মাঝি"র উনিশটি কবিতার অধিকাংশে এক সমুদ্রচারিতা দ্রষ্টব্য। সমুদ্রচারিতা ফররুখের অব্যবহিত আগে জীবনানন্দ দাশ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে দেখা গিয়েছিলো। "সাত সাগরের মাঝি" কাব্যগ্রন্থ প্রকাশেরও আগে ফররুখের প্রথম কাব্যসমালোচক আবু রুশদ (পূর্বোক্ত) ফররুখের উপর প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র ও জীবনানন্দের সমুদ্রচারিতায় যে-নিছক রোমান্টিক প্রস্থান ছিলো – ফররুখ তাতে সঞ্চার করেন নতুন অর্থ, অন্তরাখ্যান ও গতিবেগ। এলিয়ট ও ইয়েটস তাঁর পড়া ছিলো। তিনি চাচ্ছিলেন পুরাণের পুনর্জন্ম। বাঙালি-মুসলমানের অস্পষ্ট পুরাণকে তিনি আরব্যোপন্যাসের দ্বারা পূর্ণ করতে চাচ্ছিলেন। প্রথম আধুনিক বাংলা কাব্য "মেঘনাদবধ কাব্যে"র (১৮৬১) নায়ক হিশেবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন রামায়ণের রাবণকে ; নজরুল ইসলামের কাব্যনায়ক যদি কাউকে বলতে হয়, সে শিব ; আর ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্যনায়ক হিশেবে তুলে আনলেন আরব্যোপন্যাসের সিন্দাবাদকে। "সাত সাগরের মাঝি"র উনিশটি কবিতার অধিকাংশে (এবং ঐ গ্রন্থবহির্ভূত আরো কোনো-কোনো কবিতায়) এক অচেনা আবহের মধ্যে বলিষ্ঠ রোমান্টিকতার মধ্যে ফররুখ আহমদ বাঙালি-মুসলমানের জন্যে অমেয়-অম্লেয় আশাবাদ সঞ্চার ক'রে ফিরেছেন।

সেই জগৎকে স্পর্শ ক'রেও 'বন্দরে সন্ধ্যা' একটুখানি স্বাতন্ত্র্য রচনা করেছে। এখানে সম্ভবত জাতিগত উত্থানের কোনো উদ্দেশ্য কবির নেই – নিছকই একটি সন্ধ্যার বর্ণিল বর্ণনা। না, একেবারেই বর্ণনামাত্রে নিঃশেষিত নয়। তাহ'লে কবি কবিতা লিখবেন কেন? এর মধ্যে ফররুখের বলিষ্ঠ রোমান্টিকতা যেমন, তেম্নি তাঁর অবচেতন মুক্তি পেয়েছে। ফররুখ ঠিক চিত্রকল্পের কবি নন – কিন্তু এই কবিতায় কয়েকটি অসামান্য চিত্রকল্প

www.pathagar.com

যোজিত ; আর সমস্ত বিচ্ছিন্ন চিত্রকল্পগুলি একটি প্রতীকে উন্নীত হ'তে চাচ্ছে। প্রথম দুই পঙক্তিতে একটি অনুপম চিত্রকল্প : 'গোধূলি-তরল সেই হরিণের তনিমা পাটল/অস্থির বিদ্যুৎ, তার বাঁকা শিঙে ভেসে এল চাঁদ'। এই চিত্রকল্পটির উৎস সম্ভবত ফারসি কবি আমীর খসরুর "লাইলী মজনু" কাব্যের এই কয়েকটি লাইন : 'ন্যুজদেহ খর্জুরশীর্ষের ওই ক্ষীণ চাঁদ/ যেন বা আসন্ন রাত্রি হরিণীর বেশে দাঁড়াতেই তার/ সোনালী উজ্জ্বল শিঙে বিদ্ধ হল/ কয়েসের হৃৎপিণ্ডখানি' ("অমর্ত্য প্রেমকথা", ১৯৮৭ : সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ)। চতুর্থ পঙক্তির চিত্রকল্পটি 'অন্ধকার ধনু হাতে তীর ছোঁড়ে রাত্রির নিষাদ' ফররুখ-কাব্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত চিত্রকল্প। পরবর্তীকালে বহুবার কবি এই চিত্রকল্পটি প্রয়োগ ক'রে গেছেন। 'বন্দরে সন্ধ্যা'র আসন্নতার সঙ্গে ষোড়শীর জীবনে এক আগন্তুকের আবির্ভাব বর্ণিত। দ্বি-স্তর এই কবিতাটি ফররুখের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সনেট। ফররুখ সারাজীবন প্রচুর সনেট লিখেছেন। পেত্রার্কীয় সনেটেই তাঁর স্বভাবী প্রবণতা ছিলো — শেক্সপীয়রীয় সনেটে ঠিক নয়। "মুহূর্তের কবিতা" নামে তাঁর সনেট-গ্রন্থে ফররুখের উত্তরকালের একগুচ্ছ সনেট একত্রিত করা হয়েছে — কিন্তু কল্পনার ঐশ্বর্য ততোদিনে তাঁর ঝ'রে গেছে অনেকখানি। এই সনেটকার কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সনেট এই 'বন্দরে সন্ধ্যা'।।

www.pathagar.com

"হাতেম তা'য়ী"

এক

১৯৪২ সালে কলকাতায় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮), হাবীবুল্লাহ বাহার (১৯০৬-৬৬), মুজীবুর রহমান খাঁ (১৯১০-৮৪), মোহাম্মদ মোদাব্বের (১৯০৮-৮৪), জহুর হোসেন চৌধুরী (১৯২২-৮০) প্রমুখের নেতৃত্বে গঠিত এই সোসাইটি ১৯৪৩ সালে কলকাতায় তিন দিন ব্যাপী এক সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেন :

> পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি আমাদের সাহিত্যে স্বস্থতা ও স্বকীয়তা ফিরিয়ে আনতে চায়। পুঁথি ও লোকসাহিত্যে পুরোপুরিভাবে প্রত্যাবর্তনে সেই স্বস্থতা ও স্বকীয়তা আসবে না। কারণ ওটা অতীতে প্রত্যাবর্তনের কথা — রেনেসাঁর কথা নয়। তবে পুঁথি ও লোকসাহিত্যের ভিত্তিতেই আমাদের সাহিত্যকে দাঁড় করাতে হবে নিশ্চয়ই। সে ভিত্তির উপর বর্তমানের ব্যর্থ কসরতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে আমাদের ভাবী সাহিত্যের সৌধ রচনা করতে হবে।[১]

পরে এঁদের সঙ্গে যোগ দেন আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯)। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় বৃহদাকারে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল সভাপতি ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। সাহিত্য, ভাষা, তমদ্দুন, অর্থনীতি, পুঁথিসাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা, লোকসাহিত্য, ইতিহাস, শিশুসাহিত্য ও সংগীত বিষয়ে বিভিন্ন অধিবেশন হয়। 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১ সংখ্যায় অভিভাষণগুলি মুদ্রিত হয়। পুঁথিসাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক আদমউদ্দীন আহমদ। পুঁথিসাহিত্য-শাখাকে গুরুত্ব দেওয়ায় রেনেসাঁ সোসাইটির একটি আভিমুখ্য বোঝা যাচ্ছে। সভাপতি আদমউদ্দীন আহমদ সেই তিনি, যাঁর পুঁথিসাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থকে ফররুখ আহমদ ৩১শে জুলাই ১৯৪৫এর এক পত্রে অভিনন্দিত করেছিলেন।[২] কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ হলে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে কবি ফররুখ আহমদও যোগ দিয়েছিলেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন, 'তরুণ কবি ফররুখ আহমদও ছিলেন আগের থেকেই সোসাইটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।'[৩] খুব সম্ভব ১৯৪৪ সালের রেনেসাঁ সোসাইটির এই অনুষ্ঠানমালার মধ্যেই ফররুখ তাঁর 'দল-বাঁধা-বুলবুলি' ও 'বিদায়' কবিতা দুটি পাঠ করেন ('মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার ১৩৫০-এর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত)। ('সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটিও কবি

www.pathagar.com

কলকাতায় কোনো-এক সম্মেলনে আবৃত্তি করেছিলেন।) মনে হয় আশরাফ সিদ্দিকী ও লুৎফর রহমান জুলফিকার দুজনে স্মৃতিচারকই তথ্য-তারিখে ভুল করেছেন — তাঁদের আবেগকে আমরা বরং গ্রহণ করতে পারি। একটি সাক্ষাৎকারে আশরাফ সিদ্দিকী জানিয়েছেন :

> . . . ১৯৪৬এ ইসলামিয়া কলেজের এক সম্মেলনে তিনি [ফররুখ] "সাত সাগরের মাঝি" কবিতাটি পড়েন। সভায় এমন একটি ভাবাবেগ সৃষ্টি হয় যা কোনদিন ভুলতে পারব না। প্রধান কবি কায়কোবাদ তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরেন, সম্ভবত ইব্রাহিম খাঁও।[৪]

লুৎফুর রহমান জুলফিকার লিখেছেন :

> ১৯৪০এ কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ হলে পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যে জাঁকজমকপূর্ণ শিল্পী-সাহিত্যিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, সে সম্মেলনে তখনকার তরুণ কবি ফররুখ আহমদ তাঁর স্বরচিত 'খোশ আমদেদ' নামে একটি সাড়া জাগানো সুদীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। স্বরচিত কবিতা পড়ে সেদিন তিনি সেকালের শিল্পী-সাহিত্যিক-সুধীসমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। . . . /কবিতা পাঠের সেই মঞ্চে তাঁর দীপ্ত প্রতিভা, চেহারা, কণ্ঠস্বরের পৌরুষ এবং শেরওয়ানী-পাজামা চুল ও চোখের বৈশিষ্ট্য সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। আবৃত্তি শেষ হলে প্রশংসামুখর ইসলামিয়া কলেজের হল-ঘরটি হাততালির শব্দে টালমাটাল হয়ে উঠেছিলো। কবিতা পাঠের পর তরুণ কবি সুধীশ্রোতৃমণ্ডলীর কাছ থেকে কবি যে আন্তরিক সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন, তা বোধহয় আমাদের পরম প্রিয় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জোটেনি।[৫]

ফররুখ যে এসব স্মৃতি কখনো ভুলতে পারেননি, তার সাক্ষ্য দেবে এর দুই দশক পরে প্রকাশিত তাঁর "মুহূর্তের কবিতা" (১৯৬৩) গ্রন্থের উৎসর্গ : 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির শ্রদ্ধেয় কর্মী ও সদস্যদের উদ্দেশ্যে (কয়েকটি আদর্শ-দীপ্ত দিনের স্মরণে)'। রেনেসাঁ সোসাইটির পুঁথিসাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের বিষয়টি — ঠিক চল্লিশের দশকে নয়, কিন্তু পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে — যে ফররুখের মাথার ভিতরে অবিশ্রাম কাজ ক'রে যাচ্ছিলো, তার প্রমাণ দেবে "মুহূর্তের কবিতা" গ্রন্থভূত কয়েকটি সনেট : 'বাংলা ভাষার প্রতি', 'চলতি ভাষার পুঁথি', 'শাহ্ গরীবুল্লাহ্', 'শাহ্ গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত পুঁথি প্রসঙ্গে', 'পুঁথির আসর', 'পুঁথি পড়া : মুহর্রাম মাসে' (১), 'পুঁথি পড়া : মুহর্রাম মাসে (২) ; 'শহীদে কারবালা', 'তাজকেরাতুল আউলিয়া', 'কাসাসুল আম্বিয়া', 'শাহনামা', 'আলিফ লায়লা', 'চাহার দরবেশ', 'হাতেম তা'য়ী' প্রভৃতি। ফররুখ আহমদের বিরল কয়েকটি

www.pathagar.com

প্রবন্ধের একটি 'তাজকেরাতুল আউলিয়া'।[৬] আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন-প্রণীত পুঁথিসাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম প্রকাশে তিনি-যে খুশি হয়েছিলেন তার সাক্ষ্য আছে আশরাফ সিদ্দিকীকে লেখা পত্রে (৩১-৭-৪৫) ; ঐ গ্রন্থের, "পুঁথি বা চলিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস"-এর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৬৯) ভূমিকায় অধ্যাপক আদমউদ্দীন লিখেছেন : 'এই গ্রন্থ প্রণয়নে কবি ফররুখ আহমদ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন,তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।' "হাতেম তায়ী" (১৯৬৬) গ্রন্থের উৎসর্গটিও এখানে স্মরণীয় : 'প্রাচীন পুঁথিরচয়িতাদের উদ্দেশ্যে — (বহু যুগের সাধনায় যাঁরা আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডার ঐতিহ্যবাহী চলতি ভাষার পুঁথিতে সমৃদ্ধ করেছেন')। পুঁথি-সাহিত্যের প্রতি তাঁর এই মুগ্ধতা আরো বহুভাবে প্রকাশিত।[৭]

ফররুখ আহমদ ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভক্ত।[৮] জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ফররুখ ২৩শে জুলাই ১৯৫২ সালে অনুজ কবি আবদুর রশীদ খানকে একটি পত্রে লিখেছেন :

> . . . আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও পুঁথিসাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আর্কষণ করছি। সুলতানা রিজিয়ার কাহিনী একদা মাইকেলের মত মহাকবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। এরকম অসংখ্য কাহিনী আছে যা আধুনিক কবিতার আংগিকে চমৎকারভাবে রসোত্তীর্ণ হতে পারে।[৯]

ফররুখ আহমদের প্রকাশক , এবং সাহিত্যপত্র 'তাহজীব', শিশুকিশোর পত্র 'সবুজ নিশান', সাপ্তাহিক 'খবর' প্রভৃতির (যে-সব পত্রিকায় ফররুখ প্রচুর লিখেছেন) সম্পাদক তৈয়েবুর রহমান (১৯২৫-৮৬) লিখেছেন :

> সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ব্যাপারে স্বকীয় সাহিত্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে [ফররুখ] বলতেন, 'হিন্দুরা তাদের সাহিত্যের সোর্স পেয়েছে 'রামায়ণ' , 'মহাভারত' থেকে। বাঙালী মুসলমানকেও সাহিত্যের উৎস খুঁজে নিতে হবে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে।' /নিজের প্রসঙ্গ টেনে একদিন বললেন, আমি অবশ্য হাতেম তায়ীকে কেন্দ্র করে লেখা শুরু করেছি। কখনো কখনো বলতেন, 'দেখুন, গ্রামে-গঞ্জে যে 'কাসাসুল আম্বিয়া' পড়া হয়, তাকে কেন্দ্র করেই অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে।'[১০]

রেনেসাঁ সোসাইটির উৎসাহে পুঁথির দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি ; মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রেরণায় পুরোনো কাহিনীর পুনর্জন্ম দানে আগ্রহী হয়েছিলেন ; নিজের মধ্যে ছিলো বাঙালি-মুসলমানের জাতীয়তাবাদী প্রণোদনা ; প্রথম জীবনে

www.pathagar.com

আরব্যোপন্যাসের কাহিনীর পুনর্ব্যবহার করেছিলেন — নবনবোন্মেষশালী ফররুখ এবার পুঁথিসাহিত্য থেকে কাহিনী আহরণ করলেন। আবার ষাটের দশকের প্রতিভাবানদের এই জাতীয়তাবাদী প্রেরণা-প্রচারণা একমাত্র তাঁর মধ্যেই ছিলো না — নাট্যকার মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১) মহাকবি কায়কোবাদের (১৮৫৭-১৯৫১) "মহাশ্মশান" (১৯০৫) মহাকাব্যটির একটি নাট্যরূপান্তর সাধন করেছিলেন "রক্তাক্ত প্রান্তর" (১৯৬২) নাটকে।

এখানে এ তথ্যও স্মরণীয় যে, কবি ফররুখ কেবল পুঁথির পুনর্রূপায়নেরই চেষ্টা করেননি — নিজেও একটি পুঁথি রচনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। "ছহি বড় রহমতে আলম বা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)র জীবনকথা"[১১] (১৯৬৫) নামক এই পুঁথির 'প্রকাশকের কথা'য় বলা হয় :

> পল্লী অঞ্চলের কোটি কোটি বাশিন্দাকে ইসলামের খাঁটি শিক্ষা ও ইতিহাসের সাথে পরিচয় করাইয়া দেওয়ার জন্যে ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা পুঁথির ভাষায় রসূল করীমের জীবনী ও ইসলামের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 'ছহি বড় রহমতে আলম' সেই পরিকল্পনার পহেলা পুঁথি। নির্ভরযোগ্য জীবনী-পুস্তকসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া পুঁথিটির একটি কাঠামো দাঁড় করানোর জন্য জনাব কাজী আবুল হোসেনের উপর ভার দেওয়া হয়। তিনি একাডেমীর নির্দেশ মুতাবিক যে কাঠামোটি দাঁড় করান, তাহা পরে একটি সম্পাদনা-বোর্ড নূতন করিয়া ঢালাই করিয়া নেন। এই বোর্ডের সদস্য ছিলেন কবি ফররুখ আহমদ, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, জনাব কবি তালিম হোসেন এবং পুঁথির প্রকাশক নিজে। তাঁহারা পুঁথিটির ঐতিহাসিক দিক, ইহার ভাষা, ছন্দ ও কাব্যগুণের দিকে লক্ষ্য করিয়া ইহাকে সর্বাংগসুন্দর করার জন্য যে সময় দিয়াছেন তাহার জন্য একাডেমী তাঁহাদের নিকট শুকরিয়া জানাইতেছে।

ফররুখ আহমদের পরিবারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিরাশিতে 'আখ্‌লাক' নামে একটি একসারসাইজ খাতা পাওয়া গেছে। দেখা যাচ্ছে : "ছহি বড় রহমতে আলম"-এর অন্তত এই অধ্যায়টি ফররুখেরই রচনা। কেননা, আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঐ 'আখলাক' অধ্যায়টি 'নবীজীর আখলাকের বয়ান' নামে গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

দুই

হাতেম তায়ী প্রাক-ইসলাম যুগের একটি ঐতিহাসিক চরিত্র।

> আরবের বিখ্যাত দানবীর, তাঈ গোত্রের সর্দার, উদারতা, মহানুভবতা, পরোপকার এবং দানশীলতার জন্য বিশ্ববিখ্যাত, এমনকি প্রবাদবাক্যে পরিণত।

www.pathagar.com

তাঁহার দানশীলতার বহু বিস্ময়কর কাহিনী জনশ্রুত। কবিসাহিত্যিকগণ তাঁহার জীবনালেখ্য অবলম্বন করিয়া অনেক কাহিনী রচনা করিয়াছেন। প্রাক-ইসলামিক যুগের যে সমস্ত সাধু লোকের স্মৃতি ইসলামী আমলে সম্মানিত, তন্মধ্যে হাতেম তাঈ অন্যতম। মহানবীর (স.) আবির্ভাবের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। 'তাঈ' গোত্রের যুদ্ধবন্দীদের সহিত হাতেম তাঈএর কন্যা এবং পুত্র এবং 'সাদী ইবনে হাতেম তাঈকেও মদীনায় উপস্থিত করা হয়। মহানবী (স.) পিতার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কন্যার মুক্তির আদেশ প্রদান করিলে তিনি আরজ করিলেন, 'ইহা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে যে, আমি আযাদীর আনন্দ উপভোগ করিব, এবং আমার গোত্রীয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ বন্দী থাকিবেন।' ফলে মহানবী (স.) সকলকেই আযাদ করেন। মহানবী (স.) হাতেমের দানশীলতার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার কন্যাকে আপন চাদর উপহার দেন।[১২]

ফররুখ আহমদের "হাতেম তা'য়ী" ও "নৌফেল ও হাতেম" (১৯৬১)এর কেন্দ্রীয় চরিত্র হাতেম তা'য়ী অনৈসলামিক চরিত্র ব'লে অনেকে ফররুখের কৃতিত্ব খর্ব করার চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু উপরের বর্ণনার পরে — স্বয়ং মহানবীই (স.) যখন তাঁর স্বীকৃতি দিয়েছেন, তখন — হাতেম তায়ীকে অনৈসলামিক ব'লে অগ্রাহ্য করা বৃথাই। (প্রসঙ্গটা কেউ-কেউ তোলেন ব'লেই উত্থাপিত হ'লো, তা নাহ'লে নান্দনিক বিচারে এ প্রসঙ্গ অবান্তর।)

অন্যান্য সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও হাতেম তায়ীর আখ্যান বহুপ্রচলিত। পুঁথিসাহিত্যের মাধ্যমেই এ কাহিনী বাংলায় প্রবেশ করেছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি স্মৃতিরচনায় দেখেছি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও হাতেম তায়ীর পুঁথি ছিলো অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে।[১৩] ফররুখের মডেল ছিলো মধ্যযুগের কবি সৈয়দ হামজার-র (১৭৫৫ - ১৮১৫?) "হাতেম তাই"। শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) "হাতেম তাই" (১৯১৯) নামে একটি গদ্য-আখ্যান রচনা করেন — হুসনা বানুর সাতটি সওয়ালের মধ্যে মাত্র দুটি সওয়ালের কথা এ গ্রন্থে বর্ণিত।[১৪] মোজাম্মেল হকের ভূমিকার প্রথম অনুচ্ছেদ এরকম :

> মুসলমান-সমাজে হাতেমের নাম অবিদিত নাই। পুঁথিসাহিত্যে মহাত্মা হাতেম বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে বিরাজিত। অল্পশিক্ষিত পল্লীবাসীগণ অবসর সময়ে হাতেম তাই পুঁথি পাঠ কবিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করেন। বাস্তবিক হাতেমের জীবনের কাহিনীগুলি এত সুন্দর — এত আমোদজনক যে, কি বালক কি বালিকা, কি বৃদ্ধ কি যুবক, সকলেই শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকেন।

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদের আদর্শ সৈয়দ হামজা ও হাতেম তাই সম্পর্কে সুকুমার সেনের কয়েকটি মন্তব্য এখানে সংকলিত হ'লো :

(ক) বর্ধমানের মহারাজা মহাতাবচাঁদের (১৮২০–৭৯) উদ্যোগে বহু সংস্কৃত ফারসী ও উর্দু গ্রন্থের বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে উল্লেখেযোগ্য হইতেছে — রামায়ণ, মহাভারত, হাতেম তাই, সেকেন্দরনামা, চাহার দরবেশ, ব্যঞ্জনরত্নাকর ইত্যাদি।[১৫]

(খ) রচনাপ্রাচুর্য্যে সৈয়দ হামজা ইসলামি বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কবি। এঁর প্রথম রচনা "মধুমালতী"। এই কাহিনী নিয়ে আগে অনেক মুসলমান কবি কাব্যরচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় রচনা "আমীর হামজা" দ্বিতীয় (ও বৃহত্তর) খণ্ড, গরীবুল্লার কাব্যের অনুবৃত্তি। . . . তৃতীয় রচনা "জৈগুনের পুঁথি" হচ্ছে হানিফার জঙ্গনামা। . . . সৈয়দ হামজার চতুর্থ (ও শেষ) রচনা "হাতেম তাইর কেচ্ছা" রচনা শেষ হয়েছিলো ১২১০ সালে (১৮০৪ খ্রী)।[১৬]

(গ) দক্ষিণ রাঢ়ের মুসলমান লেখকদের মধ্যে রচনাবাহুল্যে সৈয়দ হামজাই প্রধান। বিরাট বই আমীর হামজা দ্বিতীয় খণ্ড ছাড়া ইনি লিখিয়াছিলেন — "মনোহর মধুমালতী", "জৈগুনের পুঁথি " (বা "জৈগুন-হানিফার কেচ্ছা") ও "হাতেম তাই"।[১৭]

'মোস্লেম পুঁথি-সাহিত্য' নামক প্রবন্ধ-রচয়িতা মোহাম্মদ আবদুল বারীর ধারণা অনুযায়ী ম্যাকমিলান কোম্পানী সৈয়দ হামজার "হাতেম তাই"-এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলো : 'সুতরাং সুধীসমাজের নিকট এখানা একেবারে অপরিচিত নহে।'[১৮] আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন সৈয়দ হামজার বর্ণনায় সম্পূর্ণভাবে সুকুমার সেনেরই প্রতিধ্বনি করেছেন : 'সাইয়িদ হামজা চলিত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবিগণের অন্যতম। রচনার প্রাচুর্যেও তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ইঁহার রচিত চারিখানি গ্রন্থের বর্ণনা কবি স্বয়ং তাঁহার হাতিম তাই নামক গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন।'[১৯]

তিন

ফররুখ আহমদের "হাতেম তা'য়ী"র আলোচনায় প্রবেশের আগে এই গ্রন্থের কাহিনীসংক্ষেপ জেনে নেওয়া দরকার।

য়েমনের বনপ্রান্তে শাহজাদা হাতেম তা'য়ীর সঙ্গে মুনীর শামীর প্রথম পরিচয়। মুনীর শামী তখন দিওয়ানা ও সংসারত্যাগী। কেননা সওদাগরজাদী সুন্দরী ও সম্পদশালিনী

www.pathagar.com

হুসনা বানু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে সাত সওয়ালের জবাব না-পাওয়া পর্যন্ত তিনি বিয়ে করবেন না। অনেক সওদাগরজাদা, শাহজাদার সঙ্গে মুনীর শামীও উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। মুনীর শামীর দুরবস্থা দেখে পরোপকারী হাতেম তায়ী তাঁকে সাত সওয়ালের জবাব এনে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। হুসনা বানুর সাতটি প্রশ্ন এরকম :

এক। 'একবার যাকে দেখেছি, আর-একবার তাকে দেখে যেতে চাই' — এ কথা কে বলে, কেন বলে?

দুই। এক ব্যক্তি তার বাড়ির দরজায় লিখে রেখেছে, 'সৎ কাজ করো, সম্পদ সমুদ্রে নিক্ষেপ করো।' এ কথার কি রহস্য?

তিন। এক ব্যক্তি চিৎকার ক'রে বলে, 'অসৎকাজ ক'রো না, অসৎকাজের ফল অতি মন্দ। বিশ্বাস না হয় ক'রে দ্যাখো।' এ কথা কে বলে? কেন বলে?

চার। এক ব্যক্তি সর্বদা বলে, 'যে সত্য কথা বলে সে সর্বদা সুখে থাকে, সত্যভাষী কখনো বিপদে পড়ে না'। এই সত্য কথার অর্থ কি?

পাঁচ। কোহে-নেদা কোন পাহাড়ের নাম? কি তার রহস্য? কেন সে মানুষের নাম ধ'রে ডাক দ্যায়?

ছয়। হুসনা বানুর কাছে সারসের ডিমের সমান, বৃহদায়তন একটি অমূল্য মোতি আছে। তার জোড়া এনে দিতে হবে।

সাত। শূন্যে ঘূর্ণ্যমান বাদগর্দ হাম্মামের কি রহস্য?

হাতেম তায়ী বারো বছর ধ'রে অসম সাহসিকতা ও কঠোর পরিশ্রমে বহু বিপদ-আপদ অতিক্রম ক'রে অনেক দেশ সফর ক'রে এই প্রশ্নগুলির উত্তর এনে দেন। উত্তর পাওয়ার পর হুসনা বানু মুনীর শামীকে বিবাহ করেন। অতঃপর 'আল্লাহতালার সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিতপ্রাণ হাতেম তায়ী কুল মখলুকের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন।'

চার

"হাতেম তায়ী"র শব্দব্যবহার নিয়ে প্রায় একটি জনশ্রুতি আছে যে, এখানে কবি অজস্র অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দে কাব্যটি ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছেন। কাব্যটি নিবিড়ভাবে পাঠ করলে এই উক্তি কখনোই তথ্যসমর্থিত মনে হবে না। ৩২৮-পৃষ্ঠার এই বিশাল কাব্যগ্রন্থে অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ কতো আর? মোটামুটি এরকম :

www.pathagar.com

পরেন্দা, কোকাফ, রাহাগির, সুবে উম্মীদ,[২০] রেজামন্দি, সাখাওয়াতি, বারিতা'লা, জুলমাত, মুখতাসার[২১], কামালৎ, কামিল ইনসান, দরখ্‌ত, মুরাদ, মাজেন্দ্রান, দেহাজ, মোহ্‌রা, বেবাহা, জোব্বা-পোশ, ওজুদ, লাজনি, জরিন,[২২] দানেশমন্দ, নাজ, শিশাগর, কোশাদা, শাহানা, তকসির, রেজা, সিহায়ী, সাহেবে-কাস্‌ফ, সামানা, সুরাত জামাল, আজার, পেশানি, জিনাত, নওবাহার, হাশমত, আজিম, মুজদা[২৩], নজ্জুম, জওয়াহের, জমরুদ, মাওয়ারিদ, মুদ্দৎ, পাঞ্জেরী, সুবে কাযিব, খালিক, মুসাল্লা[২৪], হাশমাৎ, সালামত, আবর,[২৫] রাহবার, কহর[২৬], শশম, আযল, বেকারার, শাহীন, দসত-ব-দসত, দিলীর[২৭], আবাদানী, আলমাস, সেতাব, গনিমত, মোবারক, ইনসানে কামিল প্রভৃতি।

বাঙালি-মুসলমানের প্রাত্যহিক পরিচিত আরবি-ফারসি শব্দ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি প্রযুক্ত :

তামাম, আলম, বেশুমার, রহমত, ইনসান, পেরেশান, মঞ্জিল, রাহা, দরিয়া, খেদমত, বান্দা, মোমিন, মজলুম, আফতাব, মাহতাব, ইবলিস, কামিয়াবি, দৌলত, জিন্দেগী, জিন্দেগানী, সওয়াল, সফর, সিতারা, ইবাদত, মালিকানা, লহু, মদদ, হেরেম, রওশন, হুজরা, ফরিয়াদ, কিসমত, শাহজাদা, আশিক, তসবির, তাজ-তখত, ইন্তেজার, পেরেশান, খোস-নসীব, বদ-নসীব, আওরত, হিম্মত, ইমারত, মেহেরবান, পরোয়ার দিগার, ফরমান, মখলুক, দিওয়ানা, আল্লা, খোদা, বালাখানা, মহব্বত, মহফিল, ইয়াদ, গায়েবী,শোকরানা, আজদাহা, মুসিবত, মুসাফির, সুরাত, ফেরেশতা, তেলেসমাতি, তালাব, বরাত, বে-চাঈন, জবাব, আসমান, সরাইখানা, জিন্দা-দিল, আউলাদ, হিকমত, সফেদ, জামাত, জয়ীফ, সওগাত, শহীদান, খাদিম, শামাদান, মজলিশ, মাকান, শহীদ, বে-খবর, তেজারত, জান্নাত, ফরজন্দ, হুজরা, মুল্লুক, দস্তরখান, দোজখ, আলামত, নূরানী, বখিল, আদম, বনি আদম, হক, নাজাত, জমিন, গোরস্থান, গোনাহগার, জবান, বেগানা, কুয়ত, মওত, জিঞ্জির,জ্বিন, দুসরা, মোবারকবাদ, জান, দুশমন, নাজুক, আতশ,ঈশক, আরজু, এলাজ, মুনাজাত, খাদিম, আঞ্জাম, লোবান, খোশবু, তাজিম, খেদমতদগার,আমীর, ফকীর, শরম, দোজখ, লেবাস, নিশানা, রিজিক, জাহান ইত্যাদি।

বাঙালি-মুসলমানের প্রাত্যহ চেনা শব্দ, সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল-শাহাদাৎ হোসেন-গোলাম মোস্তফা-প্রযুক্ত বাঙালি কাব্যপাঠকের পরিচিত আরবি-ফারসি শব্দাবলি

www.pathagar.com

"হাতেম তা'য়ী"তে এতো বেশি ব্যবহৃত যে এই কাব্য সম্বন্ধে অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দব্যবহারের অভিযোগ তো টেকেই না — আমরা বরং এ কথা বলতেই বাধ্য হই যে, ইতিপূর্বে ("সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪) বা "সিরাজাম মুনীরা" (১৯৫২) কাব্যে) ফররুখ বাঙালি-মুসলমানের এতো ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার করেননি আর। ফররুখ বরং এখানে বাঙালি-মুসলমানের ঘরোয়া শব্দাবলিকে একটি মহাকাব্যিক আততি দান করলেন।

এই কাব্যগ্রন্থে ফররুখের শব্দব্যবহার প্রসঙ্গে অন্য দু-একটি পয়েন্টও আমি স্পর্শ করতে চাই।

এক। কাজী নজরুল ইসলামই (১৮৯৯-১৯৭৬) চোদ্দোশো বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙালি-মুসলমানের নিত্য আচরিত আরবি-ফারসি শব্দকে শালীন সাহিত্যিক মর্যাদাসম্পন্ন ক'রে তুললেন। মধ্যযুগের শেষ কবি, সুচেতন ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-৬০) অনেক বছর আগে উচ্চারণ করেছিলেন বটে 'না রবে প্রসাদগুণ, না হবে রসাল।/অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।।' কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, বাংলা কাব্যে নজরুলের আগে তা সর্বার্থসিদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি। নজরুলের দুই-প্রজন্ম-ব্যবহিত কবি ফররুখ কেবল অগ্রজের আশ্রয়ে কাল কাটাতে চাননি ব'লেই পুরোনো প্রচলিত শব্দের সঙ্গে একগুচ্ছ অপ্রচলিত নতুন আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ ক'রে তাঁর কাব্যজগৎ একটি স্বতন্ত্র মহিমা-লোকে উত্তীর্ণ করেন। কাব্যযাত্রার অগ্রসরমানতার স্বার্থেই এই ব্যবহার প্রয়োজনীয় ছিলো।

দুই। কেউ-কেউ "সাত সাগরের মাঝি"র সঙ্গে "হাতেম তা'য়ী"র শব্দব্যবহারের তুলনা ক'রে শেষোক্ত গ্রন্থের শব্দব্যবহারকে অভ্যাসের অনুবর্তন বা যান্ত্রিক ব'লে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে আমরা ভুলে যাই, কোনো কবিতা বা ছোটোগল্প বা উপন্যাসের শব্দব্যবহার তার বিষয়েরই সহযাত্রিক। "সাত সাগরের মাঝি"র লিরিক উৎসারণের সঙ্গে "হাতেম তা'য়ী"র এপিক নির্মিতির মৌলিক ব্যবধানই এই দুই কাব্যের শব্দব্যবহারকে দুরকম করেছে।

তিন। নজরুল ও জীবনানন্দের কোনো-কোনো শব্দ ও যৌগিক শব্দ (নজরুলের 'সুবে উম্মীদ', 'মুখতাসার' , 'মুজদা', 'কহর', 'দিলীর' প্রভৃতি ; জীবনানন্দের 'মুসাল্লা' প্রভৃতি শব্দ ; নজরুলের 'শের-নর', 'ভুখা-ফাঁকা', 'বিষ-তিক্ত', 'অগ্নি-সিন্ধু' প্রভৃতি ; জীবনানন্দের 'সিন্ধু-শকুন' প্রভৃতি যৌগিক শব্দ) প্রয়োগ ক'রেও অথবা ক'রেই — ফররুখ আহমদের শব্দ-জগৎ যে তাঁর একেবারেই নিজস্ব ব'লে মনে হয়, এখানেই তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব।

www.pathagar.com

পাঁচ

চিত্রকল্পী কবি নন্ ফররুখ, তবু কিছু মনোহারী চিত্রকল্প এ বইএ উপহার দিয়েছেন তিনি — যার দুএকটি তাঁর কবিকল্পনায় বারবার সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে :

(ক) যখন রক্তিম চাঁদ অন্ধকার তাজীতে সওয়ার
উঠে আসে দিগ্বলয়ে, ওয়েসিস নিস্তব্ধ, নির্জন,
দূরে পাহাড়ের চূড়া ধ্যান-মৌন ; অজানা ইঙ্গিতে
তখনি ঘুমন্ত প্রাণ জেগে ওঠে।

[পৃ. ৯]

(খ) বল কোন শাহাবাদে অপরূপ সওদাগরজাদী
গোলাবকুঁড়ির মত মেলেছে রূপের মুক্ত দল
নিখুঁত সুঠাম তনু, অতুলন মুখের আদল ;
অমা অন্ধকার যার কেশপাশে হয়েছে বিবাদী?

[পৃ. ১৮]

(গ) রাত্রির শিকারী-ভোর পূর্বাচলে দাঁড়ালো যখন
প্রশ্নের সন্ধানে একা তা'য়ীপুত্র চলিল তখন।

[পৃ. ৩৬]

(ঘ) দিন যায়,
রাত্রি নামে আঁধারের ঘন কাল পর্দার আড়ালে,
দুর্ভেদ্য নেকাব তার দীর্ণ করে ভোরের শিকারী
— আফতাব।

[পৃ. ১৮৩]

ছয়

হোমার (৮৫০ খ্রি-পূ) ও মাইকেলের (১৮২৪-৭৩) মতো দীর্ঘ বিশদ-বিচিত্র উপমা তিনি প্রয়োগ করেছেন। (প্রসঙ্গত স্মরণীয় : হোমার ও মাইকেলের ভক্ত ফররুখ প্রায়ই তাঁদের অজস্র কবিতাংশ মুখস্থ আবৃত্তি করতেন।) হোমার ও মাইকেলের মতো ফররুখও তাঁর উপমা চয়ন করতেন জীবনের বহু বিচিত্র ক্ষেত্র থেকে। কয়েকটি উদাহরণ সংকলন করা যাক :

www.pathagar.com

(ক) সাত সওয়ালের আড়ালে জাগে যে, সেই রূপসী
আবছা আঁধারে ঘেরা যেন চাঁদ পঞ্চদশী।

[পৃ. ২৫]

(খ) হাতেম তায়ীর
উত্তর শুনিল বানু উৎকর্ণ বিস্ময়ে, রং-মহলে
পোষা তোতাপাখী শোনে যেমন সুদূর প্রত্যাগত
মুক্ত শাহীনের স্বর, কিম্বা শোনে ক্ষীণস্রোতা নদী
দরিয়ার প্রাণাবেগে উচ্ছ্বসিত জোয়ার যখন
আনে ব'য়ে দুরান্তের শুক্তি,— মুক্তা (সমুদ্রে যা ছিল
সংগোপন এত কাল)।

[পৃ. ৫৮]

(গ) তিসরা সওয়াল হুসনা বানুর জেনে মুসাফির নামলো মাঠে
(অন্তবিহীন আকাশ নীলায় জ্যোতিষ্ক যেন ভ্রাম্যমাণ),

[পৃ. ১০৫]

(ঘ) বিদ্যুতের চাবুক যেমন
জ্বালায় মেঘের ঘন প্রশান্তি নিমেষে, সুর্মা কণা
শিরায় শিরায় আর স্নায়ুকেন্দ্রে তেমনি পলকে
জাগালো দুঃসহ জ্বালা, মনে হ'ল হাভিয়ার শিখা
মুহূর্তে ফেলেছে ঘিরে ছায়াচ্ছন্ন পাপীর সত্তাকে
সহস্র সর্পিল পাকে।

[পৃ. ১১৯]

(ঙ) নদীর ভাঙনে জেগে অসতর্ক গৃহস্থ যেমন
সদ্য ঘুমভাঙা চোখ মেলে দেখে আশ্রয় মৃত্তিকা
চিড়-খাওয়া চারপাশে, ভেঙে পড়ে সে মাটি যেমন
ভাসায় প্রবল স্রোতে মুহূর্তে সে গৃহহারা জনে
যখন মেলে না ঠাঁই পদনিম্নে, মেলে না আশ্বাস,

www.pathagar.com

ধরে সে দুর্গত প্রাণ তৃণখণ্ড আপ্রাণ প্রয়াসে
তেমনি আমার মন জেগে আছে শূন্য অন্ধকারে
সর্বশেষ প্রয়াসে আত্মার।

[পৃ .১২৫]

(চ) বর্ষার মেঘের পথে চেয়ে থাকে আকণ্ঠ তৃষ্ণায়
যেমন ফাটল ধরা মরু মাঠ, অথবা তুফানে
বিধ্বস্ত অমূল তরু চায় দীর্ণ শিকড়ে যেমন
পরিচিত জমিনের স্পর্শ, . . . এই পরিত্যক্ত মাঠে
শান্তি চায় হৃদয় তেমনি।

[পৃ . ১২৮]

(ছ) তুষার কুয়াশাচ্ছন্ন মেরু ছেড়ে পাখীরা যেমন
রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে খেলা করে অচেনা বিদেশে,
দিন শেষে উড়ে যায় আরো দূর সুদুর্গম দ্বীপে
তেমনি আমিও হব যাত্রী সুদূরের।

[পৃ . ১৭২]

(জ) ঘন অন্ধকার সিয়া মোরগের মত
ফেলেছে বিপুল ছায়া অন্তহীন দিকপ্রান্ত ছুঁয়ে
পাহাড়-পাঁচিল-ঘেরা দেশে।

[পৃ . ১৯৪]

(ঝ) যেমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে
হুশিয়ার সওদাগর হাতে নেয় মুদ্রা বৈদেশিক
(সন্দেহের ক্রূর ছায়া পড়ে তার দুচোখে যখন
স্বল্পালোকে), হাজার সওয়াল শেষে হাতেম তা'য়ীকে
নিল তারা জ্ঞানীর মঞ্জিলে।

[পৃ . ১৯৪]

www.pathagar.com

(ঞ) দূরান্তের যাত্রী দেখে কোহে-নেদা ছুঁয়েছে আসমান
দৈত্যের করোটি যেন।

[পৃ. ২০০]

(ট) অন্ধকার রাত্রির আসমানে
কক্ষচ্যুত উল্কা এক ছুটে চলে যেমন আঁধারে,
পায় না পথের দিশা, কিম্বা এক অরণ্য কিনারে
সামান্য আলোক নিয়ে ঘুরে মরে, জোনাকি যেমন
পায় না বনের শেষ সীমান্ত ; তেমনি সারাক্ষণ
(সাত দিন, সাত রাত্রি) তা'য়ীপুত্র ঘুরিল প্রান্তরে।

[পৃ. ২১২]

এই গুচ্ছে দেখা যাবে ক, গ, জ, এবং ঞ এই কটি ক্ষুদ্র উপমা — সাধারণত আজকাল যে-ধরনের উপমা কবিতায় প্রযুক্ত হয়। অন্যগুলি হোমারীয় বা মধুসূদনীয় ধরনের দীর্ঘ উপমা, এর কোনো-কোনোটি আবার যেমন খ, চ, এবং ট) হোমারীয় বা মধুসূদনীয় ধরনে একাধিক উপমায় শৃংখলিত। ফররুখের বর্ণিত জগৎ মধ্যপ্রাচ্যের হ'লেও তাঁর উপমায় কোনো-কোনো সময়ে কবির স্বদেশ ঢুকে পড়েছে (যেমন ঙ এবং চ)। ঝ-চিহ্নিত উপমায় হোমারের ছায়া তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে বস্তুবোধ — "সাত সাগরের মাঝি"র রোমান্টিক জগৎ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হোমারীয় ও মধুসূদনীয় বিশদ উপমা ব্যবহার ক'রে ফররুখ বাংলা কবিতায় এমন একটি মহাকাব্যিক জগৎ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, যা বিংশ শতাব্দীতে অন্য-কোনো বাঙালি কবি করেননি।

সাত

"হাতেম তা'য়ী" কাব্যে ফররুখ আহমদ বিচিত্র ছন্দ, মিল, স্তবকবন্ধের মধ্য দিয়ে কাহিনীকে প্রবাহিত করেছেন। 'মাইকেলের ছন্দ চতুর্দশ-অক্ষরা, কবি ফররুখ আহমদের ছন্দ অষ্টাদশ-অক্ষরা।'[২৮] এর কারণ আঠারো মাত্রার অক্ষরবৃত্তই রবীন্দ্র-নজরুলোত্তর বাংলা কাব্যে স্বাভাবিক হিশেবে গৃহীত। ফররুখ এ কাব্যে ১৮-মাত্রার অমিল ও সমিল অক্ষরবৃত্ত দুই-ই ব্যবহার করেছেন। ১৮-মাত্রার অমিল অক্ষরবৃত্ত (তথা অমিত্রাক্ষর) :

বাঁধ-মুক্ত দরিয়ার টানে
ক্ষীন ঝর্ণাধারা, নদী ছুটে আসে আনন্দে যেমন

www.pathagar.com

তেমনি দারাজদিল হাতেমের সাখাওতি আর
সুরাত, হিম্মৎ দেখে এল কাছে জনতা মজলুম ;
এল নির্যাতিত প্রাণ।

[পৃ. ৫]

১৮–মাত্রার সমিল অক্ষরবৃত্ত :

কে জ্ঞানী? অজ্ঞতা কার আত্মঘাতী? জানি না তা আমি,
কিম্বা কার অভিজ্ঞতা দুনিয়ার চেয়ে ঢের দামী
জানি না, মেলেছি চোখ পৃথিবীতে স্বপ্নালোকে যেন ;
মিথ্যা ও সত্যের দ্বন্দ্ব তবু মনে জেগে ওঠে কেন?
সহস্র উর্ণার মত তবু কেন সংশয় হাজার
সূক্ষ্ম উর্ণনাভ জাল ফেলে প্রাণে ছায়া তিক্ততার?

[পৃ. ১৯]

অমিত্রাক্ষর ছন্দে পঙক্তির মধ্যবর্তী যতি দিয়েছেন তিনি সব সময় জোড়শব্দে — এদিক থেকে তিনি মাইকেলী নন্, রাবীন্দ্রিক :

(ক) বিস্ময়ে তাকালো ফিরে সুপ্তোত্থিত বহু সওদাগর,
হাজার শাহ্জাদা ;

[পৃ. ৩০৩]

(খ) তখন হাতেম তা'য়ী সেইসব মুক্ত প্রাণ নিয়ে
হাম্মামের মাঠ ছেড়ে যাত্রা শুরু করিল আবার
দূরান্তের পথে শাহাবাদে।

[পৃ. ৩০৪]

(গ) উজীর, নাজির আর সহস্র জ্ঞানীর মজলিসে
বলিল দানেশমন্দ তা'য়ীপুত্র তামাম কাহিনী
হাম্মামের।

[পৃ. ৩০৫]

www.pathagar.com

(ঘ) জঙ্গের ময়দান থেকে ফিরে চলে যেমন দিলীর
গণিমত নিয়ে ঢের, তা'য়ীপুত্র চলিল তেমনি
শহর কাতান ছেড়ে জৌলুসের সাথে।

[পৃ. ৩০৬]

স্বরবৃত্ত ছন্দ :

দিল-দীওয়ানা একলা হাতেম
ঘোরে যাদুর ময়দানে,
দৃষ্টি ব্যাকুল, দিশাহারা
রূপবতীর সন্ধানে।

[পৃ. ১৪৯]

৬-মাত্রার ৪-পঙক্তির স্তবকিত মাত্রাবৃত্ত :

কিভাবে আজিম দরিয়া হয়েছ পার,
বল সে কাহিনী হুশিয়ার মুসাফির
সোনার হরফে লিখবে সফরনামা
হয় নাই ভাগী যারা ও জিন্দেগীর।

[পৃ. ২২০]

৬-মাত্রার মুক্তক মাত্রাবৃত্ত :

অচিন মুলুকে পা রেখেছি আমি যেই
দেখি বিস্ময়ে সেই কিশতীর চিহ্ন কোথাও নেই,
দেখি সম্মুখে নবতর বিস্ময় ;
বিশাল পাহাড় ঝর্ণায় তার রক্তের ধারা বয়।
পাথরে পাথরে লোহু চুঁয়ে যায়, খুন ঝরে অবিরত ;
শংকিত চোখে দেখি আমি চেয়ে দুঃস্বপ্নের মত।[২৯]

[পৃ. ২২০]

www.pathagar.com

অন্তমিলের বিচিত্রতা সৃষ্টি করেছেন কখনো তিন পঙক্তির স্তবকবন্ধের মধ্যে একান্তর মিলের শিকল রচনা ক'রে :

যাদুর লড়াই শেষ হয়ে গেল (মিথ্যার যত দ্বন্দ্ব),
নতুন দিনের নতুন আকাশে জাগলো নতুন সূর্য ;
সারা বনে জাগে সবুজ পরীর প্রাণময় গীতি-ছন্দ।

মিলন-মধুর সুরে প'ল ঢাকা যুদ্ধের জয়-তূর্য,
খোশবু ছড়ায় নূররেজ ফুল ; জেগে ওঠে নিশিগন্ধা ;
লতা বল্লরী চায় তরু শাখা, বন্ধন চায় ভূর্জ।।

[পৃ . ১৫৭]

মিল নয় — ধ্বনির সৌকর্যই সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন কখনো :

লালাফুল যেথা পরীর বাগানে জেগে ওঠে নিষ্কম্প
বহু বিয়াবান পার হয়ে সেথা গেল একা তায়ীপুত্র ;
হুসনা বানুর তিসরা সওয়াল — মনে জাগে তবু প্রশ্ন।

[পৃ . ১১১]

এই কাব্যে স্তবকবন্ধের কিছু বিচিত্রতাও সৃষ্টি করেছেন কবি — সমস্তের মধ্যেই একটি সচ্ছল সাবলীলতা কাজ ক'রে গেছে — সওয়া তিনশো পৃষ্ঠার বইএ কোথাও এর সম্মুখগতি তিলমাত্র আহত বা বিপর্যস্ত হয়নি। বিভিন্ন ছন্দ ও স্তবকবন্ধ ব্যবহার করলেও কবি মূলত প্রয়োগ করেছেন ১৮-মাত্রার অমিল ও সমিল অক্ষরবৃত্ত। কাব্যের আরম্ভে ও শেষে আছে ১৮-মাত্রার অমিল অক্ষরবৃত্ত তথা অমিত্রাক্ষর ; কিন্তু গ্রন্থের একেবারে শেষ দুই ছত্রে অমিল অক্ষরবৃত্তের মধ্যেই এসে গেছে মিলান্ত দুটি চরণ[৩০] (ফররুখের অন্তমিল-প্রবণ স্বভাবের বশেই হয়তো) :

. . . য়েমনী হাতেম তায়ী
আল্লার আলম মাঝে দেখেছিল দেশ যে দিলীর
মুখলুকের খেদমতে চলিল সে বান্দা এলাহীর।

[পৃ . ৩২৮]

www.pathagar.com

উৎসর্গপত্রের সনেটটি বাদেও সনেট-স্বভাবী ফররুখ একগুচ্ছ সনেট চারিয়ে দিয়েছেন এ বইএর সর্বত্র :

১. হুসনা বানুর প্রতি বিধবা ধাত্রী (পৃ. ১৭)
২ চিত্রকরের প্রতি মুনীর শামী (পৃ. ১৮)
৩. হুসনা বানুর মন্তব্য ও নূতন সওয়াল (পৃ. ১০২)
৪. আলগুন পরী (পৃ. ১১২)
৫. হাতেম তা'য়ীর প্রতি আলগুন পরী (পৃ. ১১৩)
৬. তিস্‌রা সওয়ালের পথে (পৃ. ১১৪)
৭. নূররেজ ফুল (পৃ. ১৩৪)
৮. পুষ্প চয়ন (পৃ. ১৩৫)
৯. দৃষ্টি (পৃ. ১৩৬)
১০. হাতেম তা'য়ীর উক্তি (পৃ. ১৭৯)
১১. হাতেম তা'য়ীর উক্তি (পৃ. ২৬৫)
১২ আখেরী সওয়াল (পৃ. ২৬৬)
১৩. হাতেম তা'য়ীর প্রতি সামান ইরাক (পৃ. ২৯১)
১৪. কাহিনীর পরিণতি (পৃ. ৩১৬৫
১৫. মিলান্তক কথা (পৃ. ৩১৬)
১৬. বন্ধকৃত্য (পৃ. ৩১৭)

সৈয়দ হামজা তাঁর "হাতেম তাইর কেচ্ছা" গ্রন্থে লিখেছিলেন :

কেচ্ছা মধুমালতীর জঙ্গনামা আমীরের
জৈগুন পুঁথি লিখেছিনু আগে।
আল্লাতালা ভালা করে যাহার খায়েস পরে
হাতেম লিখিনু শেষ ভাগে।

ফররুখ আহমদেরও সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ "হাতেম তা'য়ী"। কবির একটি পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে, "হাতেম তা'য়ী"র রচনাকাল : ১৯৫৩-৫৫। অর্থাৎ কবির পঁয়তিরিশ বছর বয়সে, মধ্য-যৌবনে, এই গ্রন্থ রচিত হয়। তারপর বছর দশেক ধ'রে বইটির পরিশোধন-পরিমার্জন-পরিবর্তন-পুনর্লেখন চলে। 'মাসিক মোহাম্মদী', 'পূবালী', 'মৃত্তিকা বার্ষিকী',

www.pathagar.com

'পাকিস্তানী খবর', 'মাহে-নও' প্রভৃতি পত্রিকায় এই বইএর বিভিন্ন অংশ প্রকাশিত হয়। 'পূবালী' পত্রিকায় অনেক মাস ধ'রে ধারাবাহিক ছাপা হয়েছিলো। ১৯৬৬ সালে বাংলা একাডেমী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় — তার বেশ আগে পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়া হয়েছিলো।

"হাতেম তা'য়ী" মহাকাব্য কিনা এই নিয়ে একটি বিতর্ক আছে। "হাতেম তা'য়ী"কে মহাকাব্য রূপে অভিনন্দিত করেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন।[৩১] মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ একে সরাসরি মহাকাব্য না-বললেও মাইকেলের "মেঘনাদবধ কাব্যে"র সঙ্গে তুলনার ধরন দেখে মনে হয়, তিনি একে মহাকাব্য হিশেবেই বিচার করেছেন।[৩২] অন্যপক্ষে কবি আবদুল কাদির একে বলেছেন 'আখ্যানকাব্য'।[৩৩] ফররুখ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থপ্রণেতা সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, '. . . হাতেম তা'য়ী প্রকৃত পক্ষে মহাকাব্যিক মহিমা লাভ করতে পারেনি।'[৩৪] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানও এ গ্রন্থকে ঠিক মহাকাব্য হিশেবে বিচার করতে চান না। তিনি বলেছেন, 'সাম্প্রতিককালে তাই মহাকাব্যের চাইতে উৎকৃষ্ট কাব্যের প্রয়োজন বেশি। আমার তাই মনে হয়, "হাতেম তা'য়ী"তে যেসব উৎকৃষ্ট কাব্যাংশ আছে তার মূল্যই সমধিক।'[৩৫] তবে এঁরা অনেকেই "হাতেম তা'য়ী"কে ফররুখের শ্রেষ্ঠ কাব্য ব'লে বর্ণনা করেছেন :

(ক)"হাতেম তা'য়ী" কাব্য যেমন বিশাল, কবি ফররুখ আহমদের রচনাও তেমনি বলিষ্ঠ এবং প্রাণস্পর্শী।/মুসলিম ঐতিহ্যর ছায়াঘেরা এই অপূর্ব অবদান কবিকে চিরদিনের জন্য স্মরণীয় করে রাখবে সন্দেহ নেই।

[মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ]

(খ) বাঙলা সাহিত্যে ফররুখ আহমদের এ এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। প্রাচীন পুঁথির অনুসরণে কাব্যরচনার চেষ্টা অবশ্য নতুন নয়। এ প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে কিছু কিছু দেখা গেছে বটে, কিন্তু পুঁথিকে অবলম্বন করে একটা আস্ত মহাকাব্য রচনার প্রয়াস বাঙলা সাহিত্যে আর দেখা যায় নাই।

[আবুল কালাম শামসুদ্দীন]

(গ) বাংলা সাহিত্যে ফররুখ আহমদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর "হাতেম তা'য়ী"।

[আবদুল কাদির]

(ঘ) "হাতেম তা'য়ী" কবি ফররুখ আহমদের কাব্যাদর্শের শ্রেষ্ঠ ফসল এবং এ কাব্যে কবির প্রতিভা তুঙ্গতম পরিণতি লাভ করেছে।

[মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান]

www.pathagar.com

আমাদের বিবেচনায়, আঙ্গিকে এবং অন্তরাত্মায় ফররুখ আহমদের "হাতেম তা'য়ী" মহাকাব্য। আমাদের যুক্তি : (এক) সাহিত্যের কোনো আঙ্গিকই একেবারে অপরিবর্তনীয় থাকে না। কবিতা বা ছোটোগল্পের টেকনিক কি উনবিংশ শতাব্দীতে যা ছিলো, আজো তাই-ই আছে? তবু কিছু-কিছু মহাকাব্যিক টেকনিক তো ফররুখ ব্যবহার করেছেনই। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান দেখিয়েছেন, 'ফররুখ আহমদের "হাতেম তা'য়ী" "মেঘনাদবধ কাব্য"এর মত অষ্টাধিক সর্গে রচিত ('সর্গ' এই নামটি অবশ্য ব্যবহৃত হয়নি)।' এবং 'পাতাল ও মর্তে এর কাহিনী প্রসৃত।' "হাতেম তা'য়ী"র মহাকাব্যোচিত উপমা প্রয়োগের কথা আগে আমরা বলেছি। ছন্দোবৈচিত্র্য সত্ত্বেও এ কাব্যের কেন্দ্রীয় ছন্দ ১৮-মাত্রার অমিল ও সমিল অক্ষরবৃত্ত — একই ছন্দ হয়তো আজকের পাঠকের কাছে ক্লান্তিকর মনে হ'তো। (দুই) ট্রাজেডি বা অলঙ্ঘ্য নিয়তির প্রভাব নেই বটে, কিন্তু হাতেমের চরিত্রে যে-অভিযাত্রিকতা আছে, তা-ই তাকে দান করেছে চরিত্রের সমুন্নতি। (তিন) ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য ও গভীরতায় এ কাব্যে মহাকাব্যিক অতৃপ্তি রয়েছে। (চার) মহাকাব্যের যুগ শেষ হ'য়ে গেলেই তো বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য — "মেঘনাদবধ কাব্য" — রচিত হয়। আধুনিক যুগে প্রায়-অব্যবহৃত এই প্রকরণটি ফররুখ আর-একবার ব্যবহার করলেন — যেমন করেছেন গ্রীক কবি নিকোস কাজানজাকিস্ এই বিংশ শতাব্দীতেই।

সমুদ্রের সাত সফরের নায়ক সিন্দাবাদ ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যজীবনের নায়ক, আর সাত সওয়ালের উত্তরদাতা হাতেম তা'য়ী তাঁর শেষ কাব্যনায়ক। এই দুই নায়কই অভিযাত্রিক। এই অভিযাত্রাতেও ফররুখ স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হ'য়ে যান। আবার দশকী (চল্লিশের) চারিত্রও তাঁর মধ্যে শেষ-পর্যন্ত প্রবহমান — চল্লিশের দশকের অ-ব্যক্তিক মানবিকতা শেষ-পর্যন্ত তাঁকে সঞ্জীবিত রাখে : 'দুস্‌রা সওয়ালের' 'সফরের পথে'র দুটি অংশ উদ্ধৃত করা দরকার :

(ক) আদমের আউলাদ, — এক খান্দানের গোত্রভুক্ত
নারী-নর, দেশে দেশে দূরান্তরে রয়েছি ছড়িয়ে
বহুবর্ণ অসংখ্য জবান ; কিন্তু রক্তধারা এক ;
এক অনুভূতি হৃদয়ের। হাসি ও কান্নার অশ্রু
বয়ে যায় একভাবে নীড়-বাঁধা জীবনে, অথবা
মরুচারী বেদুইন যাযাবর জীবনের স্রোতে।

[পৃ. ৭৩]

www.pathagar.com

(খ) রক্ত শোষণের পালা চলেনি কি অব্যাহত আজও
এই পৃথিবীতে? সভ্যতা-গর্বিত মন জনপদে
দেখে না কি রাত্রিদিন সংখ্যাহীন যন্ত্র শোষণের,
ষড়যন্ত্রজাল শোষকের? দেখে না কি চারপাশে
অনাহার-ক্লিষ্ট প্রাণ ভারগ্রস্ত মরে? মাটি, মাঠ
কিম্বা অরণ্যের প্রান্তে ছিল যত কৃষাণ, সহজ
সরল জীবন নিয়ে প্রকৃতির মতন উদার
উজ্জ্বল আনন্দময় পরিতুষ্ট শ্রমের ফসলে
পড়েনি কি তারা আজ শোষকের ফাঁদে? পথে পথে
কেন ব্যর্থ হাহাকার? স্বপ্ন আর প্রশান্তির ঘর
পৃথিবী হারালো কোন অন্ধকারে?

[পৃ. ৭৪]

এসব পঙক্তিতে 'লাশ' ও 'আউলাদে'র ("সাত সাগরের মাঝি") কবিকে পরিষ্কার চেনা যায়। এই খেদ ছিলো তাঁর শেষ-পর্যন্ত : 'মানুষের রক্তের বেসাতি/ চালায় নিশ্চিন্ত মনে শোষক-সন্ততি।' হাতেম এসবের উর্দ্ধে, 'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে'র সন্ধানী। আধুনিক বিশ্বকবিতার জনক শার্ল বোদলেয়ারের 'শয়তান-স্তোত্র' শেষ হয়েছে এক প্রার্থনায়।[৩৬] "হাতেম তা'য়ী" কাব্যগ্রন্থের শেষেও আছে হাতেম তা'য়ীর মুনাজাত – যা মানবিকতার বোধে সন্দীপ্ত, যা আসলে ফররুখ আহমদের "হাতেম তা'য়ী" কাব্যগ্রন্থেরই নয়, সমগ্র কবিতার মর্মবাণী :

অনাগত

সন্ততিরা, — আসে নাই যারা আজও পৃথিবীর বুকে
(অস্পষ্ট আলোর মত দেখি আমি নিশানা যাদের
দূর নীহারিকালোকে), মুক্তি পায় যেন সে আউলাদ
সকল বিভ্রান্তি, পাপ, অত্যাচার, অবিচার থেকে।
বহু খণ্ডে বিখণ্ডিত মানুষের বিচ্ছিন্ন সমাজে
সকল বিভেদ মুছে করে যেন শান্তির আবাদ
সকল বিশ্বাসী প্রাণ — ইনসানে কামিল। আর যারা

www.pathagar.com

পড়ে আছে লুণ্ঠিত ধূলায়, নির্যাতিত সেইসব
মজ্‌লুমান পায় যেন বাঁচার অকুণ্ঠ অধিকার ;
সব মানুষের সাথে জীবনের পূর্ণতার পথে
চলে যেন সে মিছিল কেবলি সম্মুখে।

[পৃ. ৩২৭]

---

১ উদ্ধৃত : আবুল কালাম শামসুদ্দীন : "অতীত দিনের কথা"। দ্বি সং ১৯৮৫। খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা। পৃ. ১৮৭।

২ দ্রষ্টব্য : 'পত্রাবলি', ৪-সংখ্যক পত্র, বর্তমান গ্রন্থ।

৩ আবুল কালাম শামসুদ্দীন : "অতীত দিনের কথা"। পৃ. ১৯৫।

৪ 'বিবর্তন', ফররুখ স্মরণ-সংখ্যা ১৯৮৬।

৫ লুতফুর রহমান জুলফিকার : 'আমার বন্ধু ফররুখ আহমদ'। 'অগ্রপথিক', ১৬ অক্টোবর ১৯৮৬।

৬ ফররুখ আহমদ : 'তাজকেরাতুল আউলিয়া'। "বাঙ্গালা পুঁথিসাহিত্য", পাকিস্তান পাবলিকেশন্‌স্, ১৯৫৫।

৭ ১৯৬৬র দিকে এক মিনিটের আলাপে বর্তমান লেখককে তিনি পুঁথির পুনরুজ্জীবনী কবিতা লিখবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

৮ দুএকটি সাক্ষ্য :

"মেঘনাদবধ কাব্য"-এর সম্পূর্ণটাই বোধ করি তিনি মুখস্থ বলতে পারতেন। আমরা অবাক হয়ে তাঁর মন্দ্রিত কণ্ঠের আবৃত্তি শুনতাম আর ভাবতাম, 'তুমি কেমন করে গান করো, হে গুণী।'

['মর্যাদাবোধের প্রতীক' : আবু হেনা মোস্তফা কামাল। "ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি"]

ফররুখ ভাই প্রায়ই বলতেন, 'ক্লাসিকস পড়বি। মধুসূদন পড়েছিস?' তাঁর প্রিয় কবি মধুসূদন। ক্লাসিকসের উৎস থেকে, মধুসূদনের চর্চা থেকে একটি বিশেষ ক্ষমতা তিনি অর্জন করেন। তা হচ্ছে কবিতা রচনায় কব্জির জোর।

['এক বিস্ময়কর নায়ক' : মুস্তাফা নুরউল ইসলাম। ঐ]

৯ দ্রষ্টব্য : 'পত্রাবলি', ১০-সংখ্যক পত্র, বর্তমান গ্রন্থ।

১০ তৈয়েবুর রহমান : 'অন্তরঙ্গ আলোকে ফররুখ'। "ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি"। ১৯৮৪। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

১১ "ছহি বড় রহমতে আলম বা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দ.) জীবনকথা"। অক্টোবর ১৯৬৫। ইসলামিক একাডেমী, ৬৭.পুরানা পল্টন, ঢাকা ২। রয়াল আকারের ২১৪ পৃষ্ঠার এই বইটি নিউজপ্রিন্টে আঠারো পয়েন্টের বড়ো-বড়ো টাইপে মুদ্রিত। প্রকাশক : শাহেদ আলী।

www.pathagar.com

১২ "বাংলা বিশ্বকোষ" (চতুর্থ খণ্ড)। ফ্রাংকলিন পাবলিকেশনস, ঢাকা।

১৩ স্বর্ণকুমারী দেবী। 'ভারতী'।

১৪ আজহার ইসলাম : "মোজাম্মেল হক"। ১৯৯৩। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ৬৫।

১৫ সুকুমার সেন : "বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য"। চতুর্থ সং ১৩৭৩। ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা। পৃ. ৬৬।

১৬ সুকুমার সেন : "ইসলামি বাংলা সাহিত্য"। দ্বি সং ১৩৮০। ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা। পৃ. ১০৯-১১২।

১৭ সুকুমার সেন : "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" (প্রথম খণ্ড : অপরার্ধ)। তৃ সং ১৯৭৫। ইস্টার্ন পাবলিশার্স। কলকাতা। পৃ. ৫৫২।

১৮ মোহাম্মদ আবদুল বারী : 'মোস্লেম পুঁথিসাহিত্য'। 'মাসিক মোহাম্মদী' ,আষাঢ় ১৩৩৭।

১৯ আবুল কাসেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন : "পুঁথি বা চলিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", দ্বি সং ১৯৬৯।

২০ শব্দটি নজরুল-ব্যবহৃত। নজরুলের একটি বিখ্যাত কবিতার নাম ("সাম্যবাদী")।

২১ শব্দটি নজরুল-ব্যবহৃত।

২২ শব্দটি নজরুল-ব্যবহৃত।

২৩ শব্দটি নজরুল-ব্যবহৃত।

২৪ শব্দটি মোহিতলাল ও জীবনানন্দ-ব্যবহৃত।

২৫ শব্দটি শাহাদাৎ হোসেন-ব্যবহৃত।

২৬ শব্দটি নজরুল-ব্যবহৃত।

২৭ শব্দটি নজরুল-ব্যবহৃত।

২৮ উক্তিটি মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর, ('এক অমূল্য সম্পদ', "ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি")। কিন্তু এই উক্তির পরেই 'ছন্দযতির ব্যাঘাত ঘটেনি' ব'লে তিনি "হাতেম তা'য়ী" থেকে যে-চার লাইন উদ্ধৃত করেছেন তা আঠারো মাত্রার অক্ষরবৃত্ত নয় — ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত :

পরীর মুলুকে আমি ছাড়া নাই দ্বিতীয় আদম জাত
জানি না কিভাবে কেটে যায় দিন, ফুরায় স্বপ্নরাত
পেয়েছি পরীকে ; এ জীবনে আর কোন আফসোস নাই।
কার কাছে তুমি পরীর দেশের সন্ধান পেলে ভাই?

২৯ 'শশম সওয়ালে' (পৃ. ২১৫) হাতেম তা'য়ীর অভিযানের (লোহু দরিয়া, সফেদ দরিয়া, হীরে জহরতের দেশ, সোনার পাহাড়, আতশী দরিয়া) বর্ণনায় স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের 'The Rime of the Ancient Mariner' (রচনাকাল : ১৭৯৭-৯৮) নামে সাত-পর্বে-সম্পূর্ণ দীর্ঘ আখ্যানকবিতার প্রত্যক্ষ ছায়াপাত আছে।

www.pathagar.com

৩০ "নৌফেল ও হাতেম" (১৯৬১) কাব্যনাট্যে ফররুখ ব্যবহার করেছেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ, কিন্তু এই কাব্যেরও শেষে শায়েরের উক্তির ছয়টি পঙক্তি অন্তমিলসম্পন্ন।

৩১ 'পূবালী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত, পরে "ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি" গ্রন্থভূর্ত।

৩২ 'পাকিস্তানী খবর' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত, পরে পূর্বোক্ত গ্রন্থে অন্তর্ভূত।

৩৩ 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত, পরে পূর্বোক্ত গ্রন্থে অন্তর্ভূত।

৩৪ সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় : "কবি ফররুখ আহমদ"। ১৯৬৯। নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

৩৫ 'মাহে-নও' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত, পরে "ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি" গ্রন্থভূর্ত।

৩৬ (বুদ্ধদেব বসু-অনূদিত) "শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা"। বুদ্ধদেব বসু, 'শয়তান-স্তোত্রে'র অনুসরণে 'মোহমুদগর' নামে একটি কবিতা রচনা করেন ("মরচে-পড়া পেরেকের গান") — তারও অন্তিমে একটি প্রার্থনা আছে।

www.pathagar.com

'বীভৎস নগরী'

এখন শহর এই অন্ধকার পটভূমিকায়
জ্বেলেছে উজ্জ্বল আলো সারি সারি, — প্রমোদবালার
কদর্য ব্যাধি ও ক্লান্তি চাপা দিয়ে রঙের বাহার
আশ্চর্য জৌলুষে ফোটে ন্যাড়া পার্কে, নগ্ন রেস্তরাঁয়।

দিনের ব্যর্থতা দাহ মুছে দিতে রাত্রির নেশায়
এখানে পৃথিবী হ'ল এ মুহূর্তে উড়ন্ত 'সসার'
যাতালের হট্টগোলে, অট্টহাস্যে পাশবিকতার
[illegible]র খুলে গেল দূরাস্তৃত রাত্রির ছায়ায়।

এখন নিঃশঙ্কচিত্ত নিশাচর দিবানিদ্রা ছেড়ে
ফিরে এল রঙ্গমঞ্চে, এল সাথে গণিকা, তস্কর,
কৌশলী পটেকমার, ভদ্রবেশী জুয়াচোর : ঠক।

শিকার সন্ধানে কেউ ব্যতিব্যস্ত, কেউ চলে তেড়ে
উৎকট আনন্দ খুঁজে তন্নতন্ন করে এ শহর
(ভুঁইফোঁড় পিশাচের চিরকাম্য, বাঞ্ছিত নরক)॥

এই কবিতাটিকে কি ফররুখ আহমদের কবিতা ব'লে চেনা যাচ্ছে? এ কোন্ ফররুখ আহমদ? "সাত সাগরের মাঝি" কবিতাপর্যায়ের উদ্দাম উতরোল তরঙ্গের ওঠা-নামা এখানে কোথায়? "সিরাজাম মুনীরা"র বন্দনা-গাথাই বা কোথায় এখানে? ফররুখ আহমদ তাঁর আদর্শিক-রোমান্টিক আত্মপৃথিবী ছেড়ে এখানে কি আরেক জন্তুপৃথিবীতে এসে পড়েছেন?

হ্যাঁ, তা-ই। ১৯৬৬ সালে লেখা এই কবিতাটিতে এক অচেনা ফররুখ আহমদের আনন মুদ্রিত। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো 'পূবালী' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৭৩ সংখ্যায়। তাঁর কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

বাংলাদেশের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কোনো-কোনো কবি বোদলেয়ার-দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু ফররুখ? ফররুখ হঠাৎ এই বোদলেয়ারীয় কবিতা লিখতে

www.pathagar.com

গেলেন কেন? তাঁর সঙ্গে তো বোদলেয়ারের কোনো দিক থেকে কোনো সাদৃশ্য-সাযুজ্য নে-ই। ফররুখের এই 'বীভৎস নগরী' কবিতার সঙ্গে বুদ্ধদেব বসু-অনূদিত শার্ল বোদলেয়ারের (১৮২১-৬৭) "ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল" (১৮৫৭) গ্রন্থভুক্ত 'সান্ধ্য প্রদোষ' কবিতার সাদৃশ্য স্বতঃপ্রকাশ। শেষোক্ত কবিতার পাঁচটি অংশের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় অংশ উদ্ধৃত হ'লো — পাঠক নিজেই মিলিয়ে নিন :

সন্ধ্যা আসে, মোহিনী সুন্দরী সন্ধ্যা ; দুষ্ক্রিয় দুর্জনে
সখ্য দেয় ; আসে যেন ষড়যন্ত্রী, তরক্ষুচরণে ;
বিশাল পর্দার মতো আকাশ ক্রমশ বোজে, আর
অধৈর্য মানুষ নেয় পশুত্বের বন্য অঙ্গীকার।....
ইতিমধ্যে ব্যাধিগ্রস্ত পিশাচের দঙ্গল, সহসা
গুরুভারে জেগে উঠে, শুরু করে, দৈনিক ব্যবসা।
খড়খড়ি কাঁপায় তারা, পরদা ছেঁড়ে, দরোজা ধাক্কায় ;
বাতাঘাতে উৎপীড়িত আলোকের অস্থির ছায়ায়
রঙিন গণিকাবৃত্তি প্রজ্বলিত হ'লো ইতস্তত
পথে-পথে অবাধ পুরীষস্রাবী বল্মীকের মতো ;
খোলে সে নিগূঢ় গলি দিকে-দিকে ; চতুর সংকেতে
আকস্মিক অতর্কিত আক্রমণে শত্রু যেন জেতে ;
ক্লেদের নগর এই — তার বুকে চলে এঁকেবেঁকে,
যেমন শঙ্কিত কৃমি মানুষের চক্ষু থেকে ঢাকে
খাদ্য তার। এদিকে ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দে জাগে রান্নাঘর
এখানে ওখানে ; অর্কেস্ট্রা উল্লসে ; ওঠে তারস্বর
রঙ্গমঞ্চে ; আর শস্তা রেস্তোরাঁয়, যেখানে জুয়োর
ফূর্তির উৎসাহ জমে, জোটে বেশ্যা, মাতাল, জোচ্চোর,
তাদের সাগরেদ যত ; জোটে চোর, পিশুনস্বভাবে
প্রতিশ্রুত ; অবিলম্বে সেও যাবে, সেও কাজে যাবে,
মৃদু হাতে দরজা খুলে, বাক্স ভেঙে, হয়তো কুড়াবে
দু-দিনের অন্ন তার, কিংবা উপপত্নীরে সাজাবে।

["শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা" : বুদ্ধদেব বসু, ১৯৬১]

www.pathagar.com

"ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল" বা "ক্লেদজ কুসুম"-এর 'প্যারিস-চিত্র' নামা অংশের এই 'সান্ধ্য প্রদোষে'র সঙ্গে ফররুখের 'বীভৎস নগরী' কবিতাটি এতোটাই মিলে যায় যে, এই প্রশ্ন আমাদের মনে উত্থাপিত হয় : উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের প্যারিস আর বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের ঢাকা-র মধ্যে কি সাযুজ্য ছিলো কোনো? বোদলেয়ারের "ক্লেদজ কুসুম"-এর অধিকাংশ কবিতাই সনেট ; 'বীভৎস নগরী'ও তা-ই। চল্লিশের দশকে যিনি লিখেছেন "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪), পঞ্চাশের দশকে যিনি লিখেছেন "সিরাজাম মুনীরা" (১৯৫২), ষাটের দশকে "হাতেম তায়ী" (১৯৬৬) — এইসব আশাবাদে আন্দোলিত কবি ষাটের দশকেই কেন 'বীভৎস নগরী'র মতো বিববিষাময় বিবিক্ত কবিতা লিখতে গেলেন? এর কারণ খুঁজতে হবে ফররুখ-মানসের গভীরে।

"সাত সাগরের মাঝি"র কবি চূড়ান্ত রোমান্টিক, "সিরাজাম মুনীরা"র কবি চূড়ান্ত আদর্শবাদী, "হাতেম তায়ী"র কবির মধ্যে রোমান্টিকতা-আদর্শিকতার এক সমন্বয়ী প্রমূল্য দোলায়িত ; কিন্তু ফররুখের আতীব্র রোমান্টিকতা আর ক্রমপ্রসারী আদর্শিকতার তলে-তলে অন্য একটি ক্ষোভ-খেদ-সন্তাপ দীর্ঘদিন ধ'রে জমছিলো। তার জন্যে ফররুখ একটি ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছিলেন — ব্যঙ্গকবিতা। আবার, ব্যঙ্গকবিতা তিনি লেখেন স্বনামে নয় — ছদ্মনামে, অজস্র ছদ্মনামে। দেশবিভাগের আগে, মোটামুটি মধ্য-চল্লিশের দশক থেকে তাঁর ব্যঙ্গকবিতা রচনার সূত্রপাত হয় — কিন্তু স্বনামে তিনি প্রথম সাহিত্যজীবনে কয়েকটি মাত্র ব্যঙ্গকবিতা লিখেছেন। দেশবিভাগের পরে, কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে, ক্রমশ অজস্র ব্যঙ্গকবিতায় নিজেকে তিনি বিকীর্ণ ক'রে দেন। ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের পর দু-একটি কবিতায় তাঁর আশাভঙ্গের বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। সমকালীন কবি তালিম হোসেন ফররুখের এরকম একটি কবিতার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন আমাদের — ১৯৫২ সালে দৈনিক 'মিল্লাতে' প্রকাশিত ফররুখের 'আহ্বান' কবিতা — যেখানে তিনি (আমরা আশ্চর্য হ'য়ে শুনি) বলছেন : 'আমরা পাইনি মুক্তি, শুনি নাই ঝড়ের স্পন্দন,— /গোলামী জিঞ্জিরে তাই শোকোচ্ছ্বাস ওঠে প্রতি ক্ষণে।' দেশবিভাগের মাত্র বছর পাঁচেক পরে ফররুখ আহমদের কণ্ঠে এরকম উক্তি আমাদের অবিশ্বাস্য লাগে ঠিকই ; কিন্তু — স্মরণীয়, ফররুখের এই সনেটও শেষ হচ্ছে প্রবল আশাবাদী আহ্বানে (কবিতার নামটিও লক্ষণীয় : 'আহ্বান') : 'উড়ে যাক, পুড়ে যাক জড়তার অনুকারী সাজ/আত্মপ্রত্যয়ের কক্ষে সূর্য হোক স্বপ্ন এ রাত্রির।' — সে যাই হোক, ফররুখ আহমদ ব্যঙ্গকবিতার ছদ্মবেশই গ্রহণ করেছিলেন, তার সঙ্গে তাঁর স্বনামাঙ্কিত কবিতাকে মেলাতে চাননি : কেন্দ্রীয় ফররুখ আহমদ রোমান্টিক-আদর্শিক হিশেবেই, সিরিয়াস কবিতার রচয়িতা হিশেবেই পরিচিত হ'তে চেয়েছিলেন। একটির পর একটি ব্যঙ্গকবিতায় ফররুখ সমকালীন দেশ-কাল-সমাজকে ক্রমাগত আঘাত ক'রে যাচ্ছিলেন — বোঝা যায় :

www.pathagar.com

ভিতরটা তাঁর ভ'রে গিয়েছিলো অপার তিক্ততায়। কিন্তু তারই মধ্যে স্বকীয় কাব্যাদর্শকে তিনি প্রাণপণে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর কেন্দ্রীয় কবিতায় তিনি নানামুখে বিস্তৃত হচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর অন্তর্গত অদম্য ক্ষোভ-তাপ তাতে প্রকাশ করেননি। হয়তো জাগতিক বাধাও ছিলো : নিজে সামান্য সরকারি চাকরি করতেন, তা-ও আবার সরকারি প্রকাশ-মাধ্যম বেতারে, আবার অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধ'রে নিজেকে তিনি রোমান্টিক-আশাবাদী-আদর্শবাদী কবি হিশেবে জনসমক্ষে করেছিলেন উপস্থাপন। কিন্তু হঠাৎ আতীব্র হাওয়ায় পর্দা স'রে গেলো, আপন দমিত অবচেতনকে ফররুখ উন্মোচিত করলেন। 'বীভৎস নগরী' সেই অকস্মাৎ-উন্মোচিত কবিতা, মুখোশ-স'রে-যাওয়া মুখের ছবি।

ফররুখ আহমদের সাহিত্যজীবন পরিস্কার দুভাবে বিভক্ত : ১৯৩৭-৪৮ সময়পর্যায় কলকাতায় অতিবাহিত হয় ; ১৯৪৮-৭৪ সময়পর্যায় ঢাকায়। ফররুখ আহমদের প্রাথমিক কবিতায় — কবির পরিকল্পিত কিন্তু মৃত্যুর পরে প্রকাশিত "হে বন্য স্বপ্নেরা"য় (১৯৭৬) এরকম বেশ-কিছু কবিতা সংকলিত হয়েছে — দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের কলকাতা রূপায়িত হয়েছে। ঢাকা শহর সেভাবে তাঁর কবিতায় আসেনি — ঢাকাকে তিনি ইতিহাসের পটেই স্থাপন ক'রে দেখতে ভালোবেসেছেন। আবার কলকাতা ও ঢাকা শহরের অধিবাসী ফররুখ মর্মে-মর্মে সমুদ্রপ্রেমিক, কবিতা ও সিন্ধুর প্রেমে দারিদ্র্যকে যেমন পরোয়া করেননি, তেম্নি যে-শহরের বাসিন্দা তিনি তার প্রতিও তেমন নজর দেননি — তাঁর মনোজগৎ অন্য এক বৃহতের প্রেমে বেরিয়ে পড়েছিলো। তবু ফররুখ স্বদেশ ও স্বকালেরও কবি। 'বীভৎস নগরী'তে তারও একটি চিত্রণ মুদ্রিত।

রাত্রি ফররুখ আহমদের অজস্র কবিতার পটভূমি নির্মাণ করেছে। তাঁর বিভিন্ন কবিতা থেকে রাত্রিকালীন ক-টি ছিন্নাংশ উদ্ধৃত করছি :

১. গোধূলি-তরল সেই হরিণের তনিমা পাটল
— অস্থির বিদ্যুৎ, তার বাঁকা শিঙে ভেসে এল চাঁদ
সাত সাগরের বুকে সেই শুধু আলোক-চঞ্চল ;
অন্ধকার ধনু হাতে তীর ছোঁড়ে রাত্রির নিষাদ।

[বন্দরে সন্ধ্যা, সাত সাগরের মাঝি]

২. তারার বন্দর ছেড়ে চাঁদ চলে রাত্রির সাগরে
ক্রমাগত ভেসে ভেসে পালক মেঘের অন্তরালে,
অশ্রান্ত ডুবুরি যেন ক্রমাগত ডুব দিয়ে তোলে
স্বপ্নের প্রবাল।

[ডাহুক, ঐ]

www.pathagar.com

৩. এইসব রাত্রি শুধু একমনে কথা কহিবার
নিজেদের সাথে,
পুরানো যাত্রীর দল যারা আজ ধূলির অতিথি
দাঁড়ালো পশ্চাতে।

[এইসব রাত্রি, ঐ]

৪. মন মোর আসন্ন সন্ধ্যার তিমিমাছ—
ডুব দিল রাত্রির সাগরে।

[মন, সিরাজাম মুনীরা]

৫. বর্ষার বিষণ্ন চাঁদ এ রাতেও উঠেছে তেমনি
যেমন সে উঠেছিল হাজার বছর আগেকার
বৃষ্টি-ধোওয়া আসমানে। সে রাত্রির অস্ফুট ব্যথায়
মৃদু স্বর আছে এ আকাশে।

[বর্ষার বিষণ্ন চাঁদ, মুহূর্তের কবিতা]

৬. ইরাণী ছুরির মত তীক্ষ্ণধার হাওয়া উত্তরের
বিদ্ধ হয় অনাবৃত তরুশীর্ষে, নিমেষে নিমেষে
তারি স্পর্শ পাই শূন্য প্লাটফর্মে ; মাঘ রাত্রি শেষে
সুপ্তিমগ্ন জনপ্রাণী এখন সিলেট শহরের।

[সিলেট স্টেশনে একটি শীতের প্রভাত, ঐ]

৭. কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি. ডিপোতলে এঞ্জিন বিকল—
সুদীর্ঘ বিশ্রান্ত শ্বাস ফেলে জাগে ফাটা বয়লার,
অবরুদ্ধ গতিবেগ। তারপর আসে মিস্ত্রিদল
গলানো ইস্পাত আনে, দৃঢ় অস্ত্র হানে বারবার।

[কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি, শ্রেষ্ঠ কবিতা]

৮. তার কালো দীর্ঘ তরঙ্গের একটানা সুর ভেসে আসে,
সে অতল সমুদ্র গহনে সারা মন সংকুচিত ত্রাসে,
জনতার মুখর সভায় খোঁজে ভীরু কথার আড়াল
অসংখ্য জোনাকি শিখা নিয়ে জ্বলে দূরে ছায়াচ্ছন্ন তাল
আর পাশে তমিস্রা প্রচ্ছায় রাত্রির তরঙ্গ বয়ে যায়।

[মধুমতীর তীরে, ঐ]

www.pathagar.com

৯. দুর্ভেদ্য তিমির ঘন রাত্রির তোরণ হ'তে ভেসে আসে দোয়েলের শিস্
সন্ধ্যার বালুতে জ্বলে দিবসের শেষ সূর্য বিচিত্র ভূষায়
অজ্ঞাত রাত্রির তীরে শোনা গেল শেষবার দোয়েলের শিস্
তীক্ষ্ণ সুর সুতীব্র সংগীত।

[দোয়েলের শিস, ঐ]

১০. তখন উঠেছে চাঁদ দূর মরু দিগ্বলয় কোলে,
স্বপ্নঘোরে বনভূমি জেগে ওঠে হেজাজী হাওয়ায়
জোহরা তারার পাশে আবছায়া মৃদু স্বপ্ন দোলে
গোলাব রাঙিয়া ওঠে নিশীথের তিমির প্রচ্ছায়।

[কাফেলার আয়োজন, ঐ]

১১. দিনের দুঃস্বপ্ন শেষে আজ রাত্রে সুন্দরী ধরণী
চাঁদের জেওর পরি' সাজিয়াছে সুন্দরী উর্বশী
অকলংক জ্যোৎস্না মাঝে বিকশিত পূর্ণ পঞ্চদশী
সন্ধ্যার আরক্ত বর্ণে ভেসে এল সোনার বরণী।

[ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ারে পূর্ণিমা, ঐ]

১২. কাল এসেছিল ইরানী হাওয়ার রাত
নিশীথ খোঁপায় সিতারার ফুল গুঁজে
বন্ধুর পথ খুঁজে
গুলমোহরের রঙিন খাবের
আশায় সে সারা রাত
আমার বাজুতে প'ড়ে ছিল মুখে গুঁজে।

[ইরানী হাওয়ার রাত, ঐ]

ফররুখ আহমদের অসংখ্য কবিতায় এরকম স্বপ্নাচ্ছন্ন রাত্রিই চিত্রিত হয়েছে। এইসব স্বপ্নকল্পনাময় রাত্রির বর্ণনার সঙ্গে 'বীভৎস নগরী' কবিতার রাত্রির বর্ণনার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ফররুখের রাত্রি-রোমান্টিকতার সমস্ত পালকগুলি এখানে ঝ'রে গেছে। এখানে ন্যাড়া পার্ক ; নগ্ন রেস্তোরাঁ ; মাতাল, গণিকা, তস্কর, পকেটমার আর জুয়াচোরের রাজত্ব : ব্যাধিগ্রস্ত কিন্তু বর্ণলিপ্ত প্রমোদবালার সঙ্গেই তুলনীয় এই রাত্রির নগরী। বোদলেয়ারের 'সান্ধ্য প্রদোষ' কবিতাতেও তো এদেরই দেখেছি : বেশ্যা, মাতাল,

www.pathagar.com

জোচ্চোর, তাদের সাগরেদ, চোর — এদের, আর ঐ কবিতায় প্যারিসকে বোদলেয়ারও বলেছিলেন 'ক্লেদের নগর'। কিন্তু 'সান্ধ্য প্রদোষ' কবিতার শেষদিকে বোদলেয়ারের আত্মতাও রচিত হয়েছে ; আর 'বীভৎস নগরী' একেবারেই তন্ময় কবিতা : ফররুখ নিজেকে আড়ালে রেখে কেবল একটি চিত্র রচনা ক'রে দিলেন। তাহ'লেও শেষ-বিচারে এই কবিতাও আসলে গোপনে অমৃতকেই আকাঙ্ক্ষা করেছে, পিশাচের 'চিরকাম্য, বাঞ্ছিত নরক' ছেড়ে মানুষের স্বর্গকেই কামনা করেছে। রোমান্টিক-আদর্শিক কবি ব'লেই ফররুখ দূরপ্রেমিক — বিংশ শতাব্দীর কলকাতা বা ঢাকা শহরে বাস ক'রে তিনি সমুদ্রের অনুধ্যান করেছেন, অতীতের অন্বেষণ করেছেন — সেও আবার ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্যে। নগরীতে বাস ক'রেও নগরীর আত্মাকে তিনি ভালোবাসেননি। কিন্তু এমন ঘৃণাও কি কখনো প্রকাশ করেছেন? 'বীভৎস নগরী' কবিতায় ফররুখীয় উদ্দামতা নেই, উত্তালতা নেই, প্রার্থনা নেই, দূরবিস্তার নেই — আছে এক রুদ্ধশ্বাস শহরের রাত্রির ক্লেদাক্ত বর্ণনা। বাংলাদেশের ষাটের দশক ফররুখ আহমদকে দিয়ে তাঁর স্বভাববিরোধী এই কবিতাটি লিখিয়ে নিয়েছিলো॥

www.pathagar.com

শব্দ

১৯৩০ সালে আধুনিক বাংলা কবিতার ইশতাহার, কবি-সমালোচক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্যের মুক্তি' প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি কয়েক বছর আগে অতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্যসভায় পঠিত হয়। খুবসম্ভবত প্রবন্ধটি সুধীন্দ্রনাথ পরে বিশদভাবে পরিশোধন, পরিবর্ধন করেন। এই প্রবন্ধটিকে আমি বলছি 'আধুনিক বাংলা কবিতার ইশতাহার', তার কারণ এর মধ্যেই আধুনিক বাংলা কবিতার গন্তব্য ও উপায় সম্পর্কে প্রকৃত দিকনির্দেশনা আছে। কেউ-কেউ হয়তো বুদ্ধদেব বসুর "দময়ন্তী" (১৯৪৩) কাব্যের পরিশিষ্টে স্থাপিত 'জাঁকালো ঘোষণাপত্র'টির (বুদ্ধদেবেরই ভাষায়, "কবিতার শত্রু ও মিত্র", পৃ. ৫০) কথা বলবেন। কিন্তু ঐ ঘোষণাপত্রটি ছিলো কেবল কবিতার প্রকরণ প্রাসঙ্গিক, যা বুদ্ধদেবের সমকালীন কবিরা আগেই মেনে চলতে শুরু করেছিলেন। আধুনিক কবিতার আত্মা ও অন্বিষ্ট সুধীন্দ্রনাথ-প্রণীত 'কাব্যের মুক্তি'তেই ধরা আছে। এই প্রবন্ধের একাংশে শব্দের স্বভাব সম্পর্কে অসামান্য একটি বিশ্লেষণ আছে :

> শব্দের স্বভাব টাকার মতো ; বহুব্যবহারে তা ক্ষ'য়ে যায়, হস্তান্তরে তাতে কলঙ্ক জমে, বয়স তাকে অচল করে, আবার কালে সে স্থানে পায় যাদুঘরের গ্লাসকেসে। কিন্তু ম্যুজিয়ম-ভুক্তি বিলুপ্তির নামান্তর নয় ; অপ্রচলিত শব্দও অবস্থাবিশেষে কাজে লাগে। প্রাচীন মুদ্রার ব্যবহারিক মূল্য যখন ক'সে আসে, তখন তার আলঙ্কারিক মর্যাদা বাড়ে।/অতএব রূপদক্ষের হাতে পড়লে, পুরানো শব্দও কাব্যের বাধ সাধে না ; এবং ডাউটির রচনায় অ্যাংলো-স্যাক্সন্ শব্দগুলোই আমার কথার শ্রেষ্ঠ সাক্ষী। উপরন্তু সম্ভ্রান্ত শব্দ-সম্বন্ধে যে-কথা খাটে, অপভাষার পক্ষেও তা মিথ্যা নয় ; এবং ক্ষেত্রবিশেষে, বিশিষ্ট ভাবানুষঙ্গের খাতিরে আধুনিক কবি সাধু-অসাধু, নবীন-প্রবীণ, দেশি-বিদেশি সকল শব্দকেই সমান প্রশ্রয় দেয়। ভাষার বিষয়ে তার একমাত্র মানদণ্ড প্রাসঙ্গিকতা ; কেননা ভাষা রূপেরই উপাদান।
>
> [কাব্যের মুক্তি, স্বগত]

'অপ্রচলিত শব্দও অবস্থাবিশেষে কাজে লাগে' এবং 'রূপদক্ষের হাতে পড়লে, পুরানো শব্দও কাব্যের বাধ সাধে না' — কথা দুটি লক্ষণীয়। পুরোনো ও অপ্রচলিত শব্দব্যবহারে আধুনিক বাংলা কবিতার দুই প্রধান পুরুষের একজন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্বয়ং, অন্যজন

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদ। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পরীক্ষা করেছেন সংস্কৃত শব্দ নিয়ে, ফররুখ পরীক্ষা করেছেন আরবি-ফারসি শব্দ নিয়ে। যদিও সুধীন্দ্রনাথ 'সরমার্ত'-এর (সরম + আর্ত) মতো শব্দ সৃষ্টি করেছেন, ফররুখ 'সেতারা'র পাশেই বসিয়েছেন 'শশী' শব্দটি — তা তাঁদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা যথাক্রমে সংস্কৃত এবং আরবি-ফারসি শব্দব্যবহারে। এই পরীক্ষায় এঁরা কেউ একাকী ছিলেন না : সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সহযাত্রী ও অনুযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন বিষ্ণু দে, মনীশ ঘটক, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, এমনকি সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং ফররুখ আহমদের সহযাত্রী ও অনুযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ আলী আশরাফ প্রমুখ : প্রত্যেকের স্বরমাত্রায় অল্পবিস্তর পার্থক্য ছিলো, কিন্তু দুই গন্তব্যের শিখরে উঠেছিলেন কেবল সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও ফররুখ আহমদ।

দুই ক্ষেত্রেই বিষয়টা ছিলো স্বতন্ত্র হওয়ার সমস্যা। রবীন্দ্রনাথের পরে জ'ন্মে তিরিশের কবিদের তথা সুধীন্দ্রনাথের চেষ্টা ছিলো আলাদা হওয়ার। (মৌখিক আলাপে একবার অনুজ কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে সুধীন্দ্রনাথ সরাসরি সে-কথা বলেনও — সুনীল একথা তাঁর একটি স্মৃতিরচনায় জানিয়েছেন।) আর বাঙালি-মুসলিম তিরিশের কবিদের মূলত-অসচেতন ধারাবাহিকতার পরে সুচেতন চল্লিশের কবিরা স্বতন্ত্র হ'য়ে উঠতে চাইলেন : রবীন্দ্র-নজরুল-তিরিশের কাব্যধারা থেকে। পুঁথিসাহিত্যের পুনরুজ্জীবন অনেকখানি তার আপন শিকড় সন্ধানের চেষ্টা, আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগও তাই। এই প্রচেষ্টায় সমগ্র নজরুলকে তাঁরা গ্রহণ করেননি ; যদিও, না-মেনে উপায় নেই, নজরুলই তাঁদের আত্মবলে সাহস জুগিয়েছিলেন। যেমন সুধীন্দ্রনাথকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সুধীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণের একস্থানে বলেন : ' . . . . The first duty of every self-respecting author should be to recall the past whenever he is confronted with the future and realise only such part of the desired end as is implicit in the means at his disposal momentarily. I am afraid that after Michael this duty has been increasingly neglected . . . ., 'সুধীন্দ্রনাথ যে-অতীতের পুনরুজ্জীবনের কথা বলেছিলেন, ফররুখ আহমদের লক্ষ্য ছিলো তা-ই। ঐ প্রবন্ধে 'বাঙালি সংস্কৃতির মানবতাবাদের উদ্ভবে মুসলিম ধর্ম, বিশেষ করে সুফীবাদের প্রভাবে'র (সুধী প্রধান-উল্লিখিত) কথা বলেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। সেদিক থেকেও দেখা যাবে : ফররুখের সমগ্র কাব্যে বাঙালি-মুসলিম সংস্কৃতির মানবতাবাদই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে। প্রসঙ্গত এ তথ্যও এখানে স্মর্তব্য যে, ফররুখ আহমদেরও প্রিয়তম কবি ছিলেন মাইকেল।

www.pathagar.com

আরো : সুধীন্দ্রনাথ ও ফররুখ মাইকেলের কাছ থেকে ধ্রুপদের পাঠ নিয়েছিলেন এবং তাঁদের কাব্যে নিজের-নিজের ধরনে কাজে লাগিয়েছিলেন।

বাংলা কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দব্যবহার ফররুখের আগে ব্যাপকভাবে করেছেন ভারতচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক শিল্পিত ব্যবহার নজরুলেরই। মোহিতলাল প্রথমবার নজরুল-কাব্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন নজরুলের বিস্ময়কর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের জন্যেই। নজরুল-যে একবার রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন ('বড়র পিরীতি বালির বাঁধ'), তা 'খুন' শব্দ নিয়ে। নজরুল দেখিয়েছিলেন, 'রক্ত' শব্দ দিয়ে 'খুন' শব্দের মহিমা বোঝানো যাবে না। ঐ প্রবন্ধেই ক্ষুব্ধ নজরুল এমন একটি সত্য উচ্চারণ করেছিলেন, যা পরবর্তী সমস্ত বাঙালি-মুসলিম লেখককে সাহসী করেছে — নজরুল বলেছিলেন, বিশ্বকবিতার একটি 'মুসলমানী ঢং' আছে। তথ্য হিশেবে এও লক্ষণীয় যে, নজরুলের শব্দ ব্যবহারে একটি সর্বগ্রাসী প্রবণতা ছিলো, আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে তিনি বিপুলভাবে চলতি ও আঞ্চলিক শব্দও কবিতায় এনেছেন। অন্যদিকে, ফররুখ আহমদের পরীক্ষা-সমীক্ষা আরবি-ফারসি শব্দপ্রয়োগেই কেন্দ্রিত। কিন্তু তাঁর ঐসব শব্দব্যবহার একরকম নয় — নানারকম স্তরভেদ আছে।

এই প্রবন্ধের সূচনায় সুধীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতাংশের দুটি জায়গায় নজর দেওয়া যাক : 'রূপদক্ষের হাতে পড়লে, পুরানো শব্দও কাব্যের বাধ সাধে না' এবং 'ভাষার বিষয়ে তার [অর্থাৎ শব্দপ্রয়োগের] একমাত্র মানদণ্ড প্রাসঙ্গিকতা'। এখন দেখতে হবে, ফররুখের (১) আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার প্রাসঙ্গিক কিনা এবং (২) প্রকৃত রূপদক্ষের মতো কিনা। প্রথমত, দেখা যাবে : ফররুখের যে-সব কাব্যের বিষয় ইসলামী অথবা পুঁথিনির্ভর, সেগুলিই আরবি-ফারসি শব্দকীর্ণ ; বিষয় যখন বাংলাদেশের কোনো স্থান বা ঘটনা, সেখানে আরবি-ফারসি শব্দব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। "সাত সাগরের মাঝি"র অধিকাংশ কবিতার সুপ্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে, কিন্তু 'লাশ' কবিতায় নয় ; "সিরাজাম মুনীরা"র তুলনায় "মুহূর্তের কবিতা"য় আরবি-ফারসি শব্দ কম। দ্বিতীয়ত, তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য "সাত সাগরের মাঝি"তে ফররুখের আরবি-ফারসি শব্দব্যবহারও শ্রেষ্ঠভাবে ব্যবহৃত। আরব্যোপন্যাসের জগৎ যেখানে কিংবা যেখানে ইসলামের ইতিহাসের ঐশ্বর্য বিকিরিত, সেখানে তো আরবি-ফারসি শব্দব্যবহার প্রাসঙ্গিক কারণেই আসবে, যে-কোনো একটি জায়গা থেকে উদাহরণ দেওয়া যায়। 'শাহরিয়ার' কবিতার শেষ স্তবক :

www.pathagar.com

জুলমাত-ম্লান ডেরায় চেরাগ জ্বালাও শাহেরজাদী।
আমার মাটিতে ছড়াও আনারদানা,
হে উজীরজাদী! আজ তুমি আর শুনো না কারুর মানা,
হাজার নাজুক কমনীয় মুখ যেখানে ভাসছে, আর
আতশী দহনে খুনের তুফানে জ্বলছে শাহরিয়ার।

[শাহরিয়ার, সাত সাগরের মাঝি]

কিংবা যেখানে ইতিহাসভিত্তিক, 'সিরাজাম মুনীরা মুহাম্মদ মুস্তফা'র শেষ স্তবক :

'কে আমি' জানালে তুমিই প্রথম হে মেষ-পালক উম্মী নবী।
দীপ্ত সূর্য আলো আরশিতে ধরিয়ছে কাল তোমার ছবি।
সে এল, সে এল রাজার মত সে এ ধূলিতে তবু দীনের মত,
পুষ্পকোমল তার অন্তর হ'ল বিক্ষত কাঁটায় ক্ষত,
তবু সে জাগালো মেশকের বাস, জাগালো মরুতে গুলেআনার
ইব্রাহিমের পরশে যেমন ফুল হ'য়ে ফোটে ক্ষুব্ধ নার।

[সিরাজাম মুনীরা মুহাম্মদ মুস্তফা, সিরাজাম মুনীরা]

ফররুখের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ তোলা হয়, অপরিচিত শব্দ ব্যবহার নিয়ে। আমরা ভুলে যাই অপরিচিত আরবি-ফারসি শব্দ ফররুখ মূলত ব্যবহার করেছেন কেবল "হাতেম তা'য়ী" কাব্যগ্রন্থে। এই ধরনের অপরিচিত শব্দব্যবহারও সুচেতন ও পরিকল্পিত। এই সুচেতনা ও পরিকল্পনা দুই কারণে করেছেন ফররুখ : (১) পুঁথিনির্ভর ব'লেই ঐ কাব্যে বিপুল পরিমাণ আরবি-ফারসি শব্দপ্রয়োগ করেছেন ; (২) অপরিচিত আরবি-ফারসি শব্দব্যবহার ক'রেই হাতেম তা'য়ীর প্রাচীন জগতের পুনর্নির্মাণ সম্ভব — প্রাত্যহ পরিচিত শব্দে ঐ জগৎ ফোটানো যেতো না। হাতেম তা'য়ীর প্রাক-ইসলামিক সুদূর জগৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে কাব্যভাষায় প্রাচীনত্বের স্বাদ আনা দরকার ছিলো। স্মরণীয় : সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ "ভারত-প্রেমকথা" বইয়ে অতিগম্ভীর সংস্কৃত শব্দই প্রয়োগ করেছেন — কিংবা সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসমিশ্রিত কাহিনী নির্মাণের জন্যে সংস্কৃত শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ করেছেন। এটি বাংলা সাহিত্যেরই একটি স্বীকৃত সাহিত্যিক প্রযুক্তি। সুতরাং ফররুখ অপ্রচলিত শব্দ চালানোর চেষ্টা করেছেন — এ এক প্রথাগত ও যুক্তিহীন সমালোচনা। ফররুখ সর্বত্র ঐ ধরনের শব্দপ্রয়োগ করেননি। এমনকি এই কাব্যের সর্বত্রই ঐ ধরনের শব্দব্যবহার হয়নি ; যেমন :

www.pathagar.com

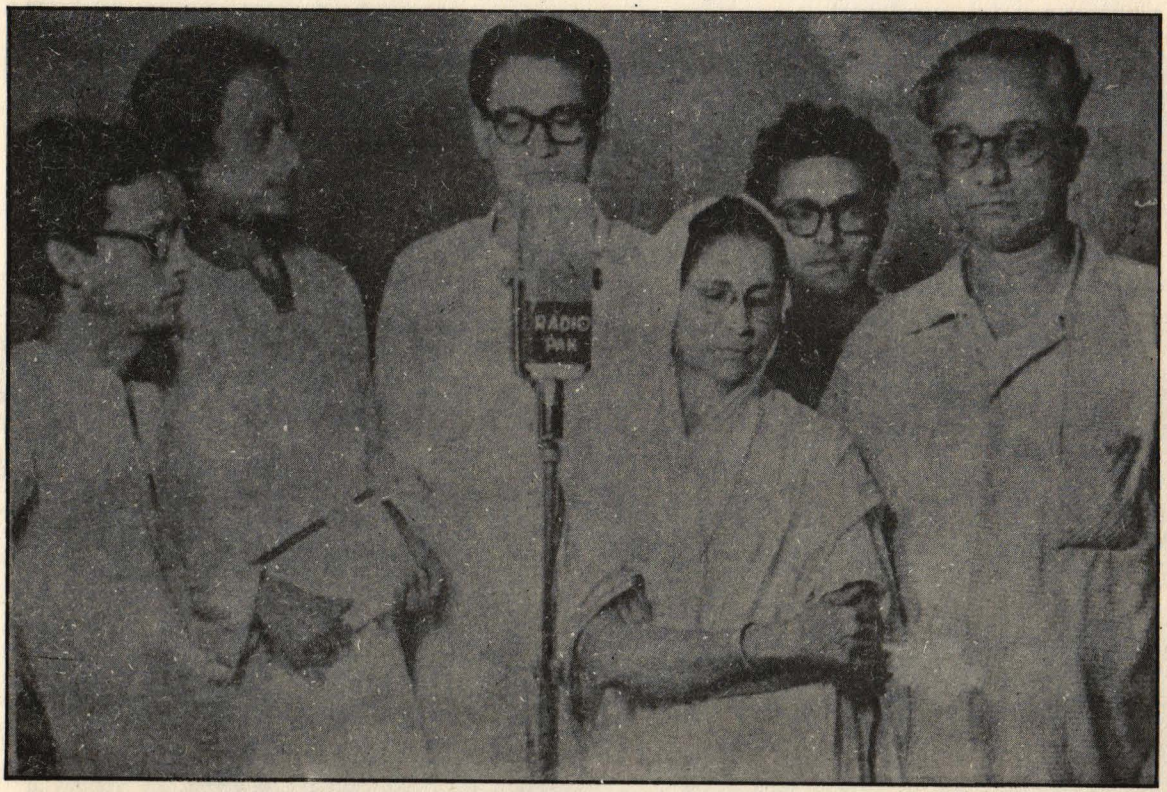

ঢাকা বেতারের একটি কবিতাপাঠের অনুষ্ঠানে (বাম থেকে) : কবি আহসান হাবীব, কবি ফররুখ আহমদ, কবি আবুল হোসেন, কবি বেগম সুফিয়া কামাল, কবি শামসুর রাহমান ও কবি আবদুল কাদির।

www.pathagar.com

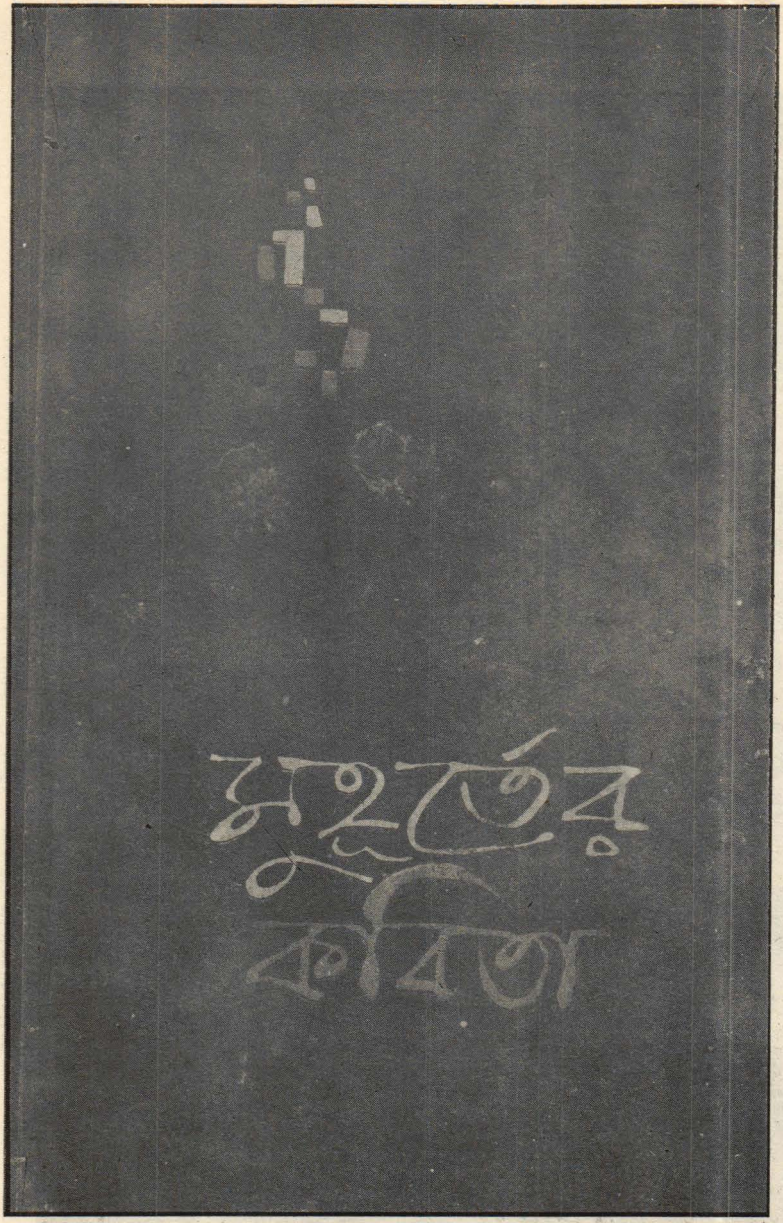

প্রচ্ছদ : মুহূর্তের কবিতা। শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী।

www.pathagar.com

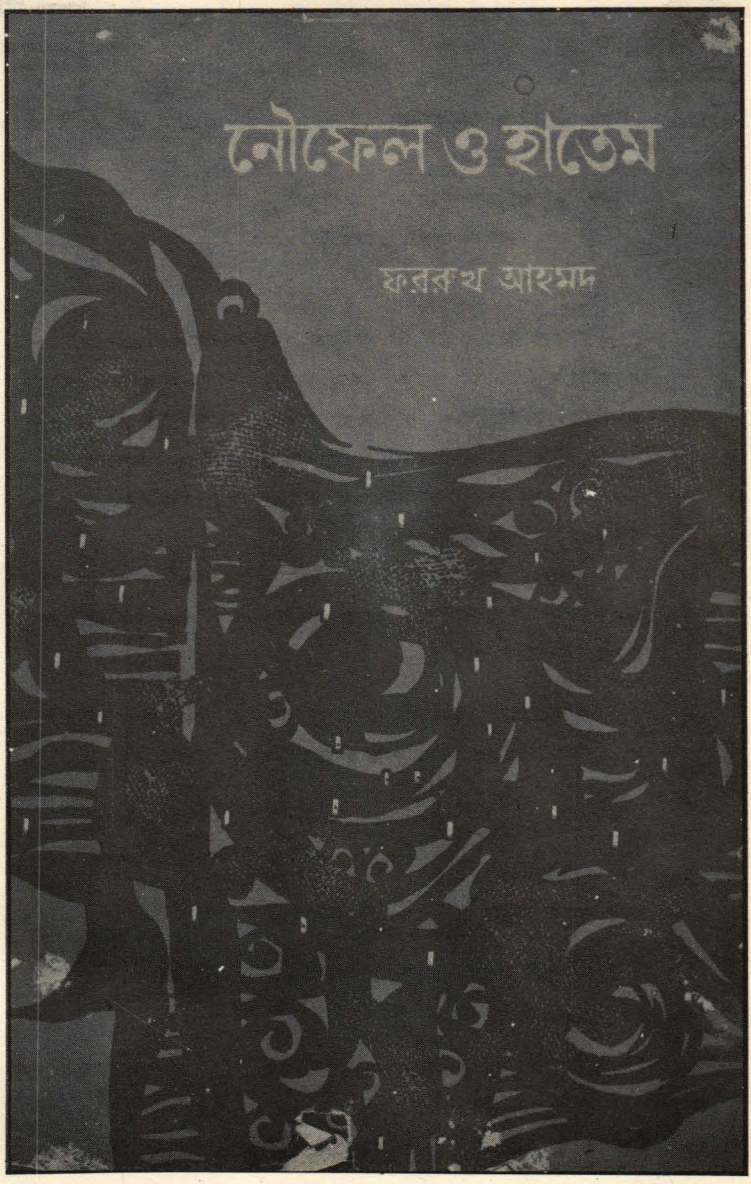

প্রচ্ছদ : নৌফেল ও হাতেম (চতুর্থ সংস্করণ)। শিল্পী : কালাম মাহমুদ।

www.pathagar.com

Telephone: 4069
9020

BENGALI ACADEMY,
Bardwan House,
Dacca—2.

No. পত্রের সংখ্যা ৮০৩০—বা—এ, The ১৪ই জুলাই, ১৯৬০ 19

প্রেরক ঃ পরিচালক, বাংলা একাডেমী,
বর্ধমান হাউস, ঢাকা।

জনাব,

বিগত ৪ঠা ও ৫ই মে তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমীর কর্মপরিষদের ৩২—তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি আপনাকে সানন্দে জানাইতেছি যে, বাংলা সাহিত্যে আপনার বিশিষ্ট ও বহুমুখী দানের স্বীকৃতিরূপে একাডেমী আপনাকে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির "ফেলো" বা "সম্মানিত সদস্যের" মর্যাদা দিয়া নিজেকেই গৌরবান্বিত মনে করিতেছে।

অতঃপর, আপনি যথানিয়মে একাডেমীর যাবতীয় সুখ-সুবিধা ভোগ করিবেন। আপনার বিশেষ অবগতির জন্য এতৎসঙ্গে আবশ্যক কাগজ-পত্র পাঠাইলাম।

আশা করি, একাডেমী আপনার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতা হইতে কখনও বঞ্চিত হইবে না। ইতি —

আপনার একান্ত
অনুগত

/ মুহম্মদ এনামুল হক /

পরম শ্রদ্ধেয়
কবি জহুরুল আহমদ
সাহেবকে লিখিত,
১ হুসুনে আল ভিলা, কমলাপুর, ঢাকা।

বাংলা একাডেমীর পরিচালক ড. মুহম্মদ এনামুল হক একাডেমীর পক্ষ থেকে ফররুখ আহমদকে এই পত্র লেখেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রচ্ছদ : হে বন্য স্বপ্নেরা। শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী।

www.pathagar.com

প্রচ্ছদ : নয়া জামাত (দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় মুদ্রণ)। শিল্পী : কামরুল হাসান।

www.pathagar.com

'বৈশাখ' কবিতার একটি ভূমিকা লিখেছিলেন কবি — যা প্রকাশকালে বর্জন করেন। কবিতাটি রচনাকালে যে-পরিকল্পনা কবি করেছিলেন, তারই নিদর্শন রয়েছে উদ্ধৃতাংশে।

www.pathagar.com

যখন রক্তিম চাঁদ অন্ধকার তাজীতে সওয়ার
উঠে আসে দিগ্বলয়ে, ওয়েসিস নিস্তব্ধ নির্জন,
দূরে পাহাড়ের চূড়া ধ্যান-মৌন ; অজানা ইঙ্গিতে
তখনি ঘুমন্ত প্রাণ জেগে ওঠে। তখনি এ মনে
মরু প্রশ্বাসের সাথে জেগে ওঠে বিগত দিনের
দীর্ঘশ্বাস। আধো-আলো-অন্ধকারে দেখি আমি চেয়ে
বিস্মৃতির দ্বার খুলে উঠে আসে ঘুমন্ত স্মৃতিরা
রাত্রির অস্পষ্ট পাখী দেখি আমি অজ্ঞাত বিস্ময়ে।

আশ্চর্য সে অনুভূতি। দুনিয়ার দুঃখ-সুখ থেকে
বিদায় নিয়েছে যারা, তাদেরি সে হারানো কাহিনী
জ্যোতিষ্কের ক্ষীণালোকে ফোটে লক্ষ বুদ্বুদের মত।
সিতারা চেরাগ যত নেভে-জ্বলে রাত্রির ডেরায়।
দৃষ্টির সম্মুখে এসে ঘুরে যায় আদম সুরাত
অতন্দ্র প্রহরী।

[উজীরজাদার প্রতি হাতেম তা'য়ী, হাতেম তা'য়ী]

ফররুখ, যিনি ছন্দ-মিলে বিশ্বাসী ছিলেন, আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার ক'রে তাঁর পক্ষে সুবিধা হ'লো এই যে, আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে বাংলা-সংস্কৃত শব্দের অন্তমিল রচনা ক'রে তিনি একটি অভিনবত্বের স্বাদ সৃষ্টি করলেন (এক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরী নজরুল — কিন্তু উত্তরাধিকারকে তো এভাবেই ভেঙে, অগ্রসর ক'রে নিয়ে যেতে হয়)। কয়েকটি উদাহরণ :

১. বুরাঈর সাথে পেয়েছি ভালাই অফুরান জিন্দিগী,
আবলুস-ঘন আঁধারে পেখম খুলেছে রাতের শিখী।

[সিন্দবাদ, সাত সাগরের মাঝি]

২ নতুন দ্বীপের পত্তনি নিয়ে পেতেছি যেখানে খিমা,
জরিপ করেছি সাত সাগরের সীমা।

[দরিয়ায় শেষ রাত্রি, ঐ]

www.pathagar.com

৩. মনে পড়ে সেই নওল উষার হাসিন পিয়ারা দিল
গ্লানি-কলঙ্কে মুছে গেছে হায় আমার সারা নিখিল।

[শাহরিয়ার, ঐ]

৪. তুমি কি ভুলেছ লবঙ্গ ফুল, এলাচের মৌসুমী,
যেখানে ধূলিতে, কাঁকরে দিনের জাফরান খোলে কলি,
যেখানে মুগ্ধ ইয়াসমিনের শুভ্র ললাট চুমি'
পরীর দেশের স্বপ্ন-সেহেলি জাগে গুলে বকাওলী।

[সাত সাগরের মাঝি, ঐ]

৫. তুমি কি এ ধূলিতলে সেই তরু? কিংবা জয়তুন।
তোমার প্রেমের বুকে একী সত্য দুর্জয় আগুন।

[ওসমান গণি, সিরাজাম মুনীরা]

৬. এমন সময় দুর্গম পথে ডাক এল যবে তার
অমনি সূর্যে ঝলসি উঠিল দুধারী জুলফিকার।

[আলী হায়দার , ঐ]

৭. এস তুমি সাড়া দিয়ে বিজয়ী বীরের মত, এস স্বর্ণশ্যেন,
বাজায়ে নাকাড়া, কাড়া এস তুমি দিগ্বিজয়ী জুলকারনায়েন।

[বৈশাখ, শ্রেষ্ঠ কবিতা]

সৈয়দ আলী আহসান ফররুখের শব্দব্যবহার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনটি আক্রমণ করেছেন :

১. ["সাত সাগরের মাঝি"র] পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ "সিরাজাম মুনীরা" বা আরো পরের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ যখন পাঠ করি তখন দেখতে পাই প্রথম কাব্যগ্রন্থের উচ্ছলতা সে [ফররুখ] আর অতিক্রম করতে পারেনি। সেটা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার কারণ, এসব শব্দ তাকে আনন্দের সঙ্গে রোমান্টিক ভাবাবহকে গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল। বিপুল পৃথিবীর বিচিত্র বিস্ময় এবং যন্ত্রণাকে প্রকাশ করবার সুযোগ দেয়নি।

২ "হাতেম তায়ী" কাব্যের বাণীভঙ্গি শব্দের বন্ধন-দশায় কবির আর্তনাদের মতো।

www.pathagar.com

৩. ফররুখ আহমদের বিদেশি শব্দ হচ্ছে আরবী-ফারসী শব্দ, কিন্তু সে শব্দগুলোও অর্থের বিশিষ্টতার কারণে গ্রাহ্য হয়নি, ধ্বনিগত কারণেই সেগুলো গৃহীত হয়েছে। কবিতায় শব্দের সিদ্ধি শুধু ধ্বনিগত কারণেই নয়, অর্থের কারণেও। মূলতঃ শব্দের অর্থবহতার চূড়ান্ত পরীক্ষা কবি করবেন, আমরা এটাই আশা করি। ফররুখ আহমদের কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের অর্থবহতার কোন পরীক্ষা ঘটেনি।

৪. .... তিনটি উদাহরণেই বাক্যাংশ এবং শব্দের পুনরাবৃত্তির ফলে একটি ধ্বনি-আবর্ত নির্মিত হয়েছে, যার ফলে আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত এ-ধ্বনির প্রসারটি পাঠকের স্মরণে থাকে। পাঠককে অথবা শ্রোতাকে আকর্ষণ করবার এ সহজ কৌশলটি ফররুখ সর্বদাই ব্যবহার করেছে।

অন্যায় আক্রমণ। আমরা এক-এক ক'রে জবাব দিচ্ছি এসবের :

১। এটা ঠিকই যে "সাত সাগরের মাঝি" ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ, এই কাব্যের শব্দব্যবহারও তুলনাহীন। আরবি-ফারসি শব্দব্যবহারকারী ফররুখের সমসাময়িক অন্য কবিরা তো বটেই, এমনকি ফররুখ নিজেও তাকে আর অতিক্রম করতে পারেনি । কিন্তু তার মানে কি এই যে, ফররুখের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলি নিরর্থক? সমকালীন কবিদের মধ্যে ফররুখের শ্রেষ্ঠত্ব কিন্তু কেবল "সাত সাগরের মাঝি"র রচয়িতা হিশেবেই নয় — সব মিলিয়েই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। আসলে একজন কবির কাছে কি আমরা কেবল আশা করবো পুনরাবৃত্তি, না অগ্রসরমানতা? "সিরাজাম মুনীরা" বা "মুহূর্তের কবিতা", "নৌফেল ও হাতেম" বা "হাতেম তা'য়ী" — ফররুখ একের পর এক নতুন-নতুন অঞ্চলে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন। এবং এইসব কাব্যের শব্দব্যবহারও তো তার বিষয় অনুসারেই হ'তে হবে। কল্পনার উচ্ছলতা "সাত সাগরের মাঝি"র শব্দপ্রয়োগেও রোমান্টিক উচ্ছলতা এনেছে — "সিরাজাম মুনীরা"র স্থির ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তার শব্দব্যবহার স্বস্থ হওয়াই স্বাভাবিক। তেম্নিভাবে "হাতেম তা'য়ী"তে এসেছে প্রাচীন ঘনঘোর শব্দপুঞ্জ, "মুহূর্তের কবিতা"য় আরবি-ফারসি শব্দের বিরলতা। আসলে কবিতায় শব্দব্যবহার প্রসঙ্গে একটি বিষয়ই তো সন্ধানীয় : কাব্যবিষয়ের সঙ্গে শব্দপ্রয়োগ ওতপ্রোত যুক্ত কিনা। 'বিপুল পৃথিবীর বিচিত্র বিস্ময় এবং যন্ত্রণাকে প্রকাশ করবার' দায়িত্ব কবির নয় — কবির দায়িত্ব তাঁর রচিত পৃথিবীর বিচিত্র বিস্ময় এবং যন্ত্রণা প্রকাশ করা। ফররুখ আহমদ তা সার্থকভাবে সম্পন্ন করেছেন।

২। "হাতেম তা'য়ী" সম্পর্কে সমকালীন কয়েকজন সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করছি : "হাতেম তা'য়ী" কাব্য যেমন বিশাল, কবি ফররুখ আহমদের রচনাও তেম্নি বলিষ্ঠ এবং প্রাণস্পর্শী। মুসলিম ঐতিহ্যের ছায়াঘেরা এই অপূর্ব অবদান কবিকে

www.pathagar.com

চিরদিনের জন্য স্মরণীয় করে রাখবে সন্দেহ নেই।' (মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্) 'বাঙলা সাহিত্যে ফররুখ আহমদের এ এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা।' (আবুল কালাম শামসুদ্দীন) 'বাংলা সাহিত্যে ফররুখ আহমদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর "হাতেম তা'য়ী"।' (আবদুল কাদির) "হাতেম তা'য়ী সম্ভবত কবি ফররুখ আহমদের কাব্যাদর্শের শ্রেষ্ঠ ফসল।' (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান) কোনো-কোনো সমালোচক যে-কাব্যগ্রন্থকে বলছেন 'শ্রেষ্ঠ' বা 'দুঃসাহসিক', তার বাণীভঙ্গিকে কি বলা যাবে 'শব্দের বন্ধন-দশায় কবির আর্তনাদের মতো'? আজকের অনেক তরুণ পাঠক জানেন না যে, ফররুখ আহমদের "হাতেম তা'য়ী" প্রকাশের পরে ষাটের দশকে একটি সাহিত্যিক আলোড়নই সৃষ্টি হয়েছিলো — নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছিলো বইটি । সেই সময় সৈয়দ আলী আহসানের মতো একই কুযুক্তিতে বইটিকে আক্রমণ করেছিলেন মরহুম রশীদ আল-ফারুকী 'সমকাল' পত্রিকায়। তাঁর মনে হয়েছিলো এই কাব্যটি : 'ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত পথ গ্রহণ এবং আধুনিক জীবন-বিমুখ কাহিনী নিয়ে মধ্যযুগীয় পুঁথিসাহিত্যের অঙ্গনে পুনঃপ্রবেশের প্রাণান্তকর প্রয়াস।' — "হাতেম তা'য়ী"র বিরুদ্ধে এইসব আক্রমণকে আমরা মনে করি অসাহিত্যিক। "হাতেম তা'য়ী"কে ফররুখ আধুনিক তাৎপর্যে রূপান্তরিত ও উন্নীত করতে চেয়েছেন, এই কাব্যের বাণীভঙ্গি কাব্যিক বা সাহিত্যিক, পরীক্ষামূলক , মূল্যবান ও উত্তীর্ণ। (আমার মনে পড়ছে কমলকুমার মজুমদারের কথা, যিনি সাধুভাষায় লিখেছেন ও উনিশ শতাব্দীর জগচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন — প্রথানুগত্যের এই দেশে ব'সে লিখলে তাঁর পরীক্ষামূলকতা কী অপমানিতই না হ'তো!)

৩। কবিতায় শব্দের একটি কাজ ব্যঞ্জনা সঞ্চার। বিদেশি শব্দে অর্থের যাথার্থ্য রক্ষা ক'রে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি সম্ভব ধ্বনিগত বা চিত্রগত ব্যঞ্জনার সাহায্যে — শব্দার্থের সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। সুধীন্দ্রনাথ বা ফররুখ যখন অব্যবহৃত সংস্কৃত বা আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করেছেন, তখন শব্দার্থ অপরিবর্তিত রেখেই ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। এ তথ্যও স্মরণীয় এখানে যে, কবিতার শব্দ সদাসর্বদা ব্যঞ্জনাকেই প্রকাশ করে না, অনেক সময় — অধিকাংশ সময় যথার্থকেই প্রকাশ করে। সারল্যের সৌন্দর্য কি কম? বলিষ্ঠতার সৌন্দর্য কি কম? ব্যঞ্জনা বা তির্যকতার সৌন্দর্যই একমাত্র সৌন্দর্য নয়। ইংরেজি শব্দ বাংলা কবিতায় (আধুনিক কালে নজরুল ও জীবনানন্দ) প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করেছেন, সেখানে কি ইংরেজি শব্দের অর্থ পরিবর্তন করা হয়েছে? অর্থবহতার পরীক্ষা কেবলমাত্র মাতৃভাষার শব্দে সম্ভব। বিদেশি শব্দে অর্থবহতার পরীক্ষা ঘটে শব্দার্থের ক্ষেত্রে নয় — বিদেশি শব্দ সংবলিত বাক্যের ব্যঞ্জনায়। আরবি-ফারসি শব্দব্যবহারে যাথার্থ ও ব্যঞ্জনা দুই ক্ষেত্রেই ফররুখ সফল।

www.pathagar.com

৪। না, ফররুখ শব্দ ও বাক্যের আবৃত্তি-পুনরাবৃত্তির কোনো 'সহজ কৌশল' আয়ত্ত করেননি। এটা যদি সহজ কৌশল হ'তো, তাহ'লে তো পুনরাবৃত্তি-অনুরাগী যে-কেউ ফররুখের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতেন। ফররুখ সাহিত্যের তথা কবিতার কোনো 'সহজ কৌশল' পেয়ে গিয়ে অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করেছেন, বিষয়টা এতো সরল নয়। শেষ-পর্যন্ত কলাকৌশলও সফল হয় লেখকের বা কবির আত্মার পবিত্রতায়, বিশ্বাসের দৃঢ়তায়, স্বপ্নের সৌজন্যে। সমালোচক-উদাহৃত নিম্নোক্ত কবিতাংশ কি পাঠক-শ্রোতা-আকর্ষী সহজ কৌশলের উদাহরণ মনে হয়, না এই ক-টি পঙক্তিতেই আমরা অনুমান করতে পারি একটি অসামান্য কবিতার হৃদয়স্পন্দন? —

এইসব রাত্রি শুধু একমনে কথা কহিবার —
খরস্রোতা জীবনের কোল ঘেঁষে যেখানে অসাড়
অন্ধকার বালিয়াড়ি, তলদেশে যাত্রীরা নিশ্চল
মৃত্যুর কুয়াশা মাঝে বিবর্ণ তুহিন তনুতল
আঘাতে সকল গান, সব কথা রিক্ত নিরুত্তাপ,
সয়ে যায় কবরের, সয়ে যায় ধূলির প্রতাপ,
এইসব রাত্রি শুধু একমনে সেই কথা শোনে
সেতারা উড়িছে তার অন্ধকার দুরন্ত পবনে।

আধুনিক বাংলা কবিতার দুই কবি — সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও ফররুখ আহমদ — শব্দপ্রয়োগে বাংলা কবিতার দিগন্ত সম্প্রসারিত ক'রে দুই সম্রাটের মতো আসীন রয়েছেন। কোনো প্রথাগত সমালোচনার ভয়ে পিছপা না-হ'য়ে এঁরা যে বাংলা কবিতাকে সংস্কৃত ও আরবি-ফারসি শব্দে সমৃদ্ধ ক'রেও বাংলা কবিতা হিশেবেই দাঁড় করিয়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করলেন, তা আর-একবার প্রমাণ করে : সাহিত্যের দিগ্বিজয়ের জন্যও সাহসই প্রথম শর্ত॥

www.pathagar.com

চিত্রকল্প

ফররুখ আহমদ চিত্রকল্পবাদী কবি ছিলেন না ; কিন্তু অনেক চিত্রকল্পের প্রয়োগ করেছেন তাঁর কবিতায়। বিশেষত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪) অসম্ভব সালংকারা। ফররুখের কাব্যগ্রন্থাবলির মধ্যে এই বইটিই সর্বাধিক চিত্রকল্প-ঋদ্ধ। আমাদের চল্লিশের কবিদের মধ্যে ফররুখই সর্বাধিক সফল চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। আর সাধারণভাবে বাংলা কবিতায় ফররুখের সমকালীন কবিদের মধ্যে দিনেশ দাসকে বলা যায় চিত্রকল্পী কবি : দিনেশ দাসের কবিতার প্রতিটি উচ্চারণ চিত্রকল্পময় : তাঁর বিশ্বাস মার্কসবাদে, কিন্তু অধিকাংশ শ্রেণীসংগ্রামী কবির মতো তিনি কখনো স্লোগান-চারিত্রের কবিতা রচনা করেন না ; সব সময়ই তিনি কথা বলেন প্রতিমায়, যে-প্রতিমা উপমা থেকে প্রতীক অবধি সঞ্চরণ ক'রে ফেরে কিন্তু তার আদি প্রতিমারূপ-কে সতত জাগ্রত রাখে অন্তরে। চিত্রকল্প প্রয়োগে তাই ফররুখের সঙ্গে দিনেশ দাসের তুলনা চলে না। চল্লিশের কবিদের মধ্যে যাঁরা কিছু বাকপ্রতিমা ব্যবহার করেছেন, যেমন — রাম বসু, তাঁর সঙ্গেই তিনি বরং তুলনীয়। পদ্ধতি ভিন্ন — কিন্তু দুজনের লক্ষ্যই একটি পরিচ্ছন্ন, শোষণহীন, উজ্জ্বল, আদর্শ সমাজ। চিত্রকল্পের সঙ্গে কল্পনার মিশেল থাকে ; আদর্শবান কবির হৃদয়ে জ্বলন্ত জাগ্রত থাকে এক স্বপ্ন ; সুতরাং ফররুখ আহমদ বা রাম বসুর মতো আদর্শবাদী কবির রচনায় চিত্রকল্পের প্রয়োগ স্বাভাবিক।

চিত্রকল্প শেষ-পর্যন্ত কল্পনারই শস্য, বস্তু ও কল্পনা দুইকেই নতুন অর্থে উত্তীর্ণ করে চিত্রকল্প : বস্তুকে করে কাল্পনিক, কল্পনাকে করে বস্তুগত। বস্তু ও কল্পনার মিলনে কবিই হন সংঘটক, ঐ দুয়ের মিলনে চিত্রকল্পের জন্ম হয়।

তিরিশের তুলনায় চল্লিশের কবিরা অনেক বেশি সমাজচিন্তিত যেমন, তেমনি আদর্শবান। এঁদের কাব্যিক তথা সাহিত্যিক ক্ষতিও হয়েছে ঐ আদর্শবাদিতা থেকে। এঁদের একটি প্রধান অংশ প্রথমত মার্কসবাদী বা ইসলামবাদী, শেষত মানবতাবাদী। মহাযুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গায় এঁদের কেউ-কেউ হ'তে পারতেন মর্বিড, মাতাল, অতিস্পর্শকাতর, আত্মধ্বংসী ও গূঢ়ার্থময়, তাহ'লে আমরা সম্পূর্ণ নতুন এক কবিতাধারা পেতে পারতাম ; — কিন্তু তা হয়নি। এঁরা প্রায় সকলেই সামাজিক-রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজেছেন। ফররুখও। চিত্রকল্প শেষ-বিচারে কল্পনারই শস্য, কবিতাও তা-ই। তাই দেখা যাবে, ফররুখ যেখানে কল্পনাময় সেখানেই ভালো কবিতা লিখেছেন, ভালো চিত্রকল্প সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেছেন। কিন্তু যেখানে তিনি বাস্তবতার দ্বারা আক্রান্ত, সেখানে তাঁর কবিতা পতিত হয়েছে। চিত্রকল্পও জমেনি। আমার এই উক্তির সাক্ষ্য দেবে কবির দুই কালের দুই কবিতাগ্রন্থ : "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪) এবং "হাবেদা মরুর কাহিনী" (১৯৮১)। সমুদ্রকেন্দ্রিক ও মরুভিত্তিক ফররুখের এই দুই কবিতাগ্রন্থই শেষ-পর্যন্ত সমকালীন জীবন, মানস ও চরিত্রকে ধারণ করতে চেয়েছে — কিন্তু কল্পনার জয় যেখানে হয়েছে সেখানে তাঁর কবিতা বিজয়ী, আর বাস্তবতা যেখানে পরিব্যাপ্ত সেখানে কবিতা নির্জিত হয়েছে। কবিতার জন্যে দরকার কল্পনার জয়, চিত্রকল্পের জন্যে দরকার কল্পনার জয়।

"সাত সাগরের মাঝি"র সমুদ্রচারী জগৎ থেকে একগুচ্ছ চিত্রকল্প চয়ন করা যাক :

১. কেটেছে রঙিন মখমল দিন নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক।

[সিন্দবাদ]

২. বুরাঈর সাথে পেয়েছি ভালাই অফুরান জিন্দিগী,
আবলুস-ঘন আঁধারে পেখম খুলেছে রাতের শিখী।

[সিন্দবাদ]

৩. কাল ঝোড়ো রাতে দাঁড়ের আঘাতে দামী জেওরের মত
হীরা জওহর ফুটেছিল কত দরিয়ার নীল ছাঁচে,
সফরের মায়া টানছে আমাকে দূর হ'তে আরো দূরে —
নোনা দরিয়ার আকাশ আমার জাগছে বুকের কাছে ;
আল্লার এই অশেষ আলমে অফুরান রূপ, রস
জমে গাঢ় হয়ে দূর সফরের আশা যেন হীরাকষ —

[দরিয়ায় শেষ রাত্রি]

৪. চাঁদির তখতে চাঁদ ডুবে যায়
পাহাড় পেতেছে জানু,
নতুন আকাশে জীবনের সুর
জাগাও হাসিন বানু।

[শাহরিয়ার]

www.pathagar.com

৫. লায়লির ইশারায় বুকে পুরে তারুণ্যের লেলিহ আগুন
সবুজ দিগন্ত তার পাড়ি দিয়ে চ'লে গেছে কবে মজনুন
ধূসর জগতে।
পরতে পরতে
এঁকে গেছে, রেখে গেছে তারা
ওয়েসিস বুকে নিয়ে হেসেছে সাহারা।

[ঝরোকা'য়]

৬. তারার বন্দর ছেড়ে চাঁদ চলে রাত্রির সাগরে
ক্রমাগত ভেসে ভেসে পালক মেঘের অন্তরালে,
অশ্রান্ত ডুবুরি যেন ক্রমাগত ডুব দিয়ে তোলে
স্বপ্নের প্রবাল।

[ডাহুক]

৭. এইসব আঁধারের পানপাত্র, মর্মর নেকাব
ছাড়ায়ে হীরার কুচী, জ্বলিতেছে জুলেখার খা'ব
লায়লির রঙিন শারাব। কেনানের ঝরোকার ধারে ;
ঝরিছে রক্তিম চাঁদ আঁধারের বালিয়াড়ি পারে।

[এইসব রাত্রি]

৮. কেশর-ফোলানো পালে লাগে হাওয়া মাস্তুলে দোলে চাঁদ,
তারার আগুনে পথ বেছে নেয় স্বপ্নেরা সারারাত,
তাজী ছুটে চলে দুরন্ত গতি দুর্বার উচ্ছল ;
সারারাত ভরি' তোলপাড় করি' দরিয়ার নোনাজল।

[বা'র দরিয়ায়]

ফররুখের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকল্পময় কবিতা 'বন্দরে সন্ধ্যা' তাঁর "সাত সাগরের মাঝি" কাব্যের অন্তর্ভূত। কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য :

www.pathagar.com

বন্দরে সন্ধ্যা[১]

গোধূলি-তরল সেই হরিণের তনিমা পাটল
— অস্থির বিদ্যুৎ, তার বাঁকা শিঙে ভেসে এল চাঁদ
সাত সাগরের বুকে সেই শুধু আলোক-চঞ্চল ;
অন্ধকার ধনু হাতে তীর ছোঁড়ে রাত্রির নিষাদ।
আরব সমুদ্র-স্রোতে ক্রমাগত দূরের আহ্বান,
তরুণীর মুখ থেকে মুছে গেছে দিনের রক্তিমা,
এদিকে হরিণ আনে বাঁকা শিঙে চাঁদ : রমজান ;
ক্ষীণাঙ্গীর প্রতীক্ষায় যৌবনের প্রাচুর্য : পূর্ণিমা।

ষোল পাপড়িতে ঘেরা ষোড়শীর সে পূর্ণ যৌবনে
আসিল অতিথি এক বন্দরের শ্রান্ত মুসাফির।
সূর্যাস্তের অগ্নিবর্ণ সেহেলির বিমুগ্ধ স্বপনে,
নিভৃত ইঙ্গিত তার ডেকে নেয় পুষ্পিত গহনে ;
অনেক সমুদ্র তীরে স্বপ্নময় হ'ল এ শিশির
তারার সোনালি ফুল ছিটে পড়ে রাত্রির অঙ্গনে॥

'বন্দরে সন্ধ্যা' এক জটিল চিত্রকল্পময় কবিতা। এক চিত্রকল্প গড়িয়ে পড়ছে অন্য চিত্রকল্পে। বন্দরে সন্ধ্যার সঙ্গে এক সদ্যতরুণীর যৌবনে প্রথম পথিকের আসন্নতার একটি বর্ণনা আছে। আরবি-ফারসি শব্দ কয়েকটি মাত্র : রমজান, মুসাফির, সেহেলি। "সাত সাগরের মাঝি"র আদর্শিক ('সিন্দবাদ', 'সাত সাগরের মাঝি' ইত্যাদি) বা সমাজচেতন কবিতার ('লাশ', 'আউলাদ' প্রভৃতি) ছাপ নেই 'বন্দরে সন্ধ্যা'য়, বরং এখানে যেন ফররুখের চেতন-অবচেতন একত্রে লীলা করেছে। এমনকি বুঝি তাঁর অবচেতন যৌনতাও সক্রিয় — রোমান্টিকতায় সমাচ্ছন্ন। চোদ্দো লাইনের সনেটের প্রথম বাক্যের প্রথম শব্দ 'গোধূলি', আর শেষ পঙক্তির শেষে 'রাত্রির অঙ্গন' — গোধূলি থেকে রাত্রির রূপান্তরের মধ্যে ষোলো পাপড়িতে ঘেরা এক ষোড়শীর নারীতে রূপান্তরের নিঃশব্দ ইতিবৃত্তও হয়তো বর্ণিত। আর ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষণের পর বিশেষণ : গোধূলি-তরল হরিণ, অন্ধকার ধনু, শ্রান্ত মুসাফির, অগ্নিবর্ণ সেহেলি, বিমুগ্ধ স্বপ্ন, নিভৃত ইঙ্গিত, পুষ্পিত গহন, স্বপ্নময় শিশির, সোনালি ফুল : এই বিশেষণগুলিই কবিতাকে রঙিন, সচল, অর্থবান করেছে। মাছরাঙার মতো বর্ণময় কবিতাটি : এইটুকু কবিতার মধ্যে কতো রঙের

www.pathagar.com

খেলা চলেছে : পাটল, রক্তিমা, অগ্নিবর্ণ, সোনালি। 'অন্ধকার ধনু হাতে তীর ছোঁড়ে রাত্রির নিষাদ' — এই চিত্রকল্পটি ফররুখ-কাব্যে রূপান্তরিত হ'য়ে বারবার (সর্বাধিক) প্রযুক্ত হয়েছে। দুএকটি উদাহরণ :

১. যখন রক্তিম চাঁদ অন্ধকার তাজীতে সওয়ার
উঠে আসে দিগ্বলয়ে, ওয়েসিস নিস্তব্ধ, নির্জন
দূরে পাহাড়ের চূড়া ধ্যান-মৌন ; অজানা ইঙ্গিতে
তখনি ঘুমন্ত প্রাণ জেগে ওঠে।

[উজীরজাদার প্রতি হাতেম তা'য়ী, হাতেম তা'য়ী]

২ দিন যায়,
রাত্রি নামে আঁধারের ঘন কালো পর্দার আড়ালে,
দুর্ভেদ্য নেকাব তার দীর্ণ করে ভোরের শিকারী
— আফতাব ।

[সফরনামা, হাতেম তা'য়ী]

৩. ভোরের শিকারী উষা নিশীথের বক্ষে হানি' তীর
উজ্জল আলোকরশ্মি আনে আজ প্রাচ্যের আকাশে,

[আরিচা-পারঘাটে, কাফেলা]

"হাবেদা মরুর কাহিনী" (১৯৮১)-কে ফররুখ নিজে বলেছেন, 'গদ্যে লেখা রূপক কবিতা'। এই বইয়ের রচনাকাল : ১৯৫৭-৫৮। তদানীন্তন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দুরবস্থা চিত্রিত হয়েছে এ বইয়ের পরম্পরাগত কবিতায়। কিন্তু রূপক তখনই সফল হয়, যখন তার বহিরাবরণ হয় শক্ত ও আচ্ছাদিত। অর্ধনগ্নতা নগ্নতার চেয়ে মারাত্মক। আবরণ ছিঁড়ে রূপকার্থ এতো বেশি পরিষ্কার বেরিয়ে গেছে যে, কবিতা আর থাকেনি। নিরলংকৃতির যে-সৌন্দর্য, তাও সৃষ্টি হয়নি। রূপকের শক্ত খোলা তৈরি হয়নি, যেন ভাবনা পরিণত হওয়ার আগেই লেখা হয়েছে এসব কবিতা। এর অর্ধআবরিত দেহই একে কাব্যহীন করেছে। যেমন : 'জোনাকী জ্বলা বিজন বনের মধ্যে/ক্ষণিক আলো ছায়ার মত/জ্বলে উঠছে আর নিভে যাচ্ছে/আমাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা।' (সাঁইতিরিশ) এখানে চিত্রকল্প গঠিত হ'তে-হ'তে ভেঙে পড়লো। আমরা বারবার দেখতে পাই : ফররুখ কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হন, কিন্তু বাস্তবে পীড়িত হন। তিনি উদাসীন নন, তিনি যুক্ত। তিনি কল্পলোকবাসী নন ; কিন্তু বাস্তবতা থেকে যখন কল্পনার দেশে সফর করেন, তখনই যথার্থ তাঁর আত্মমুক্তি ঘটে। আর সেই কল্পনায় কাজ করে ধ্বনি, চিত্র, চিত্রকল্প। ফলত "হাবেদা মরুর

www.pathagar.com

কাহিনী"তে কল্পনার প্রয়োগ নেই, ছন্দের প্রয়োগ নেই, এমনকি গদ্যকবিতাকেও সেখানে মনে হয় বিপর্যস্ত ও নিষ্প্রাণ। সমকালীন অর্থহীনতা এই মরুময় জগৎটিকে নির্মাণ করেছে, কিন্তু শিল্পের যে-শর্ত তাকেও চূর্ণ করেছে। ফররুখের আবেগী কল্পনা এবং মাত্রাবৃত্ত-অক্ষরবৃত্তের বহুস্তর তান্তবতা তিনি গদ্যছন্দে রপ্ত করতে পারেননি — "হাবেদা মরুর কাহিনী"তে নয়, অন্য তাঁর আর যেদুচারটি গদ্যকবিতা আছে সেখানেও নয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি ছন্দ (মিলের নয়, শুধু ছন্দের — মিলকে তাঁর অতো আবশ্যিক মনে হয় না) ব্যবহারকে কবিতার আবশ্যিক অঙ্গ মনে করতেন।

গদ্যকবিতায় ফলত ফররুখীয় চিত্রকল্প জমেনি ; "সাত সাগরের মাঝি"তে প্রতিমা চূড়াস্পর্শী, কিন্তু পরবর্তীকালেও অসামান্য চিত্রকল্প মাঝে-মাঝেই তাঁর কবিতায় ঝলক দিয়ে উঠেছে :

১. মন মোর আসন্ন সন্ধ্যার তিমি মাছ —
ডুব দিল রাত্রির সাগরে।

[মন, সিরাজাম মুনীরা]

২. তারপর কি আশ্চর্য দেখি চেয়ে প্রতীক্ষার শেষে
প্রশান্ত প্রভাত নামে স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসি দরবেশের।

[সিলেট স্টেশনে একটি শীতের প্রভাত, মুহূর্তের কবিতা]

৩. ঘুমন্ত কন্যার পাশে সাড়া দিয়ে জাগে হীরামন
সদাগর পুত্র জাগে চোখ মুছে ভোরের হাওয়ায়।

[ঘুম, হে বন্য স্বপ্নেরা]

৪. গভীর মেঘের নলবনে শুক্লা দ্বিতীয়ার সাদা পাখী
ডুব দিয়ে তিমির অতলে সে বিহঙ্গ ঘুমায় একাকী
পরিত্যক্ত দিনের পালক ভেসে যায় শর্বরীর বানে
অন্তহীন ছায়া-পথ ধরে ফিরিছে সে অশ্রান্ত সন্ধানে
এখন নিকটে যায় দেখা রাত্রির নিকষ তটরেখা।

[মধুমতীর তীরে, ঐ]

৫. ভাবনার কুঁড়িগলি ফুটে ওঠে তারাদের মত,
লক্ষ তারার মত এইসব বাসা-ছাড়া পাখী
হে কবি ! তোমাকে স্মরি' অন্ধ শূন্যে ফেরে ডাকি' ডাকি' ;
আঁধারের যবনিকা দীর্ণ করি জাগে ইতস্তত।

[রবীন্দ্র-স্মরণে, শ্রেষ্ঠ কবিতা]

www.pathagar.com

৬. কাল এসেছিল ইরানী হাওয়ার রাত,
নিশীথ খোঁপায় সিতারার ফুল গুঁজে
বন্ধুর পথ খুঁজে
গুল-মোহরের রঙিন খাবের
আশায় সে সারা রাত
আমার বাজুতে পড়ে ছিল মুখ গুঁজে।

[ইরানী হাওয়ার রাত, ঐ]

৭. চাঁদের মোহানা পার হয়ে ছিল দীর্ঘ অন্ধকার —
তীব্র স্রোতের মাঝখানে যেন মৃত্যুর তরবারি,
তীর, সংকট হতাশার মত উঁচু হয়ে আছে খাড়ি ;
চন্দ্র-লগ্ন পার হ'য়ে আমি দেখেছি অন্ধকার।

[রাত্রিশেষে, ঐ]

গদ্যরচনায় উৎসাহী নন ফররুখ, গদ্য লিখেছেন তিনি অত্যল্প। তাঁর মানস কবিতার দ্বারা অধিকৃত, কবিতার প্রায় সমস্ত দেশে তিনি সফর করেছেন। তাঁর গদ্য-মানসতার প্রকাশ ঘটেছে ব্যঙ্গকবিতায় — অন্যত্র তিনি কবি, প্রকৃত কবি, ডানা-মেলা কবি। বৈপরীত্য ছাড়া অগ্রসরণ অসম্ভব। কবিতাজগতের ভিতরেই ফররুখের বারবার কল্পনা ও বাস্তবতার মুখোমুখি দ্বন্দ্ব চলেছে। ফররুখ যখনই কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, তখনই তিনি তাঁর আত্মজগতে প্রবেশ করেছেন — পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসে, অখন্ড আত্মপ্রত্যয়ে, নিবিড় নির্দ্বন্দ্বে। তাই ব'লে তাঁর বাস্তববোধের সব ফসল ব্যর্থ নয়, তাঁর বহু সফল ব্যঙ্গকবিতা আছে। এমনকি তাঁর কল্পনার ভিত্তি বাস্তবতায়, উন্মূল ও বেপরোয়া কল্পনার ডানায় ভেসে যাননি ফররুখ। তাঁর রচিত চিত্রকল্প বাস্তবতা থেকে যতো উৎসারিত, তার চেয়ে বেশি নির্মুক্ত হয়েছে কল্পনা থেকে। যুক্তি ও আবেগকে এভাবেই ফররুখ মিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সার্থক চিত্রকল্পে। জমকালো, খান্দানি ভঙ্গিতেই ফররুখের স্বাচ্ছন্দ্য। তাঁর অঙ্কিত চিত্রকল্পে প্রাত্যহিক জীবনাচরণের চেয়ে কল্পনার ঐশ্বর্যই সম্প্রকাশিত॥

---

১. এই কবিতার প্রথম নাম ছিলো 'আর এক সন্ধ্যায়'। কবিতার প্রথম লেখনের কিছু-কিছু পঙক্তি অন্যরকম ছিলো :

পঙক্তি

১. গোধূলি-তরল সেই হরিণের তনুকা পাটল
১০. তোমরা অতিথি তার দূর দুরান্তের মুসাফির।
১১. তোমরা করেছ ভিড় সহেলির বিমুগ্ধ স্বপনে।
১২. নভৃত ইঙ্গিত তার ভেড়ে গিয়ে পুষ্পিত গহনে।
১৩. অনেক সমুদ্র শেষে পেয়েছো এ রাত্রির শিশির,

www.pathagar.com

সনেট

এক

সনেট লিখেই ফররুখ আহমদের কাব্যযাত্রা শুরু হয় ; আর তাঁর সর্বশেষ কবিতাও একটি সনেট। ১৯৩৭ সালে ফররুখ কাব্যজগতে প্রবেশ করেন : দুটি সনেট 'রাত্রি' আর 'পাপ-জন্ম' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে 'বুলবুল' আর 'মাসিক মোহাম্মদী'র শ্রাবণ ১৩৪৪ সংখ্যায়। ফররুখের সমসাময়িক বন্ধু কথাশিল্পী আবু রুশদ লিখেছেন, '১৯৩৭ সালে মরহুম হাবিবুল্লাহ বাহার সম্পাদিত মাসিক 'বুলবুল' পত্রিকায় আমার প্রথম ছোটগল্প 'অথর্ব' মুদ্রিত হওয়ার পরে আমি বাঙালি মুসলিম সাহিত্য সমাজে পরিচিত হতে শুরু করলাম, আর 'বুলবুল'এর পরের সংখ্যাতেই ছাপাবার জন্যে আমি বাহার সাহেবের কাছে ফররুখের লেখা 'ঝড়' কবিতাটা নিজের হাতে নিয়ে গেলাম। যথাসময়ে সে কবিতা ছাপাও হ'লো এবং পাঠক সমাজে বেশ চমকের সৃষ্টি করলো।'[১] 'বুলবুল' পত্রিকায় 'ঝড়' নামে ফররুখের কোনো কবিতা ছাপা হয়নি। 'বুলবুল' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৪৪ সংখ্যায় তাঁর 'রাত্রি' নামে যে-কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তাতে ষষ্ঠ পঙক্তিতে ঝড়-শব্দটি আছে। মনে হয়, 'বুলবুল'-সম্পাদক আবু রুশদ-প্রদত্ত কবিতাটির 'ঝড়' নাম পরিবর্তন ক'রে 'রাত্রি' নাম দিয়েছিলেন।[২] যদি তা-ই হয়, তাহ'লে বলতে হবে : প্রথম কবিতাতেই ফররুখ সমকালীন সাহিত্যজগতে সাড়া জাগিয়েছিলেন। একই মাসে 'মাসিক মোহাম্মদী'তে তাঁর 'পাপ-জন্ম' নামে যে-কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিলো, তা-ও একটি সনেট। ফররুখ আহমদের প্রথম প্রকাশিত ঐ সনেটদ্বয়ের একটি এখানে উদ্ধৃত হ'লো :

রাত্রি

ওরে পাখী, জেগে ওঠ, জেগে ওঠ রাত্রি এল বুঝি
ঘুমাবার কাল এল জাগিবার সময় যে যায়
ওরে জাগ্ জাগ্ তবু অকারণে। রাত্রির ভেলায়
কোন অন্ধ তিমিরের স্রোতে আসা নিরুদ্দেশে যুঝি
হে বিহঙ্গ, দিকভ্রষ্ট নাহি হোয়ো যেন পথ খুঁজি
অবেলায়। এখনো সম্মুখে আছে ঝড়, আছে ভয়
এখনো আনন্দ আছে খুঁজিবার দুরন্ত বিস্ময়
তবু অন্ধকার এল দেখিলাম রিক্ত মোর পুঁজী।

www.pathagar.com

এখনো যায়নি অস্ত সূর্য মোর ব্যথা আকুলিয়া
এখনো রয়েছে তার শেষ রশ্মি পাতায় পাতায়
তবু অন্ধকার এল, এল মোর আনন্দ ভুলিয়া
অনন্ত বেদনা সম রিক্ততার কঠোর ব্যথায় ;
প্রতি পল্লবের বুকে জাগিল তিমির শ্যামলিমা
এ আমার স্বপ্ন নহে, এই কালো মোর মৃত্যুসীমা॥

প্রথম কবিতা তথা সনেট 'রাত্রি' (বা 'পাপ-জন্ম') আর সর্বশেষ কবিতা তথা সনেট '১৯৭৪' রচনার মধ্যবর্তীকালে ফররুখের যে-ছত্রিশ বছরের সাহিত্যসাধনা, সেখানেও প্রধানতম বিষয় সনেটচর্চা। অর্থাৎ ফররুখ চিরকাল সনেট রচনা ক'রে গেছেন। এম্নিতে ফররুখ ছিলেন সবসময় প্রকরণমনস্ক : বিষয়ের সঙ্গে বিন্যাসের দিকে নজর রেখেছেন সবসময়, এক কাব্যপ্রকরণ থেকে অন্য কাব্যপ্রকরণে তিনি অবিরাম সফর করেছেন, কিন্তু ফিরে-ফিরে এসেছেন সনেটের কাছে। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত ছয়টি কবিতাগ্রন্থের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কাব্যনাট্য "নৌফেল ও হাতেম" (১৯৬১) বাদে বাকি পাঁচটি কবিতাগ্রন্থেই ছড়ানো আছে একরাশ সনেট : "সাত সাগরের মাঝি"র (১৯৪৪) 'বন্দরে সন্ধ্যা', 'পুরানো মাজারে', 'স্বর্ণঈগল' ও 'তুফান'[৩] ; "আজাদ করো পাকিস্তান" (১৯৪৬) গ্রন্থে 'পাকিস্তানের কবি : আল্লামা ইকবাল', "সিরাজাম মুনীরা" (১৯৭২) 'প্রেম-পন্থী', 'অশ্রুবিন্দু', 'গাউসুল আজম', 'সুলতানুন হিন্দ', 'খাজা নকশবন্দ, 'মুজাদ্দিদ' 'আলফেসানী' , মৃত্যু-সংকট', 'অভিযাত্রিকের প্রার্থনা', 'মুক্তধারা' ; "মুহূর্তের কবিতা"য় (১৯৬৩) একশোটি সনেট ; এমনকি তাঁর কাহিনীকাব্য বা মহাকাব্য "হাতেম তা'য়ী"র (১৯৬৬) মধ্যেও অনেক সনেট বা চতুর্দশপদী প্রবিষ্ট : 'হুসনা বানুর প্রতি বৃদ্ধা ধাত্রী', 'চিত্রকরের প্রতি মুনীর শামী,' 'হুসনা বানুর মন্তব্য ও নূতন সওয়াল', 'আল্‌গুন পরী', 'হাতেম তা'য়ীর প্রতি 'আলগুন পরী', 'তিসরা সওয়ালের পথে', 'নূররেজ ফুল', 'পুষ্প চয়ন', 'দৃষ্টি', 'হাতেম তা'য়ীর উক্তি', 'আখেরী সওয়াল', 'হাতেম তা'য়ীর প্রতি সামান ঈরাক', 'কাহিনীর পরিণতি', 'মিলান্তক কথা' ও 'বন্ধুকৃত্য'।

বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, তাঁর ছয়টি কবিতাগ্রন্থের মধ্যে চারটি ফররুখ বিভিন্ন জনকে উৎসর্গ করেছেন : "সাত সাগরের মাঝি" মহাকবি ইকবালকে, "সিরাজাম মুনীরা" মওলানা আবদুল খালেককে, "মুহূর্তের কবিতা" রেনেসাঁ সোসাইটির সদস্যগণকে, "হাতেম তা'য়ী" প্রাচীন পুঁথিরচয়িতাদের ; —এবং এই চারটি উৎসর্গই তিনি সম্পন্ন করেছেন

www.pathagar.com

একএকটি সনেটের মাধ্যমে। মনে হয়, বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করলেও সনেটই ছিলো তাঁর প্রিয়তম বাহন, এবং সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত।

গ্রন্থভূর্ত এইসব সনেটের বাইরেও ফররুখের অসংখ্য সনেট ছড়িয়ে আছে তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত গ্রন্থাবলিতে, পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় ও পাণ্ডুলিপিতে। যে-স্বতঃস্ফূর্ত সনেট প্রণয়নের কথা বলেছি, তাঁর সমস্ত রচনারই কেন্দ্রোৎস ঐ স্বত:স্ফূর্ততা, তবু বিশেষভাবে সনেটের কথা মনে হয়। "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা"র (১৯৭৫) প্রবেশক থেকে একটি উদ্ধৃতি এখানে প্রাসঙ্গিক : '. . . ভাঁজকরা একটি কাগজের এপিঠে-ওপিঠে ছড়ানো-ছিটোনো একরাশ সনেট দেখেছি : 'ওয়েলেস্‌লি স্কোয়রে পূর্ণিমা'.... এখান থেকেই উদ্ধার করা।'[৪]

কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর পরিকল্পিত দুটি কাব্যগ্রন্থে কিছু সনেট অন্তর্ভূত হয়েছে : "হে বন্য স্বপ্নেরা" (১৯৭৬) গ্রন্থে 'কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি', 'শেষ মুহূর্ত', 'লুব্ধ', 'শ্রান্ত', 'বিদূষক', 'সমাপ্তি', 'নির্বিষ', 'প্রতীক্ষা', 'সামুদ্রিক', তিমি', পদ্মার ফালি', 'পদ্মার ভাঙ্গন', কালো দাগ', 'শিকার','জোয়ার', 'নাবিক', 'পাথরের দিন', 'স্মরণ', 'শূন্য মাঠ', 'মরা ঘাস', 'মৃগতৃষ্ণিকা', 'নৈশ কুকুরের ডাক', 'সুর', 'সংগতি', 'সে নামে ডেকেছি আমি', 'হীরার কুচির মত', 'প্রেমের আবির্ভাব, 'ঘুম', 'প্রতীক', 'বৈশাখ', 'নৈরাজ্য' ও 'প্রেসম্যান' ; "কাফেলা" (১৯৮০) গ্রন্থে 'চতুর্দশপদী', 'ঈদের স্বপ্ন', 'নয়া সড়ক'[৫]; কয়েকটি এবং সনেটপরম্পরা : 'ঝড়', 'বর্ষায়', 'পদ্মা' ও 'আরিচা-পারঘাটে'।

এসবেরও আগে প্রকাশিত "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" বইএ (১৯৭৫) কিছু অগ্রন্থিত সনেট গৃহীত হয়েছিলো। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রকাশিতব্য "দিলরুবা" নামে কবির সনেট-পারম্পর্যময় গ্রন্থের পঞ্চম স্তবক-ভুক্ত ছয়টি সনেট। "দিলরুবা" কবির পূর্ণাঙ্গ সনেট-সিকোয়েন্সের বই। কবি-কর্তৃক প্রস্তুত, প্রথম বেরিয়েছিলো 'দিলরুবা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (বৈশাখ ১৩৫৬ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ অবধি), পরে কবি সমগ্র সনেটপুঞ্জ পরিশোধন ক'রে পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন। (দুঃখের বিষয়, এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'লো না আজো।) শ্রেষ্ঠ কবিতা-গ্রন্থভূর্ত 'ব্যঙ্গকবিতা' শীর্ষকের অনেকগুলি কবিতাই সনেটবন্ধ : 'ভূমিকা', 'অভিজাত-তন্দ্রা', 'উর্দু বনাম বাংলা', 'কবিতা চোরের প্রতি', 'ইঁদুর', 'নেতা', 'বিল্লী', 'ফাঁদ' ও 'অগত্যা'।

দুই

সমসাময়িক সমালোচকেরা কী চোখে দেখেছিলেন ফররুখ আহমদের সনেটকে?

ফররুখের সনেট প্রথম থেকেই আলোচিত হ'য়ে আসছিলো। আবদুল কাদির ও রেজাউল করীম-সম্পাদিত "কাব্য-মালঞ্চ" (১৯৪৫) সংগ্রহের 'বাঙ্গালা কাব্যের ইতিহাস' শীর্ষক প্রবেশকে ফররুখ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রথমেই কবি আবদুল কাদির লিখেছিলেন :

www.pathagar.com

ইদানীং ফররুখ আহমদ সনেট রচনায় বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'বন্ধন', 'নোঙর', 'প্রতীক্ষা', 'সমাপ্তি,' 'বন্দরে সন্ধ্যা', 'কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি' প্রভৃতি সনেটগুলিতে সৌন্দর্যবিহার ও বেদনাবোধ অনবদ্য রসমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। তিনি রোমান্টিক কবি, কিন্তু তাঁহার নভোবিহারী কল্পনা ধূলিম্লান পৃথিবীর আকর্ষণ অস্বীকার করে নাই।

"কাব্য-মালঞ্চে" ফররুখের যে-তিনটি কবিতা গৃহীত হয়েছিলো, তার একটি সনেট : 'শিকার'। 'বন্ধন' 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪৬, 'কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি' 'সওগাত' পৌষ ১৩৪৭, 'বন্দরে সন্ধ্যা' 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। 'বন্দরে সন্ধ্যা' "সাত সাগরের মাঝি" এবং 'কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি', 'সমাপ্তি', 'প্রতীক্ষা' ও 'শিকার' "হে বন্য স্বপ্নেরা" গ্রন্থভূর্ত।

ঐ মন্তব্যের কুড়ি বছর পরে আবদুল কাদির ফররুখ আহমদের সনেট সম্পর্কে আর-একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'পূবালী' পত্রিকায় ১৯৬৪ সালে, কবির "মুহূর্তের কবিতা" (১৯৬৩) গ্রন্থের সমালোচনাসূত্রে।[৬] সেখানে তিনি বলছেন :

> ফররুখ আহমদের অনেক সনেটেই কল্পনার ঐশ্বর্য ও ভাবের বিস্তার প্রচুর ; তাতে যদি চমৎকার অন্তমিল ও অনুপ্রাসের প্রয়োগ ঘটতো, এবং মিল-কল্পে থাকতো অধিকতর বিধিবশ্যতার পরিচয়, তাহলে তাঁর পরিবেশিত রসের ভোজ হতো পরিপূর্ণ। সংক্ষেপতঃ বলা চলে, তাঁর কোন কোন সনেট বক্তব্য-প্রধান (Verse as speech) হ'লেও কয়েকটি সনেট বাস্তবিকই গীতধ্বনিময় কবিতা (verse as song) হয়েছে। সাহিত্যে অনবদ্য সৃষ্টি 'হাজারে না মিলে এক'। কাজেই স্বল্পসংখ্যক রচনার জন্যেই ফররুখ আহমদ সার্থক সনেটকার হিসাবেও মর্যাদার আসন পাবেন।

সমালোচক আবদুল হকের চেতাবনী ফররুখ আহমদকে প্রথম পর্যায়ে সনেট নির্মাণে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলো। আবদুল হক লিখছেন :

> 'সওগাত'-এ যোগদানের পরেই সনেটের কারুকার্য নিয়ে তাঁর [ফররুখের] সঙ্গে আমার কিছু তর্ক হয়েছিল। তাঁর এবং আরও কোনো কোনো কবির সনেটের সংগঠন সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নেই, এই ছিল আমার বক্তব্য। তাঁরা পেত্রার্কান এবং শেক্সপীয়রিয়ান সনেটের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটান, যা রীতিবিরুদ্ধ। ঐ বিতর্কের পর আমার বক্তব্য নিয়ে 'সনেটের টেকনিক' নামে 'সওগাত'-এর মাঘ ১৩৫৩ সংখ্যায় আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রবন্ধটা কিছু প্রাথমিক ধরনের বলে এখনও আমার কোনো প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিনি, তবে ঐ

www.pathagar.com

বক্তব্য অন্যান্য প্রসঙ্গে আমার বিভিন্ন প্রবন্ধসংকলনে ছড়িয়ে আছে। ফররুখ আহমদের উপর ঐ বিতর্কের কিছু ক্রিয়া হয়েছিল, তিনি সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন।[৭]

এখানে 'সওগাত'[৮] পত্রিকায় প্রকাশিত কবির সনেটের তালিকা[৯] পেশ করা হ'লো :

১. চৈত্র-প্রভাতের সুর। ফাল্গুন ১৩৪৫।
২. চৈত্র-সন্ধ্যার সুর। বৈশাখ ১৩৪৬।
৩. কর্পূর। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬।
৪. নাটক। আষাঢ় ১৩৪৭।
৫. কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি। পৌষ ১৩৪৭।
৬. পারফিউম। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০।
৭. নির্বিষ। আশ্বিন ১৩৫০।
৮. ঘুম। অগ্রহায়ণ ১৩৫১।
৯. নাবিক। অগ্রহায়ণ ১৩৫১।
১০. দুই সন্ধ্যা (১-২)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩।
১১. প্রেম. ও সত্তা (১-২)। আষাঢ় ১৩৫৩।
১২. বিরহের শয্যা থেকে। শ্রাবণ ১৩৫৩।
১৩. প্রেমের জটিল পথে। শ্রাবণ ১৩৫৩।
১৪. সে নামে ডেকেছি আমি। ফাল্গুন ১৩৫৩।
১৫. হীরার কুচির মতো। ফাল্গুন ১৩৫৩।
১৬. রক্ত-হিংস্র মাঠে। ফাল্গুন ১৩৫৩।
১৭. বৈশাখ। বৈশাখ ১৩৫৪।
১৮. জ্যৈষ্ঠ। বৈশাখ ১৩৫৪।
১৯. স্বপ্ন। বৈশাখ ১৩৫৪।
২০. প্রতীক। বৈশাখ ১৩৫৪।
২১. নৈরাজ্য। শ্রাবণ ১৩৫৪।
২২. মৃগতৃষ্ণিকা। শ্রাবণ ১৩৫৪।
২৩. ঘূর্ণী। শ্রাবণ ১৩৫৪।
২৪. বাজ। শ্রাবণ ১৩৫৪।

www.pathagar.com

ঐ রচনাতেই আবদুল হক বলেছেন :

> ফররুখ আহমদের চতুর্দশ পংক্তির সব রচনাকেই সনেট ধরলে, তিনি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সনেটকারদের অন্যতম।

সমসাময়িক লেখক-বন্ধু আবু রুশদ — যিনি ছিলেন ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্য-সমালোচক[১০] — লিখেছেন :

> আমার নিজের স্থির বিশ্বাস : ফররুখ তার গোটা ছয়েক অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কবিতা, হাতেম তা'য়ীর অংশবিশেষ এবং কয়েকটা সনেটের জন্য বাংলার কাব্যপাঠকের কাছে দীর্ঘদিন ধরে সমাদৃত থেকে যাবে।[১১]

ফররুখের কোন্ সনেটগুলি তাঁর বিবেচনায় স্থায়ী মূল্যবান তার উল্লেখ করেননি আবু রুশদ। আমরা মনে করতে পারি : 'বন্দরে সন্ধ্যা', 'কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি', 'ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ারে পূর্ণিমা', 'শিকার', 'ঘুম', 'প্রেসম্যান' প্রভৃতি ফররুখের শ্রেষ্ঠ সনেট।

তিন

সনেটের প্রধান দুই রূপ : পেত্রার্কীয় ও শেক্সপীয়রীয়। ফররুখ আহমদ মূলত পেত্রার্কীয় সনেটই লিখেছেন ; শেক্সপীয়রীয় সনেটও কিছু লিখেছেন। পর-পর ফররুখ-রচিত এই দুই পদ্ধতির সনেটের দৃষ্টান্ত রাখা হ'লো এখানে :

দুর্লভ মুহূর্ত

এমন মুহূর্ত আসে এ জীবনে (হয়তো ক্বচিৎ
সে-মুহূর্ত, তবু আসে, তবু ফিরে আসে)
যখন বিক্ষত মন ব্যথা কিংবা বিষণ্ন সন্ত্রাসে
পড়িতে চাহে না বাঁধা, ফিরে পেতে চায় না সম্বিৎ
ফিরে পায় তপ্ত বক্ষে যে মুহূর্তে হারানো সংগীত
আকাশের, বাতাসের — শিশির-ঝরানো ঘাসে ঘাসে
সমুদ্রের হৃদপিণ্ডে অথবা প্রিয়ার বাহুপাশে
প্রাণের মূর্ছনা-মেশা জীবনের আশ্চর্য ইঙ্গিত।

জন্ম নেয় কবিতার রক্ত-দল তখনি জীবনে —
যে-কবিতা মিশে আছে পৃথিবীর অরণ্যে পাহাড়ে,

www.pathagar.com

যে-কবিতা অর্ধস্ফুট গোলাবের পাত্রে সংগোপনে
সুরভি-প্রশ্বাসে আর বিগত রাত্রির অশ্রুধারে,
শিশিরে ; — প্রকাশ যার নিজেরে হারায়ে বারেবারে
কাঁদিয়াছে বহু বর্ষ অন্ধকার মাটির বন্ধনে॥

[মুহূর্তের কবিতা]

অঝোর ধারায় বৃষ্টি

অঝোর ধারায় বৃষ্টি.... কাল রাত্রে বৃষ্টি নেমেছিল,
মৃত্যুর পাহাড় থেকে কাল রাত্রে এসেছিল মেঘ,
যেখানে জামের মূর্তি বিদায়ের পথ খুঁজে নিল
সে-কোহে নেদায় কাল জেগেছিল দুর্জয় আবেগ।
বহু শতাব্দীর আত্মা নিকষ মেঘের অন্ধকারে
বলেছিল একে একে অসম্পূর্ণ জীবনের কথা
(বিদ্যুৎ চমকে ছায়া অপসৃয়মাণ) ; বারেবারে
উদ্ভাসিত হয়েছিল তৃপ্তিহীন প্রাণের ব্যর্থতা।

শাদ্দাদের বালাখানা, কারুণের সঞ্চয়, নীলের
প্রবাহ দুকূল ব্যাপি' কাল রাত্রে পড়েছিল মনে,
কাফেলার পুরোভাগে বাঁকা চাঁদ — সুপ্ত নিখিলের
ঘনতম অন্ধকারে জেগেছিল রাত্রির প্রস্বনে।....
থামেনি তবুও সেই কাহিনীর ধারাবাহিকতা ;
অজস্র বর্ষণে মেঘ কাল রাত্রে বলেছিল কথা॥

[শ্রেষ্ঠ কবিতা]

এর প্রথমটি পেত্রার্কীয় ছাঁচের সনেট। এর মিল-বিন্যাস হচ্ছে : ক খ খ ক : ক খ খ ক। গ ঘ গ ঘ ঘ গ । দ্বিতীয়টি শেক্সপীয়রীয় ছাঁচের সনেট। এর মিলবিন্যাস এরকম : ক খ ক খ। গ ঘ গ ঘ । ঙ চ ঙ চ। ছ ছ।

মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) পর থেকে কবিরা ১৮-মাত্রার অক্ষরবৃত্তেই সনেট রচনায় বেশি আগ্রহী। ফররুখেরও অধিকাংশ সনেট তাই। বিষ্ণু দে-র (১৯০৮-৮১)

www.pathagar.com

মধ্যেই শেষবারের মতো ১৪ ও ১৮-মাত্রার দুই ধরনের সনেট রচনার কুশলতা দেখা গিয়েছিলো। ফররুখ ১৪-মাত্রার অক্ষরবৃত্তে কয়েকটি মাত্র সনেট লিখেছেন। একটি উদাহরণ :

রাত্রিচর

রাত্রিকে দ্বিখণ্ড করি' তীক্ষ্ণ খরধার
দীর্ঘ বিলম্বিত এক পাখীর আওয়াজ
কর্কশ পাখায় সঞ্চরণ। স্তব্ধতার
চাপা ছুরি ছিঁড়ে আনে নিকষ নিভাঁজ
অরণ্যের বাহু থেকে সংগীহীন ঝড়
নিবিড় রাত্রির স্রোতে শুনি হাহাকার,
জমানো আঁধারে স্তব্ধ রাত্রির মর্মর
স্তব্ধতা : পাখীর স্বর : শোন শেষবার।

চেয়ে দেখো এইসব সংগীহীন পাখী
গলানো আগুন মাটি সুঠাম সবল
দীর্ঘ রাত্রি বনে বনে ফিরেছে একাকী
পালকে লুকায়ে রেখে প্রচ্ছন্ন অনল
অনেক প্রগাঢ় সন্ধ্যা, আসন্ন বৈশাখী
অসংখ্য মাটির টাল, মাটি ঘোলাজল॥

[হে বন্য স্বপ্নেরা]

স্বরবৃত্ত ছন্দেও কবি কয়েকটি পরীক্ষামূলক সনেট লিখেছিলেন ; এরকম চারটি সনেট[১২] বেরিয়েছিলো 'সওগাত' বৈশাখ ১৩৫৪ সংখ্যায় — তা থেকে একটি সনেট এখানে উৎকলন করছি :

প্রতীক

যৌবন যে প্রেমের প্রতীক বলি না তা'
বাসন্তী নীল দিনগুলি যার রূপ বিভায়
কাটলো সুরের দাহ নিয়ে ঝড় হাওয়ায়
পিছনে পানে তাকিয়ে শুনি সেই গাথা।
ফাল্গুনে যে সবুজ শিখা সেই পাতা
ঝরল যে-দিন তাকিয়ে দেখি মোর শাখায়
ফুলের জোয়ার রিক্ত শাখার শেষ সীমায়
প্রেমের নতুন জয়ধ্বনি জয়গাথা।

www.pathagar.com

প্রৌঢ় শরৎ রাত্রে দেখি তৃপ্তিলীন
এই পৃথিবীর তপ্ত শিরা শান্ত হিম,
শ্রান্তি মধুর স্বপ্ন ছড়ায় মধ্য দিন
পাপড়ি ধূসর পরাগ তবু আরক্তিম ;
দীর্ঘ স্মৃতির রন্ধ্রে জাগে বর্ণহীন
গন্ধভারে পূর্ণ আমার মন অসীম॥

অনেক সনেট লিখেছেন ফররুখ, যা একটিমাত্র সনেটে শেষ হয়নি। তাঁর এই সনেটপরম্পরা দুইটি সনেটে বা আরো বেশি সনেটে প্রসারিত হ'য়ে গেছে। উদাহরণ : 'দুই সন্ধ্যা' (১–২, 'সওগাত', জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩), 'প্রেম ও সত্তা' (১–২, 'সওগাত', আষাঢ় ১৩৫৩); "মুহূর্তের কবিতা" (পরিশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৮) গ্রন্থভূত 'ট্রেনে' (১–৩), 'ময়নামতীর মাঠে' (১-৪), 'হাতঘড়ি' (১–২), 'পুঁথি-পড়া : মুহার্রাম মাসে' (১–২), 'সাতান্নর কবিতা' (১–২), 'সাম্পান মাঝির গান' (১–২), 'প্রার্থনা' (১–২) ; "কাফেলা" গ্রন্থভূত 'ঝড়' (১–৭), 'বর্ষায়' (১–৫), 'পদ্মা' (১–৭), 'আরিচা-পারঘাটে' (১–৫)।

আবার "কাফেলা" গ্রন্থভূত 'ঝড়', 'বর্ষায়', 'পদ্মা' ও 'আরিচা-পারঘাটে' এই চারটি কবিতায় ফররুখ স্তবকবিন্যাসে ৩ + ৩ + ৩ + ৩ + ২ এই তের্জা-রিমা রীতির ব্যবহার করেছেন। এই রীতিতে কবিতা লিখেছেন তাঁর অগ্রজ তিনজন কবি : জীবনানন্দ দাশ ('পথ হাঁটা', "ধূসর পাণ্ডুলিপি"), অজিত দত্ত ('রাঙা সন্ধ্যা', "পাতালকন্যা") ও বিষ্ণু দে ('এক ও অন্য', "তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ")। ফররুখের এই তের্জা-রিমা রীতির মিলবিন্যাসিত সনেটের উদাহরণ হিশেবে 'পদ্মা' সনেটপরম্পরা থেকে সপ্তম সনেট-স্তবকটি উদ্ধৃত হ'লো :

পদ্মা (সাত)

তোমার স্রষ্টার কাছে (কুল মখলুকের যিনি রব)
হে নদী! তোমার মত আমারো প্রার্থনা রাত্রিদিন
সকল প্রান্তরে, পথে পাই যেন গতির বৈভব।

জীবন্ত প্রবাহ সেই দুর্নিবার — বাধাবন্ধহীন
ভাসায়ে সকল ক্লেদ, পুঞ্জীভূত কদর্য কলুষ
মঞ্জিলের পথে যেন চলে স্বচ্ছ, শুভ্র, অমলিন ;

অথবা সে প্রাণধারা তীব্র গতিবেগে নিরঙ্কুশ
ভারগ্রস্ত জীবনের, জড়তার করি অবসান
জিন্দেগীর বিয়াবানে এনে দেয় মুক্তি নিষ্কলুষ

www.pathagar.com

অচল ; স্থানুর বুকে গতিমান জীবনের গান
রিক্তপ্রাণ পৃথিবীতে দেয় যেন পুষ্পের সম্ভার ;
আবদ্ধ জিন্দানে দিয়ে প্রাণোচ্ছল গতির আহ্বান

অস্তিত্বের আদি কথা খোলে যেন রহস্যের দ্বার
(হে পদ্মা, তোমার মত গতিবেগ দুরন্ত, দুর্বার)॥

এখানে মিলবিন্যাস এরকম : ক খ ক : খ গ খ : গ ঘ গ : ঘ ঙ ঘ : ঙ ঙ । চারটি কবিতার সমস্ত অংশেই এই মিলবিন্যাস তিনি মেনেছেন।

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম সনেটের প্রবর্তন করেন। মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম সনেট লেখেন কায়কোবাদ। ঔপন্যাসিক কাজী ইমদাদুল হক তাঁর স্বভাবশোভন পরিমিতির চিহ্নস্বরূপ কিছু সনেট লিখেছিলেন। শাহাদাৎ হোসেন যে একটিও সনেট লেখেননি তার থেকে প্রমাণ হয় তিনি আসলে ছদ্ম-ধ্রুপদী — মূলত রোমান্টিক। ফররুখ আহমদের অব্যবহিত আগে মুসলমান কবিদের মধ্যে বেনজীর আহমদ, হুমায়ুন কবির, আবদুল কাদির, সুফী মোতাহার হোসেন, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, বন্দে আলী মিয়া, মোয়াহেদ বখত চৌধুরী, কে. এম. শমশের আলী, কামালউদ্দীন খান, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, আজহারুল ইসলাম প্রমুখ এবং ফররুখের সমকালীনদের মধ্যে মতিউল ইসলাম, তালিম হোসেন, সিকান্দার আবু জাফর, সৈয়দ আলী আহসান, হাবীবুর রহমান, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস, আজিজুর রহমান প্রমুখ ১৮-মাত্রার অক্ষরবৃত্তে সনেট লিখেছেন — এঁদের আগে অভ্যাস ছিলো ১৪-মাত্রার অক্ষরবৃত্তের সনেট। ফররুখের আগে দুজন মুসলমান কবি — রিয়াজউদ্দীন চৌধুরী ও সুফী মোতাহার হোসেন সনেট নিয়ে একক সাধনা করেছেন। সম্ভবত সংখ্যায় ফররুখের সনেট এই দুজনের চেয়ে বেশি। আমাদের পঞ্চাশের কবিরা চোদ্দো পঙক্তির যে-কবিতাপুঞ্জ রচনা করেছেন, সেগুলি অধিকাংশ সময় সনেট না-হ'য়ে হ'য়ে উঠেছে চতুর্দশপদী। বাংলা সাহিত্যের যাঁরা শ্রেষ্ঠ সনেটশিল্পী — মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অজিত দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে — হয়তো ফররুখ আহমদের নাম একদিন তাঁদের সঙ্গেই উচ্চারিত হবে॥

---

১ "জীবন ক্রমশ" : আবু রুশদ। পৃ. ৬৬।

২ 'রাত্রি' কবিতাটির বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্যে দ্রষ্টব্য : 'ফররুখ আহমদের প্রথম প্রকাশিত কবিতা' : আবদুল মান্নান সৈয়দ, সংগ্রাম সাময়িকী, দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ জুন ১৯৯০। বর্তমান গ্রন্থভুক্ত।

৩ "সাত সাগরের মাঝি" গ্রন্থভুক্ত 'আউলাদ' কবিতার প্রথমাংশ একটি চতুর্দশপদী।

৪ 'প্রবেশক', "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" (১৯৭৫) : আবদুল মান্নান সৈয়দ।

www.pathagar.com

৫ "কাফেলা" গ্রন্থভুক্ত 'কাফেলা ও মনজিল' কবিতার প্রথমাংশে একটি চতুর্দশপদী।

৬ পুনর্মুদ্রণ : 'ফররুখ আহমদ : কাব্য-নাটিকা ও সনেট-কাব্য' : আবদুল কাদির। "ফররুখ আহমদ" (সেবা, ১৯৮৭)।

৭ 'ফররুখ আহমদ' : আবদুল হক। "ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি" : শাহাবুদ্দীন আহমদ-সম্পাদিত।

৮ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন-সম্পাদিত 'সওগাত' পত্রিকার আশ্বিন-কার্তিক ১৩৮১ সংখ্যায় 'সওগাতে' প্রকাশিত ফররুখ আহমদের সমস্ত কবিতা একত্রে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিলো। এই সংখ্যায় 'কবি ফররুখ আহমদ' নামে একটি স্মৃতিচারণিক রচনা লিখেছিলেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন।

৯ এই তালিকা থেকে সনেট নয় তবু সনেটকল্প অসামান্য একটি চতুর্দশপদী বাদ গেছে। কবিতাটি এই :

হারুনার রশিদ

অপূর্ব কাহিনী সেই — মনে হয় সে নিশির ডাক
কারা যেন ডেকে গেল মধ্যরাত্রে, 'হারুনার রশিদ।'
'কারা ডাকে?' — শুধালো না চাহিল না ফিরিয়া বারেক
প্রাসাদ ছাড়িয়া নীচে নেমে এলো হারুনার রশীদ॥

কালঘুমে, মোহে, স্বপ্নে আচ্ছন্ন, নিমীল দুনয়ন —
বাগ্‌দাদের সৌধশিরে আলোছায়া চাঁদ দেয় পাড়ি —
মাটির নিশ্বাস পড়ে, শোনা যায় বুকের স্পন্দন,
ছায়ামূর্তিদের পিছে চলে একা হারুনার রশিদ॥

অনেক অনেক রাত্রি পার হয়ে চলেছে হারুন
বাগদাদের রাজপথ, স্বপ্ন, তন্দ্রা, আলিফ-লায়লা,
সম্মুখে চলেছে ছায়া, কোন কথা কেউ শুধাবে না,
উত্তর দেবে না। শুধু দেখে যাবে হারুনার রশিদ॥

অপূর্ব কাহিনী সেই, সে কাহিনী অসংখ্য অশেষ।
ছায়ামূর্তিদের পিছে চলে একা হারুনার রশিদ॥

১০ 'আধুনিক কবিতা ও মুসলিম কবিগণ' : আবু রুশদ। 'সওগাত' ,ভাদ্র ১৩৪৮।

১১ "জীবন ক্রমশ" : আবু রুশদ। পৃ. ৬৮।

১২ এই চারটি সনেট হ'লো 'বৈশাখ', 'জ্যৈষ্ঠ', 'স্বপ্ন' ও 'প্রতীক'।

www.pathagar.com

ছোটোগল্প

এক

ফররুখ আহমদের গল্প। এ প্রায় সেই বিস্ময়ই সৃষ্টি করে, যেমন করেছিলো কিছু কাল আগে প্রকাশিত "জীবনানন্দ দাশের গল্প" বইটি[১], কিংবা "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা" বইটি[২]। 'আরে, কবি জীবনানন্দ দাশ গল্প লিখেছেন নাকি!' কিংবা 'কী আশ্চর্য, কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা লিখলেন কবে!' — এরকম বিস্ময়ই ঘ'টে যায় ফররুখ আহমদের ক্ষেত্রেও। কবি হিশেবে তাঁর পরিচিতি এমনই সর্বব্যাপী যে, ফররুখ আহমদ-যে প্রথম জীবনে কয়েকটি গল্প লিখেছেন, তা আমরা ভুলেই গিয়েছি।

যতোদূর দেখা গেছে, তাতে মনে হয় : বাংলা ১৩৪৪ বা ইংরেজি ১৯৩৭ সালে ফররুখ আহমদ সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। এই বছরই 'বুলবুল' (সম্পাদক : হাবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুননাহার) ও 'মাসিক মোহাম্মদী' (সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ) পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচনাবলি প্রকাশিত হয়। এখন-পর্যন্ত-প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনে হয়, 'বুলবুলে' প্রকাশিত 'রাত্রি' সনেটটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা (শ্রাবণ ১৩৪৪)। ঠিক তার পরের মাসেই ফররুখ আহমদের প্রথম গল্প 'অন্তর্লীন' প্রকাশিত হয় 'মাসিক মোহাম্মদী'তে (ভাদ্র ১৩৪৪)। বছর তিনেকের মধ্যে তাঁর পাঁচটি গল্প প্রকাশিত হয় 'বুলবুল' ও 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায়। পত্রিকায় প্রকাশিত পাঁচটি গল্পের পরিচয় এরকম :

১. অন্তর্লীন। মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র ১৩৪৪।
২. বিবর্ণ। মাসিক মোহাম্মদী।
৩. মৃত বসুধা। মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক ১৩৪৪।
৪. যে পুতুল ডলির মা। বুলবুল, বৈশাখ ১৩৪৫।
৫. প্রচ্ছন্ন নায়িকা। মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক ১৩৪৬।

১৩৪৪-৪৬ অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৯ — এই হচ্ছে ফররুখের গল্প রচনার কাল।[৩] এই সময়পর্যায়ে ফররুখ কলকাতার রিপন কলেজে আই. এ. পড়ছেন। ১৯৩৭ সালে খুলনা থেকে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলকাতায় গিয়ে তিনি রিপন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ; ১৯৩৯ সালে ঐ কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন। ১৩৪৪ (১৯৩৭) সালে ফররুখ কবিতা ও গল্প সমেতই সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন। স্মরণীয় : ফররুখের সাহিত্যজীবন

www.pathagar.com

(১৯৩৭-৭৪) দুই কেন্দ্রে অতিবাহিত হয়েছে — কলকাতা ও ঢাকায়। কলকাতায় কাটে তাঁর ১৯৩৭-৪৮ সময়পর্যায়, আর ঢাকায় ১৯৪৮-৭৪ সময়পর্যায়। এই গল্পগুলি তাঁর কলকাতা পর্বে লেখা।

১৯৩৯-এর পরে ফররুখ কি গল্প লেখেননি আর? — ঠিক গল্প নয়। সম্ভবত একটি ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টা তিনি নিয়েছিলেন বছর দশেক পরে। 'মৃত্তিকা' (সম্পাদক : কাজি আফসারউদ্দিন আহমদ) পত্রিকায় 'সিকান্দার শা-র ঘোড়া' নামে ফররুখের একটি অসম্পূর্ণ কথাসাহিত্যিক গদ্য প্রকাশিত হয়েছিলো (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৫৩)।[৪] রচনাটির শেষে লেখা ছিলো 'ক্রমশ:', পত্রিকায় আর বেরোয়নি। এই অসম্পূর্ণ রচনাটি বাদে সাময়িক পত্রিকার ধূসর পৃষ্ঠা থেকে ফররুখের আরো দু-একটি গল্প যদি প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে, তাহ'লে অবাক হবার কিছু নেই। তবে এও সত্য যে, ফররুখ পরবর্তীকালে কথাসাহিত্য মাধ্যমটিই বর্জন করেন এবং পুরো আত্মনিয়োগ করেন কবিতাচর্চায়।

আশ্চর্যজনক এই সংবাদ যে, ফররুখ আহমদ সম্পর্কে প্রথম যে-মন্তব্য আমরা পাই, তা তাঁর কবিতা সম্পর্কে নয় — গল্প সম্বন্ধেই। তা থেকে মনে হয়, অল্প কয়েকটি গল্প লিখেই ফররুখ সমকালীন পাঠক-সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯৩৯ (১৩৪৬) সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের কথাসাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণে খান সাহেব মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ বলেন :

> তরুণ কথাসাহিত্যিকদের মধ্যেও কয়েকজনের উদ্যম আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে। আবু রুশদ, ফররুখ আহমদ, আবু জাফর শামসুদ্দীন, নাজীরুল ইসলাম প্রভৃতির রচনা সাময়িক সাহিত্যের পৃষ্ঠায় ইতস্তত ছড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু এ সম্পর্কে ইহাদের নাম উল্লেখ না করিলে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। কারণ সত্য সত্যই ইহাদের মধ্যে শক্তির পরিচয় লক্ষ্য করা গেছে।
>
> ['মোহাম্মদী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬]

মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহর অভিভাষণে তৎকালীন কয়েকজন কথকের নাম পাওয়া যাচ্ছে : আবু রুশদ, ফররুখ আহমদ, আবু জাফর শামসুদ্দীন, নাজিরুল ইসলাম। এঁদের মধ্যে আবু রুশদ ও আবু জাফর শামসুদ্দীন উত্তরকালেও গল্প-উপন্যাস লিখে গেছেন। কিন্তু ফররুখ আহমদ কবিতার রাজ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করেন আর নাজিরুল ইসলাম স্বনিযুক্ত হন প্রবন্ধকর্মে। তখন অর্থাৎ চল্লিশের দশকে আরো গল্প লিখতেন শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, শাহেদ আলী, রশীদ করীম, ফজলুল হক[৫], সরদার জয়েনউদ্দীন প্রমুখ। এঁদের কেউ-কেউ তখনো গ্রামের বাসিন্দা। তবে

www.pathagar.com

কলকাতা মহানগরেই চল্লিশের দশকে বাঙালি-মুসলমানের হাতে আধুনিকতার উদ্বোধন ঘটে। সমসাময়িক কবি আবুল হোসেন লিখেছেন :

> এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে আমরা সে সাত-আটজন অখ্যাত তরুণ মুসলিম বাংলা সাহিত্যের মাঠে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে আধুনিকতার ঘোড়া ছুটিয়েছিলাম এলোমেলোভাবে, ওয়ালীউল্লাহ সেই দলে ভিড়েছিলেন সবশেষে। ফররুখ, আহসান হাবীব, আবু রুশদ, শওকত ওসমান, গোলাম কুদ্দুস, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, ওয়ালীউল্লাহ এবং আমাকে নিয়ে সেদিন কলকাতায় আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা বেশ কিছুটা বিব্রতই বোধ করতেন।
>
> ['কিছু স্মৃতি : ওয়ালীউল্লাহ', 'সময়' ১৯৮০]

এঁদের মধ্যে আবু রুশদ, শওকত ওসমান, শামসুদ্দীন আবুল কালাম ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর হাতে আমাদের আধুনিক গল্প-উপন্যাসের সূচনা হয়। অন্যেরা — ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, গোলাম কুদ্দুস, আবুল হোসেন কবিতায় আধুনিকতার জন্ম দেন। এখানে স্মরণীয় : ফররুখ আহমদের মতোই আহসান হাবীব ও সৈয়দ আলী আহসান কবি হিশেবে খ্যাতিমান হ'লেও একসময় কিছু গল্পও লিখেছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসে সব সময়ই অমন ঘটে : সৃষ্টিশীলতাকে সব সময় বিভক্ত করা চলে না ; আর তাকে ঘিরে রহস্যময়তা চলতেই থাকে। দুই বাল্যবন্ধুর মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রথম জীবনে গল্প লিখতেন আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-৭৬) লিখতেন কবিতা। উত্তরজীবনে নজরুল হ'য়ে ওঠেন কবি, আর শৈলজানন্দ কথাসাহিত্যিক। তাই ব'লে এটাও আমাদের মনে থাকে না যে, নজরুল পরবর্তী জীবনেও গল্প-উপন্যাস লিখেছেন এবং তাঁর কথাসাহিত্যিক কৃতিও উল্লেখযোগ্য। তিরিশের অন্তত কোনো-কোনো লেখক তো কবি ও কথক দুই হিশেবেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যেমন, কল্লোল যুগের তিন নায়ক : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮) ও বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪)। কিন্তু চল্লিশের দশকে কবিতা ও কথাসাহিত্যের চর্চা ভাগ হ'য়ে যায় : একদিকে সমরেশ বসু (১৯২১-৮৮), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-৭০), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭-৭৫), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-৮২) প্রমুখ — অন্যদিকে সমর সেন (১৯১৬-৮৭), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-৮৫), অরুণকুমার সরকার (১৯২১-৮১), নরেশ গুহ (১৯২৪) প্রমুখ। আমাদের কবি-কথকদের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে : কবি ও কথকেরা আলাদা-আলাদা এলাকায় সাফল্য রোজগার করেছেন।

ফররুখ আহমদও তা-ই : কবি হিশেবেই তিনি পূর্ণ বিকশিত হয়েছেন। কবি হিশেবে যেহেতু তিনি একটি চূড়ায় পৌঁছেছেন, কেবল সেজন্যেই প্রাথমিকভাবে আমাদের

www.pathagar.com

কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় তাঁর গল্প ব্যাপারে। সেই প্রাথমিক কৌতূহল চরিতার্থতার পরেও কিছু থেকে যায়, — ফররুখ আহমদের সমগ্র সাহিত্যকর্মে একটি অভিনব, এতোকাল-অভাবিত, বাস্তব অথচ দিব্য মাত্রা যোজনা করছে এই একগুচ্ছ গল্প।

দুই

তিন বছরে লেখা পাঁচটি গল্পের মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে।

'মৃত বসুধা' গল্পটির পটভূমি গ্রাম ; বাকি গল্পগুলির পটভূমি নগর — কলকাতা। ১৯৩৯ সালে, ঠিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে-আগে, ফররুখ আহমদের গল্প লেখা শেষ হ'য়ে যায়। মহাযুদ্ধের কালো প্রাক-ছায়া যেন গল্পগুলিতে আস্তীর্ণ হ'য়ে আছে। সমুদ্রের ডাক ফররুখের তখনো শ্রবণে পশেনি। "সাত সাগরের মাঝি"-র কবিতা লিখবেন এই কবি ও লেখক, তা তখন অকল্পনীয়। গল্পগুলিতে কলকাতার খিন্ন-দীর্ণ-ক্লিন্ন জীবন পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। তাহ'লেও ফররুখের প্রাথমিক কবিতার সঙ্গে এই গল্পগুলির একটি সাযুজ্য আছে। ফররুখের প্রথম পরিকল্পিত কবিতাগ্রন্থ "হে বন্য স্বপ্নেরা"র জগতের সঙ্গে এই গল্পগুলির কিছু সাদৃশ্য আছে। কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত "হে বন্য স্বপ্নেরা" (১৯৭৬)-র ভূমিকায় ঐ গ্রন্থের সম্পাদক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন :

> ফররুখ আহমদের প্রাথমিক রচনায় যে লক্ষণগুলি ধরা পড়বে, এবং তা আবশ্যিকভাবেই পড়বে, সে হল তারুণ্য ও নাগরিকতা, — নাগরিকতা মেজাজের নয়, দৃশ্যপটের। সাতচল্লিশের দেশ-বিভাগের আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় তিরিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত, ফররুখ আহমদ কলকাতায় ছিলেন। কলকাতার বাইরে বেশি দিন কোথায়ও থাকেননি। এ-সব কবিতার গায়ে সূক্ষ্মভাবে ঐ সময়কার কলকাতার গন্ধ লেগে আছে — বামপন্থী রাজনীতির সুর, কখনো অস্পষ্ট, কখনো বা স্পষ্টতর ; এবং অল্পকাল পরেই পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের কালো হাওয়া।
>
> [ভূমিকা, "হে বন্য স্বপ্নেরা", ১৯৭৬]

১৯৩৭-৩৯ কালপর্বে লেখা ফররুখ আহমদের গল্পগুচ্ছ সম্পর্কেও এই উক্তি অনেকটা প্রযোজ্য। আবার এই নগরদৃষ্টির খানিকটা হ'লেও ফররুখ পেয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে। সমসাময়িক লেখক আবু রুশদ তখনই লক্ষ্য করেছিলেন, ফররুখ আহমদের উপরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছায়াপাত।[৬] প্রেমেন্দ্র মিত্র ফররুখ আহমদ-আহসান হাবীব-সৈয়দ আলী আহসান, — চল্লিশের এই তিনজন কবিকেই অল্পবিস্তর প্রভাবিত

www.pathagar.com

করেছিলেন। ফররুখের গল্পেও প্রেমেন্দ্রের ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়. তবে গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের কলাকুশলতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র (সাংকেতিক একটি গল্প, 'যে পুতুল ডলির মা', হয়তো তাঁর সমানধর্মী)।

গল্পগুলিতে একটি শ্বাসরোধী আবহাওয়া আছে। এদিক থেকে তিনি বরং তাঁর জগতের সম্পূর্ণ বিরোধী জগদীশ গুপ্ত-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জগৎকে স্মরণ করিয়ে দেন ; কিন্তু তলে-তলে তখনই বোঝা যায় তাঁর আভিমুখ্য কোনখানে — সেদিক থেকে তিনি পূর্বোক্তদের মতো নির্লিপ্ত নন, যুক্ত : বিপরীতভাবে যুক্ত, যা পরে মুক্তি পেয়েছে এক আতীব্র আদর্শবাদিতায়।

'মৃত বসুধা' গল্পটি সমতল, বর্ণনাত্মক, একলক্ষ্য। সুপ্রচুর উপমার পর উপমার মালা গাঁথা হয়েছে। প্রথম বাক্য : 'নদীর ঘাটে প্রাচীন অশত্থের তলায় বৈকালিক আসর বসে গ্রাম্য বৃদ্ধদের।' শেষ বাক্য : 'বসুধা ওখানে মৃত — উৎপাদিকা শক্তিহীন।' মধ্যবর্তীতে বর্ণিত হয়েছে এক বৃদ্ধ খোন্দকার রউফ শাহেবের কাহিনী। 'শয়তানের হাতে বন্দী মানবের মত তিনি ছিলেন যৌবন-বন্দী অসহায়।' 'যৌবন-বন্দী' — এই সুন্দর যৌগিক শব্দে রউফ শাহেবের চারিত্র ধৃত। প্রকৃত গল্পকার-শোভন ইঙ্গিতময়তা আছে একটি উপমায় : 'যে চঞ্চলতায় আঁধার থাকতে পাখী বাসা ছেড়ে উড়ে গিয়ে শিকারীর হাতে ধরা দেয়, সেইরকম আত্মঘাতী ভোগস্পৃহা তখন জেগেছিল তাঁর মনে।' 'আত্মঘাতী ভোগস্পৃহা' শব্দদ্বয়ে গল্পের পরিণাম ব্যঞ্জিত। স্বেচ্ছাচারী রউফ শাহেব রাহেলাকে ভোগদখল করেন বটে, কিন্তু তার আত্মাহুতির দৃশ্য তিনি ভুলতে পারেন না ; আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঘটে রাহেলার কন্যা লতিফাকে দিয়ে : তারও রক্তে তাঁরই মতো বাসনার বন্যা, প্রেমিকের সঙ্গে সে পালিয়ে যায়, মৃত্যুকালেও তার মুখ আর দেখতে পান না রউফ শাহেব। শস্যহীন শক্তিহীন একটি মাঠের বর্ণনায় গল্প সমাপ্ত হয়। 'মৃত বসুধা' নামটি একটি সরল প্রতীক।

'বিবর্ণ' গল্পটি একেবারে তুচ্ছ, সামান্য একটি বিষয় নিয়ে। প্রথম বাক্য : 'জীবন, আলো আর আ-দিগন্ত মুক্তি।' শেষ বাক্য : 'আকাশে তখন কাজল মেঘ কেটে গেছে, — সেখানে জেগে উঠেছে নির্মম ঔদাসীন্যের কঠোর বিবর্ণতা।' ('মৃত বসুধা' ও 'বিবর্ণ' দুটি গল্পেই প্রাকৃতিক বর্ণনা গল্পের অন্তর্লোকে আলো ফ্যালে। গল্পে ফররুখ একলক্ষ্য এবং তাঁর গল্প স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বরাট্ — ঐ সূচনা ও সমাপ্তি থেকেই তা প্রতীত হয়। নিটোল গোল ক'রে শেষ হচ্ছে 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' গল্পটিও — যার শুরু 'শেষ রাত্রি' এই বাক্যবন্ধে। আর সমাপ্তিতেও তাই : 'শেষ রাত্রির বাতাস গভীর হয়ে ঘরে ঢুকল। হারুণের ক্লান্ত শরীরে চোখের পাতায় ঘুমের প্লাবন — বিস্মৃতির প্রথম প্রলেপ।' — দেখা যাচ্ছে : ফররুখ ঐ তরুণ বয়সেই গল্পের সংগঠন ও আসঞ্জনে সিদ্ধি দেখিয়েছেন।) 'বিবর্ণ'

www.pathagar.com

গল্পেও উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রাচুর্য। প্রকৃতির প্রতীক পুনঃপুনঃ প্রযুক্ত হয়েছে। চরিত্র : মা হাসিনা, ছেলে হাসান, মেয়ে, বৃদ্ধা মা। পটভূমি : কলকাতা। কিন্তু আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরের সমৃদ্ধ দিনগুলির জন্যে হাসিনার মনে বেদনা জেগে উঠেছে। সাধারণ একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে কলকাতার জীবনের রুদ্ধশ্বাস অবস্থা, হাসিনার জীবনের রুদ্ধশ্বাস অবস্থা বর্ণিত।[৭]

'অন্তর্লীন'ও হতাশার গল্প। পূর্বোক্ত গল্পদ্বয়ে প্রথম বাক্যের সঙ্গে শেষ বাক্য অচ্ছেদ্য। কিন্তু এখানে প্রথম বাক্য : 'কল্পনাবিলাসী শাহরিয়ার'। প্রথম বাক্যেই গল্পের শুধু নয় — একেবারে চরিত্রপাত্রের অন্তরে প্রবেশ করেছেন লেখক। শেষ বাক্যে বোঝা যায় : ইতিমধ্যে গল্প অন্য জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে : 'কল্পনাবিলাসী' এই নিরীহ শব্দটি শাহরিয়ারের জীবনে যে কী মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে, তা-ই উদ্ঘাটিত হয়েছে। শেষ বাক্য : 'বহুদিন আগেকার একটি বঞ্চিত রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে রিহানার অতৃপ্ত কামনা অনুভব ক'রে সে [শাহরিয়ার] বেদনায় অভিভূত হ'য়ে পড়ল।' রিহানা একদিন তীব্রভাবে সন্তান কামনা করেছিলো, তার সেই তৃষ্ণা অতৃপ্ত র'য়ে যায়, কেননা আকস্মিকভাবেই তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর শাহরিয়ারের মধ্যেও বিপুলভাবে জেগে ওঠে সন্তানের জন্যে পিপাসা — কিন্তু ততোদিনে অনেক দেরি হ'য়ে গেছে। দুজনার জীবনই বেদনা-মথিত।

'যে পুতল ডলির মা' একটু যেন সাংকেতিক রেখায় আঁকা। গল্পে কি নিয়তি প্রতীকায়িত হয়েছে? ঘুমঘোরে ডলির মায়ের 'দুর্বোধ্য হাসি' (লেখকের ভাষাতেই) কি জীবনের ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত দিচ্ছে? ('অন্তর্লীন' গল্পের একটি বাক্যাংশে কি এই গল্পের চাবি লুকোনো আছে : '... দৈহিক ক্ষুধার উপরেও ...নারীর মনে সন্তানের জন্য আর একটি ক্ষুধা আছে ...'?

'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' ফররুখ আহমদের সবচেয়ে পরিণত ও শ্রেষ্ঠ গল্প। ভাষার বুনোটের দিক থেকে পাকা অনেক (যেমন : গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদেই একটি ইশারাবাহী চিত্রকল্প : 'আকাশে তারার স্তব্ধ সঙ্কেত, নীচে পীচের আচ্ছাদনে ঢাকা পৃথিবীর একটি বিচ্ছিন্ন অংশ গ্যাসের অস্পষ্ট আলোর দুর্বোধ্য সংশয়ে শংকিত।' কিংবা এ ধরনের বাঁকা প্রকাশ : '... সমস্ত রাত কলকাতার বিভিন্ন পথে হারুণের অসংখ্য পায়ের ছাপ পড়ে।' কিংবা এ ধরনের অপরূপ উৎপ্রেক্ষা : '... তারপর সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে যেন দিক্‌ভ্রান্ত স্টেপের বুনো ঘোড়া।') চরিত্রায়নের দিক থেকেও পাকা হাতের পরিচয় মেলে। প্রধান তিন চরিত্র -হারুণ, ওয়াজেদ ও সালেমাকে খুব স্বচ্ছস্পষ্টভাবেই চেনা যায়। নায়ক হারুণ আদর্শবাদী, একটু বাম-ঘেঁষা, আবেগী আবার কঠোর : '...দিনের বেলায় সে অত্যন্ত সহজ ও মিশুক, আর রাত্তিরে গভীর ভাবপ্রবণতার আবছায়ায় রহস্যময়। নভেল পড়ার

www.pathagar.com

ফাঁকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে বিপ্লবী রাশিয়ার, জীবনদৃষ্টান্ত হারুণের ভাবপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গীকে কাজের নেশায় মাতাল ক'রে তুলেছে।' '...হারুণের মধ্যে ভাব-বিলাসিতা আছে প্রচুর পরিমাণে, তবু তার মধ্যে নমনীয়তা নাই।' এদের নেতা ওয়াজেদ শাহেব বিশ-তিরিশ-চল্লিশ দশকের বিপ্লবী নায়কদের মতো যক্ষ্মারোগে ভোগে। হারুণের বন্ধু নকীব ওয়াজেদ শাহেবের গায়ে হাত দিয়ে জ্বর টের পেলে ওয়াজেদ শাহেবের উক্তি : 'ও কিছু না, ও সেরে যাবে। ওরকম প্রায়ই হয়। ...' ওয়াজেদ শাহেব আদর্শনিষ্ঠ, আত্মবিশ্বাসী, সর্বত্যাগী কর্মী। গল্পের নায়িকা সালেমা বেগম সন্তানপিপাসায় কাতর : '... মেয়েদের জীবনে মাতৃত্বের চাইতে বড় সার্থকতা কি থাকতে পারে।' সালেমা বেগমেরই প্রণোদনায় তাকে মা ডেকেছিলো হারুণ। কিন্তু আকস্মিকভাবে সালেমা বেগমের কয়েকটি চিঠি প'ড়ে (বিভিন্ন পুরুষের কাছে লেখা পত্রগুচ্ছে শরীরী বাসনার অলজ্জ প্রকাশ ছিলো) আর সালেমা বেগমকে একটি পুরুষের সঙ্গে নগ্ন শায়িত দেখে হারুণের স্বপ্নভঙ্গ হয়। গল্পের শেষটি একেবারে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায়-যন্ত্রণায় দীর্ণ কিন্তু তারই মধ্যে হারুণ আবার সঞ্জীবিত-উজ্জীবিত হ'য়ে উঠবে, এরকম একটি ইঙ্গিতও আছে মনে হয়।[৮]

পাঁচটি গল্পেই অবক্ষয়, শীত, নাস্তির একচ্ছত্র রাজত্ব। ফররুখ যদি শুধু এই পাঁচটি গল্প লিখতেন, তাহ'লে তাঁকে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যেতো একজন শূন্যতাবাদী ও অবক্ষয়ী লেখক হিশেবে। কিন্তু তারপরেও নিবিড় পাঠে দেখা যাবে ('মৃত বসুধা' ও 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' গল্পদ্বয় বিশেষভাবে স্মরণীয়) — ফররুখ নির্বিচার ভোগবাদকে সমর্থন করেননি বরং তার বিরোধিতাই করেছেন। সমকালীন জীবনের ছাপ এইসব গল্পে প্রবলপ্রচুর। কলকাতা মহানগরী নানাভাবেই উপস্থিত। 'বিবর্ণ' গল্পে মহানগরের শ্বাসরোধী আবহাওয়া চিত্রিত। 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' গল্পে ফররুখের প্রথম জীবনের কিছু কি ছায়াপাত হয়েছে? কবি-কন্যা লিখেছেন, 'প্রথম জীবনে আব্বা ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত মানবতাবাদী কমরেড এম. এন. রায়ের শিষ্য।' 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা'র কেন্দ্রীয় চরিত্র হারুণের মধ্যে বিপ্লবের বান ডেকেছে, লেখক স্পষ্টই বলেছেন 'বিশেষ করে বিপ্লবী রাশিয়ার' ভক্ত সে। কিন্তু তাদেরই মহিলা সমিতির নেত্রী সালেমা বেগমের দুশ্চরিত্রতা যখন জেনে ফ্যালে সে, তখনই তার মোহভঙ্গ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা তখন আসন্ন ; ফররুখ নিজেও তখন তরুণ ; তবু যেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের খান্‌খান্ দিনগুলির প্রাক-ছায়া গল্পগুলির উপরে নিপতিত হয়েছে।

এই গল্পগুলি যখন লিখছেন ফররুখ, তখনো তিনি তো কবিতা লিখছেন। সুতরাং কবির রচনা যখন, তখন কাব্যকুশলতা তো প্রযুক্ত হবেই। হয়েছেও। এবং দেখা গেছে, ফররুখের এইসব কাব্যকুশলতা গদ্যকর্মেরই সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' গল্পে হারুণের স্বপ্নভঙ্গের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে নানাভাবে। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত

www.pathagar.com

কবি ফররুখ আহমদই জয়ী হয়েছেন। একটিমাত্র উৎপ্রেক্ষা হারুণের হাহাকারকে দীর্ঘ বর্ণনার চেয়ে অনেকবেশি লক্ষ্যভেদীভাবে ধারণ করেছে : 'তার মনে হ'ল যেন কালপুরুষের শাণিত তরবারি কটিবন্ধ ভেঙে গঙ্গায় ধসে পড়েছে।' এইসব গল্পে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে উপমা-উৎপ্রেক্ষা। উপমা-উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে কবিতার সেই কুশলতা, যা রূপকালংকারের অন্তর্ভূত, আরিস্টটল যে-রূপকালংকার বা 'মেতাফোরা'কে কাব্যকর্মে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[৯] এইসব গল্প থেকে ফররুখ আহমদের গাদ্যিক উপমা-উৎপ্রেক্ষার একটি চয়নিকা তৈরি ক'রে দিলাম :

১. বুকের ভিতরটা গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নের মত সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য হয়ে যায় ; তারপর হঠাৎ আসে দমকা ঝড়ের মত নিষ্ঠুর বিশ্বাস-বন্যা। বুকের শীর্ণ পাঁজরগুলো থরথর কাঁপতে থাকে সেই বেগে কালবৈশাখীর আঘাতে শুকনো পাতার মত।

[মৃত বসুধা]

২ রউফ সাহেব তখন পূর্ণ যুবক। তাঁর দেহ ইস্পাতের মত দৃঢ়, দেওদারের মত উন্নতশীর্ষ।

[মৃত বসুধা]

৩. যে-চঞ্চলতায় আঁধার থাকতে পাখী বাসা ছেড়ে উড়ে গিয়ে শিকারীর হাতে ধরা দেয়, সেইরকম আত্মঘাতী ভোগস্পৃহা তখন জেগেছিল তাঁর মনে।

[মৃত বসুধা]

৪. যে-তারকাপথ বেয়ে একদিন অসীম শক্তিতে ক্ষয়িষ্ণু উল্কা কক্ষভ্রষ্ট হ'য়ে পড়েছিল, আজ সে মাটির বুকে আশ্রয় চায়।

[মৃত বসুধা]

৫. মোমের মত নরম, শীতরৌদ্রের মত স্নিগ্ধ উষ্ণ লতিফার ছোট ছোট হাত-পা — ওকে দেখলে একটা পাখীর মত মনে হয়।

[মৃত বসুধা]

৬. সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণধার তরবারির মত সেই বিশাল স্রোত মৃত্যুর ভ্রূকুটির মত দুই তীরের বাড়ী আর গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকত।

[বিবর্ণ]

www.pathagar.com

৭. আদরযত্ন পাওয়া তো দূরে থাক সাথীহারা ডাহুকীর মত তার চোখ সজল হয়ে ওঠে। কোলের কাছে সেলাই কল টেনে নিয়ে হাসিনা সেলাই করতে বসে। অনবরত দ্রুত গতিতে চাকা ঘুরতে থাকে যেন ঋতুচক্রের দ্রুত পরিক্রমা।[১০]

[বিবর্ণ]

৮. একপাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠেছে উপরে যেন মুমূর্ষু যক্ষ্মারোগীর হৃৎপিণ্ডমুখী শীর্ণ বুকের হাড়ের অসজ্জিত সংস্থাপন। নগ্ন ইটের বুকে মাঝে মাঝে সিমেন্টের ধ্বংসশেষ টুকরো দেখা যায় অনাদৃত পূর্ব সমৃদ্ধির মত।

[প্রচ্ছন্ন নায়িকা]

৯. দিনগুলো টুকরো কাগজের মত ওড়ে।

[প্রচ্ছন্ন নায়িকা]

১০. সমস্ত মুখে রক্তের ছায়াও নাই, যাদুঘরের স্পিরিটের মধ্যে রাখা আদিযুগের সরীসৃপের মত ওর ধূসর চেহারা।

[প্রচ্ছন্ন নায়িকা]

১১. তার মনে হ'ল যেন কালপুরুষের শাণিত তরবারি কটিবন্ধ ভেঙে গঙ্গায় ধসে পড়ছে।

[প্রচ্ছন্ন নায়িকা]

হ্যাঁ, ফররুখের গল্পে কাব্যকুশলতার ব্যবহার আছে ; কিন্তু তাঁর কোনো গল্পই শেষপর্যন্ত কাব্যিক নয়। বাস্তবতার ভিত্তিতেই রচিত। এখানেই তাঁর গল্প গল্প।

তিন

পঞ্চাশ বছর আগে লেখা হ'লেও ফররুখ আহমদের এই গল্পগুলিতে কোথাও একতিল জং ধরেনি। এর কারণ মনে হয় ফররুখের আত্মস্বভাবী বলিষ্ঠতা, অগুপ্ততা। তখনো সাধু গদ্যভাষা ব্যবহার করছিলেন অনেকে ; কিন্তু ফররুখ তখনও চলতি গদ্যের নিঃসংশয় সাধক। তখনই তাঁর সহজ স্বাভাবিক সাবলীল স্বধর্ম আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর গল্পের প্লট নিয়েছেন তিনি মুসলিম জীবন থেকেই। ফররুখ তাঁর স্বভাবী বলিষ্ঠতায় এখানে যৌনতাকেও ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কোনো মর্বিডিটির আশ্রয় নেননি। যৌনতাকে তিনি অকপটে উন্মোচন করেছেন, সেখানেও একটি স্বাভাবিকত্বকে তিনি অঙ্গীকার করেছেন : 'অন্তর্লীন' গল্পে শাহরিয়ার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — 'শারীরিক কামনাকে সে সহজ এবং

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করে। কিন্তু সে অসচ্চরিত্র বা অসংযমী নয়।' সালেমা বেগমের গোপন পত্রগুচ্ছে শারীররতির অলজ্জ প্রকাশ ঘটেছে (যেমন : 'আমার স্বামী বেঁচে থাকতেও আপনি আমরা দেহ-মন পেয়েছেন, উপভোগ করেছেন, তবু কি আপনার তৃপ্তি হল না' কিংবা 'এ জীবন তোমাকেই দিলাম, তুমি নাও, আমার সব নাও, দস্যুর মত আমাকে উপভোগ করো।') এখানে যে-সাহস ফররুখ দেখিয়েছেন, তা শিল্পীর সাহস : অর্দ্ধনগ্নতা একে কদর্য ক'রে দিতো। কিন্তু এই অলজ্জ চিত্রণ আসলে ভোগবাদের সমর্থন নয় — বিরুদ্ধতা। কিন্তু এও সত্য — যৌনতা এইসব গল্পের একটি কেন্দ্রীয় উপজীব্য। এবং ফররুখ জীবনের এই সারসত্যকে তাঁর সাহিত্যে স্বীকৃতি দিয়ে ভালো করেছেন। 'মৃত বসুধা'র রউফ শাহেব বা 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা'র সালেমা শাহেবার স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধিতা করেছেন ফররুখ। বিষয়টি স্বচ্ছ করা দরকার। কবিতায় মোহিতলাল মজুমদার বা নজরুল ইসলামের বলিষ্ঠ ভোগবাদ (মোহিতলালের 'নারীস্তোত্র' বা নজরুলের 'পূজারিণী', 'মাধবী প্রলাপ' প্রভৃতি স্মরণীয়) সম্পূর্ণভাবে না-হ'লেও আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কোনো-কোনো কল্লোলীয় লেখকের গল্প-উপন্যাসে — বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশংকর রায় বা প্রবোধকুমার সান্যালে। উত্তরকল্লোলী হ'য়েও ফররুখ কিন্তু সে-পথে যাননি। সেদিক থেকে তাঁর পরবর্তী আদর্শবাদিতা এই গল্পগুচ্ছের আদর্শবাদিতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। সমকালীন গল্পকার শাহেদ আলীর কয়েকটি গল্পে তাঁর আদর্শবাদিতা রূপায়িত হয়েছে। সাধারণত গল্পকাররা জীবনচিত্রণেই নজর দেন, আদর্শ রূপায়নের চেষ্টা করেন না — ফররুখ-সমকালীন শাহেদ আলীর কয়েকটি গল্প তার ব্যতিক্রম।

ফররুখের পরবর্তী সাহিত্যকর্মের একটি কুটিল বীজ কি র'য়ে গেছে এইসব গল্পের গহনে? এইসব গল্পের সারাৎসার তো শূন্যতা, সুধীন্দ্রনাথ-কথিত 'নিখিল নাস্তি' : 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' গল্পের সালেমা বেগমকে মা ব'লে ডেকেছিলো আদর্শবাদী তরুণ হারুণ, একদিন তার স্বপ্নভঙ্গ হয় যখন সে দ্যাখে ও জানে যে, সালেমা বেগম বিভিন্ন পুরুষকে শরীর দানে অভ্যস্তা ; 'মৃত বসুধা' গল্পের নায়ক বৃদ্ধ খোন্দকার রউফ শাহেবের জৈবনিক-যৌবনিক উদ্দামতার ফসল তাঁরই আত্মজা একটি ছেলের সঙ্গে চিরদিনের জন্যে গৃহত্যাগ করে — এমনকি মৃত্যুর সময়েও তিনি তাকে শেষ দেখা দেখতে পান না ; 'বিবর্ণ' গল্পের নায়িকা স্বামীহীনা হাসিনা, ছেলেকে নিয়ে কলকাতার আবদ্ধ ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার একটুখানি সাধও পূর্ণ হ'লো না তার মায়ের বাদ সাধার ফলে ; 'অন্তর্লীন' গল্পে রিহানার জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যায় মাতৃত্ব পূর্ণ না-হওয়ায় — আর তার মৃত্যুর পরে তার স্বামী শাহরিয়ারও একই যন্ত্রণায় দীর্ণ ; — ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এই গল্পগুলি ফররুখ আহমদের সাহিত্যজগৎকে নিশ্চিতভাবে সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করলো। ফররুখের একেবারে প্রাথমিক সাহিত্যিক শস্য হিশেবেই এগুলি কেবল মূল্যবান নয়, এগুলি মহার্ঘ এজন্যে যে, এ ফররুখ-সাহিত্যে একটি সম্পূরক ভূমিকা উদযাপন করবে। যে-জগৎ এখানে রূপায়িত হয়েছে, তার সঙ্গে ফররুখের কাব্যপৃথিবীর কোনো মিল নেই। ব্যঙ্গবিদ্রূপময় ফররুখের পরবর্তী তিক্ত কবিতাগুচ্ছের সঙ্গে এর একটুখানি সমান্তরালতা আছে হয়তো কিংবা "রাজরাজড়া' নামের ব্যঙ্গাত্মক গদ্যনাটকের সঙ্গেও হয়তো — তবু, শেষ-পর্যন্ত, সে-সব তির্যক দর্পণ। তাঁর গল্পগুচ্ছে, ঐ একবারই, ফররুখ বাস্তবকে সরাসরি মোকাবিলা করেছেন। "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪) বা "হাতেম তায়ী"র (১৯৬৬) কাব্যজগৎ এই গল্পজগৎ থেকে সুদূর। ফররুখ-রচিত সর্বশেষ গল্প 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা'র নায়কের মতো ফররুখ যেন অতঃপর পিছুটানহীন আদর্শবাদিতার দিকে অসংকোচে দৃপ্ত পায়ে অগ্রসর হ'য়ে গেছেন।

এই গল্পগুলির আবিষ্কার একটি সাহিত্যিক ঘটনা ব'লেই মনে করি॥

---

১ সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তাফী-সম্পাদিত "জীবনানন্দ দাশের গল্প" বইটি বেরিয়েছিলো ১৯৭২ সালে। এই বইয়ের অন্তর্ভূত তিনটি গল্পের বিশদ আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : আবদুল মান্নান সৈয়দের "শুদ্ধতম কবি" (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭)। সমগ্রভাবে জীবনানন্দ দাশের গল্পের আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত "জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ গল্পে"র (১৯৮৯) প্রবেশক।

২ যুগান্তর চক্রবর্তী-সম্পাদিত "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা" প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৭১ সালে। এই বইয়ের বিস্তারিত আলোচনা আবদুল মান্নান সৈয়দ-প্রণীত 'শব্দ-মদের বিরুদ্ধে' পাওয়া যাবে ভুঁইয়া ইকবাল-সম্পাদিত "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়" (১৯৭৫) সংকলনে।

৩ এই গল্পগুলির সমসাময়িক অর্থাৎ ১৩৪৪-৪৬ সময়পর্যায়ে প্রকাশিত ফররুখ আহমদের কবিতার একটি তালিকা এখানে পেশ করা হ'লো :

১. রাত্রি। বুলবুল। শ্রাবণ ১৩৪৪।

২. অপ্রয়োজন। ঐ। ভাদ্র ১৩৪৪।

৩. মৃত্যু-রূপা। ঐ। পৌষ ১৩৪৪।

৪. নগর-পথ। ঐ। ফাল্গুন ১৩৪৪।

৫. অন্যায়। ঐ। চৈত্র ১৩৪৪।

৬. জন্মদৈন্য। ঐ। বৈশাখ ১২৪৫।

৭. প্রলোভন। মাসিক মোহাম্মদী। মাঘ ১৩৮৫।

৮. ইতিহাস আর আজকের রাত্রি। ঐ। ফাল্গুন ১৩৪৫।

৯. একটি কবিতা। ঐ। ফাল্গুন ১৩৪৫।

www.pathagar.com

১০. নির্লজ্জ। ঐ। আষাঢ় ১৩৪৬।

১১. জীবন-ছন্দ। ঐ। আষাঢ় ১৩৪৬।

১২. আঁধারের স্বপ্ন। সওগাত। পৌষ ১৩৪৫।

১৩. চৈত্র-প্রভাতের সুর। ঐ। ফাল্গুন ১৩৪৫।

১৪. নাটকীয়। ঐ। চৈত্র ১৩৪৫।

১৫. চৈত্র-সন্ধ্যার সুর। ঐ। বৈশাখ ১৩৪৬।

১৬. কর্পূর। ঐ। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬।

৪. সমসাময়িক কবি সৈয়দ আলী আহসান ফররুখ-সংক্রান্ত একটি স্মৃতিচারণায় ("সতত স্বাগত") জানিয়েছেন যে, ফররুখের 'সিকান্দার শা-র ঘোড়া' লেখা হচ্ছিলো উপন্যাস হিশেবে 'মৃত্তিকা' পত্রিকায় ঐ অসম্পূর্ণ উপন্যাসের সাত পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছিলো। ঐ সাত পৃষ্ঠায় উপন্যাসের দুটি পরিচ্ছেদ ছাপা হয়েছিলো : 'এ কোন দেশ?' আর 'সীমানা'।

৫ সমসাময়িক লেখক শওকত ওসমান "ফজলুল হকের গল্প" প্রকাশ ক'রে অধুনাবিস্মৃত গল্পকার ফজলুল হককে আবার সামনে এনেছেন।

৬ আবু রুশদের মন্তব্যটি ছিলো এই : 'আধুনিক কোন কবির প্রভাব ফররুখ আহমদের উপর যদি থেকে থাকে ত' তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র।' ('আধুনিক কবিতা ও মুসলিম কবিগণ', 'সওগাত', ভাদ্র ১৩৪৮)।

৭ মধ্যবিত্ত জীবনে নারীর রুদ্ধশ্বাস অবস্থার এক আশ্চর্য চিত্রণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পে — কিন্তু ঐ গল্প অনেকখানি প্রতীকী, 'বিবর্ণ' তুলনায় অনেকবেশি প্রত্যক্ষ।

৮ একই বিষয়ের জটিল্য ধ'রে দিয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "প্রতিবিম্ব" নামক একটি নভেলায়।

৯ 'মেতাফোরা' বা রূপকালংকার প্রসঙ্গে আরিস্টটলের উক্তি :

It is a great thing, indeed to make a proper use of these poetical forms, as also of compound and strange words. But the greatest thing by far is to be a master of metaphor. It is one thing that cannot be learnt from others; and it is also a sign of genius, since a good metaphor implies an intuitive perception of the similarity in dissimilars.

১০ এই উপমাটি আমাদের মনে পড়িয়ে দ্যায় ফররুখের 'ডাহুক' ("সাত সাগরের মাঝি") কবিতাটি। এই তথ্যও স্মরণীয় : বাল্যকালে ফররুখ মধুমতী নদীর পাড়ে বাঁশঝাড়ের পাশে গিয়ে ডাহুকের ডাক শুনতেন। তাঁর রচিত আরো কোনো-কোনো কবিতায় ডাহুক প্রসঙ্গ আছে—তা যতোটা কাব্যপ্রচল হিশেবে এসেছে (যেমন এসেছে নজরুল ইসলামের কবিতায়-গানে), তার চেয়ে এসেছে অভিজ্ঞতা হিশেবে।

www.pathagar.com

প্রত্যেক কবি একক। আদি মানবের মতো পৃথিবীতে প্রথম ভ্রমণ ও দৃষ্টিপাত করছেন এমন বিস্ময় তার প্রতি পদক্ষেপে ও পলকপাতে। আদি মানবের মতো প্রত্যেকেই তার নিজস্ব নতুন পৃথিবীতে ভ্রমণশীল ও দৃষ্টিপাতকারী। সেখানে অন্য কারো উপস্থিতি, পদক্ষেপ বা দৃষ্টিপাত নেই। যে-পৃথিবী কবি নির্মাণ করেন, সে-পৃথিবীর সঙ্গে অন্য পৃথিবীর যোগ নেই। সে-পৃথিবী একক স্বতন্ত্র নিজস্ব। চরাচরে ঘূর্ণমান অসংখ্য পৃথিবী, নক্ষত্র, গ্রহ বা গ্রহাণুর মতো পৃথিবীর কবিসংঘও অজস্র পৃথিবী, নক্ষত্র, গ্রহ বা গ্রহাণু নির্মাণ ক'রে চলছেন — এবং সেগুলির সংখ্যা ক্রমবিবর্ধমান।

ফররুখ আহমদও এমন-একটি পৃথিবী নির্মাণ করেছিলেন, যা অন্য-সব কাব্যপৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন একক নিজস্ব আত্মক্রীড় স্বয়ম্পূর্ণ। নজরুল ইসলামের কাব্যধারা থেকে ফররুখ আহমদের উৎসারণ — এরকম একটি কথা প্রচলিত আছে। একটু অভিনিবেশ দিলেই দেখা যাবে, এই বিচার তথ্যসমর্থিত নয়। ইসলামী বিষয় নিয়ে নজরুল ও ফররুখ দুজনেই লিখেছেন, দুজনের কিছু আরবি-ফারসি শব্দব্যবহারেও সাযুজ্য আছে — কিন্তু দুজনের কাব্যভাষা সম্পূর্ণ আলাদা ; কাব্যপ্রকরণও বিভিন্ন ; কাব্যবিশ্বাসকেও শেষ-পর্যন্ত আলাদা, এমনকি বিপরীত, বলতে বাধ্য হই আমরা। নজরুলকে হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত বলবো না — বলবো 'অভিযাত্রিক', কেননা ঐ অসাধ্য সাধনে আর-কোনো বাঙালি কবি (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে) অগ্রসর হননি। আর ফররুখ মুসলিম জাগরণের কবি, প্রথম একক-বিষয়ী মুসলিম কবি — ইসমাইল হোসেন সিরাজী বা গোলাম মোস্তফা যা আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, যেন তারই মূর্ত প্রকাশ। এটা ঠিকই যে নজরুল ইসলামই প্রথম ইসলামী বিষয়ের সফল সাহিত্যিক রূপদাতা — কিন্তু নজরুলের উৎসারণ ছিলো অজস্র মুখে ও ধারায়। নজরুলের পরে তিরিশের দশকের মুসলমান কবিরা কিন্তু মূলত গ্রহণ করেছিলেন নজরুলের দ্রোহী ধারাটি — ইসলামী ধারা নয়। ইসলামী বিষয় নিয়ে দু-চারটি কবিতা এঁরা অনেকেই লিখেছেন কিন্তু নজরুলের এক-প্রজন্ম-ব্যবহিত কবি ফররুখ যে-ভাবে ঐ বিষয়ে অভিনিবেশী হলেন তা জসীমউদ্‌দীন-আবদুল কাদির-বেগম সুফিয়া কামাল-বেনজীর আহমদ-বন্দে আলী মিয়া-মহীউদ্দীন-মঈনুদ্দীন-কাদের নওয়াজের ছিলো অকল্পিত। এদিক থেকেই বোঝা যায় : ফররুখ আহমদ ধারাবাহী নন — দ্বীপবর্তী। এদিক থেকে ফররুখ আহমদকে বলা যাবে না তিনি নজরুলের পরবর্তী পথিক। তিনি স্বরাট্। তিনি তাঁর নিজের পৃথিবীর জনক এবং ঐ পৃথিবীতেই ভ্রাম্যমাণ। মোহিতলাল, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে — এঁদের রণন আছে ফররুখে ; কিন্তু যাকে বলে প্রভাব, তা নেই। মাইকেলের নব-নব প্রকরণপরীক্ষা শব্দগত ধ্বনির

www.pathagar.com

আনন্দ ও ধ্রুপদী ধরনে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন — কিন্তু ওটুকুই। শেষ-পর্যন্ত ফররুখ আহমদ যে-জগৎ তৈরি করেছেন, তিনিই তার একক অধীশ্বর।

নজরুল ইসলাম নন — ফররুখ আহমদই প্রথম আপাদমস্তক ইসলামী কবি। তার সাক্ষ্য দেবে তাঁর অসংখ্য কবিতাই নয়, এমনকি তাঁর গদ্যরচনাও। বস্তুত কবিতায় হয়তো অনেক সময় আড়াল রচনা সম্ভব, কিন্তু গদ্যকর্ম এমনই আস্বচ্ছ একটি দর্পণ — যেখানে রচয়িতার গোপনতম মনোজগৎও উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। ফররুখ-মানস বুঝবার জন্যে তাঁর অত্যল্প গদ্যরচনার বিজন প্রদেশটি দ্রুত সফর ক'রে আসা যায় একবার। ফররুখ গদ্য লিখেছিলেন দুজন কবিকে নিয়ে — ইকবাল ও নজরুলকে নিয়ে। মুসলমান কবি হিশেবেই এঁদের তিনি বিবেচনায় এনেছিলেন। তাঁর সমস্ত গদ্যরচনার কেন্দ্রে দেখা যাবে ইসলামচিন্তা। ইকবাল সম্পর্কে তিনি বলছেন, ইকবালের কবিতার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে — 'পৃথিবীর কাব্যভাণ্ডারে ইকবাল যে-বিশিষ্ট জাগরণের বাণী ব'য়ে এনেছেন, তা সকল দেশ ও সকল কালের উপযোগী হ'লেও আদর্শচ্যুত, পরাধীন মুসলমান সমাজের জন্যই তার প্রয়োজনীয়তা সবচাইতে বেশি। ('ইকবাল-প্রসঙ্গ') আর নজরুলকে তিনি বলেছেন মুসলিম বাংলার প্রথম কবি। ('নজরুল প্রসঙ্গ') নজরুলকে তিনি ঈষৎ সমালোচনা করেছেন এই ব'লে যে বাঙালি-মুসলমান আরো চেয়েছিলো নজরুলের কাছে ; তারা তাদের নিজের দর্শন, জীবনবোধ ও ইতিহাসের অভিব্যক্তি চেয়েছিল কবি নজরুলের কবিতায়। (ঐ) তাঁর বিবেচনায় নজরুলের এই অভাবই সম্ভবত তিনি মেটাতে চেয়েছিলেন তাঁরা লেখার ভিতর দিয়ে — বাঙালি-মুসলমানের 'দর্শন', জীবনবোধ ও ইতিহাসের অভিব্যক্তির রূপায়নে। এই সূত্রেই বোঝা যায়, ফররুখ তাঁর কবিতায় কেন প্রায় আত্মবিলোপ ঘটিয়েছিলেন — কেননা তাঁর লক্ষ্য ছিলো তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে জাতির দর্শন, জীবনবোধ ও ইতিহাসের অভিব্যক্তি ঘটানো। লক্ষণীয়, ফররুখ কেবল নজরুলের ইসলামী কবিতাকেই আলোচনার অন্তর্ভূত করেননি, নজরুলের রাজনৈতিক কবিতাকেও তিনি বাঙালি-মুসলমানের জাগরণের পটভূমিতে স্থাপন ক'রে দেখেছেন। একদিকে নজরুল-কাব্যে তাঁর বিবেচিত অভাব, অন্যদিকে ইকবাল-কাব্যের প্রতি তাঁর আবেগী মুগ্ধতায় চেনা যায় ফররুখ-মানস — অন্তত তাঁর কাব্যিক উৎকাঙ্ক্ষা। ইকবাল সম্পর্কে তাঁর উক্তি আমরা মিলিয়ে নিতে পারি তাঁর নিজের সঙ্গেই যেখানে ফররুখ বলছেন, 'ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি [ইকবাল] ফকীরের মত আড়ম্বরশূন্য ছিলেন, কিন্তু শক্তিমান ছিল তাঁর মন — একটি নির্জীব জাতিকে দাস-সুলভ নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের পঙ্ককুণ্ড থেকে টেনে তোলার মত বলিষ্ঠ নির্ভীক মন'। ('ইকবাল-প্রসঙ্গ') ইকবাল সম্পর্কে তাঁর উক্তি : তাঁর মনের পূর্ণ পরিচয় পেতে হ'লে আমাদের উঠতে হবে তাঁর মননের উচ্চস্তরে, যেখানে 'Iqbal stands on a hill by

www.pathagar.com

himself' (Dr. R. A. Nicholson) (ঐ) ফররুখ নিজেও ঐরকম এক পর্বতচূড়ায় নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে। দেশবিভাগের অর্থাৎ পাকিস্তান হওয়ার এক মাস পরে-পরেই একটি প্রবন্ধে ('পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য') ফররুখ বলছেন, '... এটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচিত হবে। যদি তাই হয়, তাহলে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।' একই প্রবন্ধে তিনি দ্বিধাহীন জানিয়ে দেন : 'বাংলা ভাষাকে যে ইসলামী ভাবধারার শ্রেষ্ঠ আধারে পরিণত করা যায়, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

ফররুখের গদ্যরচনার উপর্যুক্ত সারাৎসার থেকে এই তথ্য বেরিয়ে আসে যে, তিনি ইসলামকেই তাঁর কবিতার আত্মায় পরিণত করবেন, আর সে-ক্ষেত্রে বাঙালি-মুসলমানের 'দর্শন, জীবনবোধ ও ইতিহাসের অভিব্যক্তি' ঘটানোর জন্যে আত্মবিলোপ করতেও রাজি। ফররুখ তা-ই করেছিলেন। লিরিক প্রবণতা সত্ত্বেও ফররুখের সংখ্যাহীন কবিতায় তাই আত্মতা এতো কম — প্রেমের কবিতা এতো কম। বস্তুত ব্যক্তিকে বা আত্মাকে সরিয়ে রেখে তিনি জাতিগত বেদনা ও আকাঙ্ক্ষার পরিচয়ই উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এবং এদিক থেকে তিনি এক একক পৃথিবীনির্মাতা।

কিন্তু কোনো কবিই আবার শেষ-পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন নন ; হওয়া সম্ভব নয়, তাঁর স্বদেশ ও স্বকাল থেকে অর্থাৎ তাঁর পরিপার্শ্ব থেকে। ফররুখও তা ছিলেন না। চল্লিশের কবিদের পারিবারিক চিহ্ন তাঁর রচনাতেও স্পষ্ট। সমাজ-ও-রাজনীতিচেতনা চল্লিশের কবিদের সামান্য লক্ষণ। এ বোধ হয় অনিবার্য ছিলো। এঁরা কবিতা লিখতে শুরু করেন মহাযুদ্ধের কালো দিনগুলিতে, এঁরা চোখের সামনে দেখেছেন পঞ্চাশের মন্বন্তর, হিন্দু-মুসলিম রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, দেখেছেন ভারতের বিভক্তি। ফলে এঁদের সকলের লেখায় রাজনীতি আর সমাজচেতনা ওতপ্রোত মাখামাখি হ'য়ে আছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও ফররুখ আহমদ, সমর সেন ও তালিম হোসেন — এঁদের মধ্যে যতোই আসমান-জমিন ফারাক থাক, এঁরা সকলেই তীব্রভাবে সমাজ-ও-রাজনীতি-জাগর। (একথা চল্লিশের কথাশিল্পীদের সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য।) সমাজ-ও-রাজনীতিজাগর — অর্থাৎ বাস্তববাদী চল্লিশের কবিরা। ফররুখও তাই ছিলেন। সকলেই তাই। কিন্তু তিরিশের কবিদের মধ্যে অন্তত একাংশ — জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিত দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র — প্রবলভাবে স্বপ্নবিদ্ধ। তুলনামূলকভাবে চল্লিশের কবিরা অনেক বেশি বাস্তবিক। তাঁদেরও স্বপ্ন আছে, তা না হ'লে তাঁরা কবিই হতেন না, কিন্তু তাঁদের সে-স্বপ্ন বাস্তবেরই জাতক। ফররুখেরও তাই।

www.pathagar.com

ইকবাল প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ফররুখ ঠিকই চিহ্নিত করেছেন, 'বর্ষচক্রের গাণিতিক হিসাবের সঙ্গে প্রতিভার আবির্ভাব সংযুক্ত' নয় — কিন্তু কালের স্বাক্ষরও এমন অমোঘ যে, কোনো শিল্পীই তার হাত থেকে আশরীর মুক্ত হ'তে পারেন না। ফররুখও পারেননি। ব্যক্তির আত্মবিলোপের হাত থেকে আমাদের চল্লিশের কোনো কবিই মুক্ত নন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ যে-দশককে ঝঞ্ঝামত্ত ক'রে রেখেছিলো — তার কোন্ সন্তানের পক্ষে তাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব? সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও ফররুখ আহমদের কাব্যবিশ্বাসে আকাশ-পাতাল তফাৎ — কিন্তু দুজনের কেউই আত্মকেন্দ্রিক নন, দুজনেই জনগণচিন্তিত, যে-জনগণ নির্যাতিত. আসলে সমাজ ও রাজনীতিচেতনা চল্লিশের কবিদের প্রায় বিধিলিপি — ফররুখেরও তাই। এখানে চল্লিশের কবিদের কবিতার কেন্দ্রীয় ধারাত্রয়ের কথা মনে করা যেতে পারে :

১ শ্রেণী-ও-সমাজচেতন কবিতার ধারা — সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, রাম বসু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, সিকান্দার আবু জাফর, সানাউল হক, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, প্রথম-পর্যায়ী ফররুখ আহমদ প্রমুখ ;

২ ইসলামচেতন কবিতার ধারা — ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ ;

৩ ব্যক্তিবাদী কবিতার ধারা — নরেশ গুহ, অরুণকুমার সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ·

স্মরণীয়, এই ধারাত্রয়ের মধ্যে প্রথম দুটি বিশুদ্ধ সমাজ-রাজনীতি-চেতন। ফররুখ শুধু "হে বন্য স্বপ্নেরা" ও "সাত সাগরের মাঝি"তেই শ্রেণী-ও-সমাজচেতন ছিলেন না ; , অভিনিবেশী হ'লে দেখা যাবে আসলে ফররুখ অন্যায়, অসাম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে সারাজীবনই ছিলেন সোচ্চার। ব্যক্তিবাদী তৃতীয় ধারাটির উৎসারণ বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা থেকে — কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, এই ধারা তেমন প্রভাবসম্পাতী হ'তে পারেনি, বাকি দুটি ধারাই চল্লিশের প্রধান ধারা হিশেবে ইতিমধ্যে চিহ্নিত হ'য়ে গেছে। শুধু চল্লিশের কবিদের কেন, পূর্বজ তিরিশের ব্যক্তিবাদী কবিরাও সময়ের দাবি অগ্রাহ্য করতে পারেন না, জীবনানন্দ দাশ লেখেন "সাতটি তারার তিমির", সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন "সংবর্ত", অমিয় চক্রবর্তী 'অন্ন দাও' ইত্যাদি ফোল্ডার কবিতা ছড়িয়ে দেন। ফররুখের সমসাময়িক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য যখন "আকাল" নামে মন্বন্তর বিষয়ক কবিতা সংকলন করেন, সেখানে অন্যদের সঙ্গে ফররুখ উপস্থিত থাকেন তাঁর 'লাশ' কবিতা নিয়ে। কালের স্বাক্ষর দু'রকমভাবে পড়েছে ফররুখের প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থে

www.pathagar.com

: "হে বন্য স্বপ্নেরা" ও "সাত সাগরের মাঝি"তে। এখানে ফররুখের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির একটি প্রাথমিক পরিচয় দিয়ে রাখি। ফররুখ আহমদের জীবদ্দশায় বেরিয়েছিলো তাঁর ছয়টি কবিতাগ্রন্থ : "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪), "আজাদ করো পাকিস্তান" (১৯৪৬), "সিরাজাম মুনীরা" (১৯৫২), "নৌফেল ও হাতেম" (১৯৬১), "মুহূর্তের কবিতা" (১৯৬৩) ও "হাতেম তা'য়ী" (১৯৬৬)। কবির মৃত্যুর পরে তাঁর পরিকল্পিত তিনটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে : "হে বন্য স্বপ্নেরা" (১৯৭৬), "কাফেলা" (১৯৮০) ও "হাবেদা মরুর কাহিনী" (১৯৮১)। কবির পান্ডুলিপির একটি ছেঁড়া পৃষ্ঠায় তাঁর রচনার যে-মূল্যবান সময়পঞ্জি পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে : "সাত সাগরের মাঝি"র রচনাকাল ১৯৪৩-৪৪, আর "হে বন্য স্বপ্নেরা"-র রচনাকাল ১৯৩৬-৫০। এই বিবেচনা থেকেই এখানে "হে বন্য স্বপ্নেরা" ও "সাত সাগরের মাঝি"কে কবির প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থ বলেছি। "হে বন্য স্বপ্নেরা" ও "সাত সাগরের মাঝি"তে মূলত বাস্তবতার দুটি পিঠ স্পর্শ করেছেন — প্রথমটি সমাজচেতন, নাগরিক কলকাতার পটভূমিকায় ; দ্বিতীয়টি ইসলামচেতন। সামুদ্রিক-পৌরাণিক পটভূমিকায় প্রথমটি প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়টি প্রতীকী। প্রথমটি প্রচ্ছন্ন, দ্বিতীয়টি উন্মোচক। কিন্তু দুটিই যে একই কবির রচনা তা-ও মুহূর্তে চেনা যায় — সেই একই আতীব্র রোমান্টিকতা। কিন্তু যতো সাযুজ্যই থাকুক, "হে বন্য স্বপ্নেরা"র কিছু কবিতায় ('হে বন্য স্বপ্নেরা', 'কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি', 'মধুমতীর তীরে', 'শাহেরজাদী', 'দোয়েলের শিস' প্রভৃতি) যতো মাধুর্য ও কুহেলিকাই থাক, "সাত সাগরের মাঝি"র কবিতাগুচ্ছে যা ঘটেছে তাকে বলা যায় আশ্চর্য জাগরণ।

প্রায় সব কাব্যপাঠক এ বিষয়ে একমত যে "সাত সাগরের মাঝি"ই ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। কেন? কারণ, এখানে ফররুখের কাব্যবিশ্বাস কবিতার মূল্যে উত্তীর্ণ হয়েছিলো। বিশ্বাস কবিতা নয়। কিন্তু বিশ্বাসহীন কবিতা সোনার পাথরবাটির মতো। ফররুখ আহমদের বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ শিল্পমূল্য লাভ করেছে "সাত সাগরের মাঝি" কাব্যগ্রন্থে। বিস্ময়কর চিত্রকল্প, অক্ষরবৃত্ত ও ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, ধ্বনিময় আরবি-ফারসি শব্দ, আরব্যোপন্যাসের আশ্চর্য জগতের পুনর্নির্মাণ ও তার নতুন অন্তরাখ্যান, বাঙালি-মুসলমানের জাতিগত উৎকাঙ্ক্ষার প্রকাশ — সমস্ত মিলিয়ে "সাত সাগরের মাঝি" শুধু ফররুখেরই নয় — চল্লিশের কবিদেরই এককভাবে শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "পদাতিক", দিনেশ দাসের "অহল্যা", মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের "মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়", সুকান্ত ভট্টাচার্যের "ছাড়পত্র", আবুল হোসেনের "নববসন্ত", আহসান হাবীবের "রাত্রিশেষ", গোলাম কুদ্দুসের "বিদীর্ণ" অন্য কোনো দিক থেকে নয় শিল্পমূল্যে অর্থাৎ কবিতা হিশেবেই "সাত সাগরের মাঝি"র তুল্যমূল্য নয় — একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা খুশি : আমাদের যাঁরা প্রথম আধুনিক কবি, চল্লিশের

www.pathagar.com

দশকের, তাঁদের তিনজনের তিনটি বই-ই গুরুত্বপূর্ণ : আবুল হোসেনের "নব বসন্ত" (১৯৪০), ফররুখ আহমদের "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪) আর আহসান হাবীবের "রাত্রিশেষ" (১৯৪৬)। আধুনিকতার অর্থাৎ রবীন্দ্র-নজরুল-তিরিশ-উত্তর আধুনিকতার নানা লক্ষণে সমৃদ্ধ এই বই তিনটি। এঁদের একটি সাধারণ সাযুজ্য এই যে, তিনজন কবিই নির্যাতিতের সপক্ষে কলম ধরেছিলেন। আনন্দের কথা এই, এঁরা তিনজনই স্লোগানধর্মী ছিলেন না, ছিলেন শিল্পধর্মী — এবং তিনজনের শিল্পবিশিষ্টতা ছিলো সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

কেন "সাত সাগরের মাঝি"র মতো কাব্যগ্রন্থ ফররুখ আর লিখতে পারেননি? তার কারণ অনেকে খোঁজেন কবির অতি আদর্শবাদিতায়। কিন্তু আসলে বাস্তবেই তার কারণ ছিলো। "সাত সাগরের মাঝি" ছিলো এক স্বপ্ন — পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে যা বাস্তবায়িত হয়নি। ফল যা হবার, হ'লো : স্বপ্নভঙ্গ, সমসাময়িক কবি তালিম হোসেন একটি স্মৃতিচারণায় ('ফররুখ আহমদ ও আমি', দৈনিক ইনকিলাব) লিখছেন : 'পাকিস্তানকে ঘিরে যে স্বপ্নকল্পনা' নিয়ে এসেছিলাম ঢাকার জীবনে বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে অতি অল্প সময়েই তার মধ্যে আমরা উভয়েই কেবলি আশাভঙ্গের উন্মাদনা দেখতে লাগলাম। ... নতুন তথাকথিত আদর্শ রাষ্ট্রের প্রথম পর্যায় থেকেই আমাদের বিক্ষুব্ধ হৃদয় কিভাবে কাজ করেছিল, অল্পদিনের ব্যবধানে পরস্পরকে নিবেদিত আমাদের নিম্নোদ্ধৃত দুটি কবিতায় তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।' এই কবিতাদ্বয়, ১৯৫২ সালে দৈনিক 'মিল্লাতে' প্রকাশিত ফররুখ আহমদের 'আহবান' ও ১৯৫৩ সালে 'মাহে-নও'য়ে প্রকাশিত তালিম হোসেনের 'বাতিঘর'। ফররুখের ঐ 'আহ্বান' সনেট কবিতার দুটি পঙক্তি : 'আমার পাইনি মুক্তি — শুনি নাই ঝড়ের স্পন্দন,/ গোলামী জিঞ্জিরে তাই শোকোচ্ছ্বাস ওঠে প্রতি ক্ষণে'। "সাত সাগরের মাঝি"র কবির এই শোকোচ্ছ্বাস তাঁর পরবর্তী অজস্র ব্যঙ্গকবিতায় কীর্ণ হ'য়ে গিয়েছিলো। তাই তাঁর এ ধরনের তীব্র উক্তি তাঁর সরল সমালোচকদের চোখ এড়িয়ে যায় : 'ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পেঁটরায় বন্ধ রেখে যখন রাজনৈতিক চালের কার্যকরী অস্ত্র হিসাবে ঐ দুটি বিষয়ের নাম ব্যবহার করা হয় তখন জাতি অবনতির যে স্পর্শ অনুভব করে সে স্পর্শ আত্মঘাতী। সংক্রামক ব্যাধির মত সেই মৃত্যুর ছোঁয়াচ জাতিকে বিকলাঙ্গ করে ফেলে। সম্প্রতি আমরা এসে পড়েছি সেই সংকটের সামনে যখন দ্বীন ও তমদ্দুনের কথা সর্বদাই উচ্চারিত হতে শুনছি আমাদের রাজনৈতিক ঝাণ্ডাবাহীদের মুখে, কিন্তু প্রতিক্ষণেই অনুভব করছি ঐ দুটি অস্ত্রে নেতৃস্থানীয়দের বৈষয়িক সুযোগ সন্ধান।' ('ইকবাল-প্রসঙ্গ') "সাত সাগরের মাঝি"র স্বাপ্নিক কবি কিভাবে ব্যঙ্গ-কবিতে রূপান্তরিত হন, এখানেই রয়েছে তার উৎস। কবির অমেয় উচ্ছল ও বর্ণালি রোমান্টিকতা হারিয়ে ফেলারও কারণ ঐ স্বপ্নভঙ্গ। কিন্তু আশা ও আদর্শকে শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত উন্নীত রেখেছেন ফররুখ — সম্ভবত ব্যঙ্গকবিতায় ক্রমাগত আত্মক্ষালন আত্মমার্জনার পরেই তা সম্ভব হয়েছিলো, তা নাহ'লে ফররুখ শেষ-পর্যন্ত পরিণত হতেন এক নৈরাশ্যবাদী কবিতে।

www.pathagar.com

দেখা যাবে, ফররুখে ধার্মিকতা আছে, আধ্যাত্মিকতা নেই। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলে যতোখানি আধ্যাত্মিকতা আছে, ফররুখে তা নেই। ফররুখ কোনো "গীতাঞ্জলি" বা "নতুন চাঁদ" লেখেননি। লেখা সম্ভবও নয়। চল্লিশের দশকেই কোনো আধ্যাত্মিক কবি নেই ; তার কারণ সমাজরাজনীতি চেতনার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সুদূর পার্থক্য এবং সকলেই নন নজরুলের মতো সর্বগ্রাসী। ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, সানাউল হক, তালিম হোসেন, সিকান্দার আবু জাফর -- চল্লিশের দশকের এই কবিবৃন্দ তো বটেই, এমনকি উপান্ত চল্লিশের আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুল গনি হাজারী, আতাউর রহমান প্রমুখ কারো মধ্যে নেই অধ্যাত্মঅন্বেষা। ফররুখ আহমদেও নেই। এঁরা সকলেই বাস্তববাদী।

এই সূত্রেই আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ফররুখ আহমদের ভিতরে কেউ-কেউ দেখেছেন পলায়নপরতা — বাস্তব থেকে পলায়ন। তা যথার্থ নয়। বাস্তব বুদ্ধিই ফররুখ আহমদের অতীতচারিতার মূলে। ঐ বাস্তবতা তাঁকে নিয়ে গিয়েছে আদর্শের কক্ষে, সমাজ ও রাজনীতিচেতনা তাঁকে নিয়ে গিয়েছে আদর্শের কক্ষে। বাস্তবতা ও আদর্শ এই একজন কবির ভিতরে একই রেখায় মিলিত হয়েছে। যেমন মিলিত হয়েছিলো তাঁরই সমকালীন বিপরীত বলয়ের সুকান্ত ভট্টাচার্যের মধ্যে। কাব্যাত্মার দিক দিয়ে ফররুখ আহমদ ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের সাদৃশ্য অনেক — কাব্যসাফল্যে নয় অবশ্য। বাস্তব বুদ্ধি ফররুখকে বলেছে অতীত থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করতে, অতীত থেকে আদর্শ সঞ্চয় করতে। সুতরাং এ পলায়ন নয়—এ আসলে বাস্তবতারই এই পাদপীঠ নির্মাণ। ইসলামের ইতিহাস থেকে, এমনকি প্রাক-ইসলামী ইতিহাস থেকে, আরব্যোপন্যাস থেকে ফররুখ যে-উপকরণ সংকলন করেছেন তার লক্ষ্য বিপর্যস্ত বাস্তবতার পুনর্নির্মাণ, অধঃপতিত বাঙালি-মুসলমানের পুনর্জাগরণ। অথাৎ বর্তমান ও বাস্তবতার পাদপীঠ রচনাই ছিলো ফররুখের উদ্দেশ্য। সুতরাং তা অতীতে পলায়ন নয় — অতীতকে বাস্তবতায় শ্লিষ্ট করা, যুক্ত করা। প্রসঙ্গত, আমাদের কোনো কোনো চিন্তাহীন কবি বা সমালোচনক বিষ্ণু দে-র কাব্যে ব্যবহৃত বাঙালি জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন গ্রীক পুরাণকেও গ্রহণীয় মনে করেন, কিন্তু বাঙালি-মুসলমানের পুরাণপ্রয়োগকে 'ইসলামী ব্যবহার' ব'লে অগ্রাহ্য করেন। চিন্তা বা মননের শোচনীয় অভাব থেকেই এ ধরনের অভিযোগ ওঠে। স্বদেশ ও স্বজাতিই প্রত্যেক কবির পরিগ্রহণের প্রাথমিক উৎস হওয়াই তো স্বাভাবিক। বাঙালি-মুসলমান কবি ইসলামী পুরাণ ও ইতিহাসকে ব্যবহার করবে — এ দিবালোকের মতো সত্য।

মাইকেলের এবং এলিয়ট-ইয়েটসের উদাহরণ ছিলো ফররুখের সামনে। ঐতিহ্যকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করা — এই ছিলো ফররুখের উদ্দেশ্য। (ফররুখের এলিয়ট-প্রীতি

www.pathagar.com

সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন সমসাময়িক কবি সৈয়দ আলী আহসান : 'ফররুখ আহমদ', "সতত স্বাগত"।) বাঙালি-মুসলমানের পুরাণ অনচ্ছ, প্রাক্তন সাহিত্যিক ঐতিহ্যও ধূসরায়িত। তাই "সাত সাগরের মাঝি"তে তিনি আরব্যোপন্যাসের কাহিনীকে নতুন অন্তরাখ্যান উজ্জীবিত করলেন, "সিরাজাম মুনীরা"য় ইসলামের ইতিহাসের পুনঃপ্রয়োগে "হাতেম তা'য়ী"তে পুঁথিনির্ভর প্রাক-ইসলামিক হাতেম তা'য়ীর আখ্যান। অনেকে আবার হাতেম তা'য়ী প্রাক-ইসলামিক ব'লে অভিযোগ তুলেছেন — বাঙালি-মুসলমান কিন্তু হাতেম তা'য়ীকে তাদেরই ঐতিহ্যের অন্তর্গত ব'লে মনে করে। হাতেম তা'য়ীর কাহিনী, সোহরাব-রুস্তমের কাহিনী প্রাক-ইসলামিক হ'লেও কোনো আসে যায় না। কেননা বাঙালি-মুসলমান এই কাহিনীগুলিকে তাদেরই নিজস্ব ঐতিহ্যের কাহিনী হিশেবে মেনে নিয়েছে। সুতরাং জনমানসেরই গ্রহণযোগ্য জিনিশ কবি দিয়েছেন — কোনো পাণ্ডিতিক তথ্যনির্ভরতায় নয়।

প্রসঙ্গত, বাঙালি-মুসলমানের ঐতিহ্যের ধারানুসন্ধানে আমাদের কবিরা এক সময় পুঁথির জগতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সুখের বিষয়, এটা কোনো স্থায়ী ব্যাপার ছিলো না। লোকসাহিত্য কোথাও-কোথাও আশ্চর্য লক্ষ্যভেদ করেছে ঠিকই, কিন্তু অশিক্ষিত পুঁথি-রচয়িতার যুগে আধুনিক বাংলা কবিতা তথা সাহিত্য ফিরে যেতে পারে না কখনো। সাহিত্যের পথ ক্রমঅগ্রসরণের। অসামান্য প্রতিভাবান ছিলেন ব'লে ফররুখ "হাতেম তা'য়ী"তে পুঁথির পুনর্জনন ঘটান ঠিকই। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও তাঁর পরোক্ষ আদর্শ থাকে মাইকেলের "মেঘনাদবধ কাব্য"। এই সমুন্নত কাব্যাদর্শ ও কাব্যশক্তির অভাবে পুঁথির পুনর্জননে ব্রতী অন্যেরা কেবল ব্যর্থতাই বহন করেছেন। ফররুখের সমগ্র কাব্যাদর্শের সঙ্গেও এ আত্মা অবধি প্রোথিত ব'লেই একে ফররুখ অমনভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন।

আগেই বলেছি, ফররুখ যতোখানি ব্যক্তিগত তার চেয়ে অনেক বেশি সমাজচেতন। অল্পসংখ্যক অসামান্য প্রেমের কবিতা বাদ দিলে ফররুখ সর্বত্রই সামাজিককে ধারণ করেছেন। তার একদিকের পরিচয় যদি লেখা থাকে "সাত সাগরের মাঝি"র সমুদ্রচারণায়, তো আর-একদিকের বাংলাদেশের ভূমির খামার আছে "মুহূর্তের কবিতা"য়। এর পরিচয় আছে তৎকালীন দুরকম ছন্দ-ব্যবহারেও। গদ্যছন্দ ও ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত চল্লিশের কবিদের দুটি প্রিয় ও বহু-ব্যবহৃত ছন্দ। গদ্যছন্দের সঙ্গে ঐ দশকের বাস্তবতা ব্যবহারের একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। আর ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত যেন ঐ দশকের স্বপ্নদোদুল ভবিষ্যৎ-আশার নিদর্শন। ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, সৈয়দ আলী আহসান — এঁরা অনেকেই তখন ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্তে লিখতে ভালোবাসতেন। পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় এবং "রাত্রিশেষ" ও "সাত সাগরের মাঝি"তে তার সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে। আর সর্বার্থসাধক অক্ষরবৃত্ত তো ছিলোই।

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদ যে-অজস্র ব্যঙ্গকবিতা লিখেছিলেন দুই হাতে, স্বনামে ও অজস্র ছদ্মনামে, তার পিছনে আছে জ্বলন্ত ক্রোধ। আদর্শবাদীর উজ্জ্বলন্ত ক্রোধ। ঐ ক্রোধ অবশ্য ক্ষতিও করে কবিতার — যেমন করেছিলো রোমান্টিক কবি অজিত দত্তকে। ফররুখ আহমদকেও করেছিলো। প্রসন্নতা ও উজ্জ্বলতা হারাতে নেই কবির। আসলে আদর্শবাদ কবিতার ক্ষতিও করে — আবার আদর্শ ছাড়া মহৎ কবিতাও সম্ভব নয়। এটা এক আশ্চর্য কূটাভাসিক প্রক্রিয়া, এই আদর্শে বিদ্ধ ও মুক্ত কবিতা একই সঙ্গে, এই কবিতা রচনা, যেখানে থাকে একই সঙ্গে আদর্শিক ও আদর্শঅতিক্রমী বিষয়পুঞ্জ।

মাইকেল, সুধীন্দ্রনাথ, শাহাদাৎ হোসেন, আবদুল কাদির যে-অর্থে ধ্রুপদের সাধনা করেছেন ফররুখ তার যাত্রিক, কিন্তু আশ্চর্য হ'তে হয় এঁদের মধ্যে তিনি রোমান্টিকও সবচেয়ে বেশি। ফররুখের মধ্যে বাস্তব ও আদর্শের, রোমান্টিক ও ধ্রুপদের একটি আশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

প্রত্যেক কবি যুক্ত। তার অতীত ও বর্তমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে। ফররুখ আহমদ তাঁর পূর্বজ মাইকেল, নজরুল, মোহিতলাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে-র সঙ্গে যুক্ত। এই যুক্ততা ঠিক প্রত্যক্ষভাবে নয় — অনুরণনে।

তাঁর সমকালীন চল্লিশের কবিসংঘের সঙ্গে ফররুখ যুক্ত। এই যুক্ততা কালের হাওয়ার যুক্ততা। ফররুখ আহমদ আবহমান বাংলা কবিতার সঙ্গে যুক্ত। যেমন যুক্ত প্রত্যেক বাঙালি কবি॥

www.pathagar.com

পরিশেষ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জীবনপঞ্জি

১৯১৮ জন্ম : ১০ই জুন ; গ্রাম : মাঝআইল ; মাগুরা, যশোর। পিতামাতার দ্বিতীয় পুত্র। পিতা : খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী। মাতা : রওশন আখতার। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান।

১৯২৪ মাতার মৃত্যু।

১৯৩৭ 'রাত্রি' শীর্ষক প্রথম কবিতা প্রকাশিত হ'লো মোহাম্মদ হবীবুল্লাহ্ [বাহার]-সম্পাদিত 'বুলবুল' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩৪৪)। এ-মাসেই 'পাপ-জন্ম' কবিতাটি প্রকাশিত হয় মোহাম্মদ আকরম খাঁ-সম্পাদিত 'মোহাম্মদী'তে। প্রথম গল্প 'অন্তর্লীন' প্রকাশিত হয় 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৪৪)। অন্যান্য প্রকাশিত গল্প : 'বিবর্ণ', 'মৃত বসুধা', 'যে পুতুল ডলির মা', 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' লিখলেন ১৩৪৪-৪৬ সময়পরিসরে। প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা নিজ গ্রামের পাঠশালায়। পরবর্তীতে কলকাতা মডেল এম. ই. স্কুল ও বালিগঞ্জ হাই স্কুলে অধ্যয়নশেষে এ-বছরই খুলনা জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। স্কুল-জীবনে শিক্ষক হিশেবে সংস্পর্শ লাভ করলেন কবি গোলাম মোস্তফা, কথা-সাহিত্যিক আবুল ফজল ও কবি আবুল হাশিমের। শিক্ষক আবুল ফজল কলকাতা যাচ্ছেন শুনে হুইটম্যান-এর "লীভ্স্ অব গ্রাস" আনার জন্যে অনুরোধ করেন। সাহিত্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হ'লো কবি আহসান হাবীব, কথাশিল্পী আবু রুশ্‌দ্, কবি আবুল হোসেন প্রমুখের সঙ্গে। কলকাতা রিপন কলেজে ভর্তি। বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, প্রমথনাথ বিশী - এঁদের পেলেন শিক্ষক হিশেবে। এ-সময় বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'লো কবি-র গুচ্ছ-কবিতা।

১৯৩৮ এফ. আহমদ নামে 'ব্যায়ামশিক্ষক মোহাম্মদ জনাব আলী' শীর্ষক একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হ'লো ('মোহাম্মদী', আশ্বিন ১৩৪৫)। কবি-দার্শনিক আল্লামা ইকবাল-এর ইন্তেকাল। কবি লিখলেন ইকবাল-কে নিবেদিত কবিতা 'স্মরণী'। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন-সম্পাদিত মাসিক সাহিত্যপত্র 'সওগাতে' প্রথম কবিতা

www.pathagar.com

'আঁধারের স্বপ্ন' (পৌষ ১৩৪৪)। ১৯৪৭ (১৩৫৪) পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সওগাতে' নিয়মিত লিখেছেন।

১৯৩৯ আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা, দর্শনে অনার্স নিয়ে বি. এ.-তে ভর্তি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ফতেহ্ লোহানী-কে পেলেন বন্ধু হিশেবে। শুরু হ'লো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

১৯৪১ স্কটিশ চার্চ কলেজ ছেড়ে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি. এ. ক্লাসে কলকাতা সিটি কলেজে ভর্তি। 'কাব্যে কোরআন' শিরোনামে 'মোহাম্মদী' ও 'সওগাতে' বেশ কিছু সুরা-র স্বচ্ছন্দ অনুবাদ প্রকাশিত। ১৯৪০ সালে গৃহীত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কবি-র মতাদর্শগত পরিবর্তন। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমন।

১৯৪২ বিয়ে হ'লো খালাতো বোন সৈয়দা তৈয়বা খাতুনের সঙ্গে। বিয়ে উপলক্ষে কবি লিখলেন 'উপহার' শীর্ষক একটি কবিতা। কবিতাটি প্রকাশিত হ'লো 'সওগাতে' (অগ্রহায়ণ ১৩৪৯)। জাতীয় জাগরণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম আক্রান্ত হলেন অনারোগ্য ব্যাধিতে।

১৯৪৩ কলকাতা আই. জি. প্রিজন অফিসে চাকরিতে যোগদান। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে'র সপ্তম অধিবেশনে কবি আবৃত্তি করলেন 'দল-বাঁধা বুলবুলি' ও 'বিদায়' শীর্ষক কবিতা। শুরু হ'লো "সাত সাগরের মাঝি", "সিরাজাম মুনীরা", "কাফেলা" প্রভৃতি কাব্যের অন্তর্গত কবিতার রচনা। ফররুখ এ-সময় রচনা ক'রে চলেছেন ১৩৫০-এর মন্বন্তর বিষয়ক কবিতাগুচ্ছ।

১৯৪৪ কবি-র প্রথম কবিতাগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি" প্রকাশিত। সুকান্ত ভট্টাচার্য-সম্পাদিত "আকাল"-এ সংকলিত 'লাশ' শীর্ষক কবিতা। আই. জি. প্রিজন অফিসের চাকরি ছেড়ে যোগ দিলেন কলকাতা সিভিল সাপ্লাই অফিসে। পিতা সৈয়দ হাতেম আলীর মৃত্যু : ১০ নভেম্বর ১৯৪৪।

১৯৪৫ পি. ই. এন.-আয়োজিত রাইটার্স কনফারেন্স-এ 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে'র অগ্রণী নায়ক কাজী আবদুল ওদুদ ফররুখ-কাব্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করলেন। আবদুল কাদির ও রেজাউল করীম-সম্পাদিত "কাব্য-মালঞ্চে" সংকলিত হ'লো

www.pathagar.com

কবিতাত্রয় 'শিকার', 'হে নিশানবাহী' ও 'সাত সাগরের মাঝি'। সংকলনের ভূমিকায় গুরুত্ব লাভ করলো ফররুখ-কাব্যপ্রসঙ্গ। যোগ দিলেন 'মোহাম্মদী'তে। একটি অপ্রীতিকর ঘটনার দরুন প্রায় বছরখানেক পর 'মোহাম্মদী' অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দিলেন।

১৯৪৬ "আজাদ করো পাকিস্তান" কাব্য-পুস্তিকা প্রকাশিত। সর্বভারতীয় দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লিখলেন দাঙ্গা-বিরোধী গুচ্ছকবিতা। কলকাতা বেতারে আবৃত্তি করলেন 'নিজের রক্ত' শীর্ষক কবিতা। প্রসঙ্গত, আকাশবাণী-র 'গল্পদাদুর আসরে'ও কবি অংশগ্রহণ করতেন। জলপাইগুড়িতে একটি ফার্মে অল্প কয়েক দিন চাকরি করেন।

১৯৪৭ 'মোহাম্মদী' অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দানের পর থেকে কবি বেকারজীবন যাপন করছেন। এ বছরেই কবি আবদুল কাদির-রচিত 'নবীন কবি ফররুখ আহমদ' নিবন্ধটি কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয়। কলকাতা ছেড়ে চলে আসেন শ্বশুরবাড়ি – দুর্গাপুর, যশোরে। 'পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত ('সওগাত', আশ্বিন ১৩৫৪)। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান। অর্জিত হ'লো '৪৭-এর স্বাধীনতা।

১৯৪৮ কলকাতা থেকে সপরিবারে ঢাকায় চ'লে এলেন। ঢাকা বেতারে অনিয়মিত শিল্পী হিশেবে যোগদান। বেতারের প্রয়োজনে কবি এখান থেকেই নিয়মিত গান রচনা শুরু করলেন। আধুনিক, দেশাত্মবোধক, হাম্‌দ-না'ত প্রভৃতি গানের পাশাপাশি কথিকা, নাটিকা, গীতিনাট্য, গীতিনকশা – এসব রচনাও শুরু। পঞ্চাশের দশক থেকে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান 'কিশোর মজলিশ' পরিচালনা শুরু। গদ্যনাটিকা "রাজ-রাজড়া" প্রকাশিত (পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনীত – মুনীর চৌধুরী প্রমুখ এই নাটকে অভিনয় করেন।)। শুরু হ'লো ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলন।

১৯৫১ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ইকবাল-জয়ন্তী অনুষ্ঠান বর্জন, তরুণ লেখকদের আমন্ত্রণ না-করার প্রতিবাদে।

১৯৫২ "সিরাজাম মুনীরা" প্রকাশিত। ঢাকা রেডিওর নিজস্ব শিল্পী হিশেবে বহাল হলেন। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে সালাম, জব্বার, রফিক, শফিকের শাহাদাতের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে, ঢাকা

www.pathagar.com

বেতারেই প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত। সোচ্চার হলেন ফররুখ। ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে' অংশগ্রহণ।

১৯৫৩ ফররুখ আহমদ-কে (পনেরো জন শিল্পীসহ) ছাঁটাই করা হ'লো। বেতারশিল্পীদের সতেরো দিন-ব্যাপী ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে ফররুখ (অন্যান্য শিল্পীসহ) চাকরিতে পুনর্বহাল।

১৯৫৭ সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ। ঐ উপলক্ষে কবিতা ও গান রচনা।

১৯৫৮ ঢাকা বেতার থেকে "নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাট্য প্রচারিত। এই নাটক প্রযোজনা করেন ও নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন খান আতাউর রহমান।

১৯৬০ প্রেসিডেন্ট পুরস্কার 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' লাভ করলেন। এ-বছরই বাংলা একাডেমীর পুরস্কার প্রাপ্তি (কবিতা) ও একাডেমীর 'ফেলো' নির্বাচিত। বাংলা একাডেমী উদ্‌যাপিত নাট্য-সপ্তাহে "নৌফেল ও হাতেম" মঞ্চস্থ।

১৯৬১ কাব্যনাট্য "নৌফেল ও হাতেম" প্রকাশিত। এ সময়ে সরকারী সফরে উত্তর ও দক্ষিণ বাংলা ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেন। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সভাপতিত্বে ঢাকা হলে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা-বাসরে প্রাণঢালা সংবর্ধনা পেলেন কবি। ফররুখ সাহিত্য-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেন সৈয়দ আলী আহসান, মুনীর চৌধুরী, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, শামসুল হুদা চৌধুরী প্রমুখ। কবি-র কবিতা আবৃত্তি করলেন শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বদরুল হাসান, সালমা চৌধুরী, শবনম মুশতারী প্রমুখ। আবদুল আহাদ-পরিচালিত কবি রচিত সংগীত-বিচিত্রা অনুষ্ঠিত। সংবর্ধনা-বাসরে কবি-কে প্রদত্ত মানপত্র পাঠ করলেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

১৯৬৩ "মুহূর্তের কবিতা" প্রকাশিত। এ-বছরই ফারুক মাহমুদ-সম্পাদিত "ধোলাইকাব্য" সংকলনগ্রন্থে কবি-র ছদ্মনামে লেখা ব্যঙ্গ-কবিতা সংকলিত। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে চর্যাপদ থেকে ফররুখ আহমদের কবিতা পর্যন্ত আবৃত্তির আয়োজন করা

www.pathagar.com

হয়েছিলো। এতে কবির 'ডাহুক' কবিতাটি আবৃত্তি করেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

১৯৬৫ শিশু-কিশোর কবিতাসংকলন "পাখীর বাসা" প্রকাশিত। পাক-ভারত যুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে কবি রচনা করলেন 'জঙ্গী জোয়ান চল বীর', 'শহীদের খুনরাঙা কাশ্মীর', 'জেহাদের ময়দানে চল যাই' প্রভৃতি উদ্দীপনামূলক গান।

১৯৬৬ "হাতেম তা'য়ী" প্রকাশিত। এ-বছরই "পাখীর বাসা" কাব্যের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার ও "হাতেম তা'য়ী" কাব্যের জন্য আদমজী পুরস্কার পেলেন। শেষবারের মতো ঢাকার বাইরে, অগ্রজ সৈয়দ সিদ্দিক আহমদের সঙ্গে দেখা করতে ফরিদপুরে গেলেন। ফিরে এসে লিখলেন 'বৈশাখ', 'পদ্মা', 'আরিচা-পারঘাটে' প্রভৃতি সাড়া-জাগানো কবিতা। দেশপ্রেমের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার প্রদত্ত 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

১৯৬৮ শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থ "হরফের ছড়া" প্রকাশিত।

১৯৬৯ শিশু-কিশোর কাব্যগ্রন্থ "নতুন লেখা" প্রকাশিত। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রণীত গবেষণাগ্রন্থ "কবি ফররুখ আহমদ" প্রকাশিত। প্রখ্যাত শিল্পী মোস্তফা আজীজ এ-বছর (২৯ জুলাই) কবি-র একটি পোর্ট্রেট আঁকলেন। দেশব্যাপী শুরু হ'লো উনসত্তরের গণ-আন্দোলন।

১৯৭০ ছড়াগ্রন্থ "ছড়ার আসর" (প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হ'লো। দীর্ঘ দুই দশকেরও অধিক কাল ব্যাপী কবি ঢাকা বেতারের সঙ্গে সম্পৃক্ত রইলেন। এ বছরই ঢাকা বেতারের মুখপত্র পাক্ষিক 'এলানে'র (বর্তমান 'বেতার বাংলা') নবেম্বর (১ম পক্ষ) ১৯৭০ সংখ্যার প্রচ্ছদ ও প্রসঙ্গকথায় কবি ফররুখ আহমদ প্রসঙ্গ গুরুত্ব লাভ করলো। জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

১৯৭১ কবি ঢাকা বেতারে শেষবারের মতো কবিতা আবৃত্তি করলেন। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

১৯৭৩ স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে চাকরি ক্ষেত্রে কবি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন। এ সময়ে 'ফররুখ আহমদের কি অপরাধ' ('গণকণ্ঠ', ১ আষাঢ় ১৩৮০) শীর্ষক তীব্র, তীক্ষ্ণ প্রতিবেদন লিখলেন আহমদ

www.pathagar.com

ছফা। এই প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে পুনর্বহাল।

১৯৭৪ সামাজিক ও দৈনন্দিন নানাবিধ কারণে কবি-র মন ও শরীর ভেঙে যায়। এ-বছর জুন মাসে (আষাঢ় ১৩৮১) লিখলেন তাঁর সর্বশেষ কবিতা : দুর্ভিক্ষ বিষয়ক কবিতা '১৯৭৪ (একটি আলেখ্য)'। এ-ছাড়া লিখলেন হাম্‌দ্‌-না'ত্‌, গাদ্দাফী প্রাসঙ্গিক একগুচ্ছ কবিতা, তরজমা করলেন মওলানা শফিউল্লাহ্‌ (দাদাজী)-কে নিবেদিত একটি দীর্ঘ উর্দু ক্বাসিদা। ১৯ অক্টোবর, শনিবার, সন্ধেবেলা ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকায় ইন্তেকাল।

১৯৭৫ "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" প্রকাশিত।

১৯৭৭ একুশে পদক।

১৯৮০ স্বাধীনতা পুরস্কার।

১৯৮৪ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

ফররুখ আহমদের জীবদ্দশায় তাঁর যে-সব কবিতাগ্রন্থ, শিশু-কিশোরতোষগ্রন্থ ও পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো এবং সে-সবের সংস্করণ হয়েছিলো, তার পরিচয় এই। –

ক বি তা

১. **সাত সাগরের মাঝি**। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৪৪। প্রকাশক : বেনজীর আহমদ, নওরোজ পাবলিশিং হাউস, ১০৬-এ সার্কাস রো, কলিকাতা। মূল্য : দুই টাকা। প্রচ্ছদশিল্পী : জয়নুল আবেদীন। উৎসর্গ :

বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ তামদ্দুনিক রূপকার,
দার্শনিক মহাকবি, আল্লামা ইক্‌বালের
অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে –

তোমার নয়নে দীপ্তি সিকান্দার শাহার মতন।
নতুন পথের মোহে তৃপ্তিহীন তোমার অন্বেষা
(জিন্দিগীর নীল পাত্রে উচ্ছ্বসিত ঘন রক্ত নেশা
অনির্বাণ শিরাজীর) পাড়ি দেয় মরু, মাঠ, বন,
অথই দরিয়া তীর। হে বিজয়ী। তবু অনুক্ষণ
ধ্যান করো কোন্ পথ, কোন্ রাত্রি অজানা তোমার,
এক নেশা না মিটিতে সাড়া আসে দ্বিতীয় নেশার ;
এক সমুদ্রের শেষে জাগে অন্য সমুদ্র স্বনন।

যেথা ক্ষীয়মান মৃত পাহাড়ের ঘুমন্ত শিখরে
জীবনের ক্ষীণ সত্তা মূর্ছাতুর, অসাড়, নিশ্চল ;
মুহূর্তের পদধ্বনি জাগে না সে সুষুপ্ত পাথরে,
জ্বলে না রাত্রির তীর, নাহি জাগে স্বপ্ন সমুজ্জ্বল
প্রাণবন্ত মাদকতা ; সে নির্জিত তমিস্রা সাগরে
দিনের দুর্জয় ঝড় আনিয়াছ হে স্বর্ণঈগল॥

১৬.১১.৪৪

www.pathagar.com

সূচিপত্র : ১. সিন্দবাদ ২. বা'র দরিয়ায় ৩. দরিয়ায় শেষ রাত্রি ৪. শাহরিয়ার ৫. আকাশ-নাবিক ৬. বন্দরে সন্ধ্যা ৭. ঝরোকায় ৮. ডাহুক ৯. এইসব রাত্রি ১০. পুরানো মাজারে ১১. পাঞ্জেরী ১২. স্বর্ণ-ঈগল ১৩. লাশ ১৪. তুফান ১৫. হে নিশানবাহী ১৬. নিশান ১৭. নিশানবরদার ১৮. আউলাদ ১৯. সাত সাগরের মাঝি।

এই সংস্করণের প্রকাশকের কথায় বলা হয়েছে :

> সারা পৃথিবী যখন ধ্বংস ও মৃত্যুর পথে আগাইয়া চলিয়াছে, বিশেষ করিয়া এই সোনার বাংলার আমরা সোনার চাঁদের, সোনার ধানের অতি প্রাচুর্য্যে যখন নিত্য স্বর্গ যাত্রার ভীড় লাগাইয়া রাখিয়াছি এবং সর্বোপরি এই কোটি-পৌতিক সুলভতার দিনে হঠাৎ পুস্তক প্রকাশ – বিশেষ করিয়া কাব্যপুস্তক প্রকাশের এই উৎকট বিলাসিতা কেন – সে প্রশ্ন স্বতঃই জাগা স্বাভাবিক। ইহার উত্তরে সবিনয়ে আমরা সুধু এই কথাই বলিব রাতের অন্ধকারতম অংশই অদূরাগত ছুবে-ছাদেকের নকীব এবং এই সময়েই মোয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বরে উষার আজানের তকবির ধ্বনি জাগার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। মহাকবি ইকবালের ভাষায় বলিতে গেলে আমাদের অধিকাংশ কাব্যই মৃত্যুর বন্দনাগীতি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তাঁহারই ভাষায় বলিতে চাই : ওগো বন্ধু! যদি তোমার তহবিলে কাব্যের তন্‌খা থাকিয়া থাকে মৃত্যুহীন জীবনের পরশপাথরে তাহাকে ছোঁয়াইয়া নাও। পরিচ্ছন্ন-দৃষ্টি চিন্তাধারাই কর্মপথের সন্ধানী দূত – যেমন বজ্র বর্ষণের পুর্বে আসে বিজুলি চমক। ফররুখ আহমদের কাব্যে সেই উষার আজানের সুর, জীবনদায়িনী পরশ আর বজ্রগর্ভ বিজুলীর জ্যোতির্জ্বালা আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সেই জন্যই তাঁহার এই কাব্য প্রকাশের আমাদের এই দুরূহ প্রয়াস। এই পুস্তকের সংশোধন ব্যাপারে আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কলিকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যাপক বিখ্যাত রেখাশিল্পী মিঃ জয়নুল আবেদিন এই পুস্তকটির প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিয়াছেন। তাঁহার খেদমতে আমাদের অসংখ্য শুকরিয়া।

সাত সাগরের মাঝি। [দ্বিতীয় সংস্করণ] তমদ্দুন সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৫২। রচনাকাল : ১৯৪৩–৪৪। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : তৈয়েবুর রহমান, এম. এ. তমদ্দুন প্রেস, ৫০ লালবাগ রোড, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান। সর্বস্বত্ব গ্রন্থকারের। দাম : দু টাকা আট আনা। প্রচ্ছদশিল্পী : কামরুল হাসান। পৃষ্ঠা ৮৩। উৎসর্গ ও সূচিপত্র প্রথম সংস্করণের অনুরূপ।

২. আজাদ করো পাকিস্তান। প্রথম প্রকাশ : [১৯৪৬]। ভিতরের পৃষ্ঠায় লেখা আছে : আজাদ করো পাকিস্তান/ফৌজের গান ও অন্যান্য কবিতা। প্রকাশক : কাজি

www.pathagar.com

আফসারউদদিন আহমদ ও এস.এম. বাজলুল হক, মৃত্তিকা গ্রন্থনি বিভাগ, ১০–বি তারক দত্ত রোড, বালিগঞ্জ, কলকাতা। মুদ্রাকর : কালিপদ নাগ, ভারতী প্রেস, ৫ সানিআত সেন স্ট্রীট, কলকাতা। মূল্য : রাজসংস্করণ : এক টাকা, সুলভ সংস্করণ : আট আনা। ক্রাউন সাইজ, পৃষ্ঠা ২০। উৎসর্গ :

[ইসলামের জন্য যাঁরা রক্ত দিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে]

সূচিপত্র : ১. ফৌজের গান ২. আজাদ করো পাকিস্তান ৩. ওড়াও ঝাণ্ডা ৪. কায়েদে আজম জিন্দাবাদ ৫. নতুন মোহাররাম ৬. পথ ৭. পাকিস্তানের কবি (আল্লামা ইকবাল) ৮. রাত্রির অগাধ বনে ৯. কারিগর ১০. জালিম ও মজলুম।

প্রচ্ছদে মুদ্রিত ছিলো এই কথাগুলি :

'আজাদ করো পাকিস্তান' : এ দাবী ভারতের। ভারত-গৌরব কবি মোহাম্মদ ইকবাল বলে গেছেন : 'ভারতের মুসলিমের জন্য পাকিস্তান চাই।' কায়েদে আজম জিন্নাহ বলেছেন : 'পাকিস্তান আমাদের জন্মগত দাবি।' – যে জ্বলন্ত কামনা আজকের মুসলমানের অন্তরে – তার অপূর্ব নিদর্শন নতুন সুর-যোজনায় আর অনুপম চিন্তা-বৈদগ্ধতায় কবি ফররুখ আহমদ উজ্জ্বল করে তুলেছেন। তাঁরও দাবি : 'আজাদ করো পাকিস্তান।'

৩. **সিরাজাম মুনীরা**। [প্রথম প্রকাশ] প্রথম তমদ্দুন সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৫২। রচনাকাল : ১৯৪৩–৪৬। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : তৈয়েবুর রহমান এম. এ. তমদ্দুন প্রেস, ৫০ লালবাগ রোড, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান। সর্বস্বত্ব গ্রন্থকারের। দাম : দু টাকা আট আনা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা ৮৮।

উৎসর্গ :

পরম শ্রদ্ধাভাজন
আলহাজ্জ মৌলানা আবদুল খালেক সাহেবের দস্ত মুবারকে –
যে আলোক শামাদানে জ্ব'লেছিল অম্লান বিভায়
অফুরান প্রাণৈশ্বর্যে সমুজ্জ্বল করি অন্ধকার,
তারি আলোকণা বহি দীপ জ্বলে দীপাগ্নিতে ; আর
প্রাণ পায় প্রাণের পাথেয়। নিশান্তের প্রত্যাশায়
জাগে সে অপূর্ব দ্যুতি প্রভাতের বর্ণসুষমায়
নিরন্ধ্র রাত্রির বক্ষে, নিষ্প্রাণ মৃত্যুর কালঘুমে

www.pathagar.com

(বিদ্যুৎ চমকে যেন – অথবা দুরন্ত সাইমুমে)
সিরাজাম মুনীরার জ্যোতির্লেখা মুক্ত ঝরোকায়।

তৌহিদী মশাল বহি চলে গেছে যারা যাত্রীদল
– পাথর চাপানো ভার, আঘাতের ভারী বোঝা টেনে,
অবিশ্বাসী শর্বরীর শিলা–বক্ষে সূর্যতীর হেনে
অগণ্য মৃত্যুর মাঝে নিষ্কম্প, নির্ভীক, অচঞ্চল ;
তাদের কাফেলা মাঝে নিঃসংশয় অভিযাত্রী জেনে
মানুষের মুক্ত স্বপ্ন রেখে যাই অশ্রু সমুজ্জ্বল।

সূচিপত্র : ১. সিরাজাম মুনীরা ২. আবুবকর সিদ্দিক ৩. উমর দারাজ দিল ৪. ওসমান গনি ৫. আলী হায়দার ৬. শহীদে কারবালা ৭. মন ৮. আজ সংগ্রাম ৯. এই সংগ্রাম ১০. প্রেমপন্থী ১১. অশ্রুবিন্দু ১২. গাওসুল আজম ১৩. সুলতানুল হিন্দ ১৪. খাজা নকসবন্দ ১৫. মুজাদ্দিদ আলফেসানী ১৬. মৃত্যু–সংকট ১৭. অভিযাত্রিকের প্রার্থনা ১৮. মুক্তধারা ১৯. ইশারা।

৪. **নৌফেল ও হাতেম**। প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৬১। প্রকাশক : পাকিস্তান লেখক সংঘের পক্ষে ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, বর্ধমান হাউস, ঢাকা ২। মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা। প্রচ্ছদশিল্পী : নুরুল ইসলাম আলপনা।

নৌফেল ও হাতেম। দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৬৫।

নৌফেল ও হাতেম। তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৬৭। প্রকাশক : মোহাম্মদ নাসির আলী, নওরোজ কিতাবিস্তান, ৪৬ বাংলা বাজার, ঢাকা ১।

নৌফেল ও হাতেম। চতুর্থ সংস্করণ : আগস্ট ১৯৬৯। প্রকাশক : মহিউদ্দীন আহমদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা ১। মূল্য : তিন টাকা। পৃষ্ঠা : ৪+৯২।

৫. **মুহূর্তের কবিতা**। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬৩। প্রকাশক : এফ আহমদ, বার্ডস এ্যান্ড বুকস, ৪ ফোল্ডার স্ট্রীট, ঢাকা ৩। মুদ্রক : এম. এ. কাদের, দি ইম্পিরিয়াল প্রেস, ১০ হাটখোলা রোড, ঢাকা ৩। মূল্য : তিন টাকা। প্রচ্ছদশিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী। পৃষ্ঠা : ৮+১০০।

www.pathagar.com

উৎসর্গ :

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির শ্রদ্ধেয় কর্মী ও সদস্যদের উদ্দেশ্যে
(কয়েকটি আদর্শ-দীপ্ত দিনের স্মরণে)
সে সব উজ্জ্বল দিন আজ শুধু স্মৃতির সঞ্চয়,
শেষ মঞ্জিলের পথে যাওয়ার সে সুতীব্র প্রয়াস,
প্রতি পায়ে সংগ্রামের সে দুর্বার চেতনা, বিশ্বাস
উন্মুক্ত দিনের সেনা ভুলেছে সে কাহিনী দুর্জয়।
এখন মন্থর স্রোতে জেগে ওঠে ক্লান্তি ও সংশয়,
দুরান্তে নহর দেখে আজ প্রাণ খোঁজে না আশ্বাস,
ঘূর্ণী হাওয়া ব'য়ে আনে সেদিনের সুরভি সুভাস,
প্রতি পদক্ষেপে তবু জেগে ওঠে আঁধারের ভয়।

সাত মঞ্জিলের রাহা পাড়ি দিয়ে রুস্তম যেমন
আলোকিত বিশ্ব ছেড়ে মাজেন্দ্রান গিরিগুহা মুখে
থেমেছিল অন্ধকারে, অতর্কিতে তখন সম্মুখে
বিশাল সফেদ দেও জেগেছিল মৃত্যুর মতন
জরাচিহ্ন জড়তার আজ এই আঁধারে তেমন
মৃত্যু-বিভীষিকা নিয়ে অন্ধকারে দাঁড়ায়েছে ঝুঁকে॥

সূচিপত্র : ১. মুহূর্তের কবিতা ২. মুহূর্তের গান ৩. দুর্লভ মুহূর্ত ৪. কবিতার প্রতি ৫. কোকিল ৬. ফাল্গুনে ৭. বৈশাখী ৮. ঝড় ৯. বৃষ্টি ১০. বিষণ্ন চাঁদ ১১. ক্লান্তি ১২. বিগত ১৩. পরিচিতি ১৪. ট্রেনে : এক ১৫. ট্রেনে : দুই ১৬. ট্রেনে : তিন ১৭. ময়নামতীর মাঠে : এক ১৮. ময়নামতীর মাঠে : দুই ১৯. ময়নামতীর মাঠে : তিন ২০. ময়নামতীর মাঠে : চার ২১. গাথা ও গান ২২. দীউয়ানা মদিনা ২৩. সন্ধ্যায় ২৪. রাত্রির কবিতা ২৫. রাত্রির ঘটনা ২৬. রাত্রিশেষের কাহিনী ২৭. রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে ২৮. হাত-ঘড়ি ২৯. যান্ত্রিক ৩০. 'গোধূলি-সন্ধ্যার সুর' ৩১. শতাব্দী ৩২. ফেরদৌসী ৩৩. রুমী ৩৪. জামী ৩৫. সাদী ৩৬. হাফিজ ৩৭. সমাচ্ছন্ন ৩৮. মোতিঝিল ৩৯. জিঞ্জিরা ৪০. লালবাগ কেল্লা ৪১. সোনার গাঁও ৪২. ইতিহাস ৪৩. বন্দরের স্বপ্ন ৪৪. নদীর দেশ ৪৫. ধানের কবিতা ৪৬. চিরাগী পাহাড় ৪৭. জালালী কবুতর ৪৮. সিলেট স্টেশনে একটি শীতের প্রভাত ৪৯. 'অশেষ ঐশ্বর্য' ৫০.

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার প্রতি ৫১. চলতি ভাষার পুঁথি ৫২. শাহ্ গরীবুল্লাহ্ ৫৩. শাহ গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত পুঁথি প্রসঙ্গে ৫৪. পুঁথির আসর ৫৫. পুঁথি পড়া : মুহর্রাম মাসে (১) ৫৬. পুঁথি পড়া : মুহর্রাম মাসে (২) ৫৭. শহীদে কারবালা ৫৮. তাজকেরাতুল আউলিয়া ৫৯. কাসাসুল আম্বিয়া ৬০. শাহ্নামা ৬১. আলিফ লায়লা ৬২. চাহার দরবেশ ৬৩. হাতেম তা'য়ী ৬৪. কোহে-নেদা ৬৫. নাস্তিকের প্রার্থনা ৬৬. শবে-কদর উপলক্ষে ৬৭. শবে-বরাত উপলক্ষে ৬৮. সাতান্নর কবিতা : এক ৬৯. সাতান্নর কবিতা : দুই ৭০. শহীদ-স্মরণে ৭১. পূর্বসূরীর প্রতি ৭২. কর্মীর প্রতি ৭৩. কবির প্রতি ৭৪. সাম্পান মাঝির গান : এক ৭৫. সাম্পান মাঝির গান : দুই ৭৬. কুতুব তারা ৭৭. সন্ধ্যাতারা ৭৮. মুশতারি সিতারা ৭৯. পূর্ণিমা ৮০. লোকসাহিত্যের নায়িকা ৮১. দ্বীপের রহস্য ৮২. রূপকথা ৮৩. রূপমুগ্ধ ৮৪. 'তোমাকে জাগাবো' ৮৫. 'তুমি জাগলে না' ৮৬. বিষণ্ন মুহূর্তের সুর ৮৭. প্রাচ্যের একটি বিধ্বস্ত শহর ৮৮. একটি আধুনিক শহর ৮৯. রক পাখী ৯০. অশান্ত পৃথিবী ৯১. 'হিংস্র ক্ষুধাতুর রাত্রি' ৯২. প্রার্থনা : এক ৯৩. প্রার্থনা : দুই ৯৪. ভোরের গান ৯৫. একটি সূর্যোদয় ৯৬. স্বর্ণঈগল ৯৭. মুক্তি-স্বপ্ন ৯৮. অশেষ ৯৯. প্রত্যয় ১০০. শেষ কথা।

৬. **হাতেম তা'য়ী**। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৬৬। প্রকাশক : বাঙলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা। মুদ্রক : এ্যাবকো প্রেস, ৬/৭ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা ১। প্রচ্ছদশিল্পী : আবদুর রউফ। মূল্য : আট টাকা। পৃষ্ঠা : ৮+৩২৮। উৎসর্গ :

প্রাচীন পুঁথিরচয়িতাদের উদ্দেশ্যে –

[বহু যুগের সাধনায় যাঁরা আমাদের সাহিত্য-ভান্ডার ঐতিহ্যবাহী চলতি ভাষার পুঁথিতে সমৃদ্ধ করেছেন]

কাহিনী শোনার সন্ধ্যা মিশে যায় দূরে ক্রমাগত
নাতেকা পাখীর মত রঙধনু দিগন্তের পারে,
সহস্র সংশয় এসে হানা দেয় বক্ষে বারেবারে ;
হাজার সওয়াল এসে তনু মন করে যে আহত।
যুগান্তের ঘূর্ণাবর্তে বেড়ে যায় হৃদয়ের ক্ষত,
মেলে না সান্ত্বনা, শান্তি – বাদগর্দ হাম্মামের ধারে,
অজানা মুক্তির পথ রুদ্ধ এক রাত্রির দুয়ারে
খুঁজে ফেরে অন্ধকারে শতাব্দীর কাহিনী বিগত।

নির্বাক বিস্ময়ে দেখি বিস্মৃত প্রাণের ব্যাকুলতা

www.pathagar.com

সঞ্চারিত এ মাটিতে, এই পাক বাংলার প্রান্তরে,
অথবা রাত্রির পটে জীবনের নব রূপকথা
পদ্মা মেঘনার দেশে বহমান ক্লান্তির প্রহরে।
পুঁথির পৃষ্ঠায় ম্লান মানুষের আর্তি ; – মানবতা
উজ্জ্বল হিরার মত দেখি জ্বলে রাত্রির প্রহরে॥

সূচিপত্র : সূচনা খণ্ড, পহেলা সওয়াল, দুসরা সওয়াল, তিসরা সওয়াল, চাহারম সওয়াল, পঞ্চম সওয়াল, শশম সওয়াল, আখেরী সওয়াল, শেষ খণ্ড।

শি শু – সা হি ত্য

৭. **পাখীর বাসা**। প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রচ্ছদশিল্পী ও অঙ্গসজ্জা : আবুল কাসেম। উৎসর্গ :

নতুন মানুষ এলো যারা
খোদার দুনিয়াতে
ছোট্ট আমার পাখীর বাসা
দিলাম তাদের হাতে।

সূচিপত্র : পাখীর বাসা, ঘুঘুর বাসা, বকের বাসা, প্যাঁচার বাসা, মজার ব্যাপার, মজার কোরাস, মেলায় যাওয়ার ফ্যাকড়া, নরম গরম আলাপ, বাদুড়ের কীর্তি, দাদুর কিস্‌সা, বিশেষ অনুরোধে, পাখপাখালী, টুনটুনী, কাঠঠোকরা, কুটুম পাখী, টিয়ে পাখী, ফিঙে পাখী, ঝড়ের গান, বৃষ্টির গান, বর্ষাশেষের গান, শরতের গান, বৃষ্টির গান, ফাল্গুনের গান, চৈত্রের গান, শাহজাদী, শাহজাদা, সিতারা, শাহীন, রংমহল, সাম্পান, জঙ্গীপীর, তিতুমীর, মহান নেতা, ঈমান একতা শৃঙ্খলা, আজাদ পাকিস্তান, আমাদের সবুজ নিশান, আমরা গড়বো পাকিস্তান, আশা উঁচু রাখ্, তোরা চাস্‌নে কিছু, তোরা চল্ রে ছুটে।

৮. **হরফের ছড়া**। প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৬৮। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : এ, মুক্‌তাদির। মুদ্রক : পাইওনিয়ার প্রেস, ঢাকা। দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। পৃষ্ঠা [২৬]।

৯. **নতুন লেখা**। প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৯। প্রকাশক : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। উৎসর্গ : আখতার, বাচ্চু, মন্নু, তিতু ও টিপু-কে/আব্বা।

www.pathagar.com

সূচিপত্র : মেঘের ছড়া, বৃষ্টির ছড়া, পয়লা আষাঢ়, বর্ষার গান, চিতল বোয়াল, ইলশে গুড়ি, ইলিশ, রুই-কাতলা, শ্রাবণের বৃষ্টি, শরতের সকাল, হৈমন্তী সুরে, পউষের কথা, সৌখিন পাখী, শ্রমিক পাখী, শীতের পাখী, পাখীর ঝাঁক, মেঘের শীতে, ফাল্গুনে, চৈত্রের কবিতা, রং-তামাসা, সবাই রাজা, দাদুর কথা, সহিস ও মহিষ, ফেলুর ছড়া, হোঁদল কুৎকুৎ, হাসি, কান্না, উদো-বুধোর ঝগড়া, পালোয়ানী কিস্‌সা, ঘোড়া, হাতী, মাছি, মশা, ছাগল, ষাঁড়, গণ্ডার, বন্ধু নির্বাচন, ছুঁচো, বাঘের মাসী, লালু মিঞার দুঃখ, চোপড়ের কথা, সাজ পোষাক, টাকার বান্দা, বিচিত্র অভিজ্ঞতা, রাক্ষস খোক্ষস, সবুজ নিশান, সবুজের স্বপ্ন, ঈদের কবিতা, পাক ওয়াতন, অশেষ আজান, মুজাহিদের গান, কচি-কিশোর, পথের গান, শাহীনের গান, কিস্‌সা শোনার সন্ধ্যা, দুষ্টু জিনের কিস্‌সা, সিন্দবাদ ও বুড়োর কিস্‌সা, নৌফেল ও বাদশা হাতেম তায়ীর কিস্‌সা, রাসুলে খোদা, মক্কা শহর আঁধার যুগে, মায়ের কোলে নূরনবী, শৈশবে নূরনবী, আল-আমীন, সত্যের সন্ধানী, সত্যাসত্য, শিশুদের নবী, মদীনায় নূরনবী, শেষ কথা।

১০. **ছড়ার আসর (১)**। প্রথম প্রকাশ : ১৯৭০।

পাঠ্যগ্রন্থ

১১. **নয়া জামাত** (প্রথম ভাগ)। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৫০। দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৫০। তৃতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৫১। প্রকাশক : মখ্‌দুমী এ্যান্ড আহ্‌সানউল্লাহ লাইব্রেরী, বাবুবাজার, ঢাকা। মুদ্রক : শ্রীনাথ প্রেস, ঢাকা। প্রচ্ছদশিল্পী : কামরুল হাসান। মূল্য : এক টাকা চার আনা। পৃষ্ঠা : ৮৪। [ইস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কমিটি-কর্তৃক পঞ্চম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত, ঢাকা গেজেট ১৮-১-৫১]

১২. **নয়া জামাত** (দ্বিতীয় ভাগ)। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৫০। দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ১৯৫১। প্রকাশক : মখ্‌দুমী এ্যান্ড আহসানউল্লাহ লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রচ্ছদশিল্পী : কামরুল হাসান। মূল্য : এক টাকা ছয় আনা। পৃষ্ঠা : ৭২+২৬। [পূর্ববৎ : ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

১৩. **নয়া জামাত** (তৃতীয় ভাগ)। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৫০। পূর্ববৎ। সপ্তম শ্রেণীর জন্য লিখিত বাংলা সাহিত্য। মূল্য : উল্লেখ নেই। পৃষ্ঠা : ৮৬+৩৭।

১৪. **নয়া জামাত** (চতুর্থ ভাগ)। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৫০। দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৫০। পূর্ববৎ। পৃষ্ঠা : ৯৬+৬৪। মূল্য : উল্লেখ নেই। [ইস্ট বেঙ্গল টেকস্ট বুক কমিটি-কর্তৃক অষ্টম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত : ঢাকা গেজেট দ্রষ্টব্য]।

www.pathagar.com

কবির মৃত্যুর পরে তাঁর যে-সব গ্রন্থ (কবি-পরিকল্পিত বা নতুন বা পুনর্মুদ্রিত) প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির পরিচয় এই। –

১. **ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা**। প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৭৫। সম্পাদক : আবদুল মান্নান সৈয়দ। প্রকাশক : মুহম্মদ ফাওজুল কবির খান, ফররুখ স্মৃতি তহবিল-এর পক্ষে। মুদ্রক : বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ বিভাগ। প্রচ্ছদ পরিকল্পক : ফজল শাহাবুদ্দীন। মূল্য : পনেরো টাকা। পৃষ্ঠা : ১৬+১৮৮। সূচিপত্র : প্রসঙ্গ-কথা : আবুল ফজল, প্রবেশক : আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ থেকে এবং 'অগ্রন্থিত কবিতা', 'শিশু-কিশোর কবিতা', 'আরো কবিতা' শিরোনামে কবিতা নির্বাচিত ও মুদ্রিত হয়েছে। পরিশিষ্টে জীবনিপঞ্জি ও রচনার তালিকা গ্রথিত।

২. **সাত সাগরের মাঝি**। তৃতীয় সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২ [১৯৭৫]। প্রকাশক : ইফতেখার রসুল জর্জ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ৪৬ বাংলা বাজার, ঢাকা। মুদ্রক : এম. আলম, ইডেন প্রেস, ৪১/এ হাটখোলা রোড, ঢাকা। চিত্র : ড. নওয়াজেশ আহমদ। মূল্য : নয় টাকা। পৃষ্ঠা : ১০১। প্রকাশকের নিবেদন ও পরিশিষ্টে মুজীবুর রহমান খাঁ-এর 'সাত সাগরের মাঝি – নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা' শীর্ষক আলোচনা।

সাত সাগরের মাঝি। চতুর্থ সংস্করণ : ১০ জুন ১৯৯০। প্রকাশক : নলেজ হোম, ১৪৬ গভর্ণমেন্ট নিউমার্কেট, ঢাকা ১২০৫। মুদ্রক : শিল্পতরু, ২৯০ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ : শিবনাথ বিশ্বাস। মূল্য : পঁয়তিরিশ টাকা। পৃষ্ঠা : ৬৪।

৩. **হরফের ছড়া**। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৭৬।

৪. **হে বন্য স্বপ্নেরা**। প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৭৬। কবি-পরিকল্পিত। সম্পাদক : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। প্রকাশক : মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, ফররুখ আহমদ কেন্দ্রীয় স্মৃতি সংসদের পক্ষে। মুদ্রক : বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা। প্রচ্ছদশিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : আট টাকা। পৃষ্ঠা : ৫৩। ভূমিকা : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। সূচিপত্র : ১. যৌবসেনা ২. কাঁচড়া পাড়ায় রাত্রি ৩. শেষ মুহূর্ত ৪. নাটকীয় ৫. সমস্যা ৬. ত্রয়ী ৭. সমাপ্তি ৮. নির্বিষ ৯. প্রতীক্ষা ১০. মধুমতীর তীরে ১১. দোয়েলের শিস ১২. রাত্রিচর ১৩. ঝিল্লী ১৪. পথিক ১৫. শাহেরজাদী ১৬. সাড়া ১৭. বিদায় ১৮. নিষ্প্রদীপ ১৯. পটভূমি ২০. সামুদ্রিক ২১. তিমি ২২. পদ্মার ফাটল ২৩. পদ্মার ভাঙ্গন ২৪. কালো দাগ ২৫. প্রেক্ষণ ২৬. পরিপ্রেক্ষিত ২৭. শিকার ২৮. জোয়ার ২৯. নাবিক ৩০. পাথরের দিন ৩১. স্মরণ ৩২. শূন্য মাঠ, মরা ঘাস ৩৩. মৃগতৃষ্ণিকা ৩৪. নৈশ কুকুরের ডাক ৩৫. হে

www.pathagar.com

মোর আগ্নেয় বক্ষ ৩৬. সুর ৩৭. সংগতি ৩৮. সে নামে ডেকেছি আমি ৩৯. হীরার কুচির মত ৪০. প্রেমের আবির্ভাব ৪১. ঘুম ৪২. প্রতীক ৪৩. বৈশাখ ৪৪. জ্যৈষ্ঠ ৪৫. নৈরাজ্য ৪৬. ব্যক্তিগত ৪৭. প্রেসম্যান ৪৮. সসাগরা ৪৯. হে বন্য স্বপ্নেরা।

৫. **মুহূর্তের কবিতা**। পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৭৮। সম্পাদক : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। প্রকাশক : তাজুল ইসলাম, বর্ণমিছিল, ৬৫ প্যারিদাস রোড, ঢাকা ১। মুদ্রক : তাজুল ইসলাম, বর্ণমিছিল, ৪২-এ কাজী আবদুর রউফ রোড, ঢাকা ১। প্রচ্ছদশিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : দশ টাকা। পৃষ্ঠা : ১০১। সম্পাদকের কথা : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। "মুহূর্তের কবিতা"-র প্রথম সংস্করণের কবি-কৃত পরিশোধন ও পরিবর্জন অনুসারে মুদ্রিত।

৬. **ফররুখ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)**। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৭৯। সম্পাদক : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ। প্রকাশক : বাংলা একাডেমীর পক্ষে মহিউদ্দীন আহমদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭ জিন্দাবাহার (প্রথম লেন), ঢাকা। মুদ্রক : মানিকলাল শর্মা, মনোরম মুদ্রায়ণ, ১৪ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা ১। প্রচ্ছদশিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : পঁয়তিরিশ টাকা। পৃষ্ঠা ১২+৩৮৮। সূচিপত্র : ভূমিকা ; "সাত সাগরের মাঝি", "সিরাজাম মুনীরা", "হে বন্য স্বপ্নেরা", ইকবালের কবিতা, প্রবন্ধ, সংযোজন ; পরিশিষ্ট : গ্রন্থ-পরিচিতি, কবি-জীবনী, তথ্য-নির্দেশিকা।

৭. **ইকবালের নির্বাচিত কবিতা**। প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮০। প্রকাশক : ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী। ভূমিকা ও পরিশিষ্ট : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ। প্রচ্ছদ : আবদুর রউফ সরকার। ১৬+৮০+৫ পৃষ্ঠা। দাম : দশ টাকা।

৮. **চিড়িয়াখানা**। প্রথম প্রকাশ : ১০ জুন ১৯৮০। প্রকাশক : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী। মুদ্রক : ওরিয়েন্ট কালার প্রিন্টার্স লিঃ, চট্টগ্রাম। মূল্য : পনেরো টাকা। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : সবিহ্-উল-আলম। সূচিপত্র : চিড়িয়াখানা, কাঠবিড়ালী, বিড়াল, শিয়াল, সিংহ, বানর, বেজী, হরিণ, ভল্লুক, ঈগল, আজব প্রাণী, বাঘ, অজগর, সারস পাখী, জেব্রা-জিরাফ, বাইসন, সীল মাছ, ভোঁদড়, ঘোড়া, বুনো হাতী, উট, গণ্ডার, উটপাখী, আলবাট্রস, সিন্ধুঘোটক, হাঙ্গর, তিমি, চিতা, জলহস্তী, কুমীর। ক্রোড়পত্র : পশুরাজ সিংহ, সীলমাছ, বুনো ষাঁড়-বাইসন।

৯. **নয়া জামাত**। প্রথম প্রকাশ : নবেম্বর ১৯৭৮। সংকলক : মাসুদ আলী। প্রকাশক : আধুনিক প্রকাশনী, ১৩/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১। মুদ্রক : পয়গাম প্রেস, ৯ গোপীকিষণ লেন, ঢাকা ৩। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : আবদুর রউফ সরকার। মূল্য : সুলভ – ছয় টাকা, শোভন – সাত টাকা। পৃষ্ঠা ৬৪।

www.pathagar.com

১০. **কাফেলা**। প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮০। দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৯৮৭। প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। ভূমিকা : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। প্রথম সংস্করণের মূল্য : আট টাকা, দ্বিতীয় সংস্করণের মূল্য : বিশ টাকা। সূচিপত্র : কাফেলা, কাফেলা ও মন্‌জিল, তায়েফের পথে, মদীনার মুসাফির, খলিফাতুল মুসলেমিন, এজিদের ছুরি, বেলাল, আলমগীর, কোন্ বিয়াবানে, নতুন সফর, নতুন মিনার, কাফেলার প্রতি, দুই মৃত্যু, হে আত্মবিস্মৃত সূর্য, জাগো সূর্য প্রদীপ্ত গৌরবে, বৈশাখ, ঝড়, বর্ষার পদ্মা, আরিচা-ঘাট, দ্বীপ নির্মাণ, সৃষ্টির গান, স্বর্ণ-ঈগল, ইন্‌কিলাব, কিস্‌সাখানির বাজার, পুঁথির কাহিনী অবলম্বনে, ঈদের স্বপ্ন, ঈদের কবিতা, নয়া সড়ক, শেরে বাংলার মাজারে, শিকল, বিরান শড়কের গান, মেঘনাতীরের চাষিকে, ইবলিস ও বনি আদম।

১১. **হাবেদা মরুর কাহিনী**। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৮১। প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। মুদ্রক : খেয়ালী প্রেস, ঢাকা। ভূমিকা : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। মূল্য : দশ টাকা। পৃষ্ঠা ৮৪।

১২. **সিন্দাবাদ**। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮৩। প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। সম্পাদক : আখতার-উল-আলম।

১৩. **ফুলের জলসা**। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৫। প্রকাশক : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা। ছবি : শওকাতুজ্জামান। দাম : আট টাকা। পৃষ্ঠা ২৪। সূচিপত্র : শাপলা শালুক, পদ্মফুল, কদম-কেয়া, কাঁঠালিচাঁপা, রজনীগন্ধা, রক্তকরবী, ঝুমকো জবা, সূর্যমুখী, রঙ্গন, চাঁপা ফুল, ভুঁই চাঁপা, গাঁদা ফুল, গোলাপ ফুল, ডালিয়া, গুলমোহর, রাতের ফুল, সন্ধ্যামালতী, শিউলি, হাসনাহেনা, অর্কিড ফুল, ফুলের দেশে, গন্ধরাজ।

১৪. **তসবিরনামা**। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৬। প্রকাশক : নয়া দুনিয়া পাবলিকেশনস, ৪৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১। প্রচ্ছদ : আবদুর রউফ সরকার। মুদ্রক : দিনকাল মুদ্রায়ণ, ঢাকা। মূল্য : বিশ টাকা। পৃষ্ঠা : ৫৬। সূচিপত্র : শিখন্ডীর প্রতি, মুখাপেক্ষীর প্রতি, বিশ্রম্ভালাপ, মর্ফিয়া খানের প্রতি, এক কৃষ্টি প্রসঙ্গে, ভূমিকা, মন্তব্য, বিরস মন্তব্য, মুখবন্ধ, বাজ ও বহুরূপী, মৃগ ও শাখামৃগ, বানর ও হুমাপাখি, চড়ুই-বাবুই, পোষা পাখি ও জালালী কবুতর, বনগাঁয়ে, রাজহাঁস ও পাতিকাক, পিঁজরা ও পলাতক পাখি, নেকড়ে ও কুকুর, বাঘ ও বলদ, ভাড়াটিয়া ঘোড়া ও সিংহ, শকুনী ও স্বর্ণ-ঈগল, বাছুর ও বিড়াল, চিলের আলাপ, ফিঙে ও চিল (১-২), ফিঙ্গে ও পরপুচ্ছধারী, চিতাবাঘের তরিকত শিক্ষা, একরকম বাঘের কিস্‌সা, ঐ কিস্‌সার জের, নেংটি ইঁদুরের আলাপ, কুমীর ও তথ্যজ্ঞানী, কাঁকড়ার গর্তে, শজারু ও ডালকুকুর, সেগুনের চারা ও বুনো কচু, শবেবরাত-পীলখানায়, শবেবরাত-বক ও ডাহুকের এলাকায়,

www.pathagar.com

রাত্রিশেষে, নৈশ পরিস্থিতি–আলোচনা প্রসঙ্গে, সী মোরগের দফতরে, বিতর্ক, ডিম চুরি, পাখির দরবার, সাপুড়ে ও সাপের পীর, সাপ ও ছুঁচো, ব্যঙ্গমা–ব্যঙ্গমীর আলাপ, দাড়িপাল্লা ও বাটখারা, বাটখারা ও সিন্দুক, সিন্দুক ও পাছ–দরজা, অসহায় অবস্থায়, শিয়াল ও হরিণ, কেরোসিনের কুপী ও ইমারতের ছাদ, ব্যাঙের মৃত্যু – হাটুরিয়াদের আলাপ, ব্যাঙের মৃত্যু – ধারাবর্ণনা (১–২), আগুন ও পানি, ডেগচির পানি ও দরিয়ার পানি, পেয়ালার পানি ও দরিয়ার পানি, পাহাড় ও দরিয়ার পানি, সমুদ্র ও বাষ্পবিন্দু, প্রাণ ও প্রাণী, পোকা ও মাকড়সা, মাটি ও সিংহাসন, ইঁটের কাহিনী (১–২), ইঞ্জিন ও চাকা, খেয়াঘাট ও খেয়ানৌকা, পাঁচিল ও দরজা (১–২), কড়িকাঠ ও চৌকাঠ, পিঁপড়া ও প্যাঁচা, পিঁপড়ে ও প্রজাপতি, পিঁপড়ে ও ফড়িং, ফড়িং ও মৌমাছি, ফড়িং ও মৌমাছি, কওম ও তক্‌দির, ইবলিসের বৈঠক (১–২), ইবলিসের চেলা ও নবীর উম্মত, পিতা–পুত্রের আলাপ, শাহী লেবাস ও সাধারণ মানুষ, বাঘ ও ভল্লুক, ভল্লুক ও মর্কট, দুই হাওয়া, পাতাবাহার ও পেঁপে গাছ, পাতাবাহার ও পেয়ারা গাছ, আরণ্য বিবাহ, মধু চাঁদে, চড়ুই দম্পতির পরচর্চা, হাঁস ও কবুতরের প্রতিবাদ, হুলোর কীর্তি, শামাদান জুজদান ও মসজিদ, মসজিদ ও জুতাচোর, বৈঠকী আলাপ (১–২), ইল্‌ম ও আমল, কালি কলম ও মন, আঙটি ও হিরা, বিদেশী গল্প, দুই কলমের বাহাস, স্থূল–সূক্ষ্ম সংলাপ, বাঁশ ও শরিফা, বাঁশ ও কঞ্চি, কবি ও কঞ্চি, আজাদী বার্ষিকীর আলাপ, পাহাড় ও পাতি কাক, মুসাফির ও লোকমান হাকিম, চিনি ও ছাই, মানুষের আলাপ, কুসঙ্গ মাটি ও মুসাফির, কাঁকড়াবিছা ও খেজুর গাছ, ইঁদুর ও বেজী, বিছুটি ও মেহেদী পাতা, কচ্ছপ ও প্রবালকীট, সুর্মা ও পাথুরে কয়লা, শীতরাত্রির আলাপ, শীত ও উত্তরের হাওয়া, শীত ও ফাল্গুনের হাওয়া, ফাল্গুনের হাওয়া ও বিরান মাঠ, ফাল্গুন ও পৃথিবী, কবির প্রতি, কর্মীর প্রতি, জ্ঞানীর প্রতি, ধ্যানীর প্রতি, অকর্মণ্যের প্রতি, গুহার আঁধার ও নৈশ অন্ধকার, ভোরের সূর্য ও গুহার অন্ধকার, ভোরের সূর্য ও বিশ্বপ্রকৃতি, আরশি ও বদসুরাত, হরিণ ও কুয়োর ব্যাঙ, য়েমনী মেহমান ও ইরানী মেজবান, ভূগোল পাঠ, পোনা মাছ ও প্রবীণ রুই, মৌচাক নির্মাণ, পাখি ও বাসা, পাখি ও আসমান, ঝড় ও পাখি, গাছ ও ডাল (১–২), আসমান ও জমিন, হুমা পাখির আলাপ (১–২), মাখলুকাত ও মানুষের রুহ, মোমবাতি ও শামাদান।

১৫. **কিস্‌সা কাহিনী**। প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮৪। প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররাম, ঢাকা ২। মুদ্রক : ইসলমিক ফাউন্ডেশন প্রেস, বায়তুল মুকাররাম, ঢাকা ২। লেখকের কথা :

> আরবী ও ফারসী ভাষার অমর অবদান, বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয় গ্রন্থ "আলিফ লায়লা" ও "শাহনামা" আরবী–ফারসী মিশেল চল্‌তি বাংলায় রচিত পুঁথির

www.pathagar.com

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন অঙ্কিত দুর্ভিক্ষের স্কেচ।

মানুষ তোমার হাতে করিয়াছে কবে আত্মদান,
তারি শোধ তুলে নাও হে জড় সভ্যতা, শয়তান।
শিশুর শোনিত হেসে অনায়াসে করিতেছ পান,
ধর্ষিতা নারীর দেহে অত্যাচার করিছ অম্লান,
জনতার সিঁড়ি বেয়ে, উর্দ্ধে উঠি অতি অনায়াসে
তারে তুমি ফেলে যাও পথপান্তে নর্দমার পাশে।

উদ্ধৃতাংশটি ফররুখের বিখ্যাত 'লাশ' কবিতার। কবিতাটি 'ফ্যাসিবিরোধী বৈঠকে পঠিত' হয় ব'লে কবির পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত।

www.pathagar.com

Masik Mohammadi

(ILLUSTRATED MONTHLY JOURNAL)

DAILY AZAD, Calcutta.
Calcutta 705, 400

86A, LOWER CIRCULAR ROAD,
CALCUTTA.

১১.৭.৪৫

ডক্টর ক্ব- আশ্রফ -

আপনার চিঠি পেয়েছি। এই সংখ্যা আরও
অসুস্থতার জন্য বেরুতে বিলম্ব হয়েছে। লেখার
আকুল হাত সাড়া দেয়। নতুন লেখকদের সম্বন্ধে
তিনি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। তবুও
আপনার লেখার কথা আমি বিশেষ ভাবে
তাঁকে বলেছি।

কাগজের টাকা খুব তাড়াতাড়ি আসছে, তাই
নিয়মের ব্যত্যয় হয়তো মিটবে না।
আমার শ্রদ্ধেয় সাহেব আমার সালাম জেনে
তাঁর খুশী সাহিত্য। ইতিহাস ইতিমধ্যেই
সুখকর হবে আশা করেছি। ইতি
আপনার - ফররুখ আহমদ

ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী-কে লেখা ফররুখ আহমদের একটি পত্র। কবি তখন ছিলেন 'মাসিক মোহাম্মদী'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক।

www.pathagar.com

১৯৭৪

(অবাধ অনাথ)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

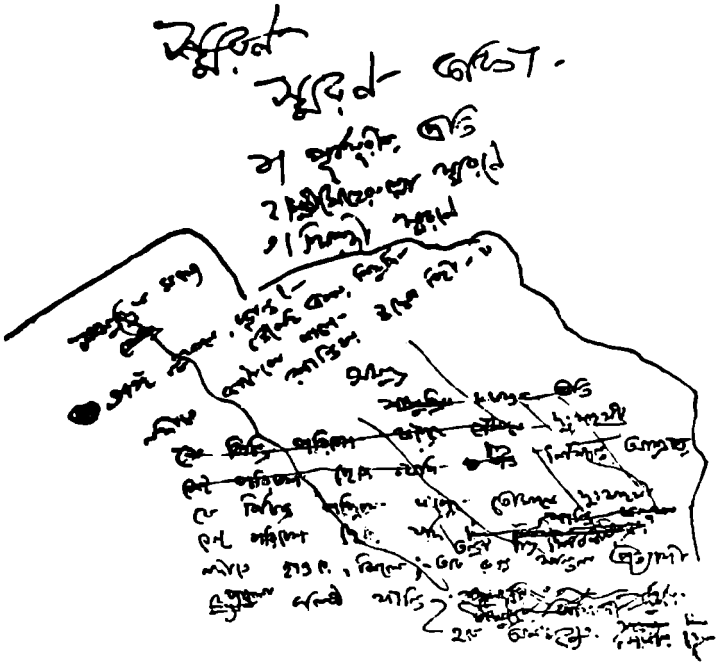

পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

[অভ্যর্থনা সমিতি]

সভাপতি :

অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ

যুগ্ম-সম্পাদক :

সুধীন্দ্র বসুমল্লিক

কাজী আহমদ

দপ্তর :

"বাইশ ভবন"

৯, আয়ুবেনিয়াম স্ট্রীট, ঢাকা

সদস্য

অধিপ

ফররুখ আহমদের একটি খশড়ার নমুনা। তবে শুধু আধেয় নয়, আধারের গুরুত্বও অন্যবিধ। খশড়া-সংবলিত 'পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' প্যাডের এই বিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠাটি জানান দ্যায় ভিন্নধর্মী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে কবির যুক্ততা।

www.pathagar.com

প্রচ্ছদ : চিড়িয়াখানা। শিল্পী : সবিহ্-উল-আলম।

www.pathagar.com

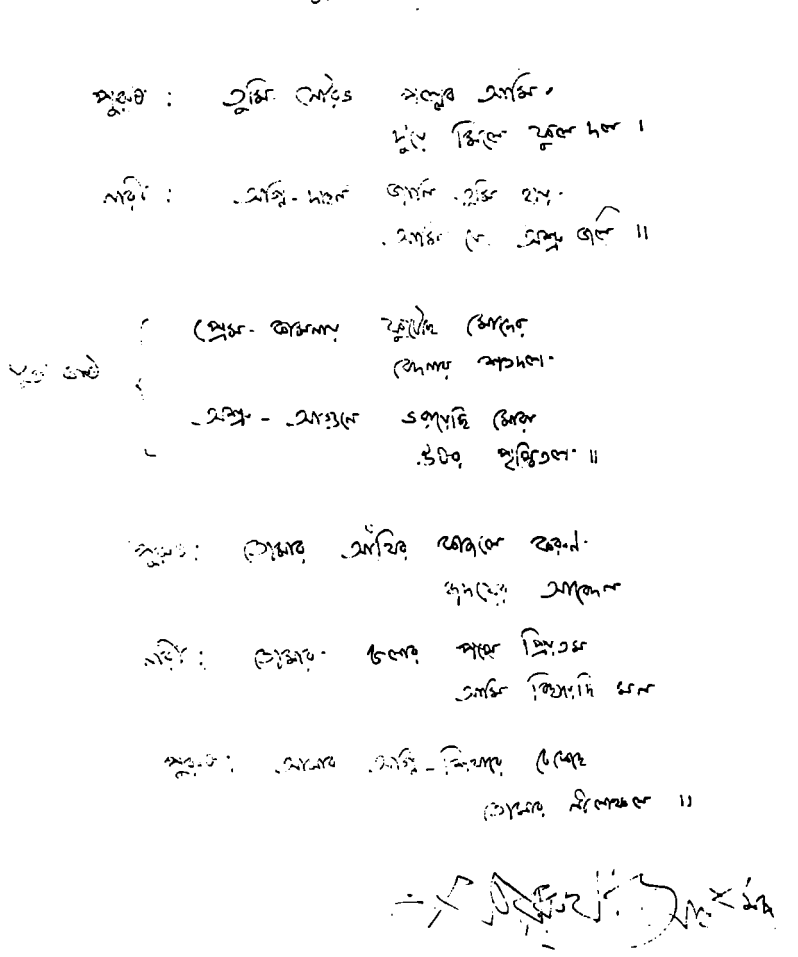

ফররুখ আহমদের অগুনতি গানের একটি হাতে-লেখা নিদর্শন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বেতারে যোগদানের পর থেকে প্রায় দুই যুগ বিষয়বৈচিত্র্যপূর্ণ অসংখ্য গান, গীতিনকশা, গীতিনাট্য লিখেছেন কবি। এসব গানের শ্রেণীবিভাজন অনেকটা এরকম : দেশাত্মবোধক, জাগরণমূলক, ইসলামী গান (হামদ্-নাত) ও আধুনিক গান। এছাড়া সৃষ্টি করেছেন শিশুকিশোর-উপযোগী গানের ভিন্ন জগৎ। ফররুখের গানের যশস্বী সুরকারদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল আহাদ, শেখ লুৎফর রহমান, আবদুল লতিফ, আবদুল হালিম চৌধুরী, আজাদ রহমান প্রমুখ। আর তাঁর গান গেয়েছেন লায়লা আরজুমান্দ বানু, আফসারী খানম, ফেরদৌসী রহমান, আঞ্জুমান আরা বেগম প্রমুখ।

www.pathagar.com

রাত্রি

ওরে পাখী, জাগো ওরে, জাগো ওরে শান্তি কিছু তুমি,
ঘুমাবে, জাগো তব সাথীরা সবে, দেখ যায়
ওরে, তারা, জাগে ওরে অন্ধকারে। শান্তি কেবল
কোন অন্ধ তিমিরে সেথা এসে নিঃশেষে ঘুমাবি
রে নিশীথ, নিভে গেছে সব দীপ, দেখে দেখ পথ খুঁজি
অবেলায়। ওখানে সম্মুখে আছে বন, আছে ভয়
ওখানে আকাশ আছে খুঁজিলাম, দূরে কিছু
শুধু অন্ধকার, তব নীরবতা ছিঁড়ি নিয়ে পুরী।

ওখানে যখনি অন্ধ সূর্য নিয়ে তুমি আসিবে
ওখানে ধরেছে তা, সেই পথে পাতায় পাতায়
শুধু অন্ধকার, তব, তব নিয়ে, আমার, ছুটিয়ে
আমার কেবল বেদনা নিয়ে [illegible]

প্রতি পদক্ষেপে তুমি আসিলে নিবিয়ে, আসিবে
শুধু আমার, সুখ নাই, ওই কোলে নিয়ে, দুঃখ নাই।

ফররুখ আহমদের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'রাত্রি'। 'মাসিক বুলবুল', শ্রাবণ ১৩৪৪।

www.pathagar.com

শাহ্ আব্দুল লতিফ ভিটাইয়ের কবিতা

ফকীর

নাই যেখানে কবরটি পাখির নিশানা, সেই জায়গাতে
দেখ কেমন অগ্নি শিখা জ্বলছে।
ফকীর! তারা জানতে যে আর এমন বিজন জায়গাতে
প্রাণের আগুন; — সেই কথা মন বলছে।
নয় সে ফকীর বেরায় নিয়ে শুধু রুটির তরাসে,
হয়না আকাঙ্ক্ষাহারা সে জন ইদং খলু মত্র সে ॥

বীর

বীর তো তারাই চলে যারা পড়তে না সে মরতে,
যায়না ভুলে বন্ধুদের জোয়ারের খেলাতে,
সুজীব যাদের আঘাত হলে পথ দেখানো শর্তে
যায় না হাঁটা বেহাদের শান্তি সুখের মেলাতে।

কৃষ্টী তোমার চলে যায় বর্ম নিয়ে, অস্ত্রে
জান বাঁচাতে চায় যে তারা যায় খদিত পড়তে,
সত্যিকারের বীর যে চলে বিনা সাজে বাস্ত্রে,
শহীদ দলে শয্যা নিতে; — খোদার কাছে মরতে ॥

কবির অনুবাদ-কবিতা। পবিত্র কুরআন-শরীফের অনেকগুলি সুরা তো কবি তর্জমা করেছিলেনই — এছাড়াও ইকবাল, হাফিজ, রুমী প্রমুখের কবিতাও।

www.pathagar.com

মাধ্যমে, যুগ যুগান্তর ধ'রে এদেশে সমাদৃত। ছোটদের জন্যে ঐ দুটি অমর গ্রন্থের তিনটি কাহিনী সহজ পদ্যে, খুব সংক্ষেপে এখানে সংকলিত হ'ল।

ফররুখ আহমদ

সূচিপত্র : আলীবাবার কিস্‌সা, আলাউদ্দীনের কিস্‌সা, সাত মনযিলের কাহিনী। মূল্য : বারো টাকা। পৃষ্ঠা : ৪২।

১৬. **মাহফিল (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)**। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৭। প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১০০০। প্রচ্ছদ : আবদুর রউফ সরকার। মূল্য : বিশ টাকা। সূচিপত্র : (প্রথম খন্ড) : হামদ, না'ত, নামাজ, জুমা, মুহার্রাম। (দ্বিতীয় খন্ড) : (....), দোওয়া ও মুনাজাত।

১৭. **ফররুখ আহমদের গল্প**। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯০। সম্পাদক : আবদুল মান্নান সৈয়দ। প্রকাশক : সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ৯৯ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, করিম চেম্বার (৫ম তলা), ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : পেপার কনভার্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড, ৯৯ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, করিম চেম্বার (৫ম তলা), ঢাকা ১০০০। প্রচ্ছদ : মোমেনউদ্দীন খালেদ। মূল্য : চল্লিশ টাকা। পৃষ্ঠা : ৮০। সূচিপত্র : ১. মৃত বসুধা ২. বিবর্ণ ৩. অন্তর্লীন ৪. যে পুতুল ডলির মা ৫. প্রচ্ছন্ন নায়িকা।

১৮. **নির্বাচিত কবিতা**। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। সম্পাদক : আবদুল মান্নান সৈয়দ। প্রকাশক : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : অর্কিড প্রিন্টার্স, বাংলা মটর, ঢাকা ১০০০। প্রচ্ছদ : শিবনাথ বিশ্বাস। মূল্য : পঞ্চাশ টাকা। পৃষ্ঠা : ৮০। সূচিপত্র : ১. সাত সাগরের মাঝি ২. সিন্দবাদ ৩. বা'র দরিয়ায় ৪. দরিয়ায় শেষ রাত্রি ৫. পাঞ্জেরী ৬. ডাহুক ৭. লাশ ৮. নাম ৯. ভাষা আন্দোলনে নিহত আত্মার প্রতি ১১. প্রতীক্ষা ১২. কবিতার প্রতি ১৩. কবির প্রতি ১৪. কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি ১৫. ঈদের স্বপ্ন ১৬. মুক্তধারা ১৭. প্রেমের আবির্ভাব ১৮. প্রেসম্যান ১৯. ঘুম ২০. হারুনার রশীদ ২১. মুহূর্তের কবিতা ২২. ক্লান্তি ২৩. গোধূলি-সন্ধ্যার সুর ২৪. মোতিঝিল ২৫. সাঙ্গ করিয়াছি পাঠ ২৬. প্রার্থনা/এক ২৭. মুক্তি ২৮. ১৯৭৪ ২৯. দীওয়ান-ই-হাফিজ অবলম্বনে ৩০. হাবীবুল্লাহ বাহারের ইন্তেকালে ৩১. শাহাদাৎ হোসেন স্মরণে ৩২. বন্দরে সন্ধ্যা ৩৩. বৈশাখ ৩৪. বিরান শড়কের গান ৩৫. মন ৩৬. হে বন্য স্বপ্নেরা ৩৭. আসন্ন শীতে ৩৮. মধুমতীর তীরে ৩৯. কাফেলা ৪০. এজিদের ছুরি ৪১. বেলাল ৪২. উজীরজা'দার প্রতি হাতেম তা'য়ী ৪৩. সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা (সা.)।

www.pathagar.com

সংকলনভুক্ত রচনাপঞ্জি

১. সুকান্ত ভট্টাচার্য-সম্পাদিত "আকাল" (১৯৪৪, কলকাতা) : 'লাশ' (কবিতা)।

২. আবদুল কাদির ও রেজাউল করীম-সম্পাদিত "কাব্য-মালঞ্চ" (১৯৪৫, কলকাতা) : 'শিকার', 'হে নিশানবাহী', 'সাত সাগরের মাঝি'[১] (কবিতা)।

৩. সৈয়দ আবদুল মান্নান-অনূদিত ও সংকলিত কবি ইকবালের "আসরারে খুদী" (১৯৪৫, কলকাতা) : শিরোনামহীন কবিতা ('দুর্বার তরঙ্গ এক...'), 'কবির শেষ বাণী' (কবিতা)।

৪. মোহাম্মদ নাসির আলী ও আবু জাফর শামসুদ্দীন-সম্পাদিত "নয়া সড়ক" (১৯৪৮) : 'কায়েদে আজম তিরোধানে' (কবিতা), 'রাজ-রাজড়া' (ব্যঙ্গ-নাটিকা), 'দুটি কবিতা' ('এক : নয়া শড়ক' ও 'দুই')।

৫. সৈয়দ আলী আহসান-সম্পাদিত "গল্প-সংগ্রহ" (১৯৫২) : 'মৃত বসুধা' (গল্প)।

৬. কায়সুল হক-সম্পাদিত "অধুনা" (১৯৫৪) : 'সনেট'।

৭. "কাব্য-বীথি" (১৯৫৪, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স্, মুখবন্ধ : আবদুল কাদির) : 'কবির প্রতি', 'কায়েদে আজমের তিরোধানে' (কবিতা)।

৮. "বাঙ্গালা পুঁথিসাহিত্য" (১৯৫৫, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স্) : 'তাজকিরাতুল আউলিয়া'[২] (প্রবন্ধ)।

৯. "নজরুল পরিচিতি" (১৯৫৯, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স্) : 'নজরুল সাহিত্যের পটভূমি'[৩] (প্রবন্ধ)।

১০. "আধুনিক কাব্য-সংগ্রহ" (১৯৬৩, বাঙলা একাডেমী, প্রসঙ্গ-কথা : সৈয়দ আলী আহসান) : 'ডাহুক', 'পাঞ্জেরী', 'সফর কাহিনী', 'বাদগর্দ হাম্মামের অন্ধকারে', 'গান' (কবিতা ও গান)।

১১. আবদুর রশীদ খান ও মোহাম্মদ মামুন-সম্পাদিত "প্রেমের কবিতা" (১৯৫৯) : 'নাম', 'শাহরিয়ার', 'দিলরুবা', 'গজল' (কবিতা ও গান)।

১২ কবীর চৌধুরী-অনূদিত ও সম্পাদিত "The Big Big sea": The Sailor of the Seven Seas', 'Son of Man', 'How long more for the night to be over', 'From Naufel and Hatem' (কবিতা)।

www.pathagar.com

১৩. "ইকবাল-চয়নিকা" (১৯৬৭, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স্) : 'রুমীর প্রতি', 'তিনটি কবিতা' (ঈমান, শৃঙ্খলা ও মর্দে মোমিন), 'বু'আলী কলন্দর' (অনুবাদ-কবিতা)।

১৪. আহসান হাবীব-সম্পাদিত "কাব্যলোক" (১৯৬৮) : 'পাঞ্জেরী', 'নিশানবরদার', 'নিশান' (কবিতা)।

১৫. "নব দিগন্তের গান" (১৯৬১, সমকাল প্রকাশনী, প্রসঙ্গ-কথা : আবদুল আহাদ) : 'দূর দিগন্তের ডাক এল', 'তুমি চেয়েছিলে মুক্ত স্বদেশভূমি', 'আজাদ ওয়াতান, স্বাধীন পাকিস্তান', 'হে নিশান, ফের ইঙ্গিত দাও মানবতার', 'ঝড়ের ইশারা ওরা জানে', 'লক্ষ পাথরে গড়া এ পাহাড়', 'এই আজাদী নিয়ে এল চাঁদ সিতারা', 'নব সৃষ্টির বুনিয়াদ হ'ল শুরু', 'মুক্ত জনতা চলে', 'মাটির মানুষ, মাঠের মানুষ', 'ওড়াও ঝান্ডা খুনেরা লাল', 'সামনে চল... সামনে চল...', 'চলো বীর, চলো নির্ভয়', 'ওঠো জাগ্রত জনতা সঘন'[৪] (গান)।

১৬. ফারুক মাহমুদ-সম্পাদিত "ধোলাই কাব্য" (প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৬)[৫] : কবিতাগুচ্ছ।

১৭. আবদুল কাদির-সম্পাদিত "সনেট শতক" (১৯৭৩) : 'প্রেমপন্থী', 'দুর্লভ মুহূর্ত', 'ঝড়' (কবিতা)।

১৮. আবদুল কাদির-সম্পাদিত "বাংলা সনেট" (১৯৭৪) : 'ধানের কবিতা', 'মৃত্যু-রূপা' (কবিতা)।

১৯. আবু রুশদ-অনূদিত ও সম্পাদিত "Four Poets From Bangladesh" (১৯৮৪) : 'Ghousul Azam', 'Tiredness', 'Night at Kanchrapara', 'A Winter morning at Sylhet Railway Station', 'From Naufel and Hatem' (1-2), 'Extract from Hatem Tai', 'The last Night at Sea'. (কবিতা)।

২০. দাউদ হায়দার-সম্পাদিত "বাংলাদেশের কবিতা" (১৯৮৫, কলকাতা) : 'যতবার আমি শুনেছি', 'বর্ষার বিষণ্ন চাঁদ', 'বন্দরে সন্ধ্যা', 'ময়নামতীর মাঠে' (কবিতা)।

২১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও দীপক রায়-সম্পাদিত "এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা" (১৯৮৭, কলকাতা) : 'নাম'।

www.pathagar.com

২২. "বাকবাকুম" (চট্টগ্রাম) : 'হাতেম তা'য়ী ও সাত ডাকাত' (গল্প), 'দোওয়া' (কবিতা)।

২৩. Yusuf Jamal Begum (Mrs. Muhammad Begum) অনূদিত "Poems From East Bengal" (১৯৫৪, করাচী) : 'Mariners of the Seven Seas', 'The Standard-Bearer', 'Radiant Signs'.

২৪. মহফিল হক-সম্পাদিত "বাংলাদেশের কবিতা" (১৯৭৬) : 'ডাহুক', 'পাঞ্জেরী', 'দোলার বাহির থেকে' (কবিতা)।

২৫. আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত "ইসলামী কবিতা/শাহাদাৎ হোসেন" (১৯৮৩) : 'স্মরণে' (কবিতা)।

২৬. সৈয়দ আলী আহসান-সম্পাদিত "ইকবালের কবিতা" (১৯৫২) : 'পূর্বাণী', 'শাহীন', 'আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন', 'জিব্রাইল ও শয়তান', 'গজল ও গীতিকা', 'আসরার-ই-খুদী থেকে', 'ভিক্ষা', 'বু'আলী কলন্দর', 'তারেকের দো'আ', 'খোদার দুনিয়া', 'খোদার ফরমান', 'ইকবাল-কণিকা' (অনুবাদ-কবিতা)।

২৭. "চির দুর্জয়" (১৯৬৬, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স্) : 'শহীদের খুনরাঙা কাশ্মীর', 'আমরা সকলে সৈনিক', 'জেহাদের এই ঝান্ডা আমরা', 'বল নারায়ে তকবির' (গান)।

২৮. আসকার ইবনে শাইখ-সম্পাদিত "নব জীবনের গান" (১৯৫৯) : 'হাজার বছর পার হয়ে ফের' (সুর ও স্বরলিপি : মোশাররফ হোসেন ফরিদ), 'ভুলি নাই, আজও ভাই নাই' (সুর ও স্বরলিপি : আবদুল লতিফ), 'শহীদী যুগের নজরানা এই পাক ওয়াতান', (সুর ও স্বরলিপি : আবদুল লতিফ), 'তোরা চাসনে কিন্তু কারো কাছে' (সুর ও স্বরলিপি : আবদুল লতিফ), 'আমার আজাদ পাকিস্তান' (সুর : আবদুল হালিম চৌধুরী, স্বরলিপি : আবেদ হোসেন খান), 'সকল দেশের চেয়ে সেরা আমার দেশের মাটি' (সুর : আবদুল হালিম চৌধুরী, স্বরলিপি : আবেদ হোসেন খান), 'মধুর চেয়ে মধুর যে ভাই আমার দেশের ভাষা' (সুর : আবদুল হালিম চৌধুরী, স্বরলিপি : আবেদ হোসেন খান), 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ' (সুর : ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু, স্বরলিপি : আবদুল লতিফ), 'মুক্ত আলোর দিগন্তে ওঠে নব জীবনের গান' (সুর ও স্বরলিপি : আবদুল লতিফ), 'জামাত হয়েছে খাড়া' (সুর : শেখ লুৎফর রহমান, স্বরলিপি : মুনশী রইসউদ্দীন), 'আল্লার দেওয়া বিশ্ব-বিধান

www.pathagar.com

ইসলামী শরিয়ত' (সুর : আবদুল হালিম চৌধুরী, স্বরলিপি : আবেদ হোসেন খান), 'এক হও দুনিয়ার মুসলিম' (সুর ও স্বরলিপি : আবদুল লতিফ), 'সাড়া দাও ফিরে' (সুর ও স্বরলিপি : বেদারউদ্দীন আহমদ), 'মরু ঝঞ্ঝার মতো উঠে আসে' (সুর ও স্বরলিপি : আবদুল লতিফ), 'গান গেয়ে যাও নতুন প্রাণের' (সুর : কাদের জামেরী, স্বরলিপি : ধীর আলী মিঞা), 'এই কাফেলা চলবে আবার' (পূর্ববৎ) (গান)।

২৯. আজীজুল হাকিম ও আবদুর রশীদ-সম্পাদিত "একুশের কবিতা" (২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪) : 'শহীদ দিবস উপলক্ষে তিনটি সনেট' (১-৩) (কবিতা)।

৩০. দেওয়ান শামসুল হক-সম্পাদিত "কবিতায় বাংলাদেশ" (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮০) : 'বাংলার ভান্ডারে' (কবিতা)।

৩১. কাজী নজরুল হক-সম্পাদিত "শহীদ নজীর" (১৯৪৫) : 'তোমার রক্তে দেখি সে রক্ত দিন' (কবিতা)।

৩২. "ছাত্র সপ্তাহ স্মারক" (১৯৬৭, রেডিও পাকিস্তান, চট্টগ্রাম) : 'আমরা তরুণ, আমরা নবীন' (গান)।

৩৩. "রাহমাতুল্লিল আলামিন" (১৯৭৪, চট্টগ্রাম নাগরিক ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন কমিটি) : 'এদিনের সুর' (গান)।[৬]

৩৪. "শেরে বাংলা স্মরণে" (বৈশাখ ১৩৭৩, ঢাকা) : 'শেরে বাংলার মাজারে' (কবিতা)।

৩৫. "জিন্দা পাকিস্তান" (পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ, ঢাকা) : 'তারানা-ই-পাকিস্তান' (গান)।

৩৬. "Poems From South Asia" (Compiled by Fazal Shahabuddin, Introduction by Syed Ali Ahsan): 'A Winter Morning at Sylhet Railway Station', 'Wood Cutter' (From Noufel and Hatem), Extract from Hatem Tai (Translated by Abu Rushd).

৩৭. "আমার সোনার দেশ" (জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা) : (প্রথম খন্ড : বীরত্বব্যঞ্জক গান) 'জঙ্গে জেহাদ! জঙ্গে জেহাদ!' (সুর : আবদুল লতিফ), 'জঙ্গী জোয়ান চল বীর' (সুর : সমর দাস), 'চলো বীর, চলো নির্ভয়' (সুর : আবদুল আহাদ), 'আল্লার তলোয়ার-অসি খরশান' (সুর : আবদুল লতিফ), 'ঐ দিকে দিকে উদ্যত লেলিহান' (সুর : আবদুল লতিফ), 'এক হও দুনিয়ার মুসলিম', (সুর : আবদুল লতিফ), 'বল নারায়ে তকবির' (সুর : আবদুল

www.pathagar.com

লতিফ), 'ফিরে আসে আজ ফের' (সুর : ধীর আলী মিয়া), 'শহীদের খুন-রাঙা কাশ্মীর' (সুর : আবদুল লতিফ), 'জেহাদের ময়দানে চল যাই' (সুর : ধীর আলী মিয়া), 'সামনে চল...সামনে চল...' (দ্বিতীয় খন্ড : দেশভক্তিমূলক গান), 'আজাদ ওয়াতান, স্বাধীন পাকিস্তান' (সুর : আবদুল আহাদ), 'ঐ উচ্ছল প্রাণ' (সুর : বেদারউদ্দীন), 'তোরা চাসনে কিছু, কারো কাছে' (সুর : আবদুল লতিফ), 'ওঠো জাগ্রত জনতা সঘন তমসায়' (সুর : আবদুল আহাদ), 'তুমি চেয়েছিলে মুক্ত স্বদেশভূমি' (সুর : আবদুল লতিফ)।

৩৮. মুনীর চৌধুরী-সম্পাদিত "সংগ্রাম ও সংহতি" (পাকিস্তান পাবলিকেশন্স্, ১৯৬৯) : 'কাশ্মীর' (কবিতা), 'শহীদের খুন-রাঙা কাশ্মীর', 'আমরা সকলে সৈনিক...', 'জেহাদের এই ঝান্ডা আমরা' ও 'বল নারায়ে তকবির' (গান)।

---

১ 'হে নিশানবাহী' ও 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাদ্বয় এই সংকলনে ঈষৎ সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত হয়েছে।

২ ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত।

৩ ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত। বিশ্বনাথ দে-সম্পাদিত "নজরুল-স্মৃতি" (১৯৭০, কলকাতা) সংকলনে পুনর্মুদ্রিত।

৪ এই গানগুলিতে সুর দিয়েছিলেন আবদুল আহাদ এবং স্বরলিপি করেছিলেন লায়লা আরজুমান্দ বানু।

৫ "ধোলাই কাব্য"র দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯৮৬) ভূমিকায় সম্পাদক ফারুক মাহমুদ জানান :

> রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন অবস্থানে স্থান করে নেয়া এসব ব্যক্তিদের ব্যবহারিক জীবনের বৈপরীত্য ও অসংগতিকে নগ্নভাবে তুলে ধরার দায়িত্বপালনের তাগিদেই তখন শুরু হয় ব্যঙ্গকবিতার রচনা ও প্রকাশ। ১৯৪৯ সালেই কবি ফররুখ আহমদের লেখনীতে তার সূত্রপাত। সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠার সৌভাগ্যের অধিকারী আমিও সে কার্যক্রমে শরীক হই। কিন্তু জালিমশাহীর সেই দুরন্ত দাপটের যুগে তাঁর বা আমার কারো লেখাই স্বনামে কোথাও প্রকাশ পায়নি – সরকারবিরোধী সাপ্তাহিক বা সাময়িক পত্রপত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে এলোপাথাড়ি ছদ্মনামে। সে-সব লেখার মধ্যে থেকে বাছাই করা কবিতা কিছু গ্রন্থিত হয়ে প্রকাশিত হয় "ধোলাই কাব্য" গ্রন্থে জানুয়ারি ১৯৬৩-তে। "ধোলাই কাব্যে"র অর্ধেক লেখাই ফররুখ ভাইয়ের। বাকীগুলো আমার।

ফররুখ আহমদ "ধোলাই কাব্যে"র দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য ভূমিকা-ও লিখে রেখেছিলেন। তাঁর ব্যঙ্গাক্ত ভূমিকাংশটি এই :

> অনেকের আনন্দ এবং বিষাদের মধ্যে আমরা ঘোষণা করছি যে, "ধোলাই কাব্যে"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। প্রথম সংস্করণের বই ভৌতিক ব্যস্ততার মধ্যে ছাপা হয়েছিল ব'লে কিছু ভুলচুক থেকে গিয়েছিল। নতুন সংস্করণে সে-সব ত্রুটিবিচ্যুতি আমরা বিলকুল সংশোধন ক'রে ফেলেছি। যার ফলে "ধোলাই কাব্যে"র পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত – অতীব পরিষ্কার সংস্করণ ভূপৃষ্ঠে অভিনব কলেবরে আত্মপ্রকাশ করল। [আশা করি, "ধোলাই কাব্যে"র এই সহীহ বড় সংস্করণকেই এখন থেকে সহৃদয় ও হৃদয়হীন পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করবেন। আর "ধোলাই কাব্যে"র কোন

www.pathagar.com

নকল সংস্করণ দেখলে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবেন। কেননা নকল করাটাই এদেশের 'আড়ষ্ট কাক' বা তথাকথিত এ্যারিস্টোক্রাট আঁতালেকচুয়ালদের বৈশিষ্ট্য।]

৬ 'আবদুল্লাহ মাহবুব' ছদ্মনামে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনাপঞ্জি

'সওগাত'। মাসিক। সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন।

১. আঁধারের স্বপ্ন। কবিতা। পৌষ ১৩৪৫।

২. চৈত্র-প্রভাতের সুর। কবিতা। ফাল্গুন ১৩৪৫।

৩. নাটকীয়। কবিতা। চৈত্র ১৩৪৫।

৪. চৈত্র সন্ধ্যার সুর। কবিতা। বৈশাখ ১৩৪৬।

৫. কর্পূর। কবিতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬।

৬. নাটক। কবিতা। আষাঢ় ১৩৪৭।

৭. কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি। কবিতা। পৌষ ১৩৪৭।

৮. একটি উক্তি। কবিতা। আশ্বিন ১৩৪৮।

৯. কাব্যে কোরআন : সুরা আল্‌ক্‌। ভাবানুবাদ। ফাল্গুন ১৩৪৮।

১০. কাব্যে কোরআন : সুরা এনশেরাহ। ভাবানুবাদ। ঐ।

১১. কাব্যে কোরআন : সুরা জোহা। ভাবানুবাদ। চৈত্র ১৩৪৮।

১২. কাব্যে কোরআন : সুরা শাম্‌স্‌। ভাবানুবাদ। ঐ।

১৩. হারুনার রশিদ। কবিতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯।

১৪. ব্ল্যাক-আউট। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৪৯।

১৫. পথ। কবিতা। আশ্বিন ১৩৪৯।

১৬. পথিক। কবিতা। কার্তিক ১৩৪৯।

১৭. উপহার। কবিতা। অগ্রহায়ণ ১৩৪৯।

১৮. রাত্রিশেষে। কবিতা। পৌষ ১৩৪৯।

১৯. জীবন-সমুদ্র। কবিতা। মাঘ ১৩৪৯।

২০. ঝিল্লী। কবিতা। ফাল্গুন ১৩৪৯।

২১. হে বন্য স্বপ্নেরা। কবিতা। চৈত্র ১৩৪৯।

২২. প্রেক্ষণ। কবিতা। বৈশাখ ১৩৫০।

www.pathagar.com

২৩. পারফিউম। কবিতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০।

২৪. সাড়া। কবিতা। আষাঢ় ১৩৫০।

২৫. তায়েফের পথে। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৫০।

২৬. পরিপ্রেক্ষিত। কবিতা। ভাদ্র ১৩৫০।

২৭. মৃত্যু ও মৃত্তিকা : নির্বিষ। কবিতা। আশ্বিন ১৩৫০।

২৮. ঐ : মৃতের গান। কবিতা। ঐ।

২৯. মৃত্যু ও মৃত্তিকা : ধূলিতল। কবিতা। আশ্বিন ১৩৫০।

৩০. শকুনেরা। কবিতা। ঐ।

৩১. সিন্দবাদ। কবিতা। পৌষ ১৩৫০।

৩২. বা'র দরিয়ায়। কবিতা। ভাদ্র ১৩৫০।

৩৩. এই সংগ্রাম দিন রাত্রির তীরে। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৫১।

৩৪. খলিফাতুল মুসলেমিন। কবিতা। ভাদ্র ১৩৫১।

৩৫. ঈদের স্বপ্ন।[২] কবিতা। আশ্বিন ১৩৫১।

৩৬. ডাহুক। কবিতা। কার্তিক ১৩৫১।

৩৭. দুইটি সনেট : ঘুম। কবিতা। অগ্রহায়ণ ১৩৫১।

৩৮. ঐ : নাবিক। কবিতা। ঐ।

৩৯. ওসমান গণি। কবিতা। পৌষ ১৩৫১।

৪০. আসন্ন ফাল্গুনে। কবিতা। ফাল্গুন ১৩৫১।

৪১. সসাগরা। কবিতা। চৈত্র ১৩৫১।

৪২. মধুমতীর তীরে। কবিতা। বৈশাখ ১৩৫১।

৪৩. মন। কবিতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২।

৪৪. দিন। কবিতা। আষাঢ় ১৩৫২।

৪৫. সংঘাত। কবিতা। ভাদ্র ১৩৫২।

৪৬. স্রোত। কবিতা। আশ্বিন ১৩৫২।

৪৭. একটি কবিতা। কবিতা। কার্তিক ১৩৫২।

৪৮. বিরান সড়কের গান। কবিতা। মাঘ ১৩৫২।

www.pathagar.com

৪৯. আর-এক দিন। কবিতা। ফাল্গুন ১৩৫২।

৫০. দুই সন্ধ্যা। কবিতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩।

৫১. প্রেম ও সত্তা। কবিতা। আষাঢ় ১৩৫৩।

৫২. চতুর্দশপদী : বিরহের শয্যা থেকে। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৫৩।

৫৩. ঐ : প্রেমের জটিল পথে।২ক কবিতা। ঐ।

৫৪. হে মোর আগ্নেয় বক্ষ। কবিতা। ভাদ্র ১৩৫৩।

৫৫. ডাক। কবিতা। আশ্বিন ১৩৫৩।

৫৬. নিঃসঙ্গ। কবিতা। কার্তিক ১৩৫৩।

৫৭. ত্যাগের মহিমা শিখাও আবার। কবিতা। অগ্রহায়ণ ১৩৫৩।

৫৮. শহীদে কারবালা। কবিতা। পৌষ ১৩৫৩।

৫৯. অশেষ যাত্রা। কবিতা। মাঘ ১৩৫৩।

৬০. কবিতাগুচ্ছ : সে নামে ডেকেছি আমি। কবিতা। ফাল্গুন ১৩৫৩।

৬১. ঐ : হীরার কুঁচির মত। কবিতা। ঐ।

৬২. ঐ : রক্ত-হিংস্র মাঠে। কবিতা। ঐ।

৬৩. ঐ : অভিযাত্রিক। কবিতা। ঐ।

৬৪. কবিতাগুচ্ছ : মোহানায়। কবিতা। চৈত্র ১৩৫৩।

৬৫. ঐ : তিক্ত আর্তনাদ। কবিতা। ঐ।

৬৬. ঐ : সামুদ্রিক । কবিতা। ঐ

৬৭. কয়েকটি কবিতা : বৈশাখ। কবিতা। বৈশাখ ১৩৫৪।

৬৮. ঐ : জ্যৈষ্ঠ। কবিতা। ঐ।

৬৯. ঐ : স্বপ্ন। কবিতা। ঐ।

৭০. ঐ : প্রতীক। কবিতা। ঐ।

৭১. বর্গী। কবিতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪।

৭২. ব্যক্তিগত। কবিতা। আষাঢ় ১৩৫৪।

৭৩. সনেট : নৈরাজ্য। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৫৪।

৭৪. ঐ : মৃগতৃষ্ণিকা। কবিতা। ঐ।

www.pathagar.com

৭৫. ঐ : ঘূর্ণি। কবিতা। ঐ।

৭৬. ঐ : বাজ। কবিতা। ঐ।

৭৭. প্রতীক্ষমানা। কবিতা। ভাদ্র ১৩৫৪।

৭৮. পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য। প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩৫৪।

৭৯. ময়নামতির মাঠে। কবিতা। অগ্রহায়ণ ১৩৬০।

৮০. ইকবাল প্রসঙ্গে। প্রবন্ধ।

'সমকাল'। মাসিক। সম্পাদক : সিকান্দার আবু জাফর।

১. বৈশাখের কালো ঘোড়া। কবিতা। কার্তিক ১৩৬৭।

২. অঝোর ধারায় বৃষ্টি। কবিতা। কার্তিক ১৩৬৭।

৩. ছড়া (১–৫)। ছড়া। কবিতাসংখ্যা, ১৩৭১–৭২।

'মৃত্তিকা'। সম্পাদক : কাজি আফসারউদ্দিন আহমদ।

১. লিলি। কবিতা। বসন্ত ১৩৪৯।

২ সনেটগুচ্ছ (শাহরিয়ার, বিস্মরণ, বিস্বাদ দিন, পরিক্রমা, শিকার)। কবিতা। বর্ষা ১৩৫০।

৩. দোয়েলের শিস। কবিতা। ১৩৫০।

৪. সনেটগুচ্ছ (সুর, সংগতি, অপসৃতা, রাত্রিচর)। কবিতা। ১৩৫০।

৫. রবীন্দ্র-স্মরণে। কবিতা। আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৫৩[৩]।

৬. সনেটগুচ্ছ (ইঁদুর, নেতা, ইডেন গার্ডেন, রসায়ন)। কবিতা। ঐ।

৭. সিকান্দার শা-র ঘোড়া।[৪] উপন্যাস। ঐ।

'বুলবুল'। সম্পাদক : মুহম্মদ হবীবুল্লাহ [বাহার] ও বেগম শামসুন নাহার [মাহমুদ]।

১. রাত্রি (সনেট)। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৪৪।

২ অপ্রয়োজন। কবিতা। ভাদ্র ১৩৪৪।

www.pathagar.com

৩. মৃত্যু-রূপা। কবিতা। পৌষ ১৩৪৪।

৪. নগর-পথ। কবিতা। ফাল্গুন ১৩৪৪।

৫. অন্যায়। কবিতা। চৈত্র ১৩৪৪।

৬. জন্মদৈন্য। কবিতা। বৈশাখ ১৩৪৫।

৭. যে পুতুল ডলির মা। গল্প। ঐ।

'মাহে-নও'। মাসিক। সম্পাদক : আবদুল কাদির।

১. সনেট। কবিতা। ভাদ্র ১৩৫৭।

২. পরোয়ানা। কবিতা। ভাদ্র ১৩৫৮।

৩. কওমী তামান্না।[৫] গান। পৌষ ১৩৫৮।

৪. জওয়াব (জওয়াব-ই-শিকোয়ার অনুকরণে)। অনুবাদ। আষাঢ় ১৩৫৯।

৫. আলোর গোলাব ফোটে। কবিতা। ভাদ্র ১৩৫৯।

৬. কবির প্রতি। কবিতা। বৈশাখ ১৩৬০।

৭. তিনটি সনেট (কবিতার প্রতি, রূপকথা, কোকিল)। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৬০।

৮. সনেটগুচ্ছ (মুহূর্ত, সন্ধ্যায়, রাত্রির কবিতা, অতন্দ্র, রাত্রিশেষে, ঝড়)। কবিতা। ভাদ্র ১৩৬০।

৯. কালাম-ই-ইকবাল : রুমীর প্রতি। অনুবাদ। ভাদ্র ১৩৬০।

১০. সনেটগুচ্ছ (১-৩)। কবিতা। ভাদ্র ১৩৬১।

১১. দুইটি সনেট। কবিতা। কার্তিক ১৩৬১।

১২ পুঁথির কাহিনী অবলম্বনে (শাহ্ আযাদ বখতের স্বগতোক্তি)। কবিতা। ভাদ্র ১৩৬২।

১৩. সনেট (রাত্রির ঘটনা, রাত্রিশেষের কাহিনী)। কবিতা। মাঘ ১৩৬২।

১৪. তিনটি সনেট (ধানের কবিতা, পুথি, নদীর দেশ)। কবিতা। চৈত্র ১৩৬২।

১৫. সাদী-র কালাম (ভাবানুবাদ)। অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৬২।

১৬. কালাম-ই-ইকবাল : ইকবাল থেকে : ঈমান, শৃঙ্খলা, মর্দে মোমিন। অনুবাদ। বৈশাখ ১৩৬৩।

১৭. কবি নজরুল ইসলাম (১-২)। কবিতা। আষাঢ় ১৩৬৩।

www.pathagar.com

১৮. সনেটগুচ্ছ (পাক বাংলা, বাংলা ভাষার প্রতি, চলতি ভাষার পুঁথি, শাহ গরীবুল্লাহ, শাহ গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত পুঁথি প্রসঙ্গে, সৈয়দ হামজার 'সাত সওয়াল ও হাতেম তা'য়ী' পুঁথি প্রসঙ্গে)। কবিতা। ভাদ্র ১৩৬৩।

১৯. নৌফেল ও হাতেম[৬]। কাব্যনাট্য। কার্তিক ১৩৬৩।

২০. নৌফেল ও হাতেম[৭]। কাব্যনাট্য। অগ্রহায়ণ ১৩৬৩।

২১. কওমী গান (১–৩)। গান। মাঘ ১৩৬৩।

২২. মাতৃভাষা[৮]। গান। ফাল্গুন ১৩৬৩।

২৩. ইসলামী জমহুরিয়া। কবিতা। চৈত্র ১৩৬৩।

২৪. দেশের মাটি[৯]। গান। চৈত্র ১৩৬৪।

২৫. মৌলিক গণতন্ত্রের গান। গান। পৌষ ১৩৬৬।

২৬. চাহারম সওয়ালের জবাব। কবিতা। কার্তিক ১৩৭০।

২৭. ....। কবিতা। অগ্রহায়ণ ১৩৭০।

'দিলরুবা'। মাসিক। ১–২ : সৈয়দ আলী আশরাফ

৩–৮ : কাজী মোতাহার হোসেন।

১. দিলরুবা (১–৫)[১০]। কবিতা। বৈশাখ ১৩৫৬।

২. দিলরুবা (দ্বিতীয় স্তবক)। কবিতা। আষাঢ় ১৩৫৬।

৩. দিলরুবা (তৃতীয় স্তবক ১–৭)। কবিতা। ভাদ্র ১৩৫৬।

৪. দিলরুবা (চতুর্থ স্তবক ১–৫)। কবিতা। আশ্বিন ১৩৫৬।

৫. দিলরুবা (পঞ্চম স্তবক ১–৬)। কবিতা । অগ্রহায়ণ ১৩৫৬।

৬. দিলরুবা (ষষ্ঠ স্তবক ১–৬)। কবিতা। ফাল্গুন–চৈত্র ১৩৫৬।

৭. দিলরুবা (সপ্তম স্তবক ১–৯)। কবিতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭।

৮. গান[১১]। গান। আশ্বিন ১৩৫৭।

৯. আজাদীর কবিতা : গান। কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৫৯।

www.pathagar.com

'মাসিক মোহাম্মদী'। মাসিক। সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

১. মৃত বসুধা। গল্প। কার্তিক ১৩৪৪।

২. প্রলোভন[১২]। কবিতা। মাঘ ১৩৪৫।

৩. ইতিহাস আর আজকের রাত্রি। কবিতা। ফাল্গুন ১৩৪৫।

৪. একটি কবিতা। কবিতা। ফাল্গুন ১৩৪৫।

৫. নির্লজ্জ। কবিতা। আষাঢ় ১৩৪৬।

৬. জীবন-ছন্দ। কবিতা। আষাঢ় ১৩৪৬।

৭. ছুরা আর্-রহমান। মর্মানুবাদ : কবিতা। আষাঢ় ১৩৪৮।

৮. আয়াতুল কুরছী। মর্মানুবাদ : কবিতা। শ্রাবণ ১৩৪৮।

৯. কাব্যে কোরআন[১৩]। ভাবানুবাদ। পৌষ ১৩৪৮।

১০. রাত্রি শেষ হয়ে আসে। কবিতা।

১১. বরাভয়। কবিতা।

১২. মহাচীন। কবিতা।

১৩. মনের মানুষ মোর। কবিতা।

১৪. নিষ্প্রদীপ। কবিতা। আশ্বিন ১৩৪৯।

১৫. আমি নই। কবিতা। কার্তিক ১৩৪৯।

১৬. অচেনা। কবিতা। মাঘ ১৩৪৯

১৭. প্রেক্ষিত। কবিতা। ফাল্গুন ১৩৪৯।

১৮. হে নিশানবাহী। কবিতা। চৈত্র ১৩৪৯।

১৯. সাত সাগরের মাঝি। কবিতা। বৈশাখ ১৩৫০।

২০. দল-বাঁধা বুলবুলি[১৪]। কবিতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০।

২১. বিদায়। কবিতা। আষাঢ় ১৩৫০।

২২. ইশারা। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৫০।

২৩. আউলাদ। কবিতা। ভাদ্র ১৩৫০।

২৪. হাজার বছর পার হয়ে। কবিতা।

www.pathagar.com

২৫. লাশ। কবিতা। আশ্বিন ১৩৫০।

২৬. শবেবরাত[১৫]। কবিতা। ভাদ্র ১৩৫০।

২৭. ঝরোকায়। কবিতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০।

২৮. আবুবকর সিদ্দিক। কবিতা। কার্তিক ১৩৫০।

২৯. মজলুম। কবিতা। অগ্রহায়ণ ১৩৫০।

৩০. আসন্ন শীতে[১৬]। কবিতা। ঐ।

৩১. উমর দারাজ-দিল । কবিতা। পৌষ ১৩৫০।

৩২. দরিয়ায় শেষ রাত্রি। কবিতা। মাঘ ১৩৫০।

৩৩. শাহরিয়ার। কবিতা। ফাল্গুন ১৩৫০।

৩৪. কাল এসেছিল ইরাণী হাওয়ার রাত[১৭]। কবিতা। ঐ।

৩৫. কাফেলা। কবিতা। বৈশাখ ১৩৫১।

৩৬. আসরার-ই-খুদী থেকে (৫ম অধ্যায়)। অনুবাদ।

৩৭. সনেট (স্বর্ণঈগল, পুরানো মাজারে, তুফান)। কবিতা। আষাঢ় ১৩৫১।

৩৮. মহাকবি কায়কোবাদের প্রতি। কবিতা। চৈত্র ১৩৫১।

৩৯. নিশান। কবিতা। আশ্বিন ১৩৫১।

৪০. শনিবারী (বিড়ালী, পেশাদারী বিদ্যালয়, পরিচয়, শনিবারী)। কবিতা। আষাঢ় ১৩৫২।

৪১. ক্রম। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৫২।

৪২. সনেট (যারা ভালোবেসেছিল, কাফেলার আয়োজন)। কবিতা। ভাদ্র ১৩৫২।

৪৩. সনেট (ঈদের স্বপ্ন, সংকট)। কবিতা। আশ্বিন ১৩৫২।

৪৪. কোন বিয়াবানে?। কবিতা। আষাঢ় ১৩৫২।

৪৫. সনেট (১-৩)। কবিতা। কার্তিক ১৩৫২।

৪৬. অশ্রু। কবিতা। পৌষ ১৩৫২।

৪৭. বুনিয়াদ। কবিতা। কার্তিক ১৩৫৯।

৪৮. দুটি সনেট (ইতিহাস, বন্দরের স্বপ্ন)। কবিতা।

৪৯. নসীহতনামা[১৮]। কবিতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০।

www.pathagar.com

৫০. নয়া জিন্দেগী[১৯]। কাব্যনাট্য। কার্তিক ১৩৫৯।

৫১. টুকরো নসীহত[২০]। কবিতা। আষাঢ় ১৩৬০।

৫২. কথা ও কবিতা[২১]। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৬০।

৫৩. সনেটগুচ্ছ (১–৫)। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৬০।

৫৪. শহীদ দিবস উপলক্ষে। কবিতা। ভাদ্র ১৩৬০।

৫৫. কয়েকটি কবিতা[২২]। কবিতা। আশ্বিন ১৩৬০।

৫৬. হাতেম তা'য়ীর কিস্‌সা। কবিতা। কার্তিক ১৩৬০।

৫৭. সওয়াল ও সফর। কবিতা। পৌষ ১৩৬০।

৫৮. সমস্যা। কবিতা। চৈত্র ১৩৪৬।

৫৯. প্রচ্ছন্ন নায়িকা। গল্প। কার্তিক ১৩৪৬।

৬০. অনুস্বার : ভূমিকা। কবিতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২।

৬১. অভিজাত–তন্দ্রা। কবিতা। ঐ।

৬২. উর্দু বনাম বাংলা। কবিতা। ঐ।

৬৩. খঞ্জন । কবিতা। পৌষ ১৩৪৬।

৬৪. কথা[২২ক]। গান। আষাঢ় ১৩৫২।

৬৫. একক। কবিতা। আষাঢ় ১৩৫২।

'পূর্বমেঘ'। ত্রৈমাসিক। সম্পাদক : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম।

১. একটি প্রেমের কবিতা। কবিতা। ১৩৬৮। ২ : ১।

২ বিষণ্ন মুহূর্তের সুর। কবিতা। ১৩৬৮। ২ : ২।

'রূপায়ণ'। সম্পাদক : আবু সাঈদ চৌধুরী।

১. কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি। কবিতা। শীত ১৩৪৭।

www.pathagar.com

hold the king, Habu Chandra and his Prime Minister, Gabu Chandra, upto ridicule and with that purpose in view, exaggerates them to the extent of making them into caricatures. But these are not mere types in asmuch as they behave, at times, like normal human beings. The dramatist maintains his detachment and lets his poet, who voices his protest against the foolish regime, have his human frailties as well. In the play the playwright has tried to make a fairy tale stand for a modern theme. This is a limitation. And consequently naturalness has suffered. Still, like Michael Dutt's "Buro Shalikcr Ghare Ro" and "Ekai Ki Bale Shabhhota", "Raj Rajra" promises to be a success on the stage.

ঐ প্রবন্ধেই আসকার ইবনে শাইখ ফররুখের "নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাট্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কয়েকটি অংশ :

'I have developed this belief that Bengali Drama should be written in blank verse (Amritakshar Chhanda). But the change should be gradual;' wrote Michael Madhusudan Dutt to his friend Rajnarayan Bose. The models before the poet were the plays of the European dramatists. ....In this context, Farrukh Ahmed's recent play "Naufel O Hatem" written in blank verse can be reckoned as a novel and adventurous undertaking.

....A play should not only resemble reality but also create an illusion, or some hallucination, as Shaw calls it. Dialogue like other requisites of the stage, vij. decorations, acting and arrangement of light, helps create the necessary illusion. Has not the poetic prose style of J. M. Synge been acclaimed in modern times? But the illusion has also its limits. The dramatists has the responsibility of restraing himself within those limits. If in his "Naufel O Hatem" Farrukh has been indicated the way in which this problem could be solved, he has indeed enriched our literature.

The play has undoubted dramatic and poetic qualities. We need not be sceptical about its suitability for the stage, either. But the play

www.pathagar.com

has certain flaws, as well. It does not open satisfactorily and Hatim appearance seems rather too abrupt.

Hatim's feelings, moreover, though humanitarian are not so human. He is more noble than lovable. Compared with him,

Naufel's character appears more natural. Since a good dramatist does not allow his antagonist to outshine the protagonist, this must be considered a flaw in the play. Its technique is also not modern. Had the poetic qualities of the play been complemented by technical excellence, "Naufel O Hatem" would have been a great cration. But still the play may not prove unsuccessful on the stage. What is important about "Naufel O Hatem" is not so much the excellence it has achieved as a drama as the possibilities it seems to open up before us.

ঐ প্রবন্ধের আলোচনাসূত্রে জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা বলেছিলেন :

Mention must be made of an interesting experiment in verse drama called "Naufel O Hatem" by one of our well-known poets, Farrukh Ahmed. Any one who reads it will be struck by its stylised diction far removed from ordinary speech. But we all know that in our times a verse play can succeed only when the dramatist follows the Wordsworthian maxim that the language of poetry should be as close as possible to the language of ordinary conversation. Secondly, the play is so over-written that the dialogue hardly leaves any scope for dramatic action. Thirdly, it has almost all the defects of the didactic plays of which we are so fond.

১৯৫৯ সালে 'পূর্ব পাকিস্তানের সমকালীন সাহিত্যে ঐতিহ্যের ভূমিকা' শীর্ষক একটি ভাষণে* কবীর চৌধুরী বলেন :

আজাদী লাভের অল্পকাল পরেই একদল লেখক সচেতনভাবে আমাদের সাহিত্যকে মুসলিম ঐতিহ্যপুষ্ট ক'রে তুলবার প্রয়াস পান। প্রাথমিকভাবে তাঁরা বিষয়বস্তুর ওপরই গুরুত্ব দিতে থাকেন। তাঁরা ইসলাম, নবী, পীর-দরবেশ,

www.pathagar.com

প্রাচীন কেচ্ছা-কাহিনী এবং মুসলিম জীবনের রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে সাহিত্য সৃষ্টি শুরু করেন। এঁদের পুনরুজ্জীবন-মূলক দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক ভাবধারা এবং গোঁড়ামী আমদানী করে। এটা অবশ্য আকস্মিক বা সম্পূর্ণ নজীরবিহীন নতুন কোন প্রচেষ্টা নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যে এর নজীর পাওয়া যায়। এই পটভূমিতে স্বভাবতঃই ইসমাইল হোসেন শিরাজী এবং কায়কোবাদের নাম এসে পড়ে। এই ঐতিহ্য ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেই – অবশ্য নিঃসন্দেহে ভাষা, রূপকল্প এবং উৎকর্ষতার দিক থেকে নবতর অগ্রগতিতে পরিপুষ্ট হ'য়ে – একটি নতুন গোষ্ঠীর অভ্যুত্থান হ'ল। এই গোষ্ঠীতে রয়েছেন – ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম এবং আরো অনেকে।

একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর ভূমিকা প্রগতিশীল ছিল। আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি প্রদানে, পুরাতন হৃত সংযোগ পুনরুদ্ধারে এবং প্রাচীনের নব মূল্যায়নের এই চেতনা একটি বিশেষ সুস্থতার লক্ষণ। এইটুকু পর্যন্তই আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে এর অবদান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাকীটুকু কূপমণ্ডুকতা এবং অন্ধ গোঁড়ামিতে পর্যবসিত হয়েছে। এই গোষ্ঠীর অত্যুৎসাহী অংশকে যথার্থ সংজ্ঞার অভাবে ইসলামী ঐতিহ্যবাদী বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এঁরা এই সত্যটিকে উপেক্ষা ক'রে গেলেন যে ঐতিহ্য হচ্ছে বেঁচে থাকবার একটি প্রক্রিয়া মাত্র এবং এই প্রক্রিয়া অবশ্যই পরিবর্তনশীল।

['সমকাল', চৈত্র ১৩৬৭]

১৯৬০ সালের ২৪শে এপ্রিল চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সম্মেলনে কবি আবদুর রশীদ খান 'পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্যের ধারা' নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশ :

ফররুখ আহমদ ...বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। তাঁর রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাব লক্ষণীয় নয়, এমনকি সাধারণ অর্থে নজরুল-প্রভাবও নয়। তাঁর মধ্যে জাতীয় চেতনাবোধের সঙ্গে মিলিত হয়েছে ইসলামের প্রবহমান ঐতিহ্যের প্রভাব। তাঁর কাছে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির রূপায়ণ অর্থহীন। যে-সমাজব্যবস্থা জাতীয় চেতনাবোধ থেকে ইসলামের প্রবহমান ঐতিহ্যের ধারাকে বাদ দেবে, মুসলমান অধ্যুষিত পাকিস্তানের জন্য তিনি সে-রকম কোন সমাজব্যবস্থার চিন্তা করতে পারেন না। সুতরাং অন্যরা যে ক্ষেত্রে এই মানসিক পটভূমিতে নজরুলের রচনাশৈলীর প্রতি স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকে পড়লেন, সে-ক্ষেত্রে তিনি একক

www.pathagar.com

ব্যতিক্রম থেকে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হলেন। এই দিক থেকে তরুণদের কাব্য-সাধনায় তাঁর প্রভাব নিতান্ত স্বাভাবিক।

[পূবালী', ভাদ্র ১৩৬৯]

ফররুখ আহমদের "নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাট্য 'মাহে-নও' পত্রিকায় ১৯৫৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। গ্রন্থবদ্ধ হয় জুন ১৯৬১ সালে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগেই ঢাকা রেডিও থেকে সম্প্রচারিত হয়েছিলো অভিনীত হ'য়েই। ১৯৬০ সালে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এই বেতারে-প্রচারিত নাট্য সম্পর্কে লিখেছিলেন :

> ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে ফররুখ আহমদের কাব্যনাটক "নৌফেল ও হাতেমে"র একটি বেতার নাট্যরূপ সম্প্রতি প্রচারিত হয়েছে। নাটকটির পরিবেশনায় হয়তো উল্লেখযোগ্য নতুনত্ব ছিলো না, কিন্তু এর রচনায় যে লক্ষণীয় নতুনত্ব আছে, তা অবশ্যি স্বীকার্য। প্রথমতঃ এটি কাব্যনাটক, সে হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যে প্রায় একক। দ্বিতীয়তঃ, এর কাহিনী পুঁথিসাহিত্য থেকে নেয়া, সেদিক থেকে পরীক্ষামূলক ও আকর্ষণীয়। – এবং বলা বাহুল্য এ দুটি দিকই প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ।
>
> ...ফররুখ আহমদের কাজ পথিকৃতের। অনেক আগাছার ভিড় থেকে সত্যিকার গাছটিকে চিনে নিতে হয় কি করে তা তিনি দেখিয়েছেন। মোহাম্মদ দানেশ রচিত "চাহার দরবেশ" পুঁথির একটি ঘটনার ইশারাকে বিকশিত করে তাকে "নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাটকের চেহারা দিয়েছেন। তার চেয়েও বড় কথা, ঐতিহ্যচেতনা এখানে দায়ভার নয়, নতুন একটি কর্মের মধ্যে তার বিচ্ছিন্ন ধারাগুলো এখানে সন্নিহিত। পুঁথিসাহিত্যের উপাদান নিয়ে নতুন সৃষ্টির বিক্ষিপ্ত প্রয়াস এর আগেও অবশ্যি হয়েছে কিন্তু তাদের কোনটির শৈল্পিক সাফল্যই "নৌফেল ও হাতেমের" সঙ্গে তুলনীয় নয়। এবং পথিকৃৎ তো আমরা তাকেই বলব যা শুধু নতুন নয়, সেই সঙ্গে সফলও।
>
> নতুন কাব্যনাটক ও ঐতিহ্যের নতুন উজ্জীবন – এই দুই অর্থেই তাই "নৌফেল ও হাতেম" স্মরণীয় সৃষ্টি। এবং দুই ক্ষেত্রেই ফররুখ আহমদের এককত্ব যদি কখনো সত্যিকারভাবে challenged হয় তাহলে সেটা আমাদের সাহিত্যের পক্ষে সমৃদ্ধির কারণ হবে – সন্দেহ নেই।

[পূবালী', ফাল্গুন ১৩৬৭]

www.pathagar.com

১৯৬১ সালে ফররুখ আহমদের "নৌফেল ও হাতেম" প্রকাশের পরে 'পূর্বমেঘ' পত্রিকায় অধ্যাপক আবদুল হাফিজ দীর্ঘ আলোচনা করেন। দু-একটি অংশ উদ্ধার করছি :

(ক) "নৌফেল ও হাতেম" ফররুখ আহমদের একটি দুঃসাহসিক কবিকর্ম। তার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত পূর্ব বাংলার সাহিত্যে নাটক রচনার ব্যাপারটি এমনিতেও খানিকটা দুঃসাহসের কাজ। সার্থক নাটক এ পর্যন্ত আমরা পাইনি, যার মধ্যে একাধারে মঞ্চধর্মিতা ও অন্যদিকে সাহিত্যিক উৎকর্ষতার সমাবেশ ঘটেছে।

(খ) ফররুখ আহমদের রাজনৈতিক সচেতনতা যদি আজ তাঁর কাব্যকে ছাড়িয়েও গিয়ে থাকে, তবু বলবো, তাঁর জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। নৌফেল চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে এক হীন মানসিকতার অধিকারী অন্ধ দেশপ্রেমের পূজারী, অপরিচ্ছন্ন রাজনীতির পাটোয়ারী ও মুনাফাখোর বা ব্যবসায়ী রাজনৈতিক কর্মীর মনোভাব।

(গ) ...নতুন রূপকল্পের সন্ধানে তিনি বোধহয় সবচেয়ে সচেতন। "নৌফেল ও হাতেম"-এ তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটা নতুন ভঙ্গী প্রবর্তন করার প্রয়াস পেয়েছেন।

['পূর্বমেঘ']

আবদুল কাদির লিখেছেন :

> ..."নৌফেল ও হাতেম" নাটকে দেখানো হয়েছে : ব্যক্তির খ্যাতির লিপ্সা বনাম মানবিকতার দ্বন্দ্ব। শুধু মনুষ্যপ্রীতি নয়, মনুষ্যত্বপ্রীতিও।

১৯৬৭ সালে মুজীবর রহমান খাঁ 'নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা' নামে "সাত সাগরের মাঝি" কাব্যগ্রন্থের এক দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। (সমালোচনাটি কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত "সাত সাগরের মাঝি"র তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫-এ, গ্রন্থশেষে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিলো)। এই সমালোচনার দুটি অনুচ্ছেদ :

> ফররুখ আহমদের আসল পরিচয় হল, তিনি একজন শিল্পী-কবি। রং ও রূপের বর্ণ এবং তার সাথে গন্ধের আলো, ছায়া এবং মোহের আবিষ্টতা নিয়ে যে-সব খেলার চাতুরী দেখান, তাঁরাই শিল্পী-কবি। তাঁদের কবিতা চিত্রধর্মী এবং তাঁরা আরো-কিছু। ফররুখ আহমদের কবিতা পড়তে পড়তে পাঠক-মন অলক্ষ্যে ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক ও তার পরবর্তী প্রি-র‍্যাফেলাইট (Pre-Raphelite) কবিদের রাজ্যে চলে যায়। রোমান্টিক কবিদের মধ্যে কীটসের

www.pathagar.com

কবিতার রঙ-প্রাচুর্যের তুলনা নাই। প্রি-র‍্যাফেলাইটদের মধ্যে মরিস, সুইনবার্ণ প্রমুখ কবি রং, আলো, সুগন্ধীর জাল বুনে কবিতায় যে ছবি আঁকতেন এবং দেহাভিসারী স্পর্শাতুরতা আনতেন, তার সাথে ফররুখ আহমদের গভীর সাদৃশ্য আছে।

উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও শব্দরীতি নির্মাণেও ফররুখ আহমদ নতুনত্বের সংযোজন করেছেন। 'আকীক-বিছান পথ', 'শিলাদৃঢ় আবলুস', 'দরিয়ার হাম্মাম' প্রভৃতির কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। পুঁথিসাহিত্যের অনুসরণে নয়, পুঁথি-পাঠের দরুন তাঁর মনের সঞ্চয় থেকে যে আলো উপচে পড়ছে, তার রঙে নিয়েই এগুলি ঝলমল করে উঠছে। এগুলি তার চিত্রধর্মী কবিতার রূপসৃষ্টির ব্যাপারে পরিপূরক হিসাবে অনেকখানি কাজ করেছে।

['পাকিস্তানী খবর', ১৯৬৭]

১৯৬৩ সালে অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ 'Pakistan Review' পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায় 'FARRUKH AHMED : The Representative of East Pakistan' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ফররুখকে এখানে তিনি বিচার করেছেন একটি বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত থেকে :

In Farrukh , we find a deviation from the main trend of Benglai literature. He is an exeception to the process of its evolution. Bengali poetry may be said to have its origin in Buddhistic Duha. It then passed on to Vaishnbava Padabali, then on to Mungul kavya, then to the Epic stage. From Epic it passed on to the lyric stage and attained the gigantic development in the hand of Rabibdranath. It now strives to be freed from it. Nazrul Islam has infused it with a heroic respect for humanity. Jasim has enriched it with the idylls of village life. Very recently these have been attempts to enrich it with the traditions of the past, in imitation of T. S. Eliot, by Vishnu De and others. There are clarion calls of the communists for class-struggle as we find it in Subhas Muckerjee and others. But Farrukh has not travelled in that historical line. His poetry has found life and inspiration from the Tawhid preached by Islam. In his poems, thought is much more important than language. His main theme is the necessity of

www.pathagar.com

Tawhid for the salvation of humanity. He is always desirous to bring back and realize that period of history in which once tawid flourished.

The technique that is adopted by him is neither that of an epic not of a lyric. In the strong structure and wide field of epic, he has introduced the sweet tune of lyric and has thereby invented a new style. Though in lofty thought it has similarity with the epic, yet the atomsphere suggested is not light. In thought he is the direct descendent of Jalal-uddin Rumi and Iqbal.

His poetry is not recreationl but recreative. In every poem of his, there is an appeal for the betterment of humanity. But inspite of all these, his verse is not didactic.

এই কাব্যনাটিকার অন্তর্নিহিত আদর্শ। এই মহৎ আদর্শের প্রচারণা কাব্য-সৌন্দর্যের আবহে ও নাটকীয় ঘটনার আবর্তে এমন রসমহিমামণ্ডিত হয়েছে যে, আমাদের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তার স্থান হবে সংশয়াতীত।

['পূবালী', আষাঢ় ১৩৭১]

১৯৬৩ সালে মোহাম্মদ নাসির আলী 'পুঁথিসাহিত্যের নবরূপায়ন : নাটকে' নামে এক আলোচনায় লেখেন :

কবি ফররুখ আহমদ মোহাম্মদ দানেশ-রচিত "চাহার দরবেশ" নামক পুঁথির একটি টুকরো কাহিনীর ছায়া নিয়ে "নৌফেল ও হাতেম" শীর্ষক একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাটক রচনা করেছেন। কাহিনী সংগ্রহের দিক থেকেই নয়, ভাষাবিন্যাসেও ফররুখ আহমদ পুঁথির আশ্রয় নিয়েছেন, পুঁথির শব্দসম্ভারকে ভারী তৎসম শব্দের সঙ্গে সুন্দরভাবে গ্রথিত করে দিয়েছেন। নাটকটির সংলাপ কাব্যে রচিত হলেও, ভাষা ব্যবহারের স্বাভাবিকতায় তা গদ্যের ধার ছুঁয়ে গেছে, ফলে অভিনয়ের সময় তা কাব্যনাটকের চরিত্রবৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে গদ্যনাটকের মতোই নাটকীয় গুণাবলীতে সুন্দর ও সার্থকভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে। "নৌফেল ও হাতেম" ইতিমধ্যেই ঢাকায় রঙ্গমঞ্চে একাধিকবার অভিনীত হয়েছে এবং বেতার মারফতও প্রচারিত হয়েছে।

['পূবালী' , ভাদ্র ১৩৭০]

www.pathagar.com

১৯৬৩ সালে 'আমাদের সাহিত্য : বিভ্রান্ত উৎক্রান্তি' প্রবন্ধে হাসান হাফিজুর রহমান বলেন :

> আমাদের সাহিত্যের সূচনালগ্নেই দুটো বিরাট ঘটনার আলোড়ন-প্রেরণা আমরা পেয়েছি। প্রথমটি হল পাকিস্তান আন্দোলন এবং দ্বিতীয়টি হল ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলন দুটি আমাদের জাতীয় মনে যে অনুভূতিপ্রবণতা ও sensation সৃষ্টি করেছিল তার অবদান কিছু কম নয়। এই আন্দোলন দুটোকে কেন্দ্র ক'রে বিশেষভাবে আমাদের কাব্য ও মননসাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছে। পাকিস্তান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে ফররুখ আহমদ ও তালিম হোসেনের কাব্যসাফল্যের কথা প্রথমেই মনে আসে। কেননা, এঁরা দুজন এই আন্দোলন-চাঞ্চল্যের সঙ্গে ঐতিহ্যবোধের সংযোগ সাধন করতে পেরেছিলেন এবং ফলে তাঁদের কাব্যমূল্যের পরিধি ও আবেদন বেড়ে গেছে স্বাভাবিকভাবেই।
>
> ...ফররুখ আহমদ বিশুদ্ধ ইসলামী ভাবধারা, খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনাদর্শ ও হাতেম তাইয়ের মাহাত্ম্যের মধ্যে নিজের স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ বোধের আশ্রয় খুঁজেছেন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র আন্দোলন নয় — তাঁর ঐতিহ্যচেতনাই একমাত্র অবলম্বন ও উপজীব্য হ'য়ে উঠেছে . . . . এখানে আমার বক্তব্য এই যে, এই দুটো আন্দোলনের তৎপরতা আমাদের সাহিত্যে কোন স্রোতশীল ভূমিকা বজায় রাখতে পারেনি — কিছুটা সৃজনী চাঞ্চল্যের পর এর effect এবং প্রেরণা অনেকাংশেই নিশ্চল হয়ে পড়েছে।
>
> [সমকাল,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০]

১৯৬৪ সালে আবদুল গনি হাজারী 'বন্দী-বিবেক সমাজ ও কবিমানস' নামা প্রবন্ধে বলেন :

> ফররুখ আহমদকে ইলিয়টের সামনে রেখে বিচার করা যায়। Waste Land ও Hollow Man এর দু:স্বপ্নকে "সাত সাগরের মাঝি"তে বারবার চমকে উঠতে দেখি। দেশ ও তার জনজীবনের রোগ ধরা পড়ছে কিংবা রোগের লক্ষণ ধরা পড়ছে এবং তা থেকে যে হতাশা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে তার বিরুদ্ধে আশ্বাস সন্ধানে দুজনেই ধর্মীয় প্রেরণার দিকে, ঐতিহ্যের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। ইলিয়টের "Four Quartret" এ 'and the vest it prayer, observace, discipline, thought and action.' ('The Dry salvage') ফররুখ আহমদের সুরও অবিকল তাই তা আগেই বলেছি। লক্ষণীয় যে দুইজনেই

www.pathagar.com

মানবতাবাদকে, সমাজের জরাকে মানুষের ধর্মীয় নীতিবোধকে উন্মেষের সাহায্যে ব্যবহার করেছেন সার্বিকভাবে। তবে তা ক'রে তাঁরা সত্যি তাঁদের সত্যাশ্রয়ী বিবেককে মুক্তি দিতে পেরেছেন কিনা, সে সম্পর্কে আমি নি:সন্দেহ নই।

ফররুখ আহমদের পর কেউ তাঁর প্রত্যয় নিয়ে এ পথে এগোননি। প্রত্যয়ের অভাব তার একটা বড় কারণ বৈকি। কিন্তু তার চাইতে বড় কারণ হলো বুদ্ধির চৌমাথায় দাঁড়িয়ে কেউ এ পথ নেয়াকে বিচার ও বিবেকসম্মত মনে করেননি।

['সমকাল', কবিতাসংখ্যা, ১৩৭১]

১৯৬৬ সালে 'আমাদের কাব্যসাহিত্যের ধারা'[১০] প্রবন্ধে তালিম হোসেন বলেন :

ফররুখ আহমদ নজরুলোত্তর মুসলিম কাব্যসাধনার ধারায় সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাবান কবি। আমাদের কবিগণের মধ্যে তিনি সবচেয়ে সৃষ্টি-সচেতন এবং সক্রিয়। এই প্রতিভাশালী কবির অনেক কবিতা কালোত্তীর্ণ হওয়ার দাবীদার। ইসলামী রেনেসাঁ ও বিশ্বমুসলিম জাতীয়তা কবিতায় তাঁর বিশেষ অনুধ্যেয় ও উপজীব্য। খণ্ড কবিতা ছাড়াও কাহিনীকাব্য ও নাট্যকাব্য রচনায় কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমানে খণ্ড কবিতা রচনায় তাঁর কিছুটা নিস্পৃহতা লক্ষ্য করা যায়।

['মাহে-নও', আষাঢ় ১৩৭৩]

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত "আধুনিক কবিতা" সংগ্রহের সম্পাদক রফিকুল ইসলাম আমাদের কবিতার একটি ইতিহাসসম্মত পর্যালোচনায় বলেন :

১. নজরুলে যে আবেগ প্রথম বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত এবং যে জাগরণ সাধারণভাবে কাম্য ফররুখ আহমদে তা বিশেষ অর্থে বিশেষ প্রেরণায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিসারী। নজরুল চেয়েছেন নবজাগরণ আর ফররুখ পুনর্জাগরণ।

২ ...ফররুখ আহমদের বিচরণ শুধু সুদূর অতীতে নয়, সৃষ্টির রহস্যলোকেই নয়। কবি আরব্য উপন্যাস আর সাত সাগর থেকে স্বদেশের রূঢ় বাস্তবতায়ও জাগ্রত হন নইলে ফররুখ আহমদ একান্তই উৎকেন্দ্রিক ও অতীতচারী কবি বলে বিবেচিত হতেন।

কবি কৃষ্ণ ধর-এর কলকাতায় 'ইমন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয় 'পূবালী' পত্রিকায়। তার একাংশ :

পূর্ব বাংলা আলাদা হয়ে যাবার পরে এক শ্রেণীর কবি নবলব্ধ স্বাতন্ত্র্যকে ইসলামিক সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের সুযোগ বলে ব্যবহার করেছিলেন। এই

www.pathagar.com

মনোভাবকে আমি নিন্দনীয় মনে করি না। যদি আন্তরিকভাবে এই সচেতনা এসে থাকে তাহলে সমাজমানসের একটি বিশেষ অভিব্যক্তি রূপেই তাকে গ্রহণ করা যেতে-পারে। ফররুখ আহমদ এই ধারার কবি। তিনি আরব সংস্কৃতির মাহাত্ম্য প্রচার করে পূর্ব বাংলার সমাজকে সীমান্তের এপারের সমাজচিন্তা থেকে আলাদা করে দেখাতে চাইলেন।

['পূবালী ', বৈশাখ ১৩৭২]

চার

ফররুখ আহমদের "হাতেম তা'য়ী" প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থ রচিত হয় অনেক আগে। কবির একটি পাণ্ডুলিপিতে তাঁর হস্তাক্ষরে রচনাকাল পাওয়া যাচ্ছে : ১৯৫৩-৫৫। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে বহুবার পরিশোধিত-পরিবর্জিত-পরিবর্ধিত হয়েছিলো। প্রকাশের পরে এই কাব্যগ্রন্থের পক্ষে-বিপক্ষে নানারকম মন্তব্য উচ্চারিত হয়। ফররুখ আহমদ জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে বিতর্কিত কবিপুরুষ হিশেবে থেকেছেন। এই একটি গ্রন্থ আশ্রয় ক'রে আমরা তাঁর বিতর্কিত পরিচয় গ্রহণ করবো।

"হাতেম তা'য়ী সম্পর্কে কবির জীবদ্দশায় আলোচনা বা মন্তব্য করেছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, সৈয়দ আলী আহসান, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবদুস সাত্তার, আনোয়ার পাশা, রশীদ-আল-ফারুকী প্রমুখ।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন :

> "হাতেম তা'য়ী" কবি ফররুখ আহমদের লেখা প্রায় সোয়া তিন শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এক বিরাট মহাকাব্য। এ আখ্যায়িকা-কাব্যটি যখন সাময়িক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই কবি আবদুল কাদির,[১১] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক [১২] প্রমুখ সাহিত্য-সমালোচকগণ একে মহাকাব্য বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আমিও মনে করি, সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে একে মহাকাব্য বলে আখ্যায়িত করলে ভুল তো কিছু করা হবেই না, বরং এতে যথার্থ মূল্যায়নই এর হবে।

['পূবালী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩]

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ লিখেছেন :

> মুসলিম ঐতিহ্যের ছায়া-ঘেরা এই অপূর্ব অবদান কবিকে চিরদিনের জন্য স্মরণীয় করে রাখবে সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যের জন্য এ কাব্য এক অমূল্য সম্পদ। ভাষার আঙ্গিক ও শব্দের কাঠিন্য স্থানে স্থানে গ্রাম-বাংলার সাধারণ

www.pathagar.com

পাঠকের কাছে কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য মনে হলেও বর্ণনার মাধুর্য, বিষয়বস্তুর মনোহারিত্ব এবং ঘটনার বৈচিত্র্য গ্রামের রাত-জাগা পাঠক ও শ্রোতাদের চিত্তকে বিমোহিত করতে সমর্থ হবে বলে বিশ্বাস করি। "শাহনামা", "জঙ্গনামা" ইত্যাদি মহাকাব্যগুলিরও এইরূপ নবরূপায়ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

['পাকিস্তানী খবর', আগস্ট ১৯৬৬]

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ফররুখ-মানসের ক্রমাগ্রগতি বর্ণনা করেন এভাবে :

"সাত সাগরের মাঝি"র কবি-স্বপ্ন "সিরাজাম মুনীরা"তে খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনালোকে নতুন রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্নের মধ্য দিয়েই প্রথম বাস্তবায়নের পথ খুঁজেছে। সে বাস্তবায়নের পথ কবি প্রথম আবিষ্কার করেছেন "নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাট্যে হাতেমের মতো এক 'কামিল ইন্‌সান্', 'মর্দে মোমিনে'র সেবা ও ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের মধ্যে। "হাতেম তা'য়ী"তে কবি সেই আদর্শ-কর্মী, সেবাব্রতী, ত্যাগী ও সত্যসাধক হাতেমের অপরূপ জীবন-গাথা রচনা করে তাঁর মনোগত আদর্শটির কার্যকারিতায় নি:সংশয়িত বিশ্বাসে উপনীত হয়েছেন।

[পৃ. ২২০, "কবি ফররুখ আহমদ", ১৯৬৯]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেছেন :

...রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুসরণে বলা যায় : সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্যের বিলোপ হয়। অর্থাৎ কাব্যের ফর্ম হিসেবে মহাকাব্যের ভূমিকা নি:শেষিত হয়। সাম্প্রতিক কালে তাই মহাকাব্যের চাইতে উৎকৃষ্ট কাব্যের প্রয়োজন বেশী। আমার তাই মনে হয়, "হাতেম তা'য়ী"তে যে-সব উৎকৃষ্ট কাব্যাংশ আছে তার মূল্যই সমধিক।

['মাহে-নও', ১৯৬৬]

আবদুস সাত্তার বলেছেন :

হাতেম তা'য়ীর জীবনপ্রবাহ যেমন গতানুগতিক বা একঘেয়েমীতে পূর্ণ নয় তেমনি ফররুখ আহমদের কাব্যগ্রন্থখানিতেও রয়েছে বৈচিত্র্যের স্বাদ। এই বৈচিত্র্য যে শুধু উপমা নির্বাচন, প্রতীক অঙ্কন, বর্ণনা কৌশল ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ তাই নয়, ছন্দ সৃষ্টিতেও রয়েছে অনুপম বৈচিত্র্যের লক্ষণ। সমগ্র কাব্যগ্রন্থটিতে যেমন রয়েছে সমিল, অমিল মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত প্রভৃতি

www.pathagar.com

কাব্যরীতির পরিপূর্ণ রূপ তেমনি কোথাও কোথাও পরিদৃষ্ট হয় এক একটি সুসংবদ্ধ সনেট।

['সওগাত', শ্রাবণ ১৩৭৩]

এগুলোকে বলা যেতে পারে পক্ষপাতী আলোচনা। একই সময়ে "হাতেম তা'য়ী"র কিছু বিরুদ্ধ আলোচনাও হয়েছিলো। এখন সেগুলি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

"হাতেম তা'য়ী"র একটি দীর্ঘ সমালোচনায় রশীদ আল-ফারুকী লেখেন :

> পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইসলামী বাংলা সাহিত্যের যে ধুয়া উঠেছে তারই ফলশ্রুতি এই কাব্য। তবুও এটিকে 'ইসলামী মূল্যবোধের জাগরণ' বলা চলে কি? হাতেম তায়ী চরিত্রটিকেই ধরা যাক। হাতেম মুসলিম নন। প্রাক-ইসলামী যুগের মানুষ তিনি। তাঁর চরিত্রের যত মহত্ত্ব থাক না কেন তাঁকে কোন অবস্থাতেই ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিনিধি করা চলে না। তবুও লেখক করেছেন।...পুঁথির অনুকরণে তিনি এই কাব্যে তাবৎ অলৌকিক এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলীও স্থাপন করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। এ গেল তাঁর কাহিনীগত ঐতিহ্য — অশিক্ষিত, গ্রাম্য এবং স্থূল রুচির পুঁথিকারদের সক্ষম ও সার্থক অনুকরণ। এই অনুকরণ ভাষাতে স্পষ্ট।...
>
> ..."হাতেম তা'য়ী"কে কোন অবস্থাতেই মহাকাব্য আখ্যা দেওয়া চলে না (জোর করে কেউ দিলে কারো কিছু বলার নেই) — জাতীয় মহাকাব্য তো নয়ই। এটি স্রেফ পুঁথি - মধ্যযুগীয় মিশ্রভাষারীতি-কাব্যের আধুনিক সংস্করণ। গ্রাম্য এবং স্থূল রুচির পুঁথিকারদের কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কাহিনীকে কবি আধুনিক ভাব এবং ভাষায় সমৃদ্ধ করে সে ধারাকেই পুষ্ট করেছেন। এবং এর গুরুত্ব (!) সেখানেই। যুগ-পরিবর্তনের অনিবার্য প্রভাব চিন্তার মননে অনুধাবন ও গ্রহণ করতে না-পারার ফলে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে যে-সব প্রতিভার অপচয় হয়েছিল তাদেরই সুষ্ঠু এবং সুশৃঙ্খল প্রতিধ্বনি শুনতে পাই ফররুখ আহমদের ভেতর।
>
> 'পূর্ণ ইসলামী মূল্যবোধের জাগরণের স্বপ্ন' এবং 'জাতীয় মহাকাব্যে'র প্রসঙ্গ বাদ দিয়েই এই কাব্যের গুরুত্ব।...ফররুখ আহমদের "হাতেম তা'য়ী" — ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত পথ গ্রহণ এবং আধুনিক জীবনবিমুখ কাহিনী নিয়ে মধ্যযুগীয় পুঁথিসাহিত্যের অঙ্গনে পুন:প্রবেশের প্রাণান্তকর প্রয়াস। তবু বলছি

www.pathagar.com

কাব্যটি আমার ভাল লেগেছে। এর ছন্দ, উপমা, ভাব ইত্যাদি প্রয়োগের নতুনত্ব এবং কৌশল দেখে যে কোন আধুনিক মন উল্লাস বোধ করবে।

['সমকাল', মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩]

এই প্রবন্ধটি রশীদ আল-ফারুকীর "রুচি ও প্রগতি" (১৩৭৬) গ্রন্থে গৃহীত হয়। গ্রন্থটির সমালোচনা-প্রসঙ্গে আনোয়ার পাশা যে-মন্তব্য করেন, তাতে তাঁর মতামতও স্পষ্ট বোঝা যায় :

'ঐতিহ্য বিভ্রাট : হাতেম তা'য়ী' প্রবন্ধের জন্য লেখক আমাদের অকুণ্ঠিত প্রশংসার দাবি রাখেন। ফররুখ আহমদের "হাতেম তা'য়ী" প্রকাশিত হলে বলা হয়েছিল - 'পূর্ণ ইসলামী মূল্যবোধের জাগরণের স্বপ্ন এই কাব্য রচনায় প্রেরণার মূল।' (ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : 'মাহে-নও') পণ্ডিত-সমালোচকের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ রয়েছে এ প্রবন্ধের সর্বত্র, এবং অতি সার্থকভাবে। "হাতেম তা'য়ী" সম্পর্কে এই তরুণ প্রবন্ধকারের অতি সুচিন্তিত মত হচ্ছে -ফররুখ আহমদের "হাতেম তা'য়ী" ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত পথ গ্রহণ এবং আধুনিক জীবনবিমুখ কাহিনী নিয়ে মধ্যযুগীয় পুঁথিসাহিত্যের অঙ্গনে পুন:প্রবেশের প্রাণান্তকর প্রয়াস।'

['সমকাল', আশ্বিন ১৩৭৬]

সৈয়দ আলী আহসানের আক্রমণ "হাতেম তা'য়ী"র প্রকরণ প্রসঙ্গে :

...একই ধ্বনি-স্বভাবের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যেমন "সাত সাগরের মাঝি"তে তেমনি "হাতেম তা'য়ী" কাব্যে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ বলে "সাত সাগরের মাঝি"র বাণীভঙ্গী নতুন এবং মধুর ছিলো, কিন্তু "হাতেম তা'য়ী" কাব্যগ্রন্থে একই বাণীভঙ্গী তাৎপর্যহীন পোয়েটিক ডিক্‌শনে পরিণত হয়েছে। শব্দের উপর কবি তার অধিকার প্রমাণ করেননি, শব্দই কবির উপর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। "হাতেম তা'য়ী" কাব্যের বাণীভঙ্গী শব্দের বন্ধন-দশায় কবির আর্তনাদের মতো।

[পৃ. ১০৮, 'পূর্ব পাকিস্তানের কবিতা', "আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে", ১৯৭০]

- "হাতেম তা'য়ী"র পক্ষে ও বিপক্ষে নানাদিক থেকে এইভাবে আলোচনা আবর্তিত হয়েছে।[১৩]

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে একটিমাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো : "কবি ফররুখ আমমদ" (১৯৬৯),রচয়িতা সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। বৃহৎ এই গ্রন্থের সূচিপত্র ছিলো এরকম :

১. আধুনিক বাংলা সাহিত্য : স্বাতন্ত্র্যকামী সাহিত্য-চেতনা ও ফররুখ আহমদ।

২ ফররুখ-প্রতিভার রূপ ও রঙ।

৩. ফররুখ আহমদের সাহিত্য-কর্ম : বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন : (ক) সাত সাগরের মাঝি, (খ) সিরাজুম মুনীরা, (গ) কাব্যনাট্যের নতুন দিগন্ত : (ঘ)

না-হ'তেই প্রকাশিত হয় "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা"। এই সংগ্রহ ফররুখ আহমদকে কয়েক বছরের নৈঃশব্দ্য ও অনালোচনা থেকে আবার ফিরিয়ে আনে রৌদ্রালোকে ; তারপর থেকে ফররুখ আবার আলোচনার একটি কেন্দ্র হ'য়ে ওঠেন। সে আরেক ইতিহাস॥

---

১. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের এই অধিবেশন ১৩৪৬-এর বৈশাখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভাপতি ছিলেন : আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ।

২ আবু রুশদের পরবর্তীকালের ফররুখ সম্পর্কিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য :

(ক) আমার বন্ধু ফররুখ (স্মৃতিকথা) : 'সচিত্র স্বদেশ', ২০ অক্টোবর ১৯৮৩।

(খ) জীবন ক্রমশ (স্মৃতিকথা) : 'উত্তরাধিকার', জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৭।

(গ) ''Four poets from Bangladesh", March 1984.

৩ 'সওগাত' শ্রাবণ ১৩৫৪ সংখ্যায় "আজাদ করো পাকিস্তান" গ্রন্থের বিজ্ঞাপন থেকে উদ্ধৃত হ'লো। সম্ভবত 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'র ১০ই ফাল্গুন ১৩৫২ সংখ্যায় সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিলো।

৪ এই প্রবন্ধটি সৈয়দ আলী আহসান-সম্পাদিত "ইকবালের কবিতা" গ্রন্থের ভূমিকা-রূপে মুদ্রিত হয় পরের বছর, ১৯৫২ সালে। এই গ্রন্থে ফররুখ আহমদ-কৃত ইকবালের বারোটি কবিতার তরজমা স্থান পায়।

৫ কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৪৫ সালে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নামে যে ভাষণ-প্রবন্ধ রচনা করেন, তার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি থেকে একটু আগে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

৬ "দিলরুবা" ফররুখ আহমদের একটি প্রেম-কাব্য। এই কাব্যের সাতটি স্তবক 'দিলরুবা' পত্রিকার সাতটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথম স্তবকটি প্রকাশিত হয়েছিলো পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩৫৬)।

৭ অন্যান্য সাহিত্যের ইতিহাস, সংকলন ও পাঠ্যগ্রন্থসমূহেও ফররুখ আহমদের জীবদ্দশাতেই তাঁর জীবনী ও পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছে। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসানের "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত"-এর (প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৬) সর্বশেষ সংস্করণ (১৩৮৯/১৯৮২, ষষ্ঠ সংস্করণ) থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ (এটি সৈয়দ আলী আহসান রচিত) :

> ফররুখ আহমদ ধর্ম-চেতনাময় বক্তব্যের কারণে খ্যাতি লাভ করলেও, মূলত: উজ্জ্বল রোমান্টিক আবেগের কারণেই তিনি কবি। প্রাথমিক যুগের ইসলাম সর্বমানুষের জন্য জীবনের যে বিশ্বাস নির্মাণ করেছিলো, জয়, ঐশ্বর্য এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগের যে মহিমাময় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলো, এবং নতুন চেতনায় মানুষের চিত্তকে যেভাবে উদ্বেলিত করেছিলো ফররুখ আহমদের কবিতা তার আবেগগত স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪) ছন্দের আনন্দিত ধ্বনি-আবর্তে, তৎসম শব্দের সঙ্গে আরবী-ফারসী শব্দের বিস্ময়কর ধ্বনিসাম্য নির্মাণে এবং সর্বোপরি বর্তমান যুগের ক্ষয় ও অসহিষ্ণুতার মধ্যে সমৃদ্ধবান ইতিহাস-নির্ভরতায় বাংলা কাব্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। "সিরাজাম মুনীরা" (১৯৫২) তুলনামূলকভাবে অনেকটা নিষ্প্রভ এবং সেখানে "সাত সাগরের মাঝি"র শব্দ ও ধ্বনিগত অনুবর্তন অসম্ভব প্রবল। "মুহূর্তের কবিতা" (১৯৬৩) সনেট রচনায় কবির দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করছে। কাহিনীকাব্য "হাতেম তায়ী" (১৯৬৬) একটি দোভাষী পুঁথির পুনর্নির্মাণ। দোভাষী কাহিনীটির রহস্য, রোমান্টিকতা, বিচিত্র ঘটনাবর্ত এবং সর্বমুহূর্তে নায়কের পথ-যাত্রা অনুসরণ, ফররুখ আহমদ পূর্ণভাবে অবলম্বন করেছেন। শুধুমাত্র ছন্দ ও বর্ণনারীতিতে কাব্যটি দোভাষী পুঁথি থেকে ব্যতিক্রম। দীর্ঘ পরিসরের এ কাহিনীকাব্যে ছন্দ ও শব্দ ব্যবহারের একটি সরল প্রবাহ পাঠককে মুগ্ধ করে। কবির অন্যান্য গ্রন্থের নাম "নৌফেল ও হাতেম" (১৯৬১), "পাখীর বাসা" (১৯৬৫), "হরফের ছড়া" (১৯৭০)
>
> পৃ ৪৪৯, "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত"
>
> [এখানে কয়েকটি বইয়ের প্রকাশকালে ভুল ছাপা হয়েছিলো – আমরা যথার্থ প্রকাশকাল বসিয়ে দিয়েছি।]

৮ এই সেমিনারের সমস্ত বিবরণ ১২০ পৃষ্ঠার একটি বৃহদাকার সংকলনগ্রন্থে গ্রথিত হয়। সমস্ত উদ্ধৃতি ঐ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

৯ কবীর চৌধুরীর ভাষণ ইংরেজিতে প্রদত্ত হয়। রণেশ মৈত্র তার অনুবাদ ক'রে 'সমকালে' ছাপেন। 'সমকালে' প্রবন্ধের সঙ্গে এই নোটটি ছাপা হয় :

> Congress for Cultural Freedom-এর পূর্ব পাকিস্তান শাখার উদ্যোগে বিগত ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে রাজসাহীতে অনুষ্ঠিত 'Tradition and change in East Pakistan' বিষয়ক সেমিনারে অধ্যক্ষ কবীর চৌধুরী এই প্রবন্ধটি (ইংরেজিতে লিখিত) পাঠ করেন।

১০ ঢাকা রেডিওতে প্রথম পঠিত।

www.pathagar.com

১১ আবদুল কাদির বলেছেন : 'বাংলা সাহিত্যে ফররুখ আহমদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর "হাতেম তায়ী"।' ['কবি ফররুখ আহমদ স্মরণে', দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৫]

১২ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর "মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য" (১৯৫৭) গ্রন্থে লিখেছেন : "হাতেম তাই" নামক মহাকাব্যের কয়েকটি সর্গে তিনি দোভাষী-বাংলাকে পুনরুজ্জীবন দানের প্রয়াস পাইয়াছেন।'

১৩ ফররুখ আহমদের শিশুসাহিত্য নিয়েও নানারকম আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। আলোচকদের মধ্যে আছেন ডক্টর আনিসুজ্জামান, হাবীবুর রহমান, আতোয়ার রহমান, সরদার ফজলুল করিম, বুলবন ওসমান, কাজী সিরাজ, মোহাম্মদ মতিউর রহমান প্রমুখ। দুএকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি। "পাখীর বাসা" বইটি সম্পর্কে :

১. ছোটদের জন্যে ফররুখ আহমদের কবিতাসংগ্রহ এই প্রথম। প্রথম বইটি তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয় জয় করবে।...চিরত্বের গুণে তাঁর কবিতা গুণান্বিত।...

[ডক্টর আনিসুজ্জামান]

২ ...যে অর্থে ইংলেণ্ডের জোনাথন সুইফট, আমেরিকার ন্যাশ, ডেনমার্কের এণ্ডারসন এবং বাংলার সুকুমার রায়, অবন ঠাকুর বিশিষ্ট, সেই একই অর্থে ফররুখ আহমদও এ আকাশে বিশিষ্ট।

[হাবীবুর রহমান]

www.pathagar.com

বেশি জানা দরকার তা এই যে বলিষ্ঠ রোমান্টিসিজ্‌ম বাস্তবিকই নিন্দার কিছু নয়।

আধুনিক কোন কবির প্রভাব ফররুখ আহমদের উপর যদি থেকে থাকে ত' তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র।

['সওগাত', ভাদ্র ১৩৪৮]

প্রথম সমালোচকের এই সময়োচিত ও সুচিন্তিত মন্তব্য ফররুখ আহমদকে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলো। ১৯৪১ সালে ঐ মন্তব্য করেছিলেন আবু রুশদ। ১৯৪৩-৪৪ সালেই ফররুখের সাত সাগরের মাঝি-কবিতাপর্যায়ে অরুগ্ন, অকুণ্ঠিত, বলিষ্ঠ রোমান্টিসিজ্‌ম প্রকাশিত হয় আতীব্র আবেগে।

১৯৪৩ [১৩৫০] সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে মূল সভাপতির ভাষণে 'নবনূর'-সম্পাদক, প্রবীণ লেখক খান সাহেব সৈয়দ এমদাদ আলী বলেন :

আমাদের নবীন কবিদের মধ্যে ফররুখ আহমদ পথের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার 'নিশানবাহী' এবং 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতা ভবিষ্যতের দিক দিয়া শুভসূচক।

['মুসলিম বঙ্গের সাহিত্য-সাধনা', 'মোহাম্মদী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০]

ঐ বছরই মুজীবর রহমান খাঁ একটি প্রবন্ধে লেখেন :

আমাদের তামদ্দুনিক জাগরণ ও জাতীয় সাহিত্যের দর্শন তাঁদের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে – যাকে নাম দেওয়া হয়েছে, সাহিত্যে পাকিস্তানবাদ। আমাদের ভিতর তমদ্দুন-দীপ্ত রচনাও আসছে। সে-সব রচনায় সুবেহ্ উম্মিদের সোনালী স্বাক্ষর নির্ভুলভাবে ধরা পড়েছে। নজরুল ইসলামের কথা পূর্বেই বলেছি। এঁর পর যাঁদের ভিতর বড় প্রতিশ্রুতি আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাঁদের মধ্যে ফররুখ আহমদ ও আলী আহসানের নাম করতে পারি।

['আমাদের সাহিত্য ও তমদ্দুন', 'মোহাম্মদী', আশ্বিন ১৩৫০]

১৯৪৩ সালে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় ফররুখ আহমদের একটি কবিতা প্রসঙ্গে লেখা হয় :

একে তো আধুনিক কবিতার জ্বালায় আমরা জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া গেলাম, ইহার উপর আবার যদি 'মজলুমে'র নুনের ছিটা এমন নৃশংসভাবে দেওয়া হয়,

www.pathagar.com

তাহা হইলে 'ডেস্টিটিউট' হইয়া মরিয়া যাওয়াই ভালো। এক অমিয় চক্রবর্তীর ঠেলা সামলাইতেই আমাদিগকে হিমসিম খাইতে হইতেছে, আবার ফররুখ আহমদেরা যদি দিল্লগী শুরু করেন, আমরা যাই কোথায়? অগ্রহায়ণের 'মাসিক মোহাম্মদী'র মুখপাতের কবিতা 'মজলুম' যেন সমস্ত মুসলমান সমাজের গভীর আর্তনাদের মতন শুনাইতেছে; তোমরা তো এতদিন মুক্ত ছিলে ভাই, শেষ পর্যন্ত তোমরাও মজিলে?

এই উৎপীড়িত হাড়, বুভুক্ষু জিন্দিগী আর পদপিষ্ট ছিনা
আজ শুধু তোমাদেরে করে যাবে ঘৃণা;
উত্তপ্ত লেলিহ ধোঁয়া বুকে তার উৎপীড়িত
রাত্রি হবে ভোর
সে আগুন জ্বালানোর দুর্বার জেহাদে।

এ অভিশাপ যে আধুনিক কবিতাপীড়িত আমাদেরই উচ্চার্য্য।

[শনিবারের চিঠি', পৌষ ১৩৫০]

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় ফররুখ আহমদের প্রথম কবিতাগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি"। জয়নুল আবেদীন এম. এ. এই বইএর আলোচনায় লেখেন (আংশিক উদ্ধৃতি):

তরুণ কবি ফররুখ আহমদের "সাত সাগরের মাঝি" তাঁর কবিজীবনের প্রথম প্রসূন। শুধু ভাব ও ভাষাতেই যে তা নূতন এমন নয়, দৃষ্টি এবং শিল্প-নৈপুণ্যেও তা নূতনত্বের দাবী জানায়। প্রতিভার সবলতা ও উৎকর্ষের সুস্পষ্ট একটি ছাপ ফুটে উঠেছে কাব্যখানির আগাগোড়ায়।

[মোহাম্মদী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২]

এই বইএর সমালোচনা করতে গিয়ে বসুধা চক্রবর্তী লেখেন (আংশিক উদ্ধৃতি):

বইটির প্রতি কবিতারই রসাবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েচে। কথা উঠেচে আরবি-ফারসি শব্দের অত্যধিক ব্যবহার নিয়ে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবযোজনার জন্যে বোধহয় তার দরকার ছিল। কোন কোন সমালোচক বলেচেন যে, ঐ শব্দগুলির মানে আলাদা লিখে দিলে ভালো হত। তা হয়তো কিছুটা হতো, কিন্তু শুধু আলাদা অর্থ পড়ে ভাবের সম্পূর্ণ অনুষঙ্গ বোঝা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। স্বীকার করতেই হবে যে, সুস্থ সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে বাংলা ভাষায় নতুন এক সমস্যা জেগে উঠচে। ভাষার দ্বিত্বের সম্ভাবনাও

www.pathagar.com

একেবারে অলীক নয়। কিন্তু সে বিচারে বর্তমান কাব্য-প্রসঙ্গকে বিড়ম্বিত করবার প্রয়োজন নেই। বাংলার সুদূরতম পল্লীতেও আজ মুসলমান আত্মোপলব্ধিতে পেতে চাইবে নতুন প্রাণ। তার সঙ্গে বাস্তব সংযোগ যার আছে তার এ খবর জানা আছে। তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার প্রয়োজন প্রতি বাঙ্গালীর, যদিও এ প্রয়োজন এখনও বেশী লোকের উপলব্ধিগত নয়। ফররুখের কাব্যে তার মর্মগত পরিচয় ; এ-কাব্যের আছে গভীর চিত্তোদ্ভূত রস-সমৃদ্ধি।

['সওগাত', বৈশাখ ১৩৫২]

১৯৪৫ সালে কাজী আবদুল ওদুদ পি. ই. এন. আয়োজিত 'অল ইন্ডিয়া রাইটার্স কনফারেন্সে' 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অগ্রণী নায়ক হ'য়েও কাজী আবদুল ওদুদ স্বীকার করেন :

...'বুদ্ধির মুক্তি'র পরিবর্তে বাংলার মুসলমান সমাজ আজ ব্যাপকভাবে নিতে চাচ্ছেন 'আত্মনিয়ন্ত্রণে'র মন্ত্র। 'চাচ্ছেন' মাত্র এই কথাটাই আপাতত এঁদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কেননা নেতৃত্ব ও অনুবর্তিতা কিছুই আজো ব্যাপকভাবে বাংলার মুসলমান সমাজে তেমন সত্য হ'য়ে ওঠেনি। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা অগ্রগণ্য সাহিত্যিক (শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর ও শ্রীমতী লীলা রায়ের গ্রন্থে তাঁদের অনেকের নাম উল্লেখিত হয়েছে) তাঁরা অবশ্য আজো প্রধানত 'বুদ্ধির মুক্তি'-বাদী। তবে মোটের উপর তাঁরা নিঃসঙ্গ সাহিত্যিক। আত্মনিয়ন্ত্রণী দলের সাহিত্যিক ও সাহিত্যোৎসাহীদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য হয়েছেন ফররুখ আহমদ। তিনি ইকবালের অনুবর্তী হতে চেষ্টা করেছেন যদিও ইকবালের দার্শনিক মেজাজ তাঁর নয়। তিনি তরুণ, কোন বিচার-বিশ্লেষণ নয় সুপরিণতিই তাঁর জন্য আজ কাম্য।

["শাশ্বত বঙ্গ", ১৯৫১]

কাজী আবদুল ওদুদ যাঁদের 'আত্মনিয়ন্ত্রণী দল' বলেছেন, চল্লিশের দশকে তাঁরাই প্রধান হ'য়ে ওঠেন – ওদুদ শাহেবও তা স্বীকার করেছেন। এঁদের প্রধানতম সাহিত্যপ্রতিভূ হিশেবে একমাত্র ফররুখ আহমদের উল্লেখ করেন ওদুদ শাহেব। আত্মনিয়ন্ত্রণ শব্দটি তখন সদ্যোজাত, এবং তা ওদুদ শাহেবের উদ্ভাবিত নয়, যুগের হাওয়ায় দান – বস্তুত বাঙালি-মুসলমানের একটি উৎকাঙ্খার নাম। একটিমাত্র সাক্ষ্য উপস্থিত করবো। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে, ১৯৪৩ সালে, সম্পাদক মুহম্মদ হবীবুল্লাহ [বাহার] যে-ভাষণ দিয়েছিলেন, তার শেষ অনুচ্ছেদ :

www.pathagar.com

আজ রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমান আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবী করছে। বাঙ্গলার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব আমরা কিছু কিছু পেয়েছি। কিন্তু এই সময় একথা ভুললে চলবে না যে, রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন নিরর্থক হয়ে যায় সাহিত্যিক বিপ্লব না এলে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সত্যিকারের লাভ হতে পারে না, যদি আমাদের সাহিত্যিক জাগরণ না সম্পূর্ণ হয়। এই জন্যেই রাজনীতির ঘনঘটার ভেতরে যখন যুদ্ধের ঝঞ্ঝা আমাদের দ্বারদেশে, সে সময়ই আমরা ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছি। ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আমাদের কাজ – আমরা কুলিমজুরের কাজ করে যাচ্ছি। আপনারা আমাদের কর্ম্মের ও জ্ঞানসাধনার সহায় হোন। সেদিন দূরে নয় যখন সেনাপতি তাঁর চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে বিজয় অভিযানে অগ্রসর হবেন। আজ তারি পদধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি।

[সাহিত্য সমিতির কথা', 'মোহাম্মদী', আষাঢ় ১৩৫০]

১৯৪৫ সালে আবদুল কাদির ও রেজাউল করীম-সম্পাদিত "কাব্য-মালঞ্চ" প্রকাশিত হয়। পরিমল রায় এই সংগ্রহের নিন্দা করেছিলেন 'কবিতা' পত্রিকায় এজন্যে যে এতে প্রকৃত কবিতা চোখে পড়ছে না, কিন্তু পরিমলবাবুর যা দৃষ্টি এড়িয়েছিলো তা এর ঐতিহাসিক মূল্য। রেজাউল করীম তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্য ও মুসলমান' শীর্ষক ভূমিকায় বলেছিলেন, 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বাঙ্গালী মুসলমানের দানের পরিমাণ নিতান্ত তুচ্ছ নয়।' তারই প্রমাণস্বরূপ শেখ ফয়জুল্লাহ থেকে সৈয়দ আলী আহসান পর্যন্ত একশো পনেরোজন কবির কবিতা এতে সংকলিত হয়েছিলো। বাঙালি-মুসলমানের ধারাবাহিক কবিতাচর্চার প্রথম এই নিদর্শনে তৎকালীন তরুণ কবিদের মধ্যে ফররুখ আহমদেরই সর্বাধিক কবিতা গৃহীত হয়েছিলো : 'শিকার', 'হে নিশানবাহী' ও 'সাত সাগরের মাঝি'। এই বই-এ 'বাঙ্গালা কাব্যের ইতিহাস : মুসলিম সাধনার ধারা' শীর্ষক ভূমিকায় আবদুল কাদির বাঙালি-মুসলমানের ধারাবাহিক কবিতাচর্চার একটি পর্যালোচনা উপস্থিত করেছিলেন। প্রসঙ্গত, ফররুখ আহমদ সম্পর্কে যা বলা হয়েছিলো তার সবটাই উদ্ধৃত করছি :

ইদানীং ফররুখ আহমদ সনেট রচনায় বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'বন্ধন', 'নোঙর', 'প্রতীক্ষা', 'সমাপ্তি', 'বন্দরে সন্ধ্যা', 'কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি' প্রভৃতি সনেটগুলিতে সৌন্দর্য্যবিহার ও বেদনাবোধ অনবদ্য রসমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। তিনি রোমান্টিক কবি, কিন্তু তাঁহার নভোবিহারী কল্পনা ধূলিম্লান পৃথিবীর আকর্ষণ অস্বীকার করে নাই। 'অপঘাত অপমৃত্যু' আছে ; কিন্তু তাহার

www.pathagar.com

মধ্যেই তিনি 'জীবনের স্বপ্নসাধ' মিটাইতে চান। এই আশাবাদী কবি 'মৃত কবরের' মধ্যে লক্ষ্য করেন 'নব জীবনের সাক্ষ্য'। – তাঁহার 'তায়েফের পথে', 'প্রেক্ষণ', 'হে বন্য স্বপ্নেরা' প্রভৃতি কবিতায় বলিষ্ঠ আশাবাদ অপূর্ব রূপমাধুর্য্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

ঐ দেখ শিশু কাঁদে, ঐ দেখ দিশে দিশে মৃত্যুর খবর।
পেষণের মর্ম্মান্তিক কালো চাপ রচিতেছে ওদের কবর।

কিন্তু কিরূপে এই 'মর্ম্মান্তিক পেষণের' অবসান আজ হইবে? তিনি বলিয়াছেন : 'সূর্য্যের লাঙল মাঠে মাঠে সোনার ফসল' ফলাইবে, তাহাতেই 'উচ্ছেদ' হইবে এই 'রজনীর ছাপ' ; অতএব 'দিকে দিকে সেই তীক্ষ্ণ লাঙলের করো অন্বেষণ'। – মহীউদ্দীন বিশ্বজনগণকে আহ্বান করিয়াছেন : 'আমার সূর্য্যের পথে দাঁড়াও, দাঁড়াও।' মহীউদ্দীনের 'সূর্য্য' আজ নতুন আলোর আশ্বাস লইয়া সর্বত্র স্বয়ম্প্রকাশ ; পক্ষান্তরে ফররুখ আহমদের 'দীপ্তফলা সূর্য্যের লাঙল' বহু দিন হইতে নূতন ও প্রয়োজনীয় 'ফসল' ফলাইতেছে না। কিন্তু আজও সেই 'লাঙল' যে অব্যর্থ, এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন 'আশংকা-কুটিল সংশয়' নাই। তাঁহার 'সাত সাগরের মাঝি' দুঃখ-রাত্রির পারে এখনও লক্ষ্য করিতেছে 'হেরার রাজতোরণ।' ইসলামের পয়গম্বরের পথে তিনি যাচ্ঞা করিতেছেন চিত্তের জাগরণ। কিন্তু 'আল্-হেলাল' তাঁহার জন্য আজও কেবল প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক :

বন্ধু, তোমরা এনেছ নূতন গান,
তোমরা এনেছ আল্-হেলালের যৌবন অম্লান।...
তার সুরজালে লুপ্ত চেতনা, সে-নারী সংজ্ঞাহারা,
কেনানের পথে সাথী খোঁজে তার ঝরছে অশ্রুধারা।
কালির আঁচড়ে খুলেছ তোমরা শাহরিয়ারের মন,
প্রেমমুগ্ধ সে শাহেরজাদীর হাতে সঁপে যৌবন।

মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবন, দুঃখজয়ী আশা, এ সমস্তই ইসলামে অস্বীকৃত নয়। কিন্তু মানব-কল্যাণ, সামাজিক ন্যায়বুদ্ধি, আল্লাহ্‌র পথে সমর্পিত-চিত্ততা – এ সমস্ত হইতেছে উহার অন্তর্নিহিত প্রাণবস্তু। ফররুখ আহমদের মনোজগতে ইসলামের এই মহান রূপের প্রতিফলন এখনো তেমন হয় নাই। নজরুলের মতন মাঝে মাঝে তিনি কোরানের রূপক ও প্রতীকসমূহ (Classical allusions and

www.pathagar.com

symbols) ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে ইসলামিক নীতিবোধ অপেক্ষা প্রকৃতি-প্রেম ও সৌন্দর্য্য স্বপ্নের প্রকাশই বেশী সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার মন বাস্তবতাবিমুখ নয়, আবার উপচেতন মনের জটিল গ্রন্থি মোচনেও তাঁহার আগ্রহ অল্প নয়। তাঁহার স্বীকৃতি অসংশয়িত, তাঁহার মন সদাসক্রিয় ; কাজেই তাঁহার কাব্যের ধারা সম্বন্ধে এখনই স্থিরনিশ্চয় হইয়া কিছু বলিতে যাওয়া জবরদস্তিরই পরিচায়ক।

[পৃ. ৪৫, "কাব্য-মালঞ্চ"]

১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয় ফররুখ আহমদের ক্ষুদ্র কাব্য-পুস্তিকা "আজাদ করো পাকিস্তান"। এই পুস্তিকার দুটি রিভিয়্যু উদ্ধৃত করছি :

(এক) পূর্ব পাকিস্তানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী তামুদ্দনিক কবি ফররুখ আহমদের সম্প্রতি প্রকাশিত কবিতা-সংগ্রহ।

প্রত্যেকটি কবিতা সংগ্রামশীল মুসলমানের প্রাণে অমোঘ শক্তির উৎস জাগাবে।

আজকের যুগসন্ধিক্ষণে বাংলার মুসলিম জনসাধারণ জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত – এ সময় মুসলিম সাধারণকে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিধন্য আহ্বানে কবি ফররুখ আহমদ যে বলিষ্ঠ সুর আর ব্যঞ্জনার আয়োজন করেছেন, তাতে আমরা তাঁকে হাজারো মোবারকবাদ জানাই।

[মোহাম্মদী', ১০ই ফাল্গুন ১৩৫২][৩]

(দুই) মুসলিম ভারতের বাঞ্ছিত পাকিস্তান আজও অলব্ধ, আজও তা বন্ধনমুক্ত নয়। কবি ফররুখ আহমদের কণ্ঠ তারই মুক্তি আনবার আহ্বানে মুখর হয়ে উঠেছে। এ বইয়ে রয়েছে তারই পরিচয়। বাহ্যত একে রাজনৈতিক প্রচারবাণী বলে মনে হবে, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের পিছনে মানুষের যে আত্মোদ্বোধনের ব্যাকুলতা কবির মারফৎ তারই প্রকাশ যখন আমরা উপলব্ধি করতে পারব তখন আর এ-কাব্যকে প্রোপাগাণ্ডা মনে হবে না। পাকিস্তানে আছে কবির দূরপ্রসারী প্রয়োজন : বইয়ের শেষ কবিতা তিনটিতে তারই অকুণ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে। জনতার আত্মার উদ্বোধন হোক, তার বুকের তপ্ত আগুনে জালিমের করতলগত এ পৃথিবী জ্বলে পুড়ে যাক। তারই সঙ্গে আসুক কারিগর। পাহাড়ের পাথর ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে ব্যবসাদারে ; কিন্তু সে পাহাড় আমাদের। সে পাহাড় ফের গড়ে তুলতে হবে। শেষ কবিতাটিতে জালিমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মজলুম জানিয়ে দিচ্ছে তাকে তার প্রতি জনতার

www.pathagar.com

অপার ঘৃণা। ঘৃণা ছাড়া সম্বল নেই আমাদের । তাতেই শেষ হবে জালিমের অত্যাচারের – পাকিস্তান বন্ধন-মুক্ত হোক।

[বসুধা চক্রবর্তী : 'মৃত্তিকা', আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৫৩]

কবি-সমালোচক আবদুল কাদিরই প্রথম ফররুখ আহমদের উপরে একক প্রবন্ধ রচনা করেন। লেখাটি কলকাতা বেতারে পঠিত হয় এবং পরে প্রকাশিত হয় 'সওগাত' পত্রিকায়। 'নবীন কবি ফররুখ আহমদ' শীর্ষক প্রবন্ধটির দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এরকম :

> বাঙলার নবীন মুসলমান কবিদের মধ্যে ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস ও সৈয়দ আলী আহসান কালের হিসেবে অতি-আধুনিক। কিন্তু কালের হিসেবেই শুধু নয়, যে-ভঙ্গী অতি-আধুনিক কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার প্রতি এঁদেরও অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল। এই পঞ্চরথীর মধ্যে ফররুখ আহমদ নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। অবশ্য আহসান হাবীবের ভাষা-সৌন্দর্য উৎকৃষ্ট মানস-বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক। ফররুখ আহমদের ভাষা তত বেশী উৎকর্ষমণ্ডিত না হলেও সৌন্দর্য্যবোধ ও ভাব-স্বাতন্ত্র্যে তিনি অগ্রগণ্য।.... সুসাহিত্যিক আবু রুশদ বলেছেন – 'আধুনিক কোন কবির প্রভাব ফররুখ আহমদের উপর যদি থেকে থাকে ত তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র', কিন্তু এ উক্তির সাথে আমি একমত হতে পারছিনে। আমার বরং মনে হয়, ফররুখের উপর যদি কোন আধুনিক কবির প্রভাব থাকে ত তিনি নজরুল ইসলাম। তবে উভয়ের মধ্যকার স্বাতন্ত্র্যও সুস্পষ্ট। ....বলা বাহুল্য যে, এই উভয় কবিই মুসলমানের পুনরুজ্জীবন কামনা করেন, আর উভয়ই রোমান্টিক। তবে নজরুল জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি, আর ফররুখ ধর্মবাদী (পাকিস্তানবাদী?) সমাজতান্ত্রিক।
>
> ['সওগাত', বৈশাখ ১৩৫৪]

তিন

১৯৪৮ সালে ফররুখ আহমদ কলকাতা থেকে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চ'লে আসেন। ১৯৭৪-এ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যসাধনা ঢাকাতেই।

১৯৫১ সালে ফররুখ আহমদ সম্পর্কে দুটি মন্তব্য পাচ্ছি – আহমদ শরীফ ও সৈয়দ আলী আহসানের। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারায় হিন্দু-

www.pathagar.com

প্রভাব' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ দেখিয়েছেন প্রাচীন বাঙালি-মুসলমান লেখকদের রচনাতেও হিন্দু প্রভাব কতো প্রবল ও মারাত্মক। তারপর তিনি লিখছেন :

> আধুনিক যুগেও মুসলমান লেখকের রচনায় হিন্দুয়ানীর অভাব নেই ; তাও একই কারণবশতঃ। মুসলমানরা ধর্মাদর্শে আরব্য আর তমদ্দুন-তাহজীবে আরব্য-পারসিকপ্রবণ। আরবী-ইরাণী ও বাঙালীয়া ভাবের ত্রিধারার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে চিন্তাধারার ত্রিবেণী সংগম করাতে পারেনি বলেই স্বকীয় আদর্শ গড়ে উঠেনি। ফলে তাদের মননশক্তি পঙ্গু এবং সাহিত্যসাধনা ব্যর্থ।
>
> [মোহাম্মদী', পৌষ ১৩৫৮]

অতঃপর লেখক মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, নজরুল ইসলাম ও সৈয়দ আলী আহসানের রচনায় হিন্দু প্রভাব দেখিয়েছেন ; একমাত্র ফররুখ আহমদের মধ্যেই আহমদ শরীফ দেখেছেন খাঁটি ও অনুসরণীয় ইসলামী আদর্শ :

> আমাদের বাংলা ভাষায় স্বকীয় আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে, আদর্শ হবে কোরআনের শিক্ষা, আধার হবে মুসলমানি ঐতিহ্যানুগ আর বিষয়বস্তু হবে ব্যক্তি বা সমাজ অথবা বৃহদর্থে জগত ও জীবন।
>
> এভাবে আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় জীবন গড়ে উঠবে। সাম্প্রতিক সাহিত্যে তরুণ কবি ফররুখ আহমদ একান্তভাবে মুসলিম ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যসাধনা করে পথের দিশারীর গৌরব অর্জন করেছেন।
>
> [মোহাম্মদী', পৌষ ১৩৫৮]

'মোহাম্মদী' পত্রিকাতেই সৈয়দ আলী আহসান লেখেন 'বাংলা সাহিত্য ও ইকবাল' নামে প্রবন্ধ।[৪] ফররুখ আহমদ ও তাঁর নিজের দ্বৈত উন্মেষ সম্পর্কে তিনি যে-মূল্যবান মন্তব্য করেন, তা এই :

> ইকবালের.... বলিষ্ঠ আবেগ তরুণ মুসলমানের মনকে নাড়া দিয়েছিলো প্রচণ্ডভাবে। সাহিত্যক্ষেত্রে এ-আলোড়নের সংবাদ পাই ১৯৪২-৪৩ সাল থেকে। যাদের অনেকটা পরিহাস করে কাজী আবদুল ওদুদ 'আত্মনিয়ন্ত্রণী দল'[৫] বলেছেন, তাদের উদ্ভব এ-সময়েই দুটি সাহিত্যপ্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি এবং পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্যসংসদ মুসলিম সাহিত্য-সাধনার পথ-নির্দেশ দিতে চাইল। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের আগ্রহ ও ঐকান্তিকতাই ছিলো এ-আন্দোলনের সজীবতার উৎস। কাব্যক্ষেত্রে নেমে এলাম ফররুখ আহমদ ও আমি। ইকবালের অনুবর্ত্তী হ'তে চেষ্টা করলেন ফররুখ আহমদ। তাঁর কাছে পরম মূল্যবান হ'লো উন্মেষ-যুগের ইসলাম। আজ হয়তো বিপর্য্যয় এবং পরিবেশের সঙ্গে অসদ্ভাব আছে কিন্তু বিশ্বাস ও

www.pathagar.com

উপলব্ধির পথে প্রথম যাত্রায় উৎসাহ ছিলো অদম্য এবং স্বস্তিও ছিলো প্রগাঢ়। তাই হেরার রাজতোরণই তাঁর লক্ষ্য, যে লক্ষ্যে অগ্রসর হ'তে হ'লে বিশ্বমুসলিম ঐক্যবোধের প্রয়োজন হয়।

[মোহাম্মদী', চৈত্র ১৩৫৮]

১৯৫২ সালের ১৭-১৮-১৯-২০শে অক্টোবর ঢাকার কার্জন হলে তমদ্দুন মজলিশ-কর্তৃক আয়োজিত 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিদেশ থেকেও কয়েকজন প্রতিনিধি এসেছিলেন : সিরিয়ার আহমদ বিন আহমদ, লাহোরের 'তাসনিম' পত্রিকার সম্পাদক নসরুল্লাহ খান আজিজ, পাকিস্তানের মজহারউদ্দীন খান সিদ্দিকী, লন্ডনের ওকিং মসজিদের প্রাক্তন ইমাম আফতাবউদ্দীন প্রমুখ। এই সম্মেলনের সাহিত্যশাখার উদ্বোধন করেছিলেন কবি শাহাদাৎ হোসেন। সম্মেলনে কবি আবদুর রশীদ খান 'পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক কাব্যসাহিত্য' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতে ফররুখ আহমদ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় :

> আল্লামা ইকবাল ও নজরুলের প্রভাবে একদল কবি এগিয়ে এলেন আজাদীপূর্ব দশকে। এঁদের লেখায় ফুটে উঠলো একদিকে নবজাগরণের সুর, অন্যদিকে নিপীড়িত ও নির্যাতিত জনগণের জন্য গভীর দরদ। এঁদের চোখের পাতায় ছিলো আজাদীর স্বপ্ন ছড়ানো। ফররুখ আহমদ, বেনজীর আহমদ, তালিম হোসেন এঁদের মধ্যে অন্যতম। ফররুখ আহমদের মন ও ভাবধারা ইসলামী আদর্শে সম্পূর্ণ সঞ্জীবিত, লক্ষ্য তাঁর 'হেরার রাজতোরণ'। তাঁর "সাত সাগরের মাঝি" বইখানা আমাদের আজাদীর স্বপ্ন ও ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট। 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় পাই আমাদের জাতীয় আদর্শের পথে অগ্রগতি। 'ডাহুক' কবিতায় পাই আমাদের আত্মার নিঃসঙ্গ জেকের। 'লাশ' কবিতায় রয়েছে বাস্তবতার নিষ্ঠুর চিত্র। ব্যক্তিগত দিকের চিত্রণ পাই "দিলরুবা" নামক সনেটপুঞ্জে। তাঁর কবিতায় একাধারে আশাবাদ, বাস্তবতা এবং আদর্শের সার্থক সমন্বয়।

[দ্যুতি', অগ্রহায়ণ ১৩৫৯]

১৯৫৩ সালে ফররুখ আহমদের উপরে দুটি প্রবন্ধ লেখেন শামসুর রাহমান ও [দেওয়ান] মোহাম্মদ আজরফ। দৈনিক 'মিল্লাত'-এর কোনো-এক রবিবাসরীয় সংখ্যায় প্রকাশিত কবি শামসুর রাহমানের প্রবন্ধটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। 'বাংলা কাব্যে কবি ফররুখ আহমদ' শীর্ষক প্রবন্ধে মোহাম্মদ আজরফ ফররুখের "সাত সাগরের মাঝি" ও "সিরাজাম মুনীরা"র বিস্তারিত আলোচনা করেন। ঐ দীর্ঘ প্রবন্ধের দুটি বিচ্ছিন্ন অংশ :

www.pathagar.com

(ক) এ দেশীয় মানব-সমাজের নব জীবনের এ নবীন প্রভাতে কবি ফররুখ আহমদ দেখা দিয়েছেন অগ্রদূতরূপে। জীবনের যে ব্যর্থতায় এতদিন এতগুলো মানুষ গুমরে মরছিল – সে ব্যর্থ জীবনের ব্যর্থতার বেদনা তাঁর লেখনীতে খুঁজে পেয়েছে ভাষা। যে আলোর দিশা পেয়েও তার সঠিক সন্ধান এতদিন তারা করতে পারেনি – তার স্পষ্ট নির্দেশ তারা পাচ্ছে তাঁর কাব্যের রোশনিতে।

['দ্যুতি', ১৯৬০]

(খ) বাঙলা ভাষায় কাব্যের ধারা যে স্রোতে প্রবাহিত যে ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে বাঙলা কাব্য হচ্ছে অগ্রসর – এঁর প্রত্যেক কবিতায়ই দেখা দিয়েছে তার ব্যতিক্রম। বৌদ্ধ দোঁহা, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, মহাকাব্যের স্তর পার হয়ে বাঙলা কাব্য, গীতিকবিতার মধুর রসে অভিষিক্ত হয়ে এখন তা থেকে মুক্তি লাভের জন্যে করেছে সাধনা। নজরুল ইসলাম তার মাঝে সঞ্চার করেছেন মানব প্রতি শ্রদ্ধার ভাবধারা, জসীমউদ্‌দীন তাতে ঢেলেছেন গ্রামজীবনের মাধুরী। সম্প্রতি শ্রেণীবিরোধের রক্তাক্ত সংগ্রামের জন্যে আহ্বান আসছে অতি আধুনিক কবিদের তরফ থেকে।

['দ্যুতি', ১৩৬০]

১৯৫৩ সালে শান্তিনিকেতন সাহিত্যমেলায় 'পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক কবিতা' নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন শামসুর রাহমান। তাতে তিনি বলেন :

> ফররুখ আহমদ সেসব বিরল কবিদের অন্যতম যাঁরা খুব অল্প দিনেই অনুকারকের দল সৃষ্টি করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর অক্ষম অনুকারকদের হাতে বাংলা কবিতা রীতিমতো বিপর্যস্ত হচ্ছে। তাঁদের প্রগলভ রচনা আর যাই হোক কবিতা তো নয়ই এমনকি বাংলাও নয় ; ফররুখ আহমদের সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি" সত্যিকারের সাড়া তুলেছিলো। সর্বপ্রথম হ'লেও "সাত সাগরের মাঝি"ই এখন পর্যন্ত ফররুখ আহমদের সবচেয়ে পরিণত গ্রন্থ। এ বইয়ে এমন কতকগুলো উজ্জ্বল কবিতা রয়েছে যার দীপ্তি ফররুখ আহমদের সাম্প্রতিক কবিতায় অনুপস্থিত। ইদানীং তিনি সে ধরনের কবিতা আর লিখছেন না, লিখলেও প্রকাশ করছেন না। আজকাল তাঁর কলম দিয়ে যা বেরুচ্ছে তাকে কবিতা বলতে অন্তত আমি রাজী নই কোন মতেই। আমার মতে সেগুলো হলো পদ্যে লেখা কাঁচা রাজনীতি।
>
> [পৃ. ৮৬, "আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ"]

www.pathagar.com

'Dilruba' পত্রিকার 1st Quarter 1953 চিহ্নিত সংখ্যায় বেগম নূরুন নাহার ফররুখ আহমদের "দিলরুবা" কাব্যের প্রথম স্তবকের (১–৫) অনুবাদ করেন।[৬] নূরুন নাহার প্রদত্ত ঐ কবিতা-সম্পর্কিত নোটের অংশ :

> the name of Farrukh Ahmed stands foremost among the modern poets of East Pakistan.
>
> ['Dilruba', 1953]

১৯৫৪ সালে ফররুখ সম্পর্কিত মন্তব্য করেছেন আবদুল কাদির, শামসুর রাহমান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ইউসুফ জামাল বেগম প্রমুখ। আবদুল কাদির 'পূর্ব পাকিস্তানের কবিতা' নামে একটি কথিকা পড়েন ঢাকা রেডিওতে – ২৫.১০.৫৪ তারিখে। লেখাটি পরে 'মাহে-নও'এ প্রকাশিত হয়। প্রাসঙ্গিক অংশ :

> ...ফররুখ আহমদ আজো নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে আত্মমগ্ন। তাঁর "সিরাজাম মুনীরা" দেশবিভাগের পর বেরিয়েছে, কিন্তু "সাত সাগরের মাঝি" এবং "আজাদ করো পাকিস্তান"-এর মত এরও কবিতাগুলো প্রাক-পাকিস্তান যুগে রচিত। 'অনুস্বার-বিসর্গ'-এর পর পর তিনি রচনা করেছেন 'নসীহত-নামা' ও 'তসবীর-নামা'। রবীন্দ্রনাথের "কণিকা"র ঢঙে অথচ আলাদা টেকনিকে 'তসবীর-নামা' রচিত। তিনি আঠারো অক্ষরের blank verse-এ 'মুসলমানী বাঙলা' প্রয়োগের এক নূতন পরীক্ষা করেছেন তাঁর "হাতেম তা'য়ী" মহাকাব্যের কয়েকটি সর্গে। দ্বিভাষী পুঁথিতে যে আদর্শ নিহিত রয়েছে, তিনি তার পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতী। ইকবালকে বাঙলায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি সচেষ্ট।
>
> [মাহে-নও', পৌষ ১৩৬১]

১৯৫৪ সালে 'কাফেলা' পত্রিকার কবিতা-সংখ্যায় তৎকালীন কয়েকজন তরুণ কবি তখনকার কবিতার পর্যালোচনা করেন। শামসুর রাহমান 'পূর্ব বাংলায় কবিতার ভবিষ্যত' প্রবন্ধে মন্তব্য করেন :

> ইসলামী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে যেসব কবি বিশ্বাসী ফররুখ আহমদ তাঁদের পুরোধা high priest। ফররুখ আহমদের "সাত সাগরের মাঝি" আমাদের কাব্যসাহিত্যের একটি উজ্জ্বল বই। সর্বপ্রথম হলেও "সাত সাগরের মাঝি"ই এখন পর্যন্ত তাঁর সবচেয়ে পরিণত গ্রন্থ। এ কাব্যগ্রন্থেই তাঁর কাব্যশক্তির সবগুলো লক্ষণ বর্তমান। আরবী-ফারসী শব্দের সুনিপুণ ব্যবহার করে,

www.pathagar.com

পুঁথিসাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি নিজস্ব একটি ডিকসান তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। ভুলতে পারবো না তাঁর 'বন্দরে সন্ধ্যা', 'শিকার', 'ডাহুক' এবং 'বা'র দরিয়ায়', 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' কবিতাগুলো পড়ার নিবিড় অনুভূতি। ফররুখ আহমদ সেসব বিরল কবিদের অন্যতম, যাঁরা খুব অল্প দিনেই অনুকারকের দল সৃষ্টি করেন।

['কাফেলা', কবিতাসংখ্যা, ১৯৫৪]

আবু হেনা মোস্তফা কামাল 'পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক কবিতা প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে বলেন :

ফররুখ আহমদকে দেখি 'হেরার রাজতোরণে'র স্বপ্নে মগ্ন। বৃহত্তর সমাজচেতনায় উদ্ভাসিত কাব্যপরিমণ্ডলে, নতুন ধরনের রূপক ও উপমা সংযোজনে তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। উত্তরাধিকারসূত্রে ইকবালের অনুকরণ তাঁর কাব্যে এসেছে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে। এটা বিস্ময়কর যে দুটি পরস্পরবিরোধী চেতনা ফররুখ আহমদকে দুদিক থেকে অনুপ্রাণিত করেছে। যে উদ্দাম প্রাণশক্তি নজরুল ইসলামের কাব্যে অসংহতিতে বিপথগামী, ফররুখ আহমদের ভিতরে সেই প্রাণশক্তি দানা বেঁধেছে বলিষ্ঠ রোমান্টিকতার আকারে। দিগন্তে সমুদ্রের ব্যাপ্তি, সিন্দাবাদের দুঃসাহসী অভিযাত্রার অনিশ্চয়তা, সব-কিছুই তাঁর কাব্যে ছন্দরূপ লাভ করেছে। ফররুখ আহমদ বৃহত্তর আদর্শের ইঙ্গিতে পরিব্যাপ্ত, উন্মুখর। এই আদর্শবোধের তাগিদে তাঁর কাব্যে এমন একটা বলিষ্ঠতার উপস্থিতি অনুভূত হয়, যা একমাত্র মহাকাব্যের আঙ্গিক গাম্ভীর্যের সঙ্গেই তুলনীয়।

['কাফেলা', কবিতাসংখ্যা, ১৯৫৪]

১৯৫৪ সালে বেগম ইউসুফ জামাল করাচী থেকে একটি অনুবাদসংগ্রহ প্রকাশ করেন "Poems from East Bengal" (Selections from East Bengal Poetry of the last Five hundred years 1389-1954) নামে। এতে ফররুখ আহমদের তিনটি কবিতা গৃহীত হয়। ফররুখ সম্পর্কে ভূমিকায় বলা হয় :

A whole group of poets of merit thus emerged. These poets, known today as the poets of the Thirties, were rather young in years and the most renowned amongst them are Farrukh Ahmed, the poet of 'Shat Shagarer Manjhi'.

[Preface, Poems from East Bengal, 1954]

www.pathagar.com

১৯৫৭ সালে 'আজ' সাপ্তাহিকপত্রের আজাদী-সংখ্যায় সৈয়দ আবদুল মান্নান 'রেনেসাঁ আন্দোলন ও পুঁথিসাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন :

> মুসলমানের নিজস্ব জবানে রচিত চলতি ভাষার পুঁথির দিকে শুরু থেকেই সোসাইটির সদস্যদের নজর ছিলো। চলতি ভাষার পুঁথি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, মুফাখখারুল ইসলাম প্রমুখ তরুণ কবিগণ নতুন কাব্য রচনার প্রয়াস পান। ১৯৪৩-৪৪ সনের মধ্যেই ফররুখ আহমদ 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিন্দবাদ', 'বা'র দরিয়ায়', 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি', 'শাহরিয়ার' ও 'পাঞ্জেরী' শীর্ষক কবিতা রচনা করেন। এসব কবিতায় পুঁথির উপাদান সুস্পষ্ট। এর সবগুলি কবিতাই কবির "সাত সাগরের মাঝি" নামক কবিতাসংগ্রহে সন্নিবেশিত হয়েছে। এর পর তিনি পুঁথির উপাদান নিয়ে 'শহীদে কারবালা', 'এজিদের ছুরি' প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন।
>
> ['আজ', ১৪ আগস্ট ১৯৫৭]

১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের "মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য"।[৭] এই গ্রন্থে ফররুখ আহমদ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> ইনি কাব্যক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা চালাইয়া চলিয়াছেন। দোভাষী-পুঁথির আদর্শ তাঁহার কাব্য-সাধনার মধ্যে অন্যতম। তিনি এই আদর্শের পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতী। "হাতেম তা'য়ী" নামক মহাকাব্যের কয়েকটি সর্গে তিনি দোভাষী-বাংলাকে পুনরুজ্জীবন দানের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার "সাত সাগরের মাঝি" ও "আজাদ করো পাকিস্তান" প্রাকপাকিস্তান যুগে তাঁহাকে কবি হিসাবে পরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। পাকিস্তানোত্তর কালে প্রকাশিত "সিরাজাম মুনীরা", "নসীহত-নামা", "তসবীর-নামা" প্রভৃতি কাব্যে তিনি নূতন নূতন কাব্য-কৌশল দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

১৯৫৮ সালে 'মোহাম্মদী' পত্রিকার সাহিত্য-সম্মেলন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় গোলাম মোস্তফার 'পাক-বাংলার কাব্য-সাহিত্য' নামক প্রবন্ধ। প্রবন্ধে গোলাম মোস্তফা বলেন :

> যে-সব কবি পাকিস্তানের সঙ্গে এপারে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে পাকিস্তানবাদের দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে ফররুখ আহমদ ও তালিম হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। জাতির প্রতি এবং ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি ফররুখের ঐকান্তিক দরদ এবং অনুরাগ লক্ষনীয়। তাঁর "সাত সাগরের মাঝি" ও "সিরাজাম মুনীরা"তে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর আছে।
>
> ['মোহাম্মদী', আষাঢ় ১৩৬৫]

www.pathagar.com

১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে সাহিত্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।[৮] তাঁর শিরোনাম ছিলো 'Dacca University Seminars on Contemporary Writing in East Pakistan'. ১৯৫৮-র ২১ ও ২২শে জুন কবিতা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের উদ্যোগে এদেশের সমকালীন সাহিত্য বিষয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ ও আলোচনা খান সারওয়ার মুরশিদ-সম্পাদিত "Contemporary Writing in East Pakistan" (Second Impression, 1960) নামে একটি পুস্তিকায় সংগ্রথিত। এই সেমিনারে প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন : আবু রুশদ মতিনউদ্দীন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, নুরুল মোমেন, রশীদ করীম, আবুল হোসেন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, খান সারওয়ার মুরশিদ, হাসান জামান, মুনীর চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, কবীর চৌধুরী ও সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী তাঁর কবিতা বিষয়ক মূল প্রবন্ধে ফররুখ আহমদের কবিতার প্রসঙ্গ তুলেই শুরু করেছিলেন। তাঁর ফররুখ-প্রাসঙ্গিক দুটি অনুচ্ছেদ :

> Prominent among the first group is Farrukh Ahmed, and one of the most prolific too. His poetry is of utmost significance, because for nearly two decades he, perhaps more than any other poet, has sought to restore the contact between individual sensibility and traditional culture. He has sought the sources of tradition in two directions : one, Islam, its Prophet and saints, and two, the myths and romances which have a Muslim setting. "Sirajam Munira" is the result of the first expedition, "Shat Sagarer Majhi", the result of the second, and, as is to be expected, the myths and romances prove to be the better field for poetic treatment than history. Though the poems of the two volumes belong to the same period, the myth-poems show better workmanship than the poems of faith and homage. One reason why this is so may be that the "Sirajam Munira" poems belong to the same family of poetry to which belong Satyen Datta's poems on Gandhiji and Jesus Christ and Nazrul Islam's poems on C.R. Das and Khalid. These poems keep

www.pathagar.com

a middle flight, are long and loud, energetic and hortatory. In his other volume Farrukh was writing so nobody else before him had written. Here we have the essence of pure romanticism, with the notable exception of the poem named 'Lash'. Poetry in this volume is highly sensuous and evocative. One can possibly say that the later sonnets (including "Dilruba") have descended from this volume, while the satires and poems of social passion descend from "Sirajam Munira". The shadowy sailors of the myth-poems ply their ships in shadowy waters, They talk about Baghdad, symbolising settled and slothful life. Life on the high seas is full of toils and rewards as the merchandize. They carry is rich beyond description.

Farrukh has great command over verbal music, and one can always expect a memorable line, and the ability to write such lines is one of the signs of a true poet. But his pelicity with words occasionally proves to be a doubtful gift. When for example, the primary requirement is precision and exactness of expression, he easily achieves musicality without attaining the other, and more important, objective. This can be felt particularly in "Dilruba", a sonnet sequence where a faint outline of a theme of personal emotion is suggested. But nothing can be personal without being particular and in these sonnets a certain vagueness and generality of emotion blurs the picture. The intimacy of tone one expects in love poetry is lost in a somewhat full-throated rhetoric. Taken as a whole the "Dilruba" sonnets must be reckoned a failure through always rich in verbal music and occasionally in striking images.

এই প্রবন্ধের আলোচনা করেছিলেন কথাশিল্পী আলাউদ্দিন আল আজাদ। তিনি প্রসঙ্গত বলেছিলেন :

Our contemporary poets, can, I feel, be divided into three groups : (a) the Revivalists (b) The Impressionists and (c) The Neo-existentialists.

www.pathagar.com

The first group belive in making their poetry fit with the ideology of the state. They are, at once, idealists and romantics in as much as they aspire to enliven the present by resuscitating the glories of the past. Mr. Siddiqui was right in considering Farrukh Ahmed the most prominent among them. Farrukh is prominent because he has deep religious feelings and is very prolific too. Farrukh Ahmed's individuality lies in the fact that his emotions are centred in his conception of the ideal State and the ideal way of life. His "Sat Sagarer Majhi" which was published just before the establishment of Pakistan, is marked by romanticism; "Sirajam Munira" is full of religious and moral principles.

A feeling of frustration born of the growing suspicion that his ideals are unrealisible has forced Farrukh Ahmed to take to the writing of satire latterly. "Nasihatnama" and "Tasbirnama" are cases in point.

সংকলনে ফররুখ-প্রসঙ্গ আরো কয়েকবার এসেছে। ব্যঙ্গরচনা প্রসঙ্গে নূরুল মোমেন লিখেছেন :

Farrukh Ahmed's satires are direct, vigorous and aggressive. As a satirist he writes under the pen-name of Hayat Daraj Khan Pakistani.

রশীদ করীম এই প্রবন্ধের আলোচনায় যোগ করেন :

Farrukh Ahmed also has written some satires characterised by skilful workmanship.

নাট্যপ্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছিলেন আসকার ইবনে শাইখ। তাতে ফররুখ-প্রসঙ্গে বলা হয় :

Munier Chowdhury and Farrukh Ahmed have shown their skill in writing satirical plays. Farrukh's "Raj Rajra" has the qualities and deficiencies of Ben Jonson's "Every man in His Humour". The poet in "Raj Rajra" is almost a prototype of the sonneteer Samuel Daniel in "Every man In His Humour". Farrukh Ahmed wants to

www.pathagar.com

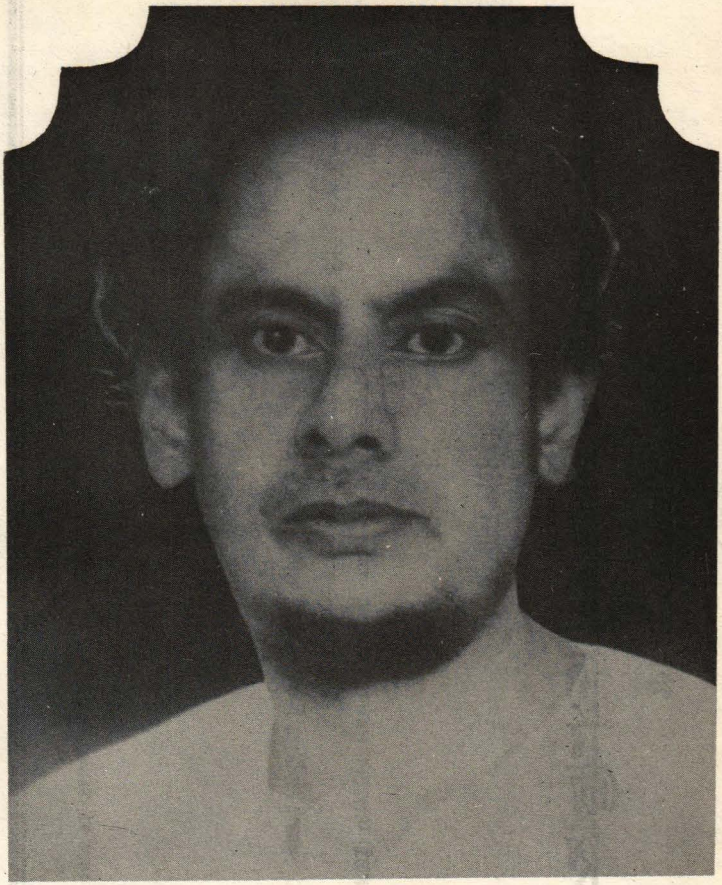

যৌবনে ফররুখ

www.pathagar.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার

সম্মান পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মরহুম কবি ফররুখ আহম্মদ কে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর গৌরবময় অবদান ও কীর্তির স্বীকৃতি-স্বরূপ ১৯৮০ সালের স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

২৬শে মার্চ, ১৯৮৬

রাষ্ট্রপতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রেডিওতে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে পুঁথি পাঠ করছেন — ১৯৬৮ সালের দিকে। রেডিওতে নিয়মিত পুঁথি পাঠ করতেন না তিনি — তবে বিভিন্ন সাহিত্য-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন, নিজস্ব কবিতা আবৃত্তি করতেন।

www.pathagar.com

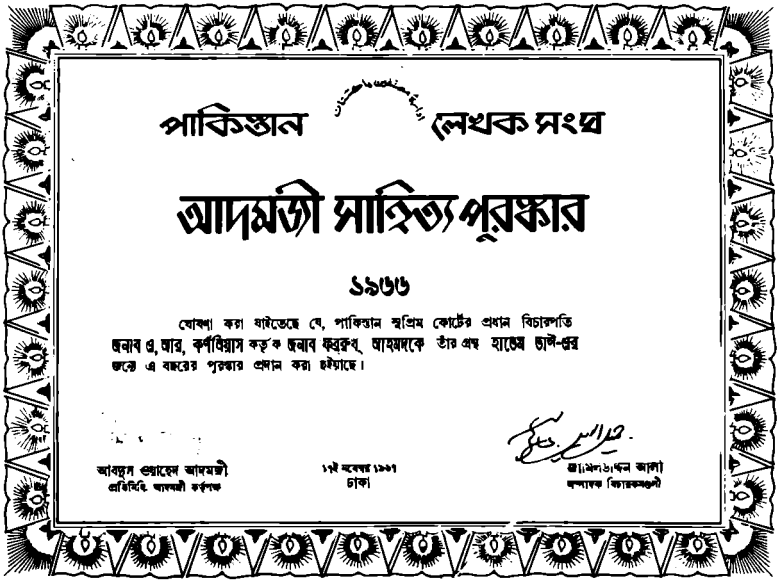

পাকিস্তান লেখক সংঘ

আদমজী সাহিত্য পুরস্কার

১৯৬৬

ঘোষণা করা যাইতেছে যে, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব এ, আর, কর্ণেলিয়াস কর্তৃক জনাব ফররুখ আহমদকে তাঁর গ্রন্থ হাতেম তাই-এর জন্যে এ বছরের পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে।

আবদুস ওয়াহেদ আদমজী
প্রতিনিধি আদমজী কর্তৃপক্ষ

১৭ই নবেম্বর ১৯৬৭
ঢাকা

জহীরুদ্দীন আলী
সম্পাদক বিচারমণ্ডলী

আদমজী সাহিত্য পুরস্কার ১৯৬৬।

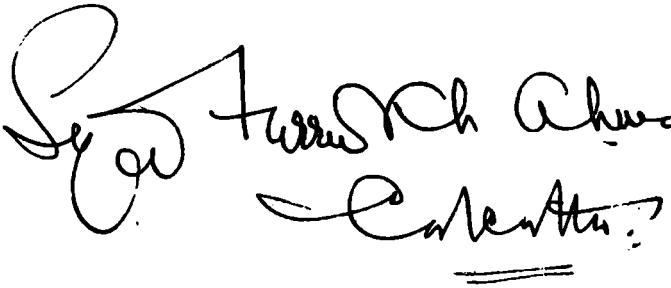

ইংরেজি স্বাক্ষর

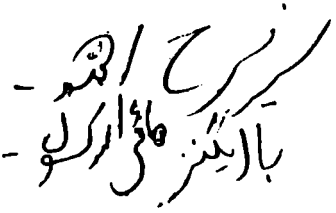

ফারসি স্বাক্ষর

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পুরস্কার ১৪০৩ হিজরী

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামের সেবায় সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ

ফররুখ আহমদ কে ১৪০৩ হিজরী সনের ইসলামিক-

ফাউণ্ডেশন পুরস্কার প্রদত্ত হইল।

ঢাকা
২০ ডিসেম্বর, ১৯৮৪

মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

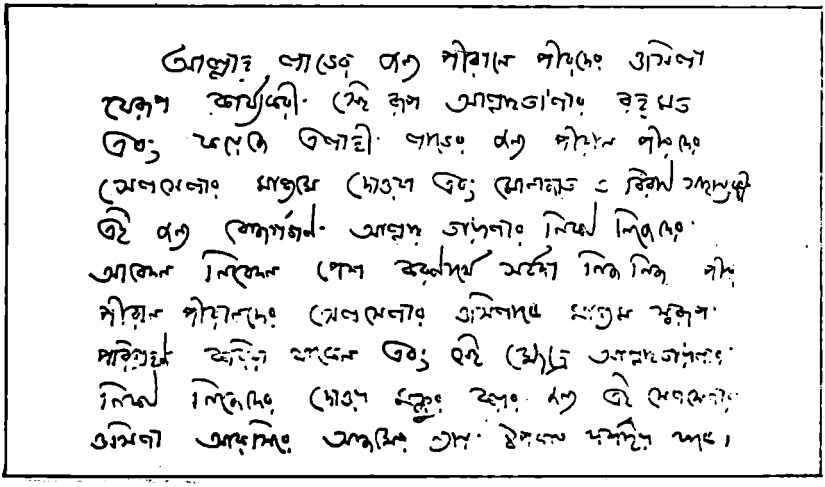

অধ্যাত্ম চর্চার নিদর্শন। কবিতাচর্চার সূচনাকালেই ফররুখের আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ঘটে। এ ক্ষেত্রে তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন মওলানা আবদুল খালেক — যাঁকে কবি তাঁর "সিরাজাম মুনীরা" (১৯৫২) কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেন। 'তাঁর [ফররুখ আহমদের] পীর ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দেদে হাসান হযরত মওলানা শাহ সুফী আবুবকর সিদ্দিকী (রহ.) এর খলিফা হযরত মওলানা শাহ সুফী প্রফেসার আবদুল খালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি। এই পীরের কাছ থেকে তিনি নকশবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া তরিকার বিভিন্ন সবক গ্রহণ করেন। একে একে তিনি সব ক'টি মকাম উত্তীর্ণ হন।'

www.pathagar.com

ষাটের দশকের শুরুতে স্ক্রিপ্ট রচনা-নিরত ফররুখ আহমদ। ঢাকা বেতার-কেন্দ্রের শিক্ষা-বিষয়ক কার্যসূচীর পরিচালক ছিলেন। প্রত্যেক শুক্রবারের কিশোর-মজলিশ পরিচালনা করতেন কবি। সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক অজস্র কথিকা-গীতিকা ইত্যাদি রচনা করেছেন।

www.pathagar.com

hold the king, Habu Chandra and his Prime Minister, Gabu Chandra, upto ridicule and with that purpose in view, exaggerates them to the extent of making them into caricatures. But these are not mere types in asmuch as they behave, at times, like normal human beings. The dramatist maintains his detachment and lets his poet, who voices his protest against the foolish regime, have his human frailties as well. In the play the playwright has tried to make a fairy tale stand for a modern theme. This is a limitation. And consequently naturalness has suffered. Still, like Michael Dutt's "Buro Shalikcr Ghare Ro" and "Ekai Ki Bale Shabhhota", "Raj Rajra" promises to be a success on the stage.

ঐ প্রবন্ধেই আসকার ইবনে শাইখ ফররুখের "নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাট্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কয়েকটি অংশ :

'I have developed this belief that Bengali Drama should be written in blank verse (Amritakshar Chhanda). But the change should be gradual;' wrote Michael Madhusudan Dutt to his friend Rajnarayan Bose. The models before the poet were the plays of the European dramatists. ....In this context, Farrukh Ahmed's recent play "Naufel O Hatem" written in blank verse can be reckoned as a novel and adventurous undertaking.

....A play should not only resemble reality but also create an illusion, or some hallucination, as Shaw calls it. Dialogue like other requisites of the stage, vij. decorations, acting and arrangement of light, helps create the necessary illusion. Has not the poetic prose style of J. M. Synge been acclaimed in modern times? But the illusion has also its limits. The dramatists has the responsibility of restraing himself within those limits. If in his "Naufel O Hatem" Farrukh has been indicated the way in which this problem could be solved, he has indeed enriched our literature.

The play has undoubted dramatic and poetic qualities. We need not be sceptical about its suitability for the stage, either. But the play

www.pathagar.com

has certain flaws, as well. It does not open satisfactorily and Hatim appearance seems rather too abrupt.

Hatim's feelings, moreover, though humanitarian are not so human. He is more noble than lovable. Compared with him,

Naufel's character appears more natural. Since a good dramatist does not allow his antagonist to outshine the protagonist, this must be considered a flaw in the play. Its technique is also not modern. Had the poetic qualities of the play been complemented by technical excellence, "Naufel O Hatem" would have been a great cration. But still the play may not prove unsuccessful on the stage. What is important about "Naufel O Hatem" is not so much the excellence it has achieved as a drama as the possibilities it seems to open up before us.

ঐ প্রবন্ধের আলোচনাসূত্রে জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা বলেছিলেন :

Mention must be made of an interesting experiment in verse drama called "Naufel O Hatem" by one of our well-known poets, Farrukh Ahmed. Any one who reads it will be struck by its stylised diction far removed from ordinary speech. But we all know that in our times a verse play can succeed only when the dramatist follows the Wordsworthian maxim that the language of poetry should be as close as possible to the language of ordinary conversation. Secondly, the play is so over-written that the dialogue hardly leaves any scope for dramatic action. Thirdly, it has almost all the defects of the didactic plays of which we are so fond.

১৯৫৯ সালে 'পূর্ব পাকিস্তানের সমকালীন সাহিত্যে ঐতিহ্যের ভূমিকা' শীর্ষক একটি ভাষণে কবীর চৌধুরী বলেন :

আজাদী লাভের অল্পকাল পরেই একদল লেখক সচেতনভাবে আমাদের সাহিত্যকে মুসলিম ঐতিহ্যপুষ্ট ক'রে তুলবার প্রয়াস পান। প্রাথমিকভাবে তাঁরা বিষয়বস্তুর ওপরই গুরুত্ব দিতে থাকেন। তাঁরা ইসলাম, নবী, পীর-দরবেশ,

www.pathagar.com

প্রাচীন কেচ্ছা-কাহিনী এবং মুসলিম জীবনের রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে সাহিত্য সৃষ্টি শুরু করেন। এঁদের পুনরুজ্জীবন-মূলক দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক ভাবধারা এবং গোঁড়ামী আমদানী করে। এটা অবশ্য আকস্মিক বা সম্পূর্ণ নজীরবিহীন নতুন কোন প্রচেষ্টা নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যে এর নজীর পাওয়া যায়। এই পটভূমিতে স্বভাবতঃই ইসমাইল হোসেন শিরাজী এবং কায়কোবাদের নাম এসে পড়ে। এই ঐতিহ্য ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেই – অবশ্য নিঃসন্দেহে ভাষা, রূপকল্প এবং উৎকর্ষতার দিক থেকে নবতর অগ্রগতিতে পরিপুষ্ট হ'য়ে – একটি নতুন গোষ্ঠীর অভ্যুত্থান হ'ল। এই গোষ্ঠীতে রয়েছেন – ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম এবং আরো অনেকে।

একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর ভূমিকা প্রগতিশীল ছিল। আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি প্রদানে, পুরাতন হৃত সংযোগ পুনরুদ্ধারে এবং প্রাচীনের নব মূল্যায়নের এই চেতনা একটি বিশেষ সুস্থতার লক্ষণ। এইটুকু পর্যন্তই আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে এর অবদান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাকীটুকু কূপমণ্ডুকতা এবং অন্ধ গোঁড়ামিতে পর্যবসিত হয়েছে। এই গোষ্ঠীর অত্যুৎসাহী অংশকে যথার্থ সংজ্ঞার অভাবে ইসলামী ঐতিহ্যবাদী বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এঁরা এই সত্যটিকে উপেক্ষা ক'রে গেলেন যে ঐতিহ্য হচ্ছে বেঁচে থাকবার একটি প্রক্রিয়া মাত্র এবং এই প্রক্রিয়া অবশ্যই পরিবর্তনশীল।

[সমকাল', চৈত্র ১৩৬৭]

১৯৬০ সালের ২৪শে এপ্রিল চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সম্মেলনে কবি আবদুর রশীদ খান 'পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্যের ধারা' নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশ :

ফররুখ আহমদ ...বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। তাঁর রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাব লক্ষণীয় নয়, এমনকি সাধারণ অর্থে নজরুল-প্রভাবও নয়। তাঁর মধ্যে জাতীয় চেতনাবোধের সঙ্গে মিলিত হয়েছে ইসলামের প্রবহমান ঐতিহ্যের প্রভাব। তাঁর কাছে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির রূপায়ণ অর্থহীন। যে-সমাজব্যবস্থা জাতীয় চেতনাবোধ থেকে ইসলামের প্রবহমান ঐতিহ্যের ধারাকে বাদ দেবে, মুসলমান অধ্যুষিত পাকিস্তানের জন্য তিনি সে-রকম কোন সমাজব্যবস্থার চিন্তা করতে পারেন না। সুতরাং অন্যরা যে ক্ষেত্রে এই মানসিক পটভূমিতে নজরুলের রচনাশৈলীর প্রতি স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকে পড়লেন, সে-ক্ষেত্রে তিনি একক

www.pathagar.com

ব্যতিক্রম থেকে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হলেন। এই দিক থেকে তরুণদের কাব্য-সাধনায় তাঁর প্রভাব নিতান্ত স্বাভাবিক।

['পূবালী', ভাদ্র ১৩৬৯]

ফররুখ আহমদের "নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাট্য 'মাহে-নও' পত্রিকায় ১৯৫৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। গ্রন্থবদ্ধ হয় জুন ১৯৬১ সালে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগেই ঢাকা রেডিও থেকে সম্প্রচারিত হয়েছিলো অভিনীত হ'য়েই। ১৯৬০ সালে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এই বেতারে-প্রচারিত নাট্য সম্পর্কে লিখেছিলেন :

> ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে ফররুখ আহমদের কাব্যনাটক "নৌফেল ও হাতেমে"র একটি বেতার নাট্যরূপ সম্প্রতি প্রচারিত হয়েছে। নাটকটির পরিবেশনায় হয়তো উল্লেখযোগ্য নতুনত্ব ছিলো না, কিন্তু এর রচনায় যে লক্ষণীয় নতুনত্ব আছে, তা অবশ্যি স্বীকার্য। প্রথমতঃ এটি কাব্যনাটক, সে হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যে প্রায় একক। দ্বিতীয়তঃ, এর কাহিনী পুঁথিসাহিত্য থেকে নেয়া, সেদিক থেকে পরীক্ষামূলক ও আকর্ষণীয়। – এবং বলা বাহুল্য এ দুটি দিকই প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ।
>
> ...ফররুখ আহমদের কাজ পথিকৃতের। অনেক আগাছার ভিড় থেকে সত্যিকার গাছটিকে চিনে নিতে হয় কি করে তা তিনি দেখিয়েছেন। মোহাম্মদ দানেশ রচিত "চাহার দরবেশ" পুঁথির একটি ঘটনার ইশারাকে বিকশিত করে তাকে "নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাটকের চেহারা দিয়েছেন। তার চেয়েও বড় কথা, ঐতিহ্যচেতনা এখানে দায়ভার নয়, নতুন একটি কর্মের মধ্যে তার বিচ্ছিন্ন ধারাগুলো এখানে সন্নিহিত। পুঁথিসাহিত্যের উপাদান নিয়ে নতুন সৃষ্টির বিক্ষিপ্ত প্রয়াস এর আগেও অবশ্যি হয়েছে কিন্তু তাদের কোনটির শৈল্পিক সাফল্যই "নৌফেল ও হাতেমের" সঙ্গে তুলনীয় নয়। এবং পথিকৃৎ তো আমরা তাকেই বলব যা শুধু নতুন নয়, সেই সঙ্গে সফলও।
>
> নতুন কাব্যনাটক ও ঐতিহ্যের নতুন উজ্জীবন – এই দুই অর্থেই তাই "নৌফেল ও হাতেম" স্মরণীয় সৃষ্টি। এবং দুই ক্ষেত্রেই ফররুখ আহমদের এককত্ব যদি কখনো সত্যিকারভাবে challenged হয় তাহলে সেটা আমাদের সাহিত্যের পক্ষে সমৃদ্ধির কারণ হবে – সন্দেহ নেই।

['পূবালী', ফাল্গুন ১৩৬৭]

www.pathagar.com

১৯৬১ সালে ফররুখ আহমদের "নৌফেল ও হাতেম" প্রকাশের পরে 'পূর্বমেঘ' পত্রিকায় অধ্যাপক আবদুল হাফিজ দীর্ঘ আলোচনা করেন। দু-একটি অংশ উদ্ধার করছি :

(ক) "নৌফেল ও হাতেম" ফররুখ আহমদের একটি দুঃসাহসিক কবিকর্ম। তার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত পূর্ব বাংলার সাহিত্যে নাটক রচনার ব্যাপারটি এমনিতেও খানিকটা দুঃসাহসের কাজ। সার্থক নাটক এ পর্যন্ত আমরা পাইনি, যার মধ্যে একাধারে মঞ্চধর্মিতা ও অন্যদিকে সাহিত্যিক উৎকর্ষতার সমাবেশ ঘটেছে।

(খ) ফররুখ আহমদের রাজনৈতিক সচেতনতা যদি আজ তাঁর কাব্যকে ছাড়িয়েও গিয়ে থাকে, তবু বলবো, তাঁর জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। নৌফেল চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে এক হীন মানসিকতার অধিকারী অন্ধ দেশপ্রেমের পূজারী, অপরিচ্ছন্ন রাজনীতির পাটোয়ারী ও মুনাফাখোর বা ব্যবসায়ী রাজনৈতিক কর্মীর মনোভাব।

(গ) ...নতুন রূপকল্পের সন্ধানে তিনি বোধহয় সবচেয়ে সচেতন। "নৌফেল ও হাতেম"-এ তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটা নতুন ভঙ্গী প্রবর্তন করার প্রয়াস পেয়েছেন।

['পূর্বমেঘ']

আবদুল কাদির লিখেছেন :

> ..."নৌফেল ও হাতেম" নাটকে দেখানো হয়েছে : ব্যক্তির খ্যাতির লিপ্সা বনাম মানবিকতার দ্বন্দ্ব। শুধু মনুষ্যপ্রীতি নয়, মনুষ্যত্বপ্রীতিও।

১৯৬৭ সালে মুজীবর রহমান খাঁ 'নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা' নামে "সাত সাগরের মাঝি" কাব্যগ্রন্থের এক দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। (সমালোচনাটি কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত "সাত সাগরের মাঝি"র তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫-এ, গ্রন্থশেষে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিলো)। এই সমালোচনার দুটি অনুচ্ছেদ :

> ফররুখ আহমদের আসল পরিচয় হল, তিনি একজন শিল্পী-কবি। রং ও রূপের বর্ণ এবং তার সাথে গন্ধের আলো, ছায়া এবং মোহের আবিষ্টতা নিয়ে যে-সব খেলার চাতুরী দেখান, তাঁরাই শিল্পী-কবি। তাঁদের কবিতা চিত্রধর্মী এবং তাঁরা আরো-কিছু। ফররুখ আহমদের কবিতা পড়তে পড়তে পাঠক-মন অলক্ষ্যে ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক ও তার পরবর্তী প্রি-র‍্যাফেলাইট (Pre-Raphelite) কবিদের রাজ্যে চলে যায়। রোমান্টিক কবিদের মধ্যে কীটসের

www.pathagar.com

কবিতার রঙ-প্রাচুর্যের তুলনা নাই। প্রি-র‍্যাফেলাইটদের মধ্যে মরিস, সুইনবার্ণ প্রমুখ কবি রং, আলো, সুগন্ধীর জাল বুনে কবিতায় যে ছবি আঁকতেন এবং দেহাভিসারী স্পর্শাতুরতা আনতেন, তার সাথে ফররুখ আহমদের গভীর সাদৃশ্য আছে।

উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও শব্দরীতি নির্মাণেও ফররুখ আহমদ নতুনত্বের সংযোজন করেছেন। 'আকীক-বিছান পথ', 'শিলাদৃঢ় আবলুস', 'দরিয়ার হাম্মাম' প্রভৃতির কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। পুঁথিসাহিত্যের অনুসরণে নয়, পুঁথি-পাঠের দরুন তাঁর মনের সঞ্চয় থেকে যে আলো উপচে পড়ছে, তার রঙে নিয়েই এগুলি ঝলমল করে উঠছে। এগুলি তার চিত্রধর্মী কবিতার রূপসৃষ্টির ব্যাপারে পরিপূরক হিসাবে অনেকখানি কাজ করেছে।

['পাকিস্তানী খবর', ১৯৬৭]

১৯৬৩ সালে অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ 'Pakistan Review' পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায় 'FARRUKH AHMED : The Representative of East Pakistan' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ফররুখকে এখানে তিনি বিচার করেছেন একটি বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত থেকে :

> In Farrukh , we find a deviation from the main trend of Benglai literature. He is an exeception to the process of its evolution. Bengali poetry may be said to have its origin in Buddhistic Duha. It then passed on to Vaishnbava Padabali, then on to Mungul kavya, then to the Epic stage. From Epic it passed on to the lyric stage and attained the gigantic development in the hand of Rabibdranath. It now strives to be freed from it. Nazrul Islam has infused it with a heroic respect for humanity. Jasim has enriched it with the idylls of village life. Very recently these have been attempts to enrich it with the traditions of the past, in imitation of T. S. Eliot, by Vishnu De and others. There are clarion calls of the communists for class-struggle as we find it in Subhas Muckerjee and others. But Farrukh has not travelled in that historical line. His poetry has found life and inspiration from the Tawhid preached by Islam. In his poems, thought is much more important than language. His main theme is the necessity of

www.pathagar.com

Tawhid for the salvation of humanity. He is always desirous to bring back and realize that period of history in which once tawid flourished.

The technique that is adopted by him is neither that of an epic not of a lyric. In the strong structure and wide field of epic, he has introduced the sweet tune of lyric and has thereby invented a new style. Though in lofty thought it has similarity with the epic, yet the atomsphere suggested is not light. In thought he is the direct descendent of Jalal-uddin Rumi and Iqbal.

His poetry is not recreationl but recreative. In every poem of his, there is an appeal for the betterment of humanity. But inspite of all these, his verse is not didactic.

এই কাব্যনাটিকার অন্তর্নিহিত আদর্শ। এই মহৎ আদর্শের প্রচারণা কাব্য-সৌন্দর্যের আবহে ও নাটকীয় ঘটনার আবর্তে এমন রসমহিমামণ্ডিত হয়েছে যে, আমাদের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তার স্থান হবে সংশয়াতীত।

['পূবালী', আষাঢ় ১৩৭১]

১৯৬৩ সালে মোহাম্মদ নাসির আলী 'পুঁথিসাহিত্যের নবরূপায়ন : নাটকে' নামে এক আলোচনায় লেখেন :

কবি ফররুখ আহমদ মোহাম্মদ দানেশ-রচিত "চাহার দরবেশ" নামক পুঁথির একটি টুকরো কাহিনীর ছায়া নিয়ে "নৌফেল ও হাতেম" শীর্ষক একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাটক রচনা করেছেন। কাহিনী সংগ্রহের দিক থেকেই নয়, ভাষাবিন্যাসেও ফররুখ আহমদ পুঁথির আশ্রয় নিয়েছেন, পুঁথির শব্দসম্ভারকে ভারী তৎসম শব্দের সঙ্গে সুন্দরভাবে গ্রথিত করে দিয়েছেন। নাটকটির সংলাপ কাব্যে রচিত হলেও, ভাষা ব্যবহারের স্বাভাবিকতায় তা গদ্যের ধার ছুঁয়ে গেছে, ফলে অভিনয়ের সময় তা কাব্যনাটকের চরিত্রবৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে গদ্যনাটকের মতোই নাটকীয় গুণাবলীতে সুন্দর ও সার্থকভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে। "নৌফেল ও হাতেম" ইতিমধ্যেই ঢাকায় রঙ্গমঞ্চে একাধিকবার অভিনীত হয়েছে এবং বেতার মারফতও প্রচারিত হয়েছে।

['পূবালী' , ভাদ্র ১৩৭০]

www.pathagar.com

১৯৬৩ সালে 'আমাদের সাহিত্য : বিভ্রান্ত উৎক্রান্তি' প্রবন্ধে হাসান হাফিজুর রহমান বলেন :

> আমাদের সাহিত্যের সূচনালগ্নেই দুটো বিরাট ঘটনার আলোড়ন-প্রেরণা আমরা পেয়েছি। প্রথমটি হল পাকিস্তান আন্দোলন এবং দ্বিতীয়টি হল ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলন দুটি আমাদের জাতীয় মনে যে অনুভূতিপ্রবণতা ও sensation সৃষ্টি করেছিল তার অবদান কিছু কম নয়। এই আন্দোলন দুটোকে কেন্দ্র ক'রে বিশেষভাবে আমাদের কাব্য ও মননসাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছে। পাকিস্তান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে ফররুখ আহমদ ও তালিম হোসেনের কাব্যসাফল্যের কথা প্রথমেই মনে আসে। কেননা, এঁরা দুজন এই আন্দোলন-চাঞ্চল্যের সঙ্গে ঐতিহ্যবোধের সংযোগ সাধন করতে পেরেছিলেন এবং ফলে তাঁদের কাব্যমূল্যের পরিধি ও আবেদন বেড়ে গেছে স্বাভাবিকভাবেই।
>
> ...ফররুখ আহমদ বিশুদ্ধ ইসলামী ভাবধারা, খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনাদর্শ ও হাতেম তাইয়ের মাহাত্ম্যের মধ্যে নিজের স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ বোধের আশ্রয় খুঁজেছেন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র আন্দোলন নয় — তাঁর ঐতিহ্যচেতনাই একমাত্র অবলম্বন ও উপজীব্য হ'য়ে উঠেছে . . . . এখানে আমার বক্তব্য এই যে, এই দুটো আন্দোলনের তৎপরতা আমাদের সাহিত্যে কোন স্রোতশীল ভূমিকা বজায় রাখতে পারেনি — কিছুটা সৃজনী চাঞ্চল্যের পর এর effect এবং প্রেরণা অনেকাংশেই নিশ্চল হয়ে পড়েছে।
>
> [সমকাল,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০]

১৯৬৪ সালে আবদুল গনি হাজারী 'বন্দী-বিবেক সমাজ ও কবিমানস' নামা প্রবন্ধে বলেন :

> ফররুখ আহমদকে ইলিয়টের সামনে রেখে বিচার করা যায়। Waste Land ও Hollow Man এর দু:স্বপ্নকে "সাত সাগরের মাঝি"তে বারবার চমকে উঠতে দেখি। দেশ ও তার জনজীবনের রোগ ধরা পড়ছে কিংবা রোগের লক্ষণ ধরা পড়ছে এবং তা থেকে যে হতাশা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে তার বিরুদ্ধে আশ্বাস সন্ধানে দুজনেই ধর্মীয় প্রেরণার দিকে, ঐতিহ্যের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। ইলিয়টের "Four Quartret" এ 'and the vest it prayer, observace, discipline, thought and action.' ('The Dry salvage') ফররুখ আহমদের সুরও অবিকল তাই তা আগেই বলেছি। লক্ষণীয় যে দুইজনেই

www.pathagar.com

মানবতাবাদকে, সমাজের জরাকে মানুষের ধর্মীয় নীতিবোধকে উন্মেষের সাহায্যে ব্যবহার করেছেন সার্বিকভাবে। তবে তা ক'রে তাঁরা সত্যি তাঁদের সত্যাশ্রয়ী বিবেককে মুক্তি দিতে পেরেছেন কিনা, সে সম্পর্কে আমি নি:সন্দেহ নই।

ফররুখ আহমদের পর কেউ তাঁর প্রত্যয় নিয়ে এ পথে এগোননি। প্রত্যয়ের অভাব তার একটা বড় কারণ বৈকি। কিন্তু তার চাইতে বড় কারণ হলো বুদ্ধির চৌমাথায় দাঁড়িয়ে কেউ এ পথ নেয়াকে বিচার ও বিবেকসম্মত মনে করেননি।

['সমকাল', কবিতাসংখ্যা, ১৩৭১]

১৯৬৬ সালে 'আমাদের কাব্যসাহিত্যের ধারা'[১০] প্রবন্ধে তালিম হোসেন বলেন :

ফররুখ আহমদ নজরুলোত্তর মুসলিম কাব্যসাধনার ধারায় সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাবান কবি। আমাদের কবিগণের মধ্যে তিনি সবচেয়ে সৃষ্টি-সচেতন এবং সক্রিয়। এই প্রতিভাশালী কবির অনেক কবিতা কালোত্তীর্ণ হওয়ার দাবীদার। ইসলামী রেনেসাঁ ও বিশ্বমুসলিম জাতীয়তা কবিতায় তাঁর বিশেষ অনুধ্যেয় ও উপজীব্য। খণ্ড কবিতা ছাড়াও কাহিনীকাব্য ও নাট্যকাব্য রচনায় কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমানে খণ্ড কবিতা রচনায় তাঁর কিছুটা নিস্পৃহতা লক্ষ্য করা যায়।

['মাহে-নও', আষাঢ় ১৩৭৩]

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত "আধুনিক কবিতা" সংগ্রহের সম্পাদক রফিকুল ইসলাম আমাদের কবিতার একটি ইতিহাসসম্মত পর্যালোচনায় বলেন :

১. নজরুলে যে আবেগ প্রথম বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত এবং যে জাগরণ সাধারণভাবে কাম্য ফররুখ আহমদে তা বিশেষ অর্থে বিশেষ প্রেরণায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিসারী। নজরুল চেয়েছেন নবজাগরণ আর ফররুখ পুনর্জাগরণ।

২ ...ফররুখ আহমদের বিচরণ শুধু সুদূর অতীতে নয়, সৃষ্টির রহস্যলোকেই নয়। কবি আরব্য উপন্যাস আর সাত সাগর থেকে স্বদেশের রূঢ় বাস্তবতায়ও জাগ্রত হন নইলে ফররুখ আহমদ একান্তই উৎকেন্দ্রিক ও অতীতচারী কবি বলে বিবেচিত হতেন।

কবি কৃষ্ণ ধর-এর কলকাতায় 'ইমন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয় 'পূবালী' পত্রিকায়। তার একাংশ :

পূর্ব বাংলা আলাদা হয়ে যাবার পরে এক শ্রেণীর কবি নবলব্ধ স্বাতন্ত্র্যকে ইসলামিক সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের সুযোগ বলে ব্যবহার করেছিলেন। এই

www.pathagar.com

মনোভাবকে আমি নিন্দনীয় মনে করি না। যদি আন্তরিকভাবে এই সচেতনা এসে থাকে তাহলে সমাজমানসের একটি বিশেষ অভিব্যক্তি রূপেই তাকে গ্রহণ করা যেতে পারে। ফররুখ আহমদ এই ধারার কবি। তিনি আরব সংস্কৃতির মাহাত্ম্য প্রচার করে পূর্ব বাংলার সমাজকে সীমান্তের এপারের সমাজচিন্তা থেকে আলাদা করে দেখাতে চাইলেন।

['পূবালী ', বৈশাখ ১৩৭২]

চার

ফররুখ আহমদের "হাতেম তা'য়ী" প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থ রচিত হয় অনেক আগে। কবির একটি পাণ্ডুলিপিতে তাঁর হস্তাক্ষরে রচনাকাল পাওয়া যাচ্ছে : ১৯৫৩–৫৫। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে বহুবার পরিশোধিত–পরিবর্জিত–পরিবর্ধিত হয়েছিলো। প্রকাশের পরে এই কাব্যগ্রন্থের পক্ষে–বিপক্ষে নানারকম মন্তব্য উচ্চারিত হয়। ফররুখ আহমদ জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে বিতর্কিত কবিপুরুষ হিশেবে থেকেছেন। এই একটি গ্রন্থ আশ্রয় ক'রে আমরা তাঁর বিতর্কিত পরিচয় গ্রহণ করবো।

"হাতেম তা'য়ী সম্পর্কে কবির জীবদ্দশায় আলোচনা বা মন্তব্য করেছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, সৈয়দ আলী আহসান, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবদুস সাত্তার, আনোয়ার পাশা, রশীদ–আল–ফারুকী প্রমুখ।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন :

> "হাতেম তা'য়ী" কবি ফররুখ আহমদের লেখা প্রায় সোয়া তিন শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এক বিরাট মহাকাব্য। এ আখ্যায়িকা–কাব্যটি যখন সাময়িক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই কবি আবদুল কাদির,[১১] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক [১২] প্রমুখ সাহিত্য–সমালোচকগণ একে মহাকাব্য বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আমিও মনে করি, সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে একে মহাকাব্য বলে আখ্যায়িত করলে ভুল তো কিছু করা হবেই না, বরং এতে যথার্থ মূল্যায়নই এর হবে।

['পূবালী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩]

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ লিখেছেন :

> মুসলিম ঐতিহ্যের ছায়া–ঘেরা এই অপূর্ব অবদান কবিকে চিরদিনের জন্য স্মরণীয় করে রাখবে সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যের জন্য এ কাব্য এক অমূল্য সম্পদ। ভাষার আঙ্গিক ও শব্দের কাঠিন্য স্থানে স্থানে গ্রাম–বাংলার সাধারণ

www.pathagar.com

পাঠকের কাছে কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য মনে হলেও বর্ণনার মাধুর্য, বিষয়বস্তুর মনোহারিত্ব এবং ঘটনার বৈচিত্র্য গ্রামের রাত-জাগা পাঠক ও শ্রোতাদের চিত্তকে বিমোহিত করতে সমর্থ হবে বলে বিশ্বাস করি। "শাহনামা", "জঙ্গনামা" ইত্যাদি মহাকাব্যগুলিরও এইরূপ নবরূপায়ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

['পাকিস্তানী খবর', আগস্ট ১৯৬৬]

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ফররুখ-মানসের ক্রমাগ্রগতি বর্ণনা করেন এভাবে :

"সাত সাগরের মাঝি"র কবি-স্বপ্ন "সিরাজাম মুনীরা"তে খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনালোকে নতুন রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্নের মধ্য দিয়েই প্রথম বাস্তবায়নের পথ খুঁজেছে। সে বাস্তবায়নের পথ কবি প্রথম আবিষ্কার করেছেন "নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাট্যে হাতেমের মতো এক 'কামিল ইন্‌সান্', 'মর্দে মোমিনে'র সেবা ও ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের মধ্যে। "হাতেম তা'য়ী"তে কবি সেই আদর্শ-কর্মী, সেবাব্রতী, ত্যাগী ও সত্যসাধক হাতেমের অপরূপ জীবন-গাথা রচনা করে তাঁর মনোগত আদর্শটির কার্যকারিতায় নিঃসংশয়িত বিশ্বাসে উপনীত হয়েছেন।

[পৃ. ২২০, "কবি ফররুখ আহমদ", ১৯৬৯]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেছেন :

...রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুসরণে বলা যায় : সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্যের বিলোপ হয়। অর্থাৎ কাব্যের ফর্ম হিসেবে মহাকাব্যের ভূমিকা নিঃশেষিত হয়। সাম্প্রতিক কালে তাই মহাকাব্যের চাইতে উৎকৃষ্ট কাব্যের প্রয়োজন বেশী। আমার তাই মনে হয়, "হাতেম তা'য়ী"তে যে-সব উৎকৃষ্ট কাব্যাংশ আছে তার মূল্যই সমধিক।

['মাহে-নও', ১৯৬৬]

আবদুস সাত্তার বলেছেন :

হাতেম তা'য়ীর জীবনপ্রবাহ যেমন গতানুগতিক বা একঘেয়েমীতে পূর্ণ নয় তেমনি ফররুখ আহমদের কাব্যগ্রন্থখানিতেও রয়েছে বৈচিত্র্যের স্বাদ। এই বৈচিত্র্য যে শুধু উপমা নির্বাচন, প্রতীক অঙ্কন, বর্ণনা কৌশল ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ তাই নয়, ছন্দ সৃষ্টিতেও রয়েছে অনুপম বৈচিত্র্যের লক্ষণ। সমগ্র কাব্যগ্রন্থটিতে যেমন রয়েছে সমিল, অমিল মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত প্রভৃতি

www.pathagar.com

কাব্যরীতির পরিপূর্ণ রূপ তেমনি কোথাও কোথাও পরিদৃষ্ট হয় এক একটি সুসংবদ্ধ সনেট।

['সওগাত', শ্রাবণ ১৩৭৩]

এগুলোকে বলা যেতে পারে পক্ষপাতী আলোচনা। একই সময়ে "হাতেম তা'য়ী"র কিছু বিরুদ্ধ আলোচনাও হয়েছিলো। এখন সেগুলি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

"হাতেম তা'য়ী"র একটি দীর্ঘ সমালোচনায় রশীদ আল-ফারুকী লেখেন :

> পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইসলামী বাংলা সাহিত্যের যে ধুয়া উঠেছে তারই ফলশ্রুতি এই কাব্য। তবুও এটিকে 'ইসলামী মূল্যবোধের জাগরণ' বলা চলে কি? হাতেম তায়ী চরিত্রটিকেই ধরা যাক। হাতেম মুসলিম নন। প্রাক-ইসলামী যুগের মানুষ তিনি। তাঁর চরিত্রের যত মহত্ত্ব থাক না কেন তাঁকে কোন অবস্থাতেই ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিনিধি করা চলে না। তবুও লেখক করেছেন।...পুঁথির অনুকরণে তিনি এই কাব্যে তাবৎ অলৌকিক এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলীও স্থাপন করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। এ গেল তাঁর কাহিনীগত ঐতিহ্য — অশিক্ষিত, গ্রাম্য এবং স্থূল রুচির পুঁথিকারদের সক্ষম ও সার্থক অনুকরণ। এই অনুকরণ ভাষাতে স্পষ্ট।...
>
> ..."হাতেম তা'য়ী"কে কোন অবস্থাতেই মহাকাব্য আখ্যা দেওয়া চলে না (জোর করে কেউ দিলে কারো কিছু বলার নেই) — জাতীয় মহাকাব্য তো নয়ই। এটি স্রেফ পুঁথি - মধ্যযুগীয় মিশ্রভাষারীতি-কাব্যের আধুনিক সংস্করণ। গ্রাম্য এবং স্থূল রুচির পুঁথিকারদের কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কাহিনীকে কবি আধুনিক ভাব এবং ভাষায় সমৃদ্ধ করে সে ধারাকেই পুষ্ট করেছেন। এবং এর গুরুত্ব (!) সেখানেই। যুগ-পরিবর্তনের অনিবার্য প্রভাব চিন্তার মননে অনুধাবন ও গ্রহণ করতে না-পারার ফলে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে যে-সব প্রতিভার অপচয় হয়েছিল তাদেরই সুষ্ঠু এবং সুশৃঙ্খল প্রতিধ্বনি শুনতে পাই ফররুখ আহমদের ভেতর।
>
> 'পূর্ণ ইসলামী মূল্যবোধের জাগরণের স্বপ্ন' এবং 'জাতীয় মহাকাব্যে'র প্রসঙ্গ বাদ দিয়েই এই কাব্যের গুরুত্ব।...ফররুখ আহমদের "হাতেম তা'য়ী" — ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত পথ গ্রহণ এবং আধুনিক জীবনবিমুখ কাহিনী নিয়ে মধ্যযুগীয় পুঁথিসাহিত্যের অঙ্গনে পুন:প্রবেশের প্রাণান্তকর প্রয়াস। তবু বলছি

www.pathagar.com

কাব্যটি আমার ভাল লেগেছে। এর ছন্দ, উপমা, ভাব ইত্যাদি প্রয়োগের নতুনত্ব এবং কৌশল দেখে যে কোন আধুনিক মন উল্লাস বোধ করবে।

['সমকাল', মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩]

এই প্রবন্ধটি রশীদ আল-ফারুকীর "রুচি ও প্রগতি" (১৩৭৬) গ্রন্থে গৃহীত হয়। গ্রন্থটির সমালোচনা-প্রসঙ্গে আনোয়ার পাশা যে-মন্তব্য করেন, তাতে তাঁর মতামতও স্পষ্ট বোঝা যায় :

'ঐতিহ্য বিভ্রাট : হাতেম তা'য়ী' প্রবন্ধের জন্য লেখক আমাদের অকুণ্ঠিত প্রশংসার দাবি রাখেন। ফররুখ আহমদের "হাতেম তা'য়ী" প্রকাশিত হলে বলা হয়েছিল - 'পূর্ণ ইসলামী মূল্যবোধের জাগরণের স্বপ্ন এই কাব্য রচনায় প্রেরণার' মূল।' (ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : 'মাহে-নও') পণ্ডিত-সমালোচকের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ রয়েছে এ প্রবন্ধের সর্বত্র, এবং অতি সার্থকভাবে। "হাতেম তা'য়ী" সম্পর্কে এই তরুণ প্রবন্ধকারের অতি সুচিন্তিত মত হচ্ছে -ফররুখ আহমদের "হাতেম তা'য়ী" ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত পথ গ্রহণ এবং আধুনিক জীবনবিমুখ কাহিনী নিয়ে মধ্যযুগীয় পুঁথিসাহিত্যের অঙ্গনে পুন:প্রবেশের প্রাণান্তকর প্রয়াস।'

['সমকাল', আশ্বিন ১৩৭৬]

সৈয়দ আলী আহসানের আক্রমণ "হাতেম তা'য়ী"র প্রকরণ প্রসঙ্গে :

...একই ধ্বনি-স্বভাবের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যেমন "সাত সাগরের মাঝি"তে তেমনি "হাতেম তা'য়ী" কাব্যে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ বলে "সাত সাগরের মাঝি"র বাণীভঙ্গী নতুন এবং মধুর ছিলো, কিন্তু "হাতেম তা'য়ী" কাব্যগ্রন্থে একই বাণীভঙ্গী তাৎপর্যহীন পোয়েটিক ডিক্‌শনে পরিণত হয়েছে। শব্দের উপর কবি তার অধিকার প্রমাণ করেননি, শব্দই কবির উপর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। "হাতেম তা'য়ী" কাব্যের বাণীভঙ্গী শব্দের বন্ধন-দশায় কবির আর্তনাদের মতো।

[পৃ. ১০৮, 'পূর্ব পাকিস্তানের কবিতা', "আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে", ১৯৭০]

- "হাতেম তা'য়ী"র পক্ষে ও বিপক্ষে নানাদিক থেকে এইভাবে আলোচনা আবর্তিত হয়েছে।[১৩]

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে একটিমাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো : "কবি ফররুখ আমমদ" (১৯৬৯),রচয়িতা সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। বৃহৎ এই গ্রন্থের সূচিপত্র ছিলো এরকম :

১. আধুনিক বাংলা সাহিত্য : স্বাতন্ত্র্যকামী সাহিত্য-চেতনা ও ফররুখ আহমদ।

২. ফররুখ-প্রতিভার রূপ ও রঙ।

৩. ফররুখ আহমদের সাহিত্য-কর্ম : বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন : (ক) সাত সাগরের মাঝি, (খ) সিরাজুম মুনীরা, (গ) কাব্যনাট্যের নতুন দিগন্ত : (ঘ)

না-হ'তেই প্রকাশিত হয় "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা"। এই সংগ্রহ ফররুখ আহমদকে কয়েক বছরের নৈঃশব্দ্য ও অনালোচনা থেকে আবার ফিরিয়ে আনে রৌদ্রালোকে ; তারপর থেকে ফররুখ আবার আলোচনার একটি কেন্দ্র হ'য়ে ওঠেন। সে আরেক ইতিহাস॥

---

১. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের এই অধিবেশন ১৩৪৬-এর বৈশাখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভাপতি ছিলেন : আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ।

২ আবু রুশদের পরবর্তীকালের ফররুখ সম্পর্কিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য :

(ক) আমার বন্ধু ফররুখ (স্মৃতিকথা) : 'সচিত্র স্বদেশ', ২০ অক্টোবর ১৯৮৩।

(খ) জীবন ক্রমশ (স্মৃতিকথা) : 'উত্তরাধিকার', জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৭।

(গ) ''Four poets from Bangladesh", March 1984.

৩ 'সওগাত' শ্রাবণ ১৩৫৪ সংখ্যায় "আজাদ করো পাকিস্তান" গ্রন্থের বিজ্ঞাপন থেকে উদ্ধৃত হ'লো। সম্ভবত 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'র ১০ই ফাল্গুন ১৩৫২ সংখ্যায় সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিলো।

৪ এই প্রবন্ধটি সৈয়দ আলী আহসান-সম্পাদিত "ইকবালের কবিতা" গ্রন্থের ভূমিকা-রূপে মুদ্রিত হয় পরের বছর, ১৯৫২ সালে। এই গ্রন্থে ফররুখ আহমদ-কৃত ইকবালের বারোটি কবিতার তরজমা স্থান পায়।

৫ কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৪৫ সালে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নামে যে ভাষণ-প্রবন্ধ রচনা করেন, তার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি থেকে একটু আগে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

৬ "দিলরুবা" ফররুখ আহমদের একটি প্রেম-কাব্য। এই কাব্যের সাতটি স্তবক 'দিলরুবা' পত্রিকার সাতটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথম স্তবকটি প্রকাশিত হয়েছিলো পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩৫৬)।

৭ অন্যান্য সাহিত্যের ইতিহাস, সংকলন ও পাঠ্যগ্রন্থসমূহেও ফররুখ আহমদের জীবদ্দশাতেই তাঁর জীবনী ও পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছে। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসানের "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত"-এর (প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৬) সর্বশেষ সংস্করণ (১৩৮৯/১৯৮২, ষষ্ঠ সংস্করণ) থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ (এটি সৈয়দ আলী আহসান রচিত) :

> ফররুখ আহমদ ধর্ম-চেতনাময় বক্তব্যের কারণে খ্যাতি লাভ করলেও, মূলত: উজ্জ্বল রোমান্টিক আবহের কারণেই তিনি কবি। প্রাথমিক যুগের ইসলাম সর্বমানুষের জন্য জীবনের যে, বিশ্বাস নির্মাণ করেছিলো, জয়, ঐশ্বর্য এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগের যে মহিমাময় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলো, এবং নতুন চেতনায় মানুষের চিত্তকে যেভাবে উদ্বেলিত করেছিলো ফররুখ আহমদের কবিতা তার আবেগগত স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪) ছন্দের আনন্দিত ধ্বনি-আবর্তে, তৎসম শব্দের সঙ্গে আরবী-ফারসী শব্দের বিস্ময়কর ধ্বনিসাম্য নির্মাণে এবং সর্বোপরি বর্তমান যুগের ক্ষয় ও অসহিষ্ণুতার মধ্যে সমৃদ্ধবান ইতিহাস-নির্ভরতায় বাংলা কাব্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। "সিরাজাম মুনীরা" (১৯৫২) তুলনামূলকভাবে অনেকটা নিষ্প্রভ এবং সেখানে "সাত সাগরের মাঝি"র শব্দ ও ধ্বনিগত অনুবর্তন অসম্ভব প্রবল। "মুহূর্তের কবিতা" (১৯৬৩) সনেট রচনায় কবির দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করছে। কাহিনীকাব্য "হাতেম তায়ী" (১৯৬৬) একটি দোভাষী পুঁথির পুনর্নির্মাণ। দোভাষী কাহিনীটির রহস্য, রোমান্টিকতা, বিচিত্র ঘটনাবর্ত এবং সর্বমুহূর্তে নায়কের পথ-যাত্রা অনুসরণ, ফররুখ আহমদ পূর্ণভাবে অবলম্বন করেছেন। শুধুমাত্র ছন্দ ও বর্ণনারীতিতে কাব্যটি দোভাষী পুঁথি থেকে ব্যতিক্রম। দীর্ঘ পরিসরের এ কাহিনীকাব্যে ছন্দ ও শব্দ ব্যবহারের একটি সরল প্রবাহ পাঠককে মুগ্ধ করে। কবির অন্যান্য গ্রন্থের নাম "নৌফেল ও হাতেম" (১৯৬১), "পাখীর বাসা" (১৯৬৫), "হরফের ছড়া" (১৯৭০)
>
> পৃ ৪৪৯, "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত"
>
> [এখানে কয়েকটি বইয়ের প্রকাশকালে ভুল ছাপা হয়েছিলো – আমরা যথার্থ প্রকাশকাল বসিয়ে দিয়েছি।]

৮ এই সেমিনারের সমস্ত বিবরণ ১২০ পৃষ্ঠার একটি বৃহদাকার সংকলনগ্রন্থে গ্রথিত হয়। সমস্ত উদ্ধৃতি ঐ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

৯ কবীর চৌধুরীর ভাষণ ইংরেজিতে প্রদত্ত হয়। রণেশ মৈত্র তার অনুবাদ ক'রে 'সমকালে' ছাপেন। 'সমকালে' প্রবন্ধের সঙ্গে এই নোটটি ছাপা হয় :

> Congress for Cultural Freedom-এর পূর্ব পাকিস্তান শাখার উদ্যোগে বিগত ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে রাজসাহীতে অনুষ্ঠিত 'Tradition and change in East Pakistan' বিষয়ক সেমিনারে অধ্যক্ষ কবীর চৌধুরী এই প্রবন্ধটি (ইংরেজিতে লিখিত) পাঠ করেন।

১০ ঢাকা রেডিওতে প্রথম পঠিত।

www.pathagar.com

১১ আবদুল কাদির বলেছেন : 'বাংলা সাহিত্যে ফররুখ আহমদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর "হাতেম তায়ী"।' ['কবি ফররুখ আহমদ স্মরণে', দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৫]

১২ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর "মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য" (১৯৫৭) গ্রন্থে লিখেছেন : "হাতেম তাই" নামক মহাকাব্যের কয়েকটি সর্গে, তিনি দোভাষী-বাংলাকে পুনরুজ্জীবন দানের প্রয়াস পাইয়াছেন।'

১৩ ফররুখ আহমদের শিশুসাহিত্য নিয়েও নানারকম আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। আলোচকদের মধ্যে আছেন ডক্টর আনিসুজ্জামান, হাবীবুর রহমান, আতোয়ার রহমান, সরদার ফজলুল করিম, বুলবন ওসমান, কাজী সিরাজ, মোহাম্মদ মতিউর রহমান প্রমুখ। দুএকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি। "পাখীর বাসা" বইটি সম্পর্কে :

১. ছোটদের জন্যে ফররুখ আহমদের কবিতাসংগ্রহ এই প্রথম। প্রথম বইটি তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয় জয় করবে।...চিরত্বের গুণে তাঁর কবিতা গুণান্বিত।...

[ডক্টর আনিসুজ্জামান]

২ ...যে অর্থে ইংলেণ্ডের জোনাথন সুইফট, আমেরিকার ন্যাশ, ডেনমার্কের এণ্ডারসন এবং বাংলার সুকুমার রায়, অবন ঠাকুর বিশিষ্ট, সেই একই অর্থে ফররুখ আহমদও এ আকাশে বিশিষ্ট।

[হাবীবুর রহমান]

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকার

[কবি ফররুখ আহমদ প্রচলিত অর্থে পত্রিকায় যে-ধরণের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়, তার বিষয়ে বিরূপ ছিলেন। ফলে, বিপুল খ্যাতি সত্ত্বেও তাঁর সাক্ষাৎকার প্রকাশিতই ময়নি বলতে গেলে। আমাদের জানামতে, কবির এই একটিমাত্র মুদ্রিত সাক্ষাৎকারই পাওয়া যায়। এই সাক্ষ্যাকার প্রকাশিত হয়েছিলো 'বই' পত্রিকার জুন ১৯৬৮ সংখ্যায়। 'বই' পত্রিকার প্রতিনিধি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। সাক্ষ্যাকার গৃহীত হয় কবি-র ইস্কটনস্থ সরকারি বাসভবনে।]

দীর্ঘকাল যাবত আপনি কবিতায় নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। আপনার সদ্য পুরস্কার পাওয়া 'হাতেম তা'য়ী' কাব্যও এইরকম পরীক্ষার পল বলে সুধী মহলে স্বীকৃতি পেয়েছে। আপনি নিশ্চয় কুব পড়াশোনা করেন। তাই না?

আমি যদি বলি যে, পড়াশোনা চিন্তা-বাবনার পাট একান থেকে প্রায় উঠেই গেছে, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি বিস্মিত হবেন।

তা হব বৈকি।

কথাটা বিস্ময়কর হলেও মর্মান্তিকভাবে সত্য।

আপনি বড় অদ্ভুত কতা বলছেন দেখি।

অদ্ভুত কথা নয়। কাজের পরিচয় ফল দেখেই পাওয়া যায়।

কি রকম?

দুনিয়ার আরো দশটা উন্নত দেশের চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক অথবা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক আর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট অবদানের তুলনা ক'রে দেখুন, খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে, আমাদের পড়াশোনার বহর আর বিদ্যার দৌড় কতটুকু। আমাদের চিন্তাভাবনার পরিধি কতটুকু সে কথা বুঝতেও দেরী হবে না।

পড়াশোনার সঙ্গে আপনি কেন বারবার চিন্তা-ভাবনার কতা বলছেন।

আমি স্বাধীন চিন্তার কতা বলছি।

কেন?

স্বাধীন চিন্তাভাবনার সঙ্গে গ্রহণ-বর্জন, হজম, বদহজমের যোগ আছে বলেই।

বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি আমাদের পড়াশোনা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তাতে সায় দিতে পারছি না।

www.pathagar.com

কেন?

অনেকেই আমাকে একথা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে না পড়লে তাঁদের ঘুম হয় না। একতা কি মিথ্যে?

ডাহা ভাঁওতাবাজি। ঘুমানোর জন্য কেউ পড়াশোনা করে না। সত্যিকারের জ্ঞানীন্বেষী পাঠক তো নয়-ই।

তবে কি মানুষ না ঘুমানোর জন্য পড়াশোনা করে?

যে মানুষ পড়াশোনা করে সে শুধু নিজেই জেগে থাকে না, অন্যকেও জাগায়, তাতে জাতি জাগ্রত হয়ে ওঠে। যারা ঘুমানোর জন্য পড়াশোনা করে তারা পাঠকই নয়।

তা হ'লে আপনি আমাদের পাঠক সম্প্রদায়কে সত্যিকারের পড়ুয়া মনে করেনা না?

যারা ঘুমানোর জন্য পড়ে তাদেরকে আমি পাঠক মনে করি না।

আর লেখক সম্প্রদায়কে?

যে সব লেখকের স্বকীয়তা আছে, যাঁদের চিন্তাভাবনায়, প্রকাশ ভঙ্গীতে মৌলিকতা আছে তাঁদেরকে আমি সতিৎকারের লেখক বলে মনে করি।

আমাদের দেশে কি এরকম লেখকের সংখ্যা বেশী?

কোন দেশেই এরকম লেখকের সংখ্যা বেশী নয়।

তা হলে আপনি আমাদের দেশের সাধারণ লেখক অথবা পাঠক সম্প্রদায়কে বাজে ব'লে মনে করেন?

কোন মানুষকেই আমি বাজে ব'লে মনে করি না, শুধু হামবাড়া দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষকেই আমি বাজে মনে করি।

আপনি আমাদের লেখক ও পাঠকদের সম্পর্কে করেন কি?

নগন্য হলেও নিজে যখন এক-আধটু লেখার চেষ্টা করি তখন ও বিষেয়েও কিছু চিন্তা করি বৈকি।

আপনি যেভাবে চিন্তা করেন, জানাবেন কি?

উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে এই সব সাধারণ পাঠকই হয়ে উঠবে অসাধারণ পাঠক, নকল নবীশ হবে সথ্যিকারের ভালো লেখক।

এটা কি আপনার কাব্যিক উচ্ছ্বাস?

সর্বসাধারণের পড়াশোনর জন্য আপনি কি রকম পরিবেশ চান?

সাধারণ পাঠাগার।

www.pathagar.com

পাঠাগার কি আমাদের নাই?

আছে, কিন্তু সংখ্যায় কূব কম। এতো কম যে বলতোও লজ্জা বোধ হয়।

আপনার কথা মেনে নিলাম। মনে করুন কোনো অলৌকিক উপরে রাতারাতি দেশের বিভিন্নএলাকায় পাঠাগার স্থাপিত হ'লো কিন্তু তাতেই কি সমস্যার সমাধাম হবে?

না নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে।

কিসের সমস্যা?

বইয়ের। লেখকের। প্রকাশকের।

সেই কিরকম?

দুনিয়ার বিভিন্নদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের পাঠক সম্প্রদায়কে পরিচিত করতে হ'লে মাতৃভাষার মাধ্যমেই সে চেষ্টা করতে হবে, এক্ষেত্রে বইয়ের অভাব কেন হবে করি তা আপনাকে খুলে বলতে হবে না।

কিন্তু লেখকের অভাব হবে কেন?

অমাদের দেশের অনেকের ধারণা এই যে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না কাজেই লেখকেরও অভাব হবে না কোনদিন। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। তৈরি কাক অনেক পাওয়া যায়। বিশেষ ক'রে শহরে অনেক কাক মৌজুদ থাকে। কিন্তু তৈরী লেখক অতটা সহজে পাওয়া যায় না, শহরেও খুব বেশী লেখক মৌজুদ থাকে না। কাজেই মৌলিক রচনার কথা বাদ দিলেও তরজমা করার মত যোগ্য লোকেরওতখন অভাব হবে। আর যে সমস্ত বই লেখা বা তরজমা করা হবে, তারও প্রকাশক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আপনার শেষের কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। এখানো কি আমাদের সমাজে প্রকাশনা একটা বড় সমস্যা?

বাংলা ভাষাভাষী মুললিম সমাজের এটা চিরন্তন সমস্যা। এই সমস্যার জন্যই ছোট একখানা বর্ণপরিচয় থেকে শুরু ক'রে বিশ্বেকোষ জাতীয় বিরাট গ্রন্থের ব্যাপারে আমাদের পরমুখাপেক্ষী থাকতে হয়েছে।

আগেও কি এই সমস্যা ছিল?

আগেও ছিল। আপনারা বোধহয় জানে-যে নজরুল ইসলামকে নিয়ে আমরা এত উচ্ছাস প্রকাশ করি সেই নজরুল ইসলামের প্রায় সব বই-ই প্রকাশ ক'রেছিলেন অমুসলিম প্রকাশক। মাত্র দু'চারখানা বই প্রকাশ করেছিলেন কোনো কোনো মুসলিম প্রকাশক ; তা'ও শেষ অবস্থায়।

নজরুল ইসলাম কি তাঁদের কাছে থেকে উপযুক্ত মূল্য পেয়েছিলেন?

www.pathagar.com

তা আমি জানি ন।

এটাতো দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেকার ঘটনা।

হ্যা।

তখন হয়তো মুসলিম প্রকাশকদের অবস্থা খারাপ ছিল।

ধরে নিলাম আপনার কথাই ঠিক। এখন আর সে অবস্থা নাই। অনেক প্রকাশকই এখন বিত্তের অধিকারী। ধন-দৌলতের মালিক। অনেক বাড়ী, গাড়ী, মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স এখন তাঁদের সৌভাগ্যের খবর দিচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগা লেখকদের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। লেখলদের অর্থনৈতিক সমস্যার মত সৎ গ্রন্থ প্রকাশের সমস্যাও প্রায় অপরিতি রয়ে গেছে।

আপনি কি শুধু লেখকদের দিকটিই তুলে ধরেছেন না? আমার তো বিশ্বাস যে প্রকাশকেরাই এখন লেখকদের সবচাইতে বেশী পৃষ্ঠপোষকতা করছেন।

লেখকের পৃষ্ঠপোষকতা ক'রছেন না নিজেরা পরিপুষ্ট হচ্ছেন?

লেখক সম্প্রদায় কি একেবারেই বঞ্চিত হচ্ছেন?

পুরাপুরি বঞ্চিত হচ্ছেন বল্‌লে হয়তো বাড়াবাড়ি হবে কিন্তু অধিকাংশ লেখলই সে তাঁদের ন্যায্য পাওনা পাচ্ছেন না এ কতা ঠিক। তার প্রমাণ বই-এর ব্যবসা করে প্রকাশক বড় হলে তার সঙ্গে লেখকেরও তো হওয়া উচিৎ, কিন্তু কোন তেমন হননি আজ পর্যন্ত।

প্রকাশনা একটা নতুন শিল্প হিশেবে এদেশে গড়ে উঠেছে, দেনা পাওনার ব্যবাপারে প্রকাশকের ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছুটা থাকতে পারে, কিন্তু লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক উন্নয়নের মধ্যেই এই সমশ্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমরা আশা করি।

দেখুন এই প্রসঙ্গে ছেলেবেলায় পড়া একটা ফাসী গল্প হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মুখতাসার গল্পটা বলব।

বলুন।

ইরানে এক দরবেশ ছিলেন। তিনি সন্ধ্যার সময় আধমণ রুটি খেয়ে সারারাত এবাদত বন্দেগী করতেন।

আধমণ?

হ্যাঁ আধমণ। গল্প লেখক এই আধমণ রুটি খাওয়ার উল্লেখ ক'রে ব'লছেন যে, আধমণ রুটি খেয়ে সারারাত এবাদত বন্দেগীতে না কাটিয়ে দরবেশ যাদ আধখানা রুটি খেয়ে সারারাত ঘুমিয়ে কাটাতেন তাহ'ল কি চমৎকার ব্যাপারই না হ'ত। অর্থাৎ বিশ-তিরিসশ জন লোক খেয়ে বাঁচতো।

www.pathagar.com

আধমণী দরবেশের যে কাহিনী আপনি শোনালেন সে কথা আমাদের সকল প্রকাশকের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। প্রকাশকেরা শুধু নিজেদের উদরপূর্তিই করেনা না। পৃষ্ঠপোষকতা ও সৎকাজও করে থাকেন।

তা হয়তো করে থাকেন। কিন্তু লেখকের ন্যায্য পাওনা গণ্ডা ঠিক সময়ে মিটিয়ে দিলেই লেখক সম্প্রদায়ের সঙ্গে গোটা সমাজেরও উপকার করা হ'ত। লেখকরাও নিশ্চিত মনে লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারনে।

লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে আপনি এত আগ্রহশীল কেন?

পেশা হিসেবে গ্রণ না করলে এ যুগে লেখকের এবং লেখার অস্তিত্ব রক্ষা প্রায় অসম্ভব বলেই আমি লেখাকে স্বাধীন সম্মানজনক পেশা হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী।

দুনিয়ার সব দেশেই কি লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

দুনিয়ার সব দেশের খবর আম বলতে পারিনা, তবে অধিকাংশ উন্নত দেশের লেখকেরাই লেখাকে শাধীন, সম্মানজনক পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এর তো খারাপ দিকও আছে?

আছে। লেখক যদি নিজের বিবেক বিক্রী করে অর্থপিশাচের ভূমিকায় নেমে লিখতে বসেন তাহলে সেটা ব্যক্তির জন্যেই নয়, সমাজের জন্যেও মারাত্মক স্ততিকর হবে। কিন্তু খারাপ দিকটার কথাই আপনি আগে ভাবছেন কেন?

না, ও কতা আমি ভাবিনি। আমি এমন কয়েকজন লেখককে দেখছি যাঁরা বিত্তশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লেখা ছেড়ে দিয়েছেন।

আমাদের দেশে লিখে বিত্তশালী হয়েছেন?

না, লিখে নয়। নানা রকম ব্যবসা বাণিজ্য ক'রে।

'তাই বলুন। তা' উত্তর তো আপনি নিজেই দিলেন।

একজন বয়স্ক পত্রিকা পত্রিকা সম্পাদকও কিছুকাল আগে আমাকে বলেছেন যে, যতদিন লেখক দরিদ্র থাকেন ততদিন নাকি তিনি ভাল লিখতে পারেন। কথাটো কি সত্য?

কথাটার উত্তর সরাসরি নিজে না দিয়ে আমি আপনাকে আবার অনুরোধ করবো দুনিয়ার উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকাতে। সচ্ছল অবস্থান দরুণ সে সব দেশের লেখকেরা ভাল লিখতে পারছেন, বেশী লিখাতে পারছেন – না আমরা পারছি।,

পত্রিকা-সম্পাদকেরা কথার উপর আমি কোনো গুরুত্ব দিইনি।

না দিয়ে ভালই করেছেন। কারণ অভুক্ত অবস্থায় থাকলে পত্রিকা সম্পাদকের যে ঐ দারিদ্র্যবিলাস থাকতো না সে আমি নি:সন্দেহ।

www.pathagar.com

লেখাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে এটি তাহলে আপনার বড় যুক্তি?

লেখাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার সবচাইতে বড় লাভ এই যে, লেখক লেখাপড়ায় সবসময় আত্মনিয়োগ করতে পারেন। রুজী-রোজগারের ধান্দায় লেখককে যদি অকারণে ঘুরতে না হয় তাহলে সত্যিকারের প্রতিভাবান লেখক অনেক বেশী কাজ করতে পারেন বা পারবেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উন্নত মানের লেকার জন্যে এই পরিবেশ বিশেষভাবে প্রয়োজন।

যতদিন এই পরিবেশ সৃষ্টি না হচ্ছে ততদিন কি লেখক সম্প্রদায় লেখাপড়া বাদ দিয়ে ব'সে থাকবেন?

তা যে থাকবেন না তা আপনি নিজেও জানেন। কিন্তু বিনা চষের ফসল যে কি হয় তার নমুনা তো আপনারা আমাদের লেখা থেকেই পাচ্ছেন।

আচ্ছা একটা কথা আবার আপনাকে জিগ্‌গেস করব, যদি কিছু মনে না করেন।

অত সঙ্কোচবোধ করছেন কেন, সরাসরি বলে ফেলুন।

আলোচনার শুরুতে আপনি ও কথাটা বল্লেন কেন, লেখাপড়া চিন্তা ভাবনার পাট এখান থেকে প্রায় উঠেই গেছে। কথাটা আমরা কাছে যেন কেমন বোধ হচ্ছে।

অর্থাৎ অপ্রিয় সত্যকে মেনে নিতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব সত্যকে না মেনে উপায় কি বলুন। একটা স্বাধীন, গতিশীল জাতির লেখক হিশেবেযেভাবে পড়াশোনা করা দরকার সেভাবে যে আমরা পড়াশোনা করি না, করছি না অথবা করতে পারছি না সেটা তো আমাদের কাজের নমুনা দেখলেই বোঝা যায়। নিজেদের ব্যর্থতার কথা আর কিভাবে?'

আমরা যাঁরা লেখাপড়াকে দৈনন্দিন জীবনের কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করছি তাঁরা যদি না পড়ি তাহলে এদেশে সাধারণ পাঠক জন্মাবেই না। অতরব সেদিকে চেয়ে দেশের ও বিষয়টা একবার চিন্তা করুন।

একথা বলতে গিয়ে আপনি অত মনমরা হয়ে গেলেন কেন? আমি বরং আমাদের দেশের একশ্রেণীর পাঠকের কবর দিতে পারি, যাঁরা বয়সে প্রাচীন আর উচ্চশিক্ষিত তারা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সারা জীবন পড়ছেন এমনকি ডিটেক্টিভ নভেল কি ঐ ধরণের অন্যান্য বই পড়ে কাটাচ্ছেন। এসব পাঠক সম্পর্কে আপনার কি ধারনা?

গদ্যে আর উত্তর কি উত্তর দেই, এর উত্তর দিতে হয় পদ্যে।

তাই দিন।

অবাক হলাম দাদুর হাতে

দেখে চুষি কাটি,

www.pathagar.com

ঘোরেন তিনি মারবেল আর

নিয়ে দুধের বাটি।

কেমন, হ'ল তো? এই যে চির-নাবালক দাদুর পড়াশোনা দেখলে অবাক হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

নাবালক কেন, ঘোরানও হতে পারেন।

তা পারেন, তবে এ বিষয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

কিন্তু এ কথাও তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সৎ পাঠকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

আপনার কথা সত্য হোক এটাই দোয়া করি। তবে এ কথাটাও আমাদের জানা আছে যে, আজাদী পাওয়ার পর আমরা এমন এক উৎকট ভব্যতার শিকারে পরিণত হয়েছি ; যেখানে কার্পেট বিছানো ড্রয়িং রুমের একপাশে দামী শেলফে রেক্সিনে বাঁধানো অনেক অনেক বই সাজানো থাকে। কোনদিন সে সব বইয়ের পাতা খোলা হয় না। সেখানে শুধু আলোচনা হয় হাল ফ্যাসানের বাড়ী, গাড়ী আর শাড়ী সম্পর্কে।

কিন্তু ঐ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে লেখকদের কি সম্পর্ক?

লেখকদের উপরেও এখন ঐ তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায় প্রভাব বিস্তার করছেন, যার ফলে কঠিন শ্রম-সাধনার পথ ছেড়ে অনেক লেখক বাড়ী গাড়ীর স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছেন।

আপনার বুঝি এখানো বাড়ী-গাড়ী কিছুই হয়নি।

আমার নয়, আমাদের কথা বলছিলাম।

আশা করি এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো কথা হবে।

তবে সেটা যেন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান না হয়।

কেন?

সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আমার পেশা নয়।।

www.pathagar.com

পান্ডুলিপি

এক

১৯৭৪ সালে ফররুখ আহমদ যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ছাপ্পান্ন। ১৯৩৭ সালে ফররুখের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় – 'রাত্রি' অথবা 'পাপ-জন্ম' ; আর তাঁর সর্বশেষ কবিতা মৃত্যুর কয়েক মাস আগে লেখা – '১৯৭৪'।[১] ১৯৩৭–৭৪ : এই সাড়ে-তিন দশকের কালপরিসরে ফররুখ আহমদের মোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৪ – ৬টি কবিতাগ্রন্থ, ৪টি শিশুতোষ গ্রন্থ আর ৪টি পাঠ্যগ্রন্থ।[২] কবির মৃত্যুর পরের বছরেই "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" সম্পাদনা করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম ফররুখ আহমদের অগ্রন্থিত-অপ্রকাশিত রচনার সংখ্যা বিপুল।[৩] কবির মৃত্যুর পরে তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ পুন:প্রকাশিত হয় এবং একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় তাঁর পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত কয়েকটি গ্রন্থ – প্রায় ২০টি গ্রন্থ। কবির সমগ্র রচনা একত্রীকরণের একটি উদ্যোগও হয় বটে – কিন্তু তা প্রথম খন্ডেই স্তব্ধ হ'য়ে যায়।[৪] এই একত্রীকরণের কাজটি অসম্ভব জটিল – কেননা ফররুখ আহমদের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত রচনার বিপুল পরিমাণ পান্ডুলিপি কবি নিজেই থরে-থরে সাজিয়ে রেখে গেছেন। এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় – নিজের রচনার প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও প্রেম – এবং তাঁর আত্মপ্রত্যয়।

ফররুখ আহমদের এই বিপুল পরিমাণ পান্ডুলিপি মূলত তাঁর পরিবারের কাছেই সংরক্ষিত আছে। এছাড়া নিশ্চয় বিভিন্ন শিল্পীর কাছে আছে তাঁর গানের খাতা বা পান্ডুলিপি। তাঁর কর্মক্ষেত্র ঢাকা রেডিওতেও সন্ধান করলে নিশ্চয় তাঁর গান বা অন্য রচনার পান্ডুলিপি পাওয়া যাবে। অন্য কোনো-কোনো সূত্রেও কোনো-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে পান্ডুলিপি থাকতে পারে। কবির মৃত্যুর পরে অনেক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। খুব-বেশি দেরি করলে তাঁর অমূল্য পান্ডুলিপি নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে যে-কোনো দৈবদুর্বিপাকে।

দুই

কবি তাঁর পান্ডুলিপি রচনা করতেন আঁজি-টানা একসারসাইজ খাতায় বা বড়ো ল্যাবরেটরি খাতায় ; কখনো-বা ছেঁড়া টুকরো কাগজে ; পত্রিকা বা বইএর শাদা পৃষ্ঠায় বা পৃষ্ঠাংশেও লিখতেন অনেক সময়। আর ছিলো তাঁর অবিশ্রাম পরিশোধনের অভ্যাস ; নতুন-লেখা রচনায় তো পরিমার্জনের কাজ চলতোই – প্রকাশিত গ্রন্থ বা

www.pathagar.com

পত্রিকার পৃষ্ঠাতেও কবি অনেক পরিশোধন-পরিমার্জন-পরিবর্ধন-পরিবর্তন করেছেন। প্রথম জীবনে কবি কয়েকটি গল্পও লিখেছিলেন।[৫] তাঁর পান্ডুলিপিরাশির মধ্যে তাঁর রচিত গল্পের কোনো পান্ডুলিপি নেই। কবিতা, গান, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য প্রভৃতির অনেক অবিন্যস্ত পান্ডুলিপি আছে। পান্ডুলিপির সংখ্যা কম-বেশি ৫০টির মতো - এর মধ্যে গানের পান্ডুলিপি ৬-৭টি, ব্যঙ্গকবিতা ৭-৮টি, প্রস্তুত পান্ডুলিপি ৫-৬টি (শিশুতোষ বাদে), শিশুতোষ গ্রন্থের পান্ডুলিপি ১৫-১৬টি।

জীবদ্দশায় প্রকাশিত মূল বইগুলোর মধ্যে একমাত্র "নৌফেল ও হাতেম" (১৯৬১) বইটির কোনো পান্ডুলিপি নেই। "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪), "সিরাজাম মুনীরা" (১৯৫২), "মুহূর্তের কবিতা" (১৯৬৩), "হাতেম তা'য়ী" (১৯৬৬) প্রভৃতি গ্রন্থের ছড়ানো-ছিটোনো পান্ডুলিপিবদ্ধ রূপ পাওয়া যায়। কয়েকটি পান্ডুলিপির বিবরণ। -

১। আনুমানিক ১৯৪৩-৪৪ সালে লেখা একটি 'Labratory Note-book'এ এই কবিতাগুলি দেখা যাচ্ছে : ১. নিশান-বরদার ২. ডাহুক ৩. খলিফাতুল মুসলেমিন [পেন্সিলে লেখা] ৪. দোয়েলের শিস ৫. লাশ ৬. আউলাদ ৭. কম্‌লিওয়ালা (অন্ধকার যুগে মানবাত্মার অভিনন্দন-গীতিকা) ৮. জাগো ইসলাম সূর্য-দীপ্তি ৯. আচ্ছালাতো খায়রুম মিনাননাউম ১০. [নামহীন কবিতা বা গান] ১১. সিন্ধু-শকুন ১২. পারফিউম [কেটে 'ঝরোকায়' করা হয়েছে] ১৩. এই সংগ্রাম দিন-রাত্রির তীরে ১৪. ধূলি ১৫. [ইকবালের বু' আলী কলন্দর] ১৬. নিশান। এই খাতার 'লাশ' কবিতাটি কবির সর্বাধিক খ্যাতি-সম্পন্ন কবিতার অন্যতম। 'লাশ' কবিতার পান্ডুলিপিতে এক টুকরো উল্লেখযোগ্য সংবাদ : 'ফ্যাসি-বিরোধী বৈঠকে পঠিত'। ফ্যাসি-বিরোধী বৈঠকে ফররুখ আহমদের যাতায়াত ছিলো - চিন্মোহন সেহানবীশ প্রদত্ত তথ্যের সমর্থন এখন পাচ্ছি।[৬] 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত (আশ্বিন ১৩৫০) 'লাশ' কবিতাটি যে সুকান্ত ভট্টাচার্য-সম্পাদিত "আকাল" (১৯৪৪) নামে মন্বন্তর-বিষয়ক কবিতার সংকলনে গৃহীত হয়েছিলো, তার একটি সূত্র হয়তো এখানে আছে। 'সিন্ধু-শকুন'[৭] কবিতাটি এই :

সিন্ধু-শকুন পার হল যবে ফেন-উত্তাল নিবিড় রাত
ঝলশি' উঠিল আঁধার তনুর বাঁধন-মুক্ত নীল প্রভাত
সম্মুখে তার সাগর-বেলার পটভূমিকায় লাল প্রবাল
বিগত দিনের জীর্ণ বৃন্তে পাপড়ি মেলেছে আগামীকাল

ঝড়ের আঘাতে ঘূর্ণাবর্তে বিক্ষত তনু আজি সবল
তীক্ষ্ণ সূর্য-দৃষ্টিতে আজ মাপিছে অতল সাগর-জল

www.pathagar.com

ঝড়-তরঙ্গে ফেন-সমুদ্র সংঘাতে তার নিটোল তনু

পুষ্ট পালকে পিছলিয়া পড়ে পদ্মরাগের বর্ণধনু।

২। আনুমানিক ১৯৪৩-৪৪ সালে লেখা আরেকটি খাতায় রয়েছে এই কবিতাগুলি : ১. উমর-দারাজ-দিল ২. হে নিশানবাহী ৩. আবুবকর সিদ্দিক (রা.) ৪. আলী হায়দার ৫. সিন্দবাদ ৬. হজরত ওসমান ৭. [এলো শবে-বরাত] ৮. শেষে। এর মধ্যে 'সিন্দবাদ' কবির প্রথম কবিতাগ্রন্থের প্রথম কবিতা। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো 'সওগাত' পত্রিকায় (পৌষ ১৩৫০)। পান্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে এই কবিতার শীর্ষদেশে কবি পুঁথি থেকে চারটি পঙক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

বড়ই তাজ্জব তুমি না চেন ইহারে।

সিন্দবাদ জাহাজী থাকেন এই ঘরে॥

তামাম দরিয়া আইল সফর করিয়া।

এ খাতেরে ডাকে তারে জাহাজী বলিয়া+ – আলিফ লায়লা

প্রকাশকালে কবি এই চার পঙক্তি বর্জন করেছিলেন। কিন্তু এ থেকে বোঝা যাচ্ছে : পুঁথিসাহিত্য ফররুখ-মানসে প্রথম থেকেই প্রবলভাবে সক্রিয় ছিলো। 'শেষে' নামে এই খাতার শেষ কবিতাটি এরকম :

যেদিন আমার কাজ ফুরোবে

সেদিন আমায় ডাকে যেন মাটি

মায়ের মত মেলেছে সে

কোমল স্নেহে যেথায় শীতলপাটি

সেই ধূলিতে মায়ের সাথে

মিশবো আমার মায়ের শ্যামল দেহে

মাটি হয়ে মিশবো মাটির

গভীর বুকের অতল মধুর স্নেহে

রইবে পড়ে এই এপারের

তুফান ঝড়ের প্রবল কোলাহল

মাটির মাঝে মিশবো যেদিন

মাটিতে মোর মিশবে তনুতল।

www.pathagar.com

৩। "পরিপূরক" নামে একটি খাতায় নিম্নোক্ত কবিতা : ১. ["সিরাজাম মুনীরা"র অংশবিশেষ] ২. তায়েফের পথে ৩. উল্কা ৪. গজল ৫. সাহসিকা ৬. কাফেলা।

৪। "কওমী গান" (গানের খাতা)।

৫। "হাল্কা লেখা" (ব্যঙ্গকবিতা)।

৬। "আমপারা" (২৯টি সুরার অনুবাদ আছে)।

৭। "টুকরো কবিতা" (ব্যঙ্গকবিতা)। সর্বশেষ তারিখ : আগস্ট ১৯৫৭।

৮। "পেঁয়াজ ও পয়জার" (ব্যঙ্গকবিতা)। সূচিপত্র : ১. জাল ভেজালের গান ২. জটিল পরিস্থিতি ৩. রংবাজীর গান ৪. একতান ৫. ভোটরঙ্গ ৬. যুক্তফ্রন্ট ট্রাজেডী ৭. টেডী তত্ত্ব ৮. সংঘের গান ৯. ভুয়া লেখক ১০. পার্টি পলিটিক্স ১১. উদ্দেশ্যমূলক রচনা ১২. গদাবলী বা গদ্যকবিতা ১৩. মোবারকবাদ ১৪. [ইসলামী দোহাই ১৫. পঞ্চভূত ১৬. পল্লীগীতি ১৭. লৌকিক ছড়া ও লোকালয়ের গান] ১৮. .... ১৯. হনুমানের গান ২০. ঔচিত্যবোধের গান ২১. উদ্দীপনা-গীতি ২২. রমনা গ্রীনে ২৩. আলাপ-আলোচনা ২৪. পেঁয়াজ ও পয়জার।

৯। ফারুক-মাহমুদ-সম্পাদিত "ধোলাই কাব্যে" (প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৬) ফররুখ আহমদের অনেকগুলি কবিতা আছে। "ধোলাই কাব্যে"র প্রথম সংস্করণের একটি কপিতে কবি নিজে কিছু সংশোধন-পরিবর্তন করেন। কবি নিজেই "ধোলাই কাব্যে"র দ্বিতীয় সংস্করণের একটি পান্ডুলিপি তৈরি করেন নিজস্ব কবিতা দিয়ে। এই পান্ডুলিপির সূচিপত্র : ১. ওলন্দাজের ছড়া ২. টেডী সংবাদ ৩. ভুয়া নেতা ৪. ময়লানা ডিগবাজী খাঁর ভেল্কী ৫. আহা বেশ বেশ ৬. চোরাই যাত্রা ৭. ঘোড়েল বোয়ালের জারী ৮. ল্যাম্পপোষ্টের জারী ৯. লোকদেখানো জারী ১০. ছাগমারী কনফারেন্স ১১. কেঁদো হোলা ১২. মুজাহিদের যম ১৩. জনসেবা য়্যুনিভার্সিটি ১৪. শ্যাক সাহেব ১৫. মীর্জা সাহেব [১৬. গুল গণতন্ত্র ১৭. খতিয়ান]। আলাদা কাগজে লেখা দুটি কবিতাও এর সংলগ্ন : ১. বোকাডেমী : মোল্লা কিস্তীমাত ২. ইয়ারবাজের কবিতা : ইয়ারবাজ।[৮]

১০। পঞ্চভূত/পল্লীগীতি সংগ্রহ/লৌকিক ছড়া ও লোকালয়ের গান/খুচরো কবিতা ও খরচা গান।

১১। "কাব্যগীতি" (গানের খাতা – ২টি – লাল খাতা ও কালো খাতা)।

১২। "রসরংগ" (খসড়া খাতা ও মূল খাতা – ২টি খাতা)।

www.pathagar.com

১৩। "মাহফিল" (গানের খাতা – ২টি)। প্রথম খন্ড : পূর্ণাঙ্গ। দ্বিতীয় খন্ড : তালিকা।[৯]

১৪। "পিন্টুর কাহিনী" (ছোটোদের গল্প)।

১৫। 1951-চিহ্নিত একটি খাতা (গানের খাতা)।

১৬। "জোড় হরফের খেলা" (শিশুদের বর্ণশিক্ষা)।

১৭। "খুশীর ছড়া" (ছোটোদের লেখা)।

১৮। "নতুন লেখা" (ছোটোদের লেখা)।

১৯। "দিলরুবা" (সম্পূর্ণ সনেট-কাব্য)। পত্রিকা থেকে পরিবর্তিত এবং পরিশোধিত শেষ পাঠ। দুটি উৎসর্গ-কবিতা আছে, দুটিই কেটে-দেওয়া : ১. সহস্র রাত্রির অপরিচিতার প্রতি ২. অজান্তিকার প্রতি।

২০। "হাতেম তায়ী" : পহেলা সওয়াল (১টি খাতা)।

২১। "ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য"। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।[১০]

২২। "আল্লামা ইকবালের নির্বাচিত কবিতা"। কবিকৃত সূচিপত্র : ১. শাহীন (add : জওয়াব-ই-শিকওয়া থেকে, তারেকের দোওয়া, ওয়াতান ও মিল্লাত, খিজিরেরা) ২. আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন ৩. গজল ও গীতিকা [৪. তারেকের দোয়া] ৫. কর্ভোভা মসজিদ ৬. জামানা ৭. ইকবাল থেকে/ওয়াতান ও মিল্লাত ৮. আলমে বরজাখ ৯. ইনকিলাব ১০. খোদার ফরমান ১১. আসরারে খুদী : সূচনা খন্ড ১২. আসরারে খুদী থেকে (add রমুজ-ই-বেখুদী থেকে) ১৩. কালামে ইকবাল ১৪. বু'আলী কলন্দর ১৫. শিশুদের জন্য ১৬. পাঞ্জাবের পীরজাদাদের উদ্দেশ্যে ১৭. ইকবাল-কণিকা। – কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত "ইকবালের নির্বাচিত কবিতা" বইএ ক্রমভঙ্গ করা হয়েছে।[১১]

২৩। "মুহূর্তের কবিতা"। রচনাকাল ১৯৫১–৫৯। "মুহূর্তের কবিতা"র সনেটগুলি আছে, আর আছে "হাতেম তায়ী"র অংশ। কবি বারবার "সিরাজাম মুনীরা" ও "মুহূর্তের কবিতা"র পাঠ-পরিবর্তন করেছেন। "মুহূর্তের কবিতা" গ্রন্থ প্রকাশের পরে পাঁচ-ছয়টি সূচিপত্র করেছেন বিভিন্ন খাতায়। "মুহূর্তের কবিতা"র পরিশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ যথাযথভাবেই মুদ্রিত হয়েছে – কিন্তু অন্যায়ভাবে কবির উৎসর্গ-পত্র পরিবর্তন করা হয়েছে।[১২]

২৪। "কুরআন-মঞ্জুষা" (সুরা মুনাফেকুন, সুরা তাগাবুন, সুরা মুলক, সুরা মুজাম্মিল)। এটি কবির শেষ-পর্যায়ের অনুবাদকর্ম – বাংলাদেশের জন্মের পর কৃত।

www.pathagar.com

২৫। ব্রিটিশ আমলের একটি খাতা (কুরআন-শরীফের তরজমা : ১. সুরা কমর : চাঁদ ২. সুরা ইয়াসিন : মানুষ)।

২৬। সবুজ-রঙা একসারসাইজ খাতা। প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা : কবিতাগুচ্ছ (১৯৫১)। প্রথম পৃষ্ঠাতেই চার পঙক্তির একটি শিশুতোষ কবিতা :

"বুলবুলি গো বুলবুলি
কোথায় যাবে সুর তুলি?"
বুলবুলি কয়, "খানে কা'বা ; – কা'বা ঘরে যাই
চলার পথে খোদার হাম্‌দ ; নবীর তারিফ গাই॥"

[হরফ নিয়ে লেখা]

কবিতার সূচিপত্র : ১. বাদগর্দ হাম্মাম ২. রকপাখী ৩. নকীব ৪. শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে : এক ৫. শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে : দুই ৬. স্মরণী : দুই ৭. স্মরণী : এক ৮. কবির অন্তিম শয্যা স্মরণে ৯. হবীবুল্লাহ বাহারের ইন্তেকালে ১০. নজরুল ইসলাম : এক ১১. নজরুল ইসলাম : দুই ১২. অভিনয় ১৩. অতন্দ্র ১৪. সিলহেট রেলস্টেশনে একটি শীতের প্রভাত ১৫. অঝোর ধারায় বৃষ্টি ১৬. বাদগর্দ হাম্মামের অন্ধকারে (এক : প্রশ্ন, দুই : পুনরাবৃত্তি, তিন : ভ্রাম্যমাণ, চার : ভ্রান্তি) ১৭. সাম্পান মাঝির গান : এক ১৮. সাম্পান মাঝির গান : দুই ১৯. সফর-নামা ২০. শেরে বাংলার মাজারে ২১. প্রাচীন পুঁথি-রচয়িতাদের উদ্দেশ্যে ২২. বীভৎস নগরী ২৩. বিরতি ২৪. একটি স্বাভাবিক মৃত্যু ২৫. মৃত্যু-রহস্য ২৬. ময়নামতীর মাঠে : ২ক ২৭. ময়নামতীর মাঠে : ২খ ২৮. ছেলে-ভোলানো গান ২৯. প্রাচীন সড়ক ৩০. চৈত্রের কবিতা ৩১. বৈশাখী ৩২. শাহ আবদুল লতিফ ভিটাইয়ের কবিতা (ফকীর, বীর) ৩৩. আরব জাহান (এক-দুই-তিন) ৩৪. আম কুড়ানি বাও ৩৫. আমের ছুটি (এক-দুই-তিন-চার) ৩৬. গান (নতুন দিনের বার্তা আনো) ৩৬. গান (এল রে আজ সাল পহেলি) ৩৭. (লক্ষ শহীদের খুনে ভাসমান এ রক্ত কমল) ৩৮. শহীদ স্মরণে ৩৯. চতুর্দশপদী।

তিন

কয়েকটি গ্রন্থের সম্পূর্ণ পান্ডুলিপি রচনা করেছেন ফররুখ আহমদ ("দিলরুবা", "হাবেদা মরুর কাহিনী", "ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য", "আল্লামা ইকবালের নির্বাচিত কবিতা" প্রভৃতি)। শিশুতোষ গ্রন্থেরও অনেকগুলি পান্ডুলিপি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু ফররুখ আহমদের অধিকাংশ পান্ডুলিপি বিমিশ্র। এসবের মধ্যে কবির কাব্য-অভ্যাসের নানারকম সংবাদ পাওয়া যায়। তার একটি হচ্ছে : কবি প্রায়ই তাঁর পরিকল্পিত গ্রন্থের সূচিপত্র তৈরি

www.pathagar.com

করতেন বা তাঁর পরিকল্পিত গ্রন্থের নামগুলি লিখে রাখতেন। "নতুন লেখা" নামে শিশুতোষ একটি গ্রন্থের পান্ডুলিপিতে তাঁর প্রকাশিত ও পরিকল্পিত গ্রন্থের দু-ভাগে ভাগ করা (শিশুতোষ ও কবিতা) দুটি তালিকা পাচ্ছি আমরা : (ক) পাখীর ছড়া, ফুলের ছড়া, ছড়ার আসর, পাগলা ইঞ্জিন, পোকামাকড়, চিড়িয়াখানা, পাখীর বাসা, আলোকলতা, নতুন লেখা। (খ) সা সা মা, সিরাজাম মুনীরা, হাতেম তা'য়ী, মুহূর্তের কবিতা, জোহাকের মৃত্যু, ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য, তসবির-নামা, হাল্কা লেখা, রসরংগ, অনুস্বার, বিসর্গ, হাবেদা মরুর কাহিনী, রক্তগোলাপ, হে বন্য স্বপ্নেরা। – সম্ভবত এই তালিকা ষাটের দশকের শেষদিকে প্রণীত হয়েছে। এখানে উল্লিখিত গ্রন্থাবলির মধ্যে কয়েকটি তাঁর জীবদ্দশায়, কয়েকটি মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে ; আর কয়েকটি আদৌ প্রকাশিত হয়নি।

"নির্বাচিত কবিতা" নামে একটি চয়নিকা প্রকাশের ইচ্ছা ছিলো তাঁর।[১৩] এজন্যেও কবি তাঁর গ্রন্থাবলির একটি তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন। এখানে পাওয়া যাচ্ছে ১৫টি বইয়ের নাম : ১. সাত সাগরের মাঝি (ক সিন্দবাদ, খ বা'র দরিয়ায়, গ দরিয়ায় শেষ রাত্রি) ২. সিরাজাম মুনীরা (ক সিরাজাম মুনীরা) ৩. কাফেলা ৪. হে বন্য স্বপ্নেরা ৫. অনুস্বার বিসর্গ ৬. রুবাইয়াত হায়াত দারাজ খান ৭. হালকা লেখা ৮. টুকরো কবিতা ৯. কবিতাগুচ্ছ ১০. ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য ১১. তসবির-নামা ১২. নৌফেল ও হাতেম (৩য় অঙ্ক) ১৩. হাতেম তা'য়ী ১৪. হাবেদা মরুর কাহিনী ১৫. মুহূর্তের কবিতা।

২-চিহ্নিত খাতায় "কাফেলা" গ্রন্থের একটি প্রাথমিক তালিকা আছে – যার মধ্যে "সিরাজাম মুনীরা"র কবিতাগুলি উল্লিখিত। ২৫-চিহ্নিত পান্ডুলিপিতে 'সংযোজন' শীর্ষক একটি তালিকা আছে : ১. লক্ষ শহীদের রক্তে ২. একটি ঘাসের ফুলে ৩. স্মরণী : মুনশী মেহেরুল্লা ৪. ইসমাইল হোসেন সিরাজী ৫. শেরে বাংলা ৬. রূপচ্ছন্দার কবি ৭. হাবীবুল্লাহ বাহার ৮. আবদুল মালেক ৯-১০. শহীদ স্মরণে ১১. নকীব ১২. অতন্দ্র ১৩. অঝোর ধারায় বৃষ্টি ১৪. সফর-নামা ১৫-১৬. ময়নামতীর মাঠে ১৭-২০. বাদগর্দ হাম্মামের অন্ধকারে ২১. মৃত্যু-রহস্য ২২. প্রাচীন সড়ক ২৩. চৈত্রের কবিতা ২৪. টঙ্গীর শহরে। এছাড়া : ১-২. কাজী নজরুল ইসলাম ৩. বুনিয়াদ ৪. বিরতি ৫-৬. পূর্ণমেঘ ৭. অন্য শহর। তারপর : ১. রাত্রির কবিতা ২. রাত্রির ঘটনা ৩. রাত্রিশেষের কাহিনী ৪. অশেষ।

এইসব অজস্র চালাচালির মধ্যে এটা প্রমাণ হয় যে, ফররুখ আহমদ এক-একটি গ্রন্থ প্রকাশের আগে তার সম্পাদিত রূপের জন্যে কতো গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতেন। নিজস্ব কবিতার নানারকম সংকলন প্রকাশেরও বাসনা ছিলো তাঁর। মধ্য-ষাটের দশকে প্রস্তুত একটি নীলবর্ণ শিশুতোষ গ্রন্থের পান্ডুলিপিতে এরকম দুটি গ্রন্থের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। তার একটির নাম "সমকালীন কবিতা", আর-একটি "সমকালীন

www.pathagar.com

প্রেমের কবিতা"। "সমকালীন কবিতা"র কবিকৃত সূচিপত্র : ১. বা'র দরিয়ায় ২. লাশ ৩. চতুর্দশপদী (অঝোর ধারায় বৃষ্টি, সফরনামা, টঙ্গীর শহরে) ৪. কো'কাফ ৫. নৌফেলের স্বগতোক্তি ৬. কয়েকটি গদ্যকবিতা ৭. তসবির-নামা (৫) ৮. ঝড়ের ইশারা ওরা জানে (গান)। "সমকালীন প্রেমের কবিতা"র কবিকৃত সূচিপত্র : ১. কাল এসেছিল ২. শাহরিয়ার ৩. ঝরোকায় ৪. দিলরুবা (প্রথম গুচ্ছ) ৫. হাতেম তা'য়ী ও আশিক সওদাগর ৬. নাম ৭. গান ও গজল (ঝড়ের পাখায় আমরা বেঁধেছি বাসা)।

কবির মৃত্যুপরবর্তীকালে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থ – "হে বন্য স্বপ্নেরা"[১৪] ও "কাফেলা"[১৫] – এই দুটি গ্রন্থের কোনো পান্ডুলিপি পাওয়া যায়নি ; কিন্তু দুটি বইএরই কবি-প্রণীত কবিতার তালিকা আছে – ঐ তালিকা থেকেই বই দুটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

তাঁর কোনো-কোনো বিজ্ঞাপিত বই শেষ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। "আজাদ করো পাকিস্তান" (১৯৪৬) গ্রন্থে "ঘুঘু সংবাদ" নামে কবির প্রকাশিতব্য একটি বইএর বিজ্ঞাপন আছে ; শেষ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি – এই বইএর প্রকাশিতব্য কবিতাগুলি "অনুস্বার" নামক পান্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত আছে।

কবির পান্ডুলিপিরাশির মধ্যে এখনো অনেক অপ্রকাশিত বা অগ্রন্থিত রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন : ১. 'শিরী ফরহাদ' নামে একটি খসড়া কাব্যনাট্য – যা কবি সম্পূর্ণ করেননি ; ২. ইতিহাসধর্মী একটি নাটকের খসড়া ; ৩. একটি গদ্যরচনার খসড়া। সম্পূর্ণ, কিন্তু কাটাকুটি আছে। 'আলিফ লায়লা : নব পর্য্যায় হাজার দুই রাতের কিসসা (বুড়া খান্নাসের পয়দায়েশ ও তাহার আজীব বয়ান)।' – হায়াৎ দারাজ খান পাকিস্তানী।

একটি পান্ডুলিপিতে কবির হাতের লেখায় কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কবিতার একটি ক্ষুদ্র কিন্তু মূল্যবান তালিকা পাওয়া যায়। তালিকাটি এই : (ক) 'নবযুগ' : ১. লক্ষ ধ্বংসস্তূপ ২. লক্ষ প্রাণকণা ৩. দোলার বাহিরে থেকে ৪. শাহেরজাদী ৫. পটভূমি। (খ) 'জীবাণু' : ১. সমাপ্তি। (গ) 'নবশক্তি' : ১. নোঙর।

কোনো-কোনো কবিতার পান্ডুলিপিবদ্ধ রূপ কবির অভিপ্রায় বুঝে নিতে সহায়তা করে। একটি ছোট্ট একসারসাইজ খাতায় দুটি রচনা আছে : ১. সাত ডাকাত আর হাতেম তা'য়ীর কিসসা (শিশুতোষ গদ্যরচনা) ২. বৈশাখ (দীর্ঘ কবিতা)। 'বৈশাখ' নামক দীর্ঘকবিতাটির[১৬] একটি ক্ষুদ্র গদ্য-ভূমিকা রচনা করেছিলেন কবি। পত্রিকায় বা গ্রন্থে প্রকাশকালে বর্জিত এই ভূমিকাটি এখানে উদ্ধৃত করা হ'লো :

> পশ্চিম বাংলার উষর রুক্ষ রাঢ় এলাকায় বৈশাখ অসহ্য তাপের জন্যই সুপরিচিত, ঘর্ম ও তাপে সেখানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তাতে মানুষ অবসন্ন অসহায় হয়ে পড়ে। কিন্তু উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলা নিয়ে গঠিত সাগর-বিধৌতা, শস্য-শ্যামলা, নদী-কুন্তলা পূর্ব পাকিস্তানে বৈশাখ শুধু অসহ্য উত্তাপের জন্যই নয়, প্রচন্ড ঝড়ের

www.pathagar.com

জন্যও সুপরিচিত। ঝড় এবং বৈশাখ এখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এক অভিন্নসত্তা। বৈশাখের এই মারাত্মক ঝড়ের সঙ্গে সংগ্রামী নারী-নর আজন্ম সুপরিচিত।

এই পরিপ্রেক্ষিত জানার পর বাংলায় রচিত আবহমান বৈশাখী কবিতার ধারাবাহিকতায় ফররুখ আহমদের 'বৈশাখ' কবিতার বিশিষ্টতা পরিষ্কার হ'য়ে যায়। আর ফররুখের কবিতা, বিশেষত 'বৈশাখ', যতোই আবেগী হোক, তার পিছনেও যে-সুচিন্তা ও সুপরিকল্পনা কাজ করে, তার সাক্ষ্য দেবে 'বৈশাখ' কবিতার পূর্ব-পৃষ্ঠায় লেখা কবির এই নোট :

বৈশাখের পটভূমি

বৈশাখের আগমনী

বৈশাখের আবির্ভাব

বৈশাখের প্রতি কবির উক্তি

Conclusion

এই পাঁচটি স্তরের অন্তত চারটি স্তর কবি পান্ডুলিপির পৃষ্ঠায় চিহ্নিত করেছেন : (১) পটভূমি (প্রথম ৪ স্তবক), (২) আগমনী (৭ স্তবক), (৩)আবির্ভাব (৬ স্তবক), (৪) উপসংহার (২ স্তবক)। কিন্তু এ প্রমাণ দিচ্ছে, ফররুখ আহমদের রোমান্টিক মানসের মধ্যে ধ্রুপদী নিরাসক্ত স্বভাব মিশেছিলো।

জীবনের শেষ-পর্বে ফররুখ আহমদ স্বরচিত পান্ডুলিপিগুলি সংস্কৃত, পুনর্লিখিত, পরিমার্জিত, সজ্জিত, বিন্যস্ত করেছিলেন সযত্নে। বেতারে সম্প্রচারিত তাঁর অজস্র গান সংগ্রহ করছিলেন – গানের পাশে-পাশে সুরকারের নামও লিখে রাখছিলেন। গদ্যরচনার বাসনাও ছিলো – কিন্তু লিখতে পারেননি বা সময় পাননি। আত্মপ্রত্যয়ী ফররুখ নিজের লেখার মূল্য ঠিকই জানতেন। ১৯৭৪এর অক্টোবরে ফররুখ ইন্তেকাল করেন। ঐ মাসেই তিনটি একসারসাইজ খাতা কিনেছিলেন – তার পৃষ্ঠাগুলি শাদাই র'য়ে গেছে। কিছুই লেখা হয়নি। অনেক পান্ডুলিপি ও পত্রকর্তিকা ফররুখ রেখে গেছেন সত্যি – কিন্তু পান্ডুলিপির বাইরে পত্রিকার পৃষ্ঠাতেও ছড়িয়ে আছে অনেক অগ্রন্থিত লেখা। নিশ্চিতভাবে বহু কবিতা ও অন্য লেখা হারিয়ে গেছে।[১৭] কিন্তু তার পরেও পান্ডুলিপি আকারে ফররুখের যে-বিচিত্রবিপুল রচনাবলি সংরক্ষিত আছে, তাকে 'বিস্ময়কর' বললে কমই বলা হয়+

---

১ 'ফররুখ আহমদের প্রথম প্রকাশিত কবিতা', "দরোজার পর দরোজা" : আবদুল মান্নান সৈয়দ। ১৯৯১। বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা।

www.pathagar.com

২ "ফররুখ আহমদ" : আবদুল মান্নান সৈয়দ। ১৯৮৮। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩ "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" : আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত। ১৯৭৫। ফররুখ স্মৃতি তহবিল, চট্টগ্রাম।

৪ "ফররুখ-রচনাবলী" (প্রথম খন্ড) : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত। ১৯৭৯। আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

৫ "ফররুখ আহমদের গল্প" : আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত। ১৯৯০। সৃজন, ঢাকা।

৬ "৪৬ নং : একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে" : চিন্মোহন সেহানবীশ। ১৯৮৬। রিসার্চ ইন্ডিয়া পাবলিকেশনস, কলকাতা।

৭ 'সিন্ধু-শকুন' শব্দটি জীবনানন্দ দাশ থেকে উড়ে এসেছে।

৮ "ধোলাই কাব্য" : ফারুক মাহমুদ-সম্পাদিত। ১৯৮৬। নয়া দুনিয়া পাবলিকেশনস, ঢাকা।

৯ "মাহফিল" (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) : ফররুখ আহমদ। ১৯৮৭। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

১০ "ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য" : ফররুখ আহমদ। ভূমিকা : আবদুল মান্নান সৈয়দ। ১৯৯১। বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা।

১১ "ইকবালের নির্বাচিত কবিতা" : ফররুখ আহমদ। ১৯৮০। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা।

১২ "মুহূর্তের কবিতা" : ফররুখ আহমদ। প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৩। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী-সম্পাদিত পরিশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৭৮। বর্ণমিছিল, ঢাকা।

১৩ আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত "ফররুখ আহমদের নির্বাচিত কবিতা"। ১৯৯২। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

১৪ "হে বন্য স্বপ্নেরা" : ফররুখ আহমদ। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী-সম্পাদিত। ১৯৭৬। ফররুখ আহমদ কেন্দ্রীয় স্মৃতি সংসদ, চট্টগ্রাম।

১৫ "কাফেলা" : ফররুখ আহমদ। ১৯৮০। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৭। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

১৬ 'বৈশাখ' কবিতাটি "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" ও "কাফেলা" গ্রন্থদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত।

১৭ এইসব রচনার মধ্যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে 'বিষ্ণু দে' শীর্ষক একটি অসামান্য কবিতার লুপ্তিতে।

www.pathagar.com

পত্রাবলি

ভূমিকা

ফররুখ আহমদ ছিলেন অফুরানভাবে সৃষ্টিশীল – কিন্তু কবিতায় ; গদ্যরচনায় অনেকখানি অনীহ। ফলে তাঁর গদ্যরচনা তাঁর কবিতার তুলনায় একেবারেই কম। চিঠিপত্র লেখাতেও খুব আগ্রহী ছিলেন ব'লে মনে হয় না। নেহাৎ-দরকারে সামান্য কিছু চিঠি লিখেছেন। বত্রিশ বছরের পরিসরে লেখা (প্রথম পত্র রচনাকাল ১৯৪১ ; সর্বশেষ পত্ররচনার আনুমানিক সময় ১৯৭৩) তাঁর মাত্র কুড়িটি চিঠি আমরা পেয়েছি। আমাদের লাভ এই : ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাহিত্যিক এই কুড়িটি পত্রের মধ্য দিয়ে ফররুখ-মানস একটু ঘনিষ্ঠতর জানতে পারি। জানতে পারি : ফররুখ আহমদের আধ্যাত্মিকতা-ধার্মিকতার উন্মেষ (অনেকে যেমন ভাবেন) "সিরাজাম মুনীরা"র প্রকাশকাল ১৯৫২ থেকে নয় – তারও এক দশক আগে থেকেই – তাঁর প্রথম পর্যায়েই। জানতে পারি : ১৯৪৩ সালেই – পঁচিশ বছর বয়সেই – তৈরি হ'য়ে যাচ্ছে তাঁর মানসের নির্মলতা, পুলিশ অফিসের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন চাকরি পাওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যেই। তখনই স্ত্রীকে লিখছেন, 'মানুষের ঈমানই বড়ো কথা – পোষাক খুব সামান্য জিনিষ।' তখনই যেন স্ত্রীকে তৈরি ক'রে নিচ্ছেন ভাবী জীবনের কৃচ্ছ্র সাধনার জন্যে, 'আল্লাহতায়ালার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে থাকতে হবে। জীবনে অনেক দুঃখদৈন্য আসে, ধৈর্য ধরে থাকতে না পারলে শুধু ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু লাভ হয় না।' (পত্র ৩) চিঠিপত্রে দেখা যাচ্ছে : তরুণ কবি ও লেখকদের সবসময় উৎসাহিত করেছেন ফররুখ। আবার এঁদের কাউকে যখন লিখছেন, 'মৌলিক প্রচেষ্টায় তোমার হাতে নাট্যকাব্য অথবা মনোলগ জাতীয় লেখা ইনশাআল্লাহ আরো ভালো হবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।' (পত্র ১০), তখন তাঁর নিজেরও কাব্য-অন্বিষ্ট ধরা প'ড়ে যাচ্ছে। ফররুখ এই পত্ররচনার তারিখ দেননি, পত্রপ্রাপক জানিয়েছেন পত্রপ্রাপ্তির তারিখ ২৩-৭-১৯৫২। ফররুখ-প্রণীত "নৌফেল ও হাতেম", "ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য" ইত্যাদির কথা মনে প'ড়ে যায় আমাদের। ঐ পত্রেই জাতীয় ইতিহাস ও পুঁথিসাহিত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণও একই চিন্তার দ্যোতক। আবার, গদ্যরচনার জন্য সমকালীন লেখক-বন্ধুকে তারিফ করছেন (পত্র ১১)। তাঁর দরদী চিত্তের প্রকাশও পত্রাবলিতে পাওয়া যাবে (পত্র ১৮)। সব-মিলিয়ে এই পত্রাবলি থেকে অন্তরঙ্গ এক ফররুখ আহমদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় – কেননা দুটি বাদে এর কোনোটিই মুদ্রণ বা প্রকাশের উদ্দেশ্যে রচিত নয়। সব-মিলিয়ে এই পত্রাবলি থেকে ফররুখ-মানসকে আরেকটু পরিচ্ছন্ন ও ঘনিষ্ঠভাবে জেনে নিতে পারি আমরা।

www.pathagar.com

১

[আনুমানিক মওলানা আবদুল খালেককে]

অনেকদিন আপনার কোন সংবাদ পাইনি। আশা করি ভাল আছেন।

আমি সিটি কলেজে ভর্তি হয়েছি।[১]

অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম যেতে পারিনি — সুবিধা হলেই একদিন আপনাকে দেখে আসব।

আমার শরীর এখনো দুর্বল — খাটুনি বেশী পড়েছে তবু মানসিক অবস্থা অত্যন্ত ভালো।

আল্লার রহমতে — আমি যে বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়েছি — তার মধ্যে আপনাকে জেনেছি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্করূপে — [২]

হজরতের,উমর ফারুকের মহান আদর্শ আপনার বুকে সুপ্ত আছে ...সেই অনেন্দের সংবাদ আপনাকে জানালাম।[৩]

আমার ছালাম নেবেন।

পুনশ্চ —

মাসিক 'মোহাম্মদী'র জন্য দুটী সুরা পাঠালাম।[৪] অবসরমত একদিন দেখে 'মোহাম্মদী'তে পাঠিয়ে দেবেন।

২

[সৈয়দা তৈয়বা খাতুন লিলিকে]

প্রিয়া,

ক'দিন আগে তোমার কাছে একখানা চিঠি লিখেছিলাম বোধহয় পেয়েছ। আশা করি ভাল আছ।

তুমি শুনে খুশী হবে যে, আল্লার রহমতে আমি একটা চাকরি পেয়েছি।[৫] তোমাদের আনার জন্য খুব বাসা খোঁজ করা হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে ক'লকাতায় একটি সীট পর্যন্ত পাওয়া কঠিন। দেখা যাক কি হয়। পাওয়া গেলে কলকাতার বাইরেও বাসা নেওয়ার চেষ্টা করা হবে। এখনও খালুজান এবং আমরা সন্ধান নিচ্ছি।[৬]

আল্লাকে ডাকো। আল্লার রহমতে যদি তোমাকে কাছে রাখতে পারি তাহলে আমার কোন দুঃখ থাকে না। শীগগিরই ছুটি হচ্ছে কিন্তু আমি বোধহয় তার আগে মাইনে পাবো না।

www.pathagar.com

আমার নাহার বানু কেমন আছে?[৭]

ইনশাআল্লাহ আমরা শীঘ্রই রওনা হব, সেজন্য এনভেলাপ দিলাম না।

ইতি তোমার

৩

[সৈয়দা তৈয়বা খাতুন লিলি-কে]

প্রিয়তমাসু, যাদবপুর শনিবার

প্রায় মাসখানেক আগে তোমার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছিলাম, তারপর আর কোন খোঁজ পাইনি। আশা করি তুমি ও বকুল ভাল আছো।

ইতিমধ্যে তোমার কাছে একটা কাপড়ের বাণ্ডিল এবং একখানা চিঠি লিখেছি, তারও কোন প্রাপ্তিসংবাদ পাইনি।

আমার মনে হয় তোমার শাড়ী নিয়ে অনেক কথা হয়েছে [।] খারাপ শাড়ী বলে তুমি হয়তো বেজার হয়েছো। শাড়ীখানা খুব খারাপ নয়, শান্তিপুরের শাড়ী। ভাইজান পছন্দ করেছিলেন বলে আমি টাকা দেয়ার সময় আপত্তি করিনি। টাকা চোদ্দ মত দাম নিয়েছিল।

সে কথা থাক্ তুমি বাজে মেয়ের মত মন খারাপ করবে না আশা করি। আম্মা আয়েশার মাত্র একটি জামা ছিল। মদিনার সকল মেয়ের বিবাহের সময় সেইটি কাজে লাগত। মানুষের ঈমানই বড় কথা — পোষাক খুব সামান্য জিনিষ।

আমি তোমাকে খুব ভালভাবে চিন্তা ক'রে দেখতে বলছি। আল্লাহতায়ালার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে থাকতে হবে। জীবনে অনেক দুঃখদৈন্য আসে, ধৈর্য ধরে থাকতে না পারলে শুধু ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু লাভ হয় না। আমি পুলিশ অফিসের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। কারণ ওখানে চাকরি করলে অনেক ক্ষতি হয়। একটা ভালো চাকরির চেষ্টায় আছি, কাল রাতে পীর সাহেব[৮] দোয়া করেছেন। দোয়া ক'রো যেন আল্লাহতায়ালার রহমতে তোমাদের নিয়ে আসতে পারি। ছবক ছেড়ো না। অকারণে মন খারাপ ক'রো না। ... তাড়াতাড়ি সকল খবর জানিয়ে চিঠির উত্তর দিয়ো।

ইতি তোমার

ফুলবাবু

পুনশ্চ :

বকুলের[৯] এবং তোমার কথা সবিস্তার লিখো, বাড়ীর অন্যান্য সকলে কেমন আছেন? এখন চাকুরি নাই বলে তোমাদের ওখানে যাচ্ছি না — কারণ টাকাই এখন

www.pathagar.com

মানুষের ঈমানের চাইতে বড় হয়ে উঠেছে, দোয়া করি তোমার এবং আমার যেন অমন কাফেরী দুর্গতি না হয়॥

৪

[আশরাফ সিদ্দিকী -কে]

MasiK Mohammadi (Illustrated Monthly) Journal,
86 A Lower Circular Road,
Gram : Daily Azad, Calcutta,
Phone : 465, 466

৩১-৭-৪৫

তসলিম বাদ আরজ,

আপনার চিঠি পেয়েছি। ঈদসংখ্যা 'আজাদ' সম্পাদনা করছেন এবনে খলদুনের লেখক আবদুল হাই সাহেব। নতুন লেখকদের সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সজাগ এবং সহানুভূতিশীল। তবুও আপনার লেখার জন্যে আমি বিশেষভাবে তাঁকে বলব। কাজের চাপে খুব ব্যস্ত আছি, শান্তিনিকেতনে যাওয়া হয়তো সম্ভব হবে না। আদমউদ্দিন সাহেবকে আমার সালাম দেবেন। তাঁর পুঁথি-সাহিত্যের ইতিহাস ইতিমধ্যেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[১০]

ইতি—
আপনাদের
ফররুখ আহমদ

৫

[আবদুল হক-কে]

বন্ধুবরেষু,

দুর্গাপুর
১৩-৯-৪৭

আপনার ৮-৯-৪৭ তারিখের লেখা চিঠি বারো তারিখে হাতে এল। বর্তমানে কি কারণে আমার পক্ষে কলকাতা যাওয়া অসম্ভব তা আপনি ভালো ক'রেই জানেন। 'কাফেলা' কর্তৃপক্ষের কাছে আমার ৪০/- পাওনা আছে, টাকাটা পেলে আমার যাওয়ায় আপত্তি নেই।[১১]

'কাফেলা'র পরিচালকবর্গকে আমি যে চিঠি লিখেছিলাম (যা আপনি পৌঁছে দিয়েছেন) তাতে সেপ্টেম্বরের আগে 'কাফেলা'র ভার গ্রহণ করতে আমি অসম্মতি জানিয়েছিলাম। তাঁদের কাছে আমার ঠিকানা ছিল। এ পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে কোন

www.pathagar.com

সংবাদ না পাওয়ায় 'কাফেলা'য় যোগ দেওয়ার কোন কথাই আমার মনে ওঠেনি। অথচ ব্যাপারটা বহুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে যে, আমি নতুন পত্রিকা সম্পাদনা করছি। সুদূর পল্লীতেও বর্তমানে পত্রিকার যে প্রকার চাহিদা দেখা যাচ্ছে তা আনন্দদায়ক।

...সুতরাং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য নতুনভাবে উৎসাহ বোধ করছি। আপনি অনুগ্রহ করে 'কাফেলা' অফিসে গিয়ে তাঁদের মনোভাব অবগত হতে পারেন। আমার কাছে টাকা পাঠালেই আমি কলকাতা রওনা হতে পারি। অন্যত্র কাগজের অফিসে কাজ করতেও আমার আপত্তি নাই। অকারণে বসে থাকা কষ্টকর। তাড়াতাড়ি চিঠির উত্তর দেবেন।

— ফররুখ

৬

[আবদুল হক—কে]

দুর্গাপুর
৫-১-৪৮

বন্ধুবরেষু,

বহুদিন পরে আপনার উৎসাহব্যঞ্জক চিঠি পেয়ে উল্লসিত হয়েছি। কারণ আমার অবস্থা বর্তমানে সেই রূপকথার শেয়ালের মত, যাকে প্রহারান্তে আধমরা অবস্থায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। অবশ্য শেয়ালের সঙ্গে আমার পার্থক্য এইটুকু যে, শেয়ালের অন্নচিন্তা থাকলেও বস্ত্র-সমস্যা ছিল না। আমার ও দুটো ত আছেই, তার উপর আছে পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ চিন্তা। ঐ চিন্তাতেই বিশেষ বিব্রত এবং প্রয়োজনমতো চেষ্টিত ছিলাম বলে সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে হয়েছিল। আপনি যে আত্মবিলোপের কথা লিখেছেন, তা অনেকাংশে ভুল ; কারণ আত্মরক্ষারূপ সংগ্রামে আমাকে কালাতিপাত করতে হচ্ছে।

লেখার দিক থেকে অবশ্য এই কয় মাস একেবারে ফাঁকা যায়নি। ক'দিনের মধ্যেই অনেকগুলো ব্যঙ্গকবিতা (Satire) [ধনতন্ত্র ও অন্যান্য সামাজিক বিস্ফোটকের পক্ষে যা মূল্যবান ওষুধ হতে পারে] এবং দুই-চারটি সামান্য সিরিয়াস কবিতা লিখেছি।[১২] কাগজের অভাবে এতদিন প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এইবার প্রকাশ করার সুযোগ এসেছে। ট্যাকের অস্বচ্ছলতার দরুণ আমাকে বাধ্য হয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পত্রালাপ অথবা সংশ্রব বর্জন করতে হয়েছিল (কারণ পোস্টকার্ড কেনার মত পয়সা প্রচুর সংখ্যায় হামেশাই থাকতো না)। ঐ একই কারণে আপনাকে একখানা অর্ধ-ব্যবহৃত কাগজে ক্ষুদ্র বর্জাইস অক্ষরে চিঠি লিখছি। কারণ পরিস্কার কাগজ আমার তহবিলে নাই।

www.pathagar.com

যাই হোক, কলকাতা যাওয়ার পাথেয় জোগাড় করেছি, কয়েক দিন আহারের বন্দোবস্ত করতে পারলেই আমি অনতিবিলম্বে কলকাতা অভিমুখে পদচালনা করব। হয়তো এ চিঠি পাওয়ার কয়েকদিন পরেই আপনারা এই মহাকবির মুখচন্দ্র (দাড়ি সমেত) দর্শন করে কৃতার্থ হবেন। এই উপলক্ষে প্রাথমিক আয়োজন প্রায় শেষ করে ফেলেছি। নগদ আট আনা খরচ করে জুতো সেলাই এবং কয়েকটি পট্টি সংযোগ করা হয়েছে। এমনকি একটা নতুন কামিজের যোগাড়ও হয়ে যেতে পারে। পুরানো শীতবস্ত্রগুলো বর্তমানে খুব কাজে লাগছে, — সুতরাং যতদিন ধনতন্ত্রের কবর খোঁড়া না হচ্ছে, ততদিন বাধ্য হয়ে বলতে হবে : ধনতন্ত্র জিন্দাবাদ। —

প্রীতিমুগ্ধ

ফররুখ আহমদ

৭

[সালেহা খাতুন ও মেরী খাতুন-কে]

ও ভাই ছালামত ;

তোমাকে চিঠি দিয়েছিলাম। উত্তর দিলে না কেন? কারণ বুঝলাম না। আশা করি সুখে আছো। এবার যা হোক উত্তর দিও।

ইতি—

ফররোখ

মেরী খাতুন।

আপনি কেমন আছেন? চিঠির উত্তর পাওয়া যায় না। কেন জানাবেন।

ইতি

৮

[সুফী জুলফিকার হায়দার-কে]

আলোকপুরী
যাদবপুর
২৪ পরগনা

কবি সাহেব।

কাজী আফসারউদ্দীনের বিবাহোপলক্ষ্যে আপনি উপরের ঠিকানায় একটী কবিতা পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব। সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করা হইতেছে।[১৩]

ইতি

ফররুখ আহমদ

www.pathagar.com

৯

[আবদুর রশীদ খান-কে]

আস্‌সালামু আলায়কুম, ১৭-২-৫১

ভাই,

আবদুর রশীদ, তোমার 'রাত্রি' কবিতাটি আমার ভালো লেগেছে। খুঁটিনাটি সমালোচনা করার সময় এখানে নাই, 'তাহজীবে' ছাপা হ'লে পরে আলোচনা করা যাবে।

মুফাখ্‌খারকে বলে দিও, তার 'আস্‌পে তাজী' (নয়া জামাত চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত) মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[১৪] তোমরা দু'জনেই আমার স্নেহ নিও। দু'জনের কাছ থেকে আরো লেখা চাই।

ইতি

ফররুখ আহমদ

১০

[আবদুর রশীদ খান-কে]

রেডিও পাকিস্তান,ঢাকা

ঈদের সালাম, স্নেহ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এর আগেও তোমার কাছে আর একখানা চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু রোজার ছুটিতে তোমার বর্তমান ঠিকানা কি এবং কোথায়, না জানার দরুন চিঠি পোস্ট করা হয়নি।

তোমার কবিতা সম্পর্কে আমার আগে যে উঁচু ধারণা ছিল, পুস্তকাকারে বাছাই করা কবিতাগুলো পড়ে সে ধারণা আরো উঁচু হয়েছে। সমালোচনা করার মত পাণ্ডিত্য আর কলম আমার নাই। নইলে আমি নিজেই সমালোচনা করতাম। তবু আমাদের সংকীর্ণ কবি ও ক্রিটিক মহলে তোমার বই সম্পর্কে আমি আলোচনার অবতারণা করেছি। তুমি শুনে আনন্দিত হবে যে, সৈয়দ আলী আহসানের মত কড়া সমালোচকও আমার মন্তব্যে সায় দিয়েছেন। অতঃপর "নক্ষত্র-মানুষ-মন"-এর[১৫] কবির কবিতা আগামী দিনের যে কোন বাংলা এ্যানথলজির জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে, এটাই আমার বিশ্বাস।

বইয়ের দুএকটা সমালোচনা আমি পড়েছি। কিন্তু তৃপ্তি পাইনি। সমালোচনার চাইতে স্বকীয় বাহাদুরী অথবা অজ্ঞতা এঁদের আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও "নক্ষত্র-মানুষ-মন" সর্বত্র গৃহীত হয়েছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তোমার কবিতা আরো অনেক বেশী উজ্জ্বল হোক, এটাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

www.pathagar.com

'দ্যুতি', 'সৈনিক' ও অন্যান্য কাগজে সমালোচনার জন্য একটু তৎপর হ'তে হবে। আমার মনে হয় যে 'সৈনিকে'র আবদুল গফুর এ বিষয়ে তোমার সংগে পূর্ণ সহযোগিতা করবে।[১৬] সাহিত্য ও কাব্যসমালোচকের অভাব আমাদের এত বেশী যে, এখন থেকেই আমাদের এ বিষয়ে হুঁশিয়ার হওয়া দরকার।

চিঠি শেষ করার আগে আর একটা কথা বলতে চাই। আশা করি, ক্ষুণ্ণ হবে না। "নক্ষত্র-মানুষ-মন"কে তুমি তোমার সাফল্যের প্রথম ধাপ হিসেবেই গণ্য করবে, আশা করি। মহত্তর কবিতা রচনার জন্যে এখন থেকেই তোমাকে সচেষ্ট হতে হবে। তোমার শেক্‌স্‌পীয়ারের অনুবাদ আমি পড়েছি। মৌলিক প্রচেষ্টায় তোমার হাতে নাট্যকাব্য অথবা মনোলগ জাতীয় লেখা ইনশাল্লাহ আরো ভালো হবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সবশেষে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও পুঁথিসাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুলতানা রিজিয়ার কাহিনী একদা মাইকেলের মত মহাকবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এরকম অসংখ্য কাহিনী আছে যা আধুনিক কবিতার আংগিকে চমৎকারভাবে রসোত্তীর্ণ হতে পারে। চেষ্টা করো। কথা আরো ছিল, দেখা হলে বলবো।

খোদা হাফেজ

ফররুখ আহমদ

পুনশ্চ :

কবে ঢাকায় আসছো জানিও। চিঠি লেখায় আমার স্বাভাবিক উদাসীনতার জন্যে কিছু মনে করো না। "সাত সাগরের মাঝি" ও "সিরাজাম মুনীরা" ছাপা হয়ে গেছে।[১৭] পাঠিয়ে দেবো।

১১

[তালিম হোসেন-কে]

কমলাপুর
১৬-১২-৫২

আস্‌-সালামু আলাইকুম —

মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

খাঁচাটা অচল হয়ে পড়েছে।

নড়নচড়ন রহিত।

নৈলে নিজেই যেতাম মোবারকবাদ জানাতে।

কয়েকবার পড়েছি তোর লেখাটা।

www.pathagar.com

আমি নিজেই প্রেরণা পেয়েছি, পদ্যও লিখে ফেলেছি একটা 'কৈফিয়ৎ' নাম দিয়ে।
আমাদের কথা এবার তোকেই বলতে হবে।
আশা করি মুজাহিদের কলম শেষ পর্যন্ত লড়বে।
এনোফিলিস নয় — রুমী[১৮]–ইকবালের[১৯] খান্দানে শাহীন এবার পাখা মেলবে।
এগিয়ে যাও। আমরা তোমার অনুবর্তী হবো। শরীরটা সুস্থ হলেই আশা করি দেখা হবে।

ইতি

ফররুখ আহমদ

পুনশ্চ :

গদ্যের স্টাইল দেখে একটা লোভ হচ্ছে, কিন্তু এখন নয় পরে জানাবো। বাসায় ওদেরকে আমার স্নেহ জানিও। মিল্লাতের রহীমুদ্দীন সিদ্দিকী[২০] ও হাসান জামানের[২১] সঙ্গে সুবিধামতন একটু আলাপ কোরো।

১২

[আবদুর রশীদ খান-কে]

১নং হুসনে আলম ভিলা
পোঃ ওয়ারী
ঢাকা

ভাই আবদুর রশীদ,

তোমার কথামতো উকিলের নিকট যাইয়া গত বছরের (১৯৫৬) প্রদত্ত প্রকাশকের প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব কপি করিয়া আনিয়াছি। প্রথম মুদ্রণ (সাবমিশনের জন্য) উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সামান্য সংখ্যক হইলেও আজ হুবহু উদ্ধৃত করিলাম।

অতঃপর ১ম ও ২য় ভাগের (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর) দ্বিতীয় ও ৩য় মুদ্রণ এবং ৪র্থ ভাগের মাত্র দ্বিতীয় মুদ্রণ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশক উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলি সবই ১৩৫৭ সন বা ১৯৫১ সালের মধ্যে ছাপা হইয়াছিল। অতঃপর আর কোন মুদ্রণ হইয়াছে কিনা জানি না। গত শুক্রবার তোমার নিকট মামলার পুরা খবর বলিতে পারি নাই।

হাইকোর্টে আমার আপীল গৃহীত হইয়াছে। কেস এ মাসের কজ লিস্টে উঠিয়াছে। এ্যাডভোকেটের নিকট শুনিলাম যে, এ সপ্তাহের যে কোন দিন মামলার শুনানী হইতে পারে।[২২]

কাজেই তুমি যদি আল্লার ওয়াস্তে যথাশীঘ্র (আজ বিকালের মধ্যে হইলে খুব ভাল হয়) আমার হিসাবটা বাহির করিয়া দাও, তাহা হইলে বিশেষভাবে উপকৃত হইব।

www.pathagar.com

হিসাবের দুইটা কপি দরকার হইবে। ভাইয়ের কাছে টাকা আছে। তাহার নিকট সবকিছু জানিতে পারিবে এবং হিসাবের কাগজ দিবে।

নিতান্ত প্রয়োজনেই তোমাকে খাটাইয়া লইতেছি। আশা করি, এটুকু দাবী আমার আছে।

দোওয়াগো

ফররুখ আহমদ

নয়া জামাত	total upto date
১ম ভাগ (৫ম শ্রেণী)	২০,০০০
২য় ভাগ (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	১৭,০০০
৪র্থ ভাগ (৮ম শ্রেণী)	১০,০০০

[printed in 1951 and onward]

১৩

[তৈয়েবুর রহমান-কে]

আস্-সালামু আলায়কুম,

বহু দিন খোঁজ খবর পাই না। আশা করি ভাল আছেন। কিছু টাকার দরকার হ'য়ে পড়েছে (শ দুয়েক মত)। বিশেষ জরুরী ব'লেই আপনাকে বিব্রত ক'রলাম।

এই প্রসঙ্গে আলাপ করার জন্যে আগামী রবিবার সকালবেলায় দেখা ক'রব। আশা করি বাসায় থাকবেন।

ইতি—

১৫।৩।৫৭

— ফররুখ আহমদ

১৪

[আবু জাফর শামসুদ্দীন-কে]

আস্-সালামু আলায়কুম,

মওলানা মুজীবুর রহমান[২৩] সাহেবকে আপনার কাছে পাঠালাম। মওলানা মুহীউদ্দীন[২৪] মূল পুস্তক সংগ্রহ করে দিয়েছেন, কাজেই অথেনটিসিটি সম্পর্কে এবার কোন রকম গণ্ডগোল হবে না বলেই আশা করি।

www.pathagar.com

বর্তমানে আমি কিছুটা ভাল আছি। আশা করি শীগগিরই দেখা হবে।

২৫।১০।৬৩

আরজ গোজার

— ফররুখ আহমদ

১৫

[দৈনিক 'আজাদ' সম্পাদক-কে]

জনাব,

গত বৃহস্পতিবার ৪ঠা শ্রাবণ তারিখের 'আজাদে' 'পাঠ্যবই সম্বন্ধে দু'টি কথা' শীর্ষক চিঠিতে পত্রলেখক জনাব ইব্রাহীম খাঁ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রচলিত বিধির রদবদলের ব্যাপারে — কতকগুলি মন্তব্য করেছেন। তাঁর মন্তব্যের সংগে সর্বত্র একমত হতে না পারায় আমরা আমাদের বক্তব্য আপনার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাচ্ছি।

পত্রের সূচনাতেই শ্রদ্ধেয় খাঁ সাহেব পূর্ববঙ্গ সরকারকে কটাক্ষ করে বলেছেন, 'এ রদবদলের ব্যাপারে তাঁরা জনসাধারণের তরফ হতে কোন আলোচনা পরামর্শ আহবান করেন নাই, বিষয়টা নিজেরাও ভাল করে পরীক্ষা করেন নাই।'

জনাব ইব্রাহীম খাঁ সাহেবের মত প্রবীণ ব্যক্তির মুখ থেকে আমরা এ জাতীয় কথা আশা করি নাই। বস্তুতঃ অতি দীর্ঘ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষার পরই যে প্রাথমিক শিক্ষার বিধি পরিবর্তিত হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করার বৈপ্লবিক পরিবর্তনেই। এদিক দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার জন্য জাতীয় সরকার জনসাধারণের অকুন্ঠ সমর্থন লাভ করেছে। 'বিষয়টা নিজেরাও ভাল করে পরীক্ষা করেন নাই।' — এ জাতীয় কথায় লেখকের আত্মাভিমান পরিতৃপ্ত হলেও শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের প্রতি সুবিচার করা হয়নি বলেই আমাদের ধারণা। অবশ্য আদর্শবাদী লোক নিয়ে পাঠ্যবই বোর্ড গঠন, পাঠ্যবই তৈরীর জন্য গ্রন্থকারদের এক বৎসর সময় দেওয়া ; অনুমোদিত পুস্তক কমপক্ষে চার বৎসর চালু রাখা প্রভৃতি বিষয়ে আমরা তার সঙ্গে একমত।

পত্রের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে 'কোন বিদেশী কোম্পানীকেই বইয়ের একচ্ছত্র অধিকার বা মনোপলী দেওয়া উচিত নয়' — বলে খাঁ সাহেব যে উক্তি করেছেন আমরা সে বিষয়েও তার সঙ্গে একমত। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গেই আমরা একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে রাখতে চাই যে, বিদেশী কোম্পানীর মত কোন দেশী কোম্পানীকেও বইয়ের একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া উচিত নয়। কারণ, যে ক্ষতির ভয়ে আমরা বিদেশী কোম্পানীকে একচ্ছত্র অধিকার দিতে চাইনে, সেই ক্ষতিরই ষোল আনা সম্ভাবনা আছে দেশী কোম্পানীর একচ্ছত্র অধিকারে।

www.pathagar.com

ক্ষতিটা দেশী বা বিদেশী কোন তরফ থেকেই আসা কাম্য নয়। পত্রলেখক প্রকাশকের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে একপেশে কথা বলেছেন। আমাদের এক শ্রেণীর প্রকাশক গত সাত বৎসর প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে দুর্নীতির কালো বাজার চালু রেখেছেন তাঁদের সম্পর্কে অথবা তাঁদের প্রকাশিত পুস্তকাদির কোনরকম সমালোচনা না করেই পুস্তক প্রকাশের অব্যবস্থা অপসারণের জন্য সরকারকে আহবান জানিয়েছেন। বস্তুত 'ভাল টাইপ, ভাল ব্লক আর ভাল আর্ট কাগজ' — এই চার ভালর বন্দোবস্ত সরকার করে দিতে পারলেই যে আমাদের দেশী প্রকাশকেরা সর্বাংগীন 'ভাল' বই বাজারে চালু করে দেবেন সে কথাটাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের জিজ্ঞাসা, ভাল লেখা বাদ দিয়ে প্রতিশ্রুত ভাল বই কি করে প্রকাশ করা সম্ভব? প্রতিষ্ঠিত লেখকদের বঞ্চনা করার উদ্দেশ্যে গত সাত বৎসর আমাদের এক শ্রেণীর অতি বুদ্ধিমান(।) প্রকাশক পাঠ্য-পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে ভুয়া লেখক আমদানী করে পাঠ্য-পুস্তকের মান যে জাহান্নামে নিয়ে গেছেন সেখান থেকে পাঠ্য-পুস্তককে উদ্ধার করার কোন পন্থাই খাঁ সাহেব বাত্‌লান্‌নি উপরন্তু কিছুটা লেখক দরদী সেজে তিনি লেখক ও প্রকাশকদের দু'পয়সা প্রাপ্তি সম্পর্কে উদার মন্তব্য করেছেন।

লেখকদের প্রাপ্তি সম্পর্কে কথাটা এতই হাস্যকর যে, এ বিষয়ে আলোচনা করতেও ইচ্ছা হয় না। এখানে আমরা শুধু একটি মাত্র প্রশ্ন করব। প্রশ্নটা হল এই যে, গত সাত বৎসরে কত টাকা প্রকাশকদের পকেটে আর কত টাকা লেখকদের হাতে এসেছে?

পত্রের সপ্তম অনুচ্ছেদে 'সরকার কর্তৃক কোন কোন পাঠ্যবই প্রকাশের সংকল্প' খাঁ সাহেব 'বিপজ্জনক' বলে মনে করেন। কারণ 'সরকার-প্রকাশিত বই গুণের দিক দিয়ে ভাল হওয়ার কথা নয়।'

—পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের আলোচনা শুধু তিক্ততাই সৃষ্টি করবে। প্রকাশক দরদী জনাব ইব্রাহীম খাঁ সাহেবের বিপদ কোনখানে তা বুঝতে দেরী হয় না। কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে কোনো কথা বলতে চাইনে। আমরা আশা করি যে, ভুয়া লেখকদের পরিবর্তে প্রকৃত গুণী ও অভিজ্ঞ লেখকদের সহযোগিতায় আমাদের জাতীয় সরকার অতি সহজেই এই প্রকার কল্পিত আকাঙ্ক্ষার অবসান ঘটাতে সক্ষম হবেন। আরজ ইতি -

১৬

[কোনো পত্রিকা-সম্পাদক-কে]

জনাব,

বাংলা-উর্দু অভিধান প্রসঙ্গে, — পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, 'বাঙলা না সংস্কৃত' — শিরোনামায় যে রিপোর্ট আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা' পড়ে আমরা

www.pathagar.com

পরম পুলকিত হয়েছি। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির অগ্রদূত হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষায় যে 'সংস্কৃতের সংস্কৃতি'র শুভাগমন হচ্ছে এ তারই নির্ভুল পূর্বাভাষ। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই 'আচার্য', 'পুরোহিত', 'পৌরোহিত্য' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ আমাদের বহুল প্রচলিত শব্দগুলোকে স্থানচ্যুত করেছে। অতঃপর আমরা আশা করছি যে, উর্দুভাষীদেরকেও আমরা বাঙলার নামেও সংস্কৃত শিখিয়ে দেব, সে সংস্কৃত আমাদের জবানে থাকুক আর নাই থাকুক। এজন্যে 'অংশভাক', 'অংশকূট', 'অজরামর', 'অজহলিঙ্গ' জাতীয় সম্পূর্ণ অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বাংলার নামে চালিয়ে দিতে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। কেননা 'সংস্কৃতের সংস্কৃতি' রক্ষা করতেই হবে।

এই 'সংস্কৃত-বাঙ্গালা'র প্রসঙ্গে পঞ্চাশ বৎসর আগে একজন বিখ্যাত অভিধান-প্রণেতা লিখেছিলেন, 'বাঙ্গালার এমনও দিন গিয়াছে, যখন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ অমরকোষাদি সংস্কৃত অভিধানের শব্দসমূহ বিভক্তিযুক্ত অথবা বিভক্তিহীন করিয়া বঙ্গীয় পদ্ধতিসিদ্ধ ক্রিয়াযোগে সম্পূর্ণ সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে ঢালা পণ্ডিতী বাংলার সৃষ্টি করিতেছিলেন.....।'

কেন, কি উদ্দেশ্যে ইংরেজ আমলে এই পণ্ডিতী বাংলা চালু করা হয়েছিল সে-কথা সকলেই জানেন। উক্ত অভিধান-প্রণেতা বৌদ্ধ যুগের কথা উল্লেখ করলেও আসলে যে আরবী-ফার্সী মিশেল মুসলমানী বাংলা ও বিরাট মুসলিম ঐতিহ্যবাহী পুঁথিসাহিত্যকে নস্যাৎ করার জন্যেই 'সংস্কৃতের সংস্কৃতি' আমদানী করা হয়েছিল সে কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে তমদ্দুনের দাবীতে পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পরেও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিনিয়ন্তা[২৫] কেন যে আবার সংস্কৃতের ভূত পাকিস্তানে টেনে আনছেন সে-কথা আমাদের পক্ষে বলা কঠিন। তবে এ ব্যাপারে শুধু বাংলা উন্নয়ন বোর্ড একাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার কর্ণধারগণ এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক মহোদয়ও এই কাজে যে-ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন তাতে ক'রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে অচিরে মুসলিম ঐতিহ্যবাহী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উৎখাত এবং 'সংস্কৃতের সংস্কৃতি' বহাল হয়ে যাবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কেননা, উপরোক্ত মহোদয়গণ সংস্কৃতজ্ঞ না হয়েও যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানের 'সংস্কৃত-বাঙ্গালা'র পরিচর্যা করছেন তাতে আরবী-ফারসী মিশেল মুসলমানী বাংলা কয়েক সহস্র পুঁথি-পুস্তকসহ অচিরেই যে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষিপ্ত হবে সে কথা আবার উল্লেখ না করলেও চলে।

www.pathagar.com

১৭

[ইব্রাহীম আকন্দ-কে]

Farrukh Ahmed
Radio Pakistan
Dacca

জনাব
ইব্রাহীম আকন্দ
এ আর ডি
রেডিও পাকিস্তান
চট্টগ্রাম।

জনাব আকন্দ সাহেব

আসসালামু আলায়কুম।

আমাদের পুরাতন বন্ধু জনাব নুরুল আলম রঈসী চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনার কাজ লইয়া যাইতেছেন।[২৬] ইনি একজন আলেম এবং বাংলা ভাষায় পণ্ডিত ব্যক্তি। লেখক এবং বক্তা, ঢাকা বেতার কেন্দ্রেও ইনি শিশু, কিশোর ও বয়স্কদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কথিকা প্রচার করিয়াছেন।

নতুন জায়গায় অপরিচিত পরিবেশে রইসী সাহেব যাহাতে নিজেকে বন্ধুহীন বলিয়া অস্বস্তি অনুভব না করেন, সেই জন্য আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য এই চিঠি দিলাম। আশা করি আল্লার ফজলে ভাল আছেন। আমাদের তামদ্দুনিক আন্দোলনের কাজ নানারকম বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। দোওয়া করিবেন।

২২।৮।৬৭

আরজ গোজার
ফররুখ আহমদ

১৮

[বেগম রওশন ইজদানী-কে]

Farrukh Ahmed
Radio Pakistan
Dacca
93-7/D-S Eskatan Garden
Dacca-2

www.pathagar.com

আস্-সালামু আলায়কুম,

জনাবা,

আপনার পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইয়াছি। আমি আপনাদের সাহায্যের ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর cultural officer ও

ব্যুরোর (B.N.R.) ডিরেক্টর জনাব ডক্টর হাসান জামানের সহিত আলাপ করিয়াছি। আপনি যথাশীঘ্র ব্যুরোর ডিরেক্টর সাহেবের নিকট একখানি দরখাস্ত করুন। উহাতে আপনাদের জন্য আর্থিক সাহায্য ও পুস্তক প্রকাশনা সংক্রান্ত বিষয়াদির উল্লেখ করিবেন। আশা করি আল্লার রহমতে হইয়া যাইবে।

আমার একটি মেয়ে হাসপাতালে আছে, নানারকম মুসীবতে দিন কাটাইতেছি বলিয়া চিঠির উত্তর দিতে কিছু দেরী হইয়া গেল। দোওয়া করিবেন। আরজ ইতি

ফররুখ আহমদ

১৯

[মিন্নাত আলী-কে]

ঢাকা বেতার কেন্দ্র
৭ই জানুয়ারী,৬৯

জনাব মিন্নাত আলী
[অধ্যক্ষ মহিলা কলেজ]
শুভবাড়ি
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
জেলা – কুমিল্লা
পূর্ব পাকিস্তান

আস্ সালামু আলায়কুম,

আপনার চিঠির উত্তর দিতে একটু দেরী হ'য়ে গেল। আশা করি কিছু মনে ক'রবেন না।

"হাতেম তা'য়ী" যে কুমিল্লা বোর্ডের পাঠ্য হ'য়েছে সে সম্পর্কে আমি একটা উড়ো খবর শুনেছিলাম বেশ কিছু দিন আগে। আপনার চিঠি পেয়ে সঠিকভাবে জানতে পারলাম।

জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ বরকতুল্লা, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান প্রমুখ সুধী সমালোচক মাসিক 'পূবালী', সাপ্তাহিক 'পাকিস্তানী খবর', মাসিক 'মাহে-নও' প্রভৃতি

www.pathagar.com

পত্রিকায় "হাতেম তা'য়ী"র সমালোচনা করেন। হাতের কাছে পত্রিকাগুলো না থাকায় আপাতত সন-তারিখ উল্লেখ করতে পারছি না।

আপাতত আপনাকে আর একটি খবর দিচ্ছি। বোধহয় এটি আপনাদের কাজে লাগবে।

অধ্যাপক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় "হাতেম তা'য়ী" সহ আমার প্রকাশিত যাবতীয় কবিতাগ্রন্থের একখানি সমালোচনা পুস্তক প্রকাশ ক'রছেন। নওরোজ কিতাবিস্তান থেকে বইখানি প্রকাশিত হচ্ছে। ছাপার কাজও প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। সম্ভবত বইখানি ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে লাগতে পারে। আপনি যদি 'নওরোজ কিতাবিস্তানে' চিঠি লেখেন তাহ'লে তাঁরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন।

আরজ গোজার

— ফররুখ আহমদ

২০

[অধ্যাপক শাহেদ আলী-কে]

আস্-সালামু আলায়কুম,

আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। আস্কার এসেছিল কিছুকাল আগে, তাঁর খোঁজ পাচ্ছি না। সম্ভব হ'লে আজকালের মধ্যেই আপনি একবার আসুন। অফিস থেকে বরাবর চলে আসবেন।

১১ই জানুয়ারী;

আরজ গোজার

ফররুখ আহমদ

টীকা-ভাষ্য

পত্র ১

মওলানা আবদুল খালেক ছিলেন অসামান্য একজন ইসলামী চিন্তাবিদ। দেশবিভাগের আগে লেডী ব্রাবোর্ন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। দেশভাগের পরে ঢাকায় চ'লে এসেছিলেন, থাকতেন বকশীবাজার এলাকায়। পাকিস্তান আমলে পরিষদ-সদস্য ছিলেন। গ্রন্থ : "সাইয়েদুল মুরসালীন" (দুই খণ্ড), "সিরাজুস সালেকীন" প্রভৃতি। মরণোত্তর ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পুরস্কারে ভূষিত। ফররুখ আহমদের আধ্যাত্মিক গুরু। কবিকন্যা

www.pathagar.com

সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু লিখেছেন, 'আব্বার জীবনে এক অচিন্তনীয় পরিবর্তনের মূলে যে মহান আওলিয়ার দোয়া ছিল, তিনি হচ্ছেন আব্বার পীর মরহুম অধ্যাপক আবদুল খালেক — তৎকালীন যুগে ইংরেজী এবং আরবীতে এম.এ.ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট (গোল্ড মেডালিস্ট)। বহু বিতর্কের মাধ্যমে আব্বাকে পরাস্ত ক'রে সেদিন তিনি আব্বাকে বুঝিয়েছিলেন যে, ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা, যেখানে মানুষের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান রয়েছে।' ('আব্বাকে যেমন দেখেছি', "ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি") জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী জানাচ্ছেন, 'যিনি ফররুখ ভাইয়ের এই কনভার্শনের মুখ্য পুরুষ, সেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটি মওলানা আবদুল খালেক — ঘটনাচক্রে — আমাদের টেইলর হোস্টেলের সুপারিনটেণ্ডেন্ট ছিলেন। তাঁর পরিচয় হিসেবে এটা একেবারেই তুচ্ছ। তিনি অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তখন কোন একটা গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। এবং তাঁকে ভাষার পরিমার্জনায় সাহায্য করছিলেন ফররুখ ভাই। এ উপলক্ষে তাঁকে মাঝে-মধ্যে টেইলর হোস্টেলে আসতে দেখেছি, এবং সবসময় তাঁর মধ্যে একটা অস্থিরতা লক্ষ্য করেছি।' ('ফররুখ ভাইয়ের কথা', "ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি") ফররুখ আহমদের তৃতীয় কবিতাগ্রন্থ "সিরাজাম মুনীরা" (১৯৫২) 'পরম শ্রদ্ধাভাজন/আলহাজ্জ মৌলানা আবদুল খালেক সাহেবের দস্তমুবারকে' উৎসর্গিত।

এই পত্রটি হয়তো পোস্ট করা হয়নি শেষ-পর্যন্ত ; কেননা এটি আমরা উদ্ধার করি ফররুখ আহমদের কাগজপত্রের মধ্য থেকে। ফররুখের সৃজনশীলতা ছিলো এমনই তীব্র ও তৎপর যে, তিনি যত্রতত্র কবিতা লিখতেন। এই পত্রের উল্টোপিঠেও একটি ছোটো সম্পূর্ণ কবিতা পাওয়া গেছে ফররুখের হস্তাক্ষরে :

এ রিক্ত অঞ্জলি যিনি পূর্ণ করি দিলেন তাঁহারে
জানাইনি কৃতজ্ঞতা, ফিরিয়া এসেছি বারেবারে।
শুনিনি তাঁহার মানা, শুনি নাই তাঁহার নির্দেশ
তবুও তো তাঁর দান কোনদিন হয় নাই শেষ।
ধূলিতল হ'তে তবু বারেবারে নিলেন কুড়ায়ে —
দাহনের সব জ্বালা চিরদিন দিলেন জুড়ায়ে —
মৃত্যুমাঝে দিলেন অমৃত। চিরদিন আমি তাঁর
চির আজ্ঞাবহ দাস। ওগো প্রভু, হে প্রভু আমার —
আমাদেরে ক্ষমা কোরো, দয়া কোরো, চিরদিন প্রভু
অশান্তির স্রোতাবর্তে হে মহান শান্তি দিও তবু — ;
তব প্রতি চিরদিন আমাদেরে করিও সতত
বিনীত, কৃতজ্ঞ দাস তব প্রতি একান্ত বিনত।।

www.pathagar.com

১ আই.এ.পরীক্ষা পাশ ক'রে ফররুখ আহমদ প্রথমে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন — পরে কলকাতা সিটি কলেজে চ'লে যান। স্কটিশ চার্চ কলেজে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ফররুখ আহমদের সহপাঠী ছিলেন। সিটি কলেজে বি.এ. পড়েছিলেন ফররুখ - কিন্তু পরীক্ষা দেননি।

২ মওলানা আবদুল খালেকের সংস্পর্শে এসে ফররুখ আধ্যাত্মিকতায় দীক্ষিত হয়েছিলেন — যে-প্রভাব তাঁর ভিতরে শেষ-পর্যন্ত বলবৎ ছিলো । 'সম্ভাবনার ইঙ্গিত' তাঁর পরবর্তী কবিতায় ফলপ্রসূ হয়েছিলো।

৩ হযরত মুহম্মদ (স:), হযরত উমর (রা:) প্রমুখের উপরে কবিতা লেখেন এই পত্ররচনার বছর দুয়েক পরে, 'মাসিক মোহাম্মদী' ও 'সওগাতে'। এই কবিতাগুচ্ছ তাঁর "সিরাজাম মুনীরা" (১৯৫২) গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত হয়। ফররুখের বিশেষ মুগ্ধতা ছিলো হযরত উমরের (রা:) প্রতি — "সিরাজাম মুনীরা"র অন্তর্ভূক্ত। 'উমর দারাজ-দিল' কবিতা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে হযরত উমর (রঃ) কে নিয়ে আরো কয়েকটি কবিতা লেখেন — "কাফেলা" (১৯৮০) ও "হাবেদা মরুর কাহিনী"তে (১৯৮১) আছে ; এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা লেখেন সাপ্তাহিক 'সৈনিক' পত্রিকায় (২৫শে জুলাই ১৯৫৭) — কবিতাটির নাম 'উমর দিবস উপলক্ষে'।

৪ পবিত্র কুরআন শরীফের ভাবানুবাদ তথা কাব্যানুবাদে ফররুখ আহমদ লিপ্ত হয়েছিলেন ১৯৪১ সালে — এই পত্ররচনার সমকালে। 'মাসিক মোহাম্মদী' ও 'সওগাত' পত্রিকায় এই ভাবানুবাদগুচ্ছ বেরিয়েছিলো। জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে মাসিক 'মদীনা' পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে কুরআন শরীফের অনুবাদ করেছিলেন। এসব তর্জমা এখনো সংকলিত হয়নি কোনো গ্রন্থে। কুরআন শরীফের অনুবাদ যখনই করেছেন ফররুখ, কোনো আলেমকে দিয়ে দেখিয়ে নিতেন — ঐ হিশেবেই মওলানা আবদুল খালেককে তরজমাগুলি পাঠিয়েছিলেন।

পত্র ২-৩

ফররুখের স্ত্রী সৈয়দা তৈয়বা খাতুন লিলিকে লেখা এই পত্রদ্বয়। ১৯৪২ সালে খালাতো বোন তৈয়বা খাতুনকে ফররুখ বিবাহ করেন। একটি স্মৃতিচারণায় কবিপত্নী লিখেছেন,'আমাদের যখন বিয়ে হয়, তখন আমার বয়স মাত্র ষোল। আমরা গ্রামেই

www.pathagar.com

থাকতাম। সম্পর্কে কবি ছিলেন আমার খালাতো ভাই। সে কারণেই তাঁকে চিনতাম ছোটবেলা থেকেই। তিনি কবিতা লিখতেন, তাও জানতাম। আমাদের বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে আলোচনা হতো। অবশ্য বিয়ের আগে তাঁর কবিতা পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়নি।' ('সংসারে ফররুখ আহমদ', "ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি") বিয়ে উপলক্ষে ফররুখ একটি কবিতা লেখেন 'উপহার' নামে ('সওগাত', অগ্রহায়ণ ১৩৪৯)। ঐ সময়ে স্ত্রী-র ডাকনাম 'লিলি' নামেও একটি কবিতা লেখেন ('মৃত্তিকা', বসন্ত ১৩৪৯)। এই পত্রদ্বয় ১৯৪৪-৪৫-এর দিকে লেখা।

৫ এটাই ফররুখের প্রথম চাকরি — পুলিশের চাকরি-মাত্র সপ্তা দুয়েক করেছিলেন।

৬ খালুজান হচ্ছেন ফররুখের শ্বশুর সৈয়দ মুহম্মদ নূরুল হুদা, তিনি পুলিশে চাকরি করতেন।

৭ নাহার বানু ফররুখের জ্যেষ্ঠা কন্যা, মরহুমা সৈয়দা শামারুখ বানু (১৯৪৩-৭৩)।

৮ পীরসাহেব : মওলানা আবদুল খালেক।

৯ বকুল : জ্যেষ্ঠা কন্যার ডাকনাম।

পত্র ৪

আশরাফ সিদ্দিকী (জন্ম ১৯২৭) কবি ও লোকসাহিত্য-গবেষক।

ফররুখ আহমদ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-সম্পাদিত 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় ১৯৪৫ সালে যোগ দিয়েছিলেন। সাত-আট মাস চাকরি করেছিলেন সম্ভবত। সম্পাদকের সঙ্গে একটি অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে 'মোহাম্মদী'-র চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

১০ আদমউদ্দীন আহমদের "পুঁথিসাহিত্যের ইতিহাস" খ্যাতিমান বই। বইএর ভূমিকায় ফররুখ আহমদের উল্লেখ আছে। ফররুখ চিরকাল পুঁথিসাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন — পুঁথিপ্রশস্তিমূলক কবিতা লিখেছেন, পুঁথিপুনরুজ্জীবক কবিতা লিখেছেন।

www.pathagar.com

পত্র ৫–৬

আবদুল হক (জন্ম ১৯১৮) : প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক।

১৯৪৬ সালে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকা ছেড়ে দেওয়ার পরে ফররুখ বেকার ছিলেন অনেক দিন। 'দেশের বাড়িতে', যশোরে, চ'লে গিয়েছিলেন। এই সময়ই কলকাতা থেকে 'কাফেলা' পত্রিকা প্রকাশের একটি উদ্যোগ হয়েছিলো – – খুবসম্ভবত শেষ–পর্যন্ত বেরোয়নি। ফররুখের এই দুটি চিঠি থেকে পরিস্কার : তাঁকে এই পত্রিকায় যোগদানের আহ্বান জানানো হয়েছিলো। উৎসাহী ফররুখ এই পত্রিকার জন্যে একটি সম্পাদকীয় লিখে ফেলেছিলেন — কবির মৃত্যুর পরে তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে । 'অপ্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ' নামে কয়েক বছর আগে লেখাটি প্রকাশিতও হয়েছে ('শিল্পতরু', অক্টোবর ১৯৮৮)।

১১ এই বাক্যটি থেকে সন্দেহ হয়, 'কাফেলা' হয়তো দু–একটি সংখ্যা বেরোতেও পারে। অথবা হয়তো কবি তাঁর লেখা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

১২ অনেকেরই একটি ভুল ধারণা আছে এরকম যে, ফররুখ ব্যঙ্গকবিতা লিখতে শুরু করেন দেশবিভাগের পরে। কিন্তু তা সত্য নয়। 'মাসিক মোহাম্মদী'তে তাঁর বেশ–কিছু ব্যঙ্গকবিতা দেশবিভাগের আগেই প্রকাশিত হয়।

পত্র ৭

সালেহা খাতুন ও মেরী খাতুন দুই শ্যালিকা।

পত্র ৮

সুফী জুলফিকার হায়দার (১৮৯৯–১৯৮৭) কবি ও স্মৃতিরচয়িতা। "ভাঙা তলোয়ার" (১৯৪৫) তাঁর খ্যাত কবিতাগ্রন্থ, সবচেয়ে খ্যাত তাঁর স্মৃতিকথা "নজরুল–জীবনের শেষ অধ্যায়" — অনেকগুলি সংস্করণ হয়েছে। নজরুল–সম্পৃক্ত আরো গ্রন্থ আছে তাঁর।

১৩ কথাশিল্পী কাজী আফসারউদ্দিন আহমদের (১৯২১–৭৫) বিবাহপলক্ষে বন্ধুদের রচনা সংবলিত যে–পুস্তিকা বেরিয়েছিলো, ফররুখ তাতে কবিতা লিখেছিলেন। পুস্তিকাটি দুষ্প্রাপ্য, আমরা পাইনি। (স্মরণীয় : কথাশিল্পী আবু রুশদের (জন্ম

www.pathagar.com

১৯১৯) বিবাহপলক্ষেও এরকম একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিলো, তাতে অন্যদের সঙ্গে ফররুখও একটি কবিতা লিখেছিলেন — '৬ই আশ্বিন' নামে এই কবিতাটি "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা"য় অন্তর্ভূত আছে। ফররুখ আহমদ কথাশিল্পী শাহেদ আলীকেও কাজি আফসারউদ্দিন আহমদের বিবাহে একটি কবিতা রচনার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শাহেদ আলী পত্রোত্তরে লেখেন :

Central Muslim Sahitya Sangsad
Dargah Mahalla,Sylhet
18-11-44

মান্যবরেষু,

আপনার কার্ডখানা গতকল্য হাতে পড়লো। পড়ে না-হেসে পারিনি — আমি নাকি আবার কবিতা লিখি। এককালে যে লিখবার চেষ্টা করতাম না — তা নয়। তবে আজকাল সে-বাতিক একদম চলে গেছে। তবু বন্ধুর বিয়ে — নীরব থাকতে পারলাম না। একটা কিছু পাঠাতেই হলো — যেহেতু তাগিদ পাচ্ছি অন্তর থেকে।

কাজি সাহেবের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা লিখে জানাবার নয়। তার কিছুটা ইংগিত হয়তো আপনি পেয়ে থাকবেন। যাঁকে বিয়ে করছেন তিনি আবার আমাদের সিলেটের মেয়ে। তাঁদের মিলন সার্থক হোক, কামনা করি।

যাক্ — কাজি সাহেবের কাছে আজই লিখছি। ঘটনাক্রমে বর্তমান মুসলিম বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবির সংগে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে সুখী হলাম।

ইতি

আপনার শাহেদ আলী

১৮-১১-৪৪এ সিলেট থেকে লেখা কথাশিল্পী শাহেদ আলীর চিঠির উল্টোপিঠে এবং চিঠির পৃষ্ঠাতেই ফররুখ তাঁর স্বভাবসুলভভাবে একটি কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতাটিও খুবসম্ভবত ১৯৪৪ সালে বা তার কাছাকাছি সময়ে প্রণীত। কবিতাটি এই :

স্বপ্নশেষে

নির্মেঘ নীলায় হাসে মেঘমুক্ত আদম-সুরাত
রজনীগন্ধার বনে বাড়ে স্বপ্নভারাতুর রাত

www.pathagar.com

হেমন্ত ধানের ক্ষেতে, জাফরাণের পুষ্পিত পাথারে
সে যেন অনেক আগে নেমেছিল স্বপ্ন চারিধারে
কিন্তু সে স্বপ্নের ঘোর না কাটিতে আসিল সকাল
ক্ষুধিত কদর্য ম্লান চারদিকে ফেলি বেড়াজাল।
নির্মেঘ রজনীগন্ধা মুছে গেল, আদম সুরাত
স্বপ্নিল রাত্রির শেষে দেখিল তমসাচ্ছন্ন রাত
দিনের প্রান্তর ভরি দেখিল মৃত্যুর সমারোহ ;
অনেক রাত্রির স্বপ্ন আর বহু গোধূলির মোহ
নিমেষে ভাঙিয়া গেল, যেমন কঠিন গ্রানাইটে
সমুদ্রের নীল স্রোত চূর্ণ হয়, নীলাভ প্রাবৃটে
হারায় উল্কার শিখা ধাবমান গতির জোয়ারে
তেমনি সকল স্বপ্ন চূর্ণ হ'ল শৃঙ্খলের ভারে
পথের দু'পাশে তারা হ'ল সেই মৃত্যুর স্বাক্ষর।
নর্দমার পাশে তারা গড়িল শবের খেলাঘর
নগ্নতার আবরণে তারা সবে পরিল কাফন
জনাকীর্ণ রাজপথে দেখিল নিঃসঙ্গ ঘন বন
সাথী-হীন, বন্ধুহীন পথে পথে মিলাল সকলে
ধর্ষিতা নারীর লজ্জা মুছে গেল তিক্ত অশ্রুজলে
আকাশে ঢাকিয়া মুখ মানুষের ব্যথা-কৃষ্ণ রাত
নীরব প্রতীক্ষমাণা দেখে গেল মুমূর্ষু প্রভাত।
তারপর রাত্রিশেষে এল সেই প্রভাত যদিও
এল না বলিষ্ঠ স্বপ্ন এল না রাত্রির স্মরণীয়
রজনীগন্ধার ক্ষণ, মৃত্যু-বিষ সংক্রমিত তার
বিষাক্ত কঠিন স্পর্শ নিঃশেষে মুছিচে চারিধার
ফুল, পাখী, নারী আর শিশুর জগৎ
একসাথে পিষে ফেলে চলিল মৃত্যুর কৃষ্ণ রথ।।

পত্র ৯-১০

আবদুর রশীদ খান (জন্ম ১৯২৭) কবি।

www.pathagar.com

১৪ মুফাখ্খার হচ্ছেন কবি মুফাখ্খারুল ইসলাম (জন্ম ১৯২১)। "নয়া জামাত" ফররুখ – প্রণীত পাঠ্যগ্রন্থ — স্কুলপর্যায়ের। "নয়া জামাতে"র চতুর্থ খণ্ড সেপ্টেম্বর ১৯৫০এ প্রকাশিত।

১৫ "নক্ষত্র মানুষ মন" (১৯৫১) আবদুর রশীদ খানের প্রথম কবিতাগ্রন্থ।

১৬ অধ্যাপক আবদুল গফুর সাপ্তাহিক 'সৈনিক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'দ্যুতি'র সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক আসকার ইবনে শাইখ।

১৭ ফররুখ আহমদের "সাত সাগরের মাঝি"র দ্বিতীয় সংস্করণ (সেপ্টেম্বর ১৯৫২) ও "সিরাজাম মুনীরা" (সেপ্টেম্বর ১৯৫২) একসঙ্গে প্রকাশিত হয় ঢাকার তমদ্দুন প্রেস থেকে। ঢাকায় ফররুখের এই প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ।

<u>পত্র ১১</u>

তালিম হোসেন (জন্ম ১৯১৮) কবি, সম্পাদক, সংগঠক। 'মাহে-নও' ও 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা' সম্পাদনা করেন, 'নজরুল একাডেমী'র প্রতিষ্ঠাতা। ফররুখ আহমদ 'আহ্বান' নামে তাঁর একটি কবিতা তালিম হোসেনকে উৎসর্গ করেন ('দৈনিক মিল্লাত', ১৯৫২) এবং তালিম হোসেন 'বাতিঘর' নামে একটি কবিতা ফররুখ আহমদকে উৎসর্গ করেন ('মাহে-নও', ১৯৫৩)।

১৮ রুমী : জালালউদ্দীন রুমী (১২০৭-৭৩)। ইরানের সবচেয়ে বড়ো মরমী কবি। তাঁর "মসনবী" ভুবনবিখ্যাত।

ফররুখ আহমদ রুমীর 'কালামে'র 'স্বচ্ছন্দ অনুবাদ' করেছেন। যেমন :

কাল রাত্রে দীপ হাতে নগরীর সংখ্যাহীন
পথ হতে পথে
ভ্রাম্যমাণ বৃদ্ধ শেখ বলেছেন এই কথা
অস্পষ্ট আলোতে,
'এমন দুর্বলচিত্ত পশু ও মানব নিয়ে
ক্লান্ত আমি – তাই
আল্লার শার্দুল এক পরিপূর্ণ ইনসান
শের-নর চাই।'
যখন বলিল তারা, 'খুঁজেছি অনেক তাকে
ব্যর্থ হ'লো তবু সেই চাওয়া।'
তিনি বলিলেন শুধু, 'তারেই তো চাই আমি
যারে খুঁজে নাহি যায় পাওয়া।'

www.pathagar.com

১৯ ইকবাল : স্যার মুহম্মদ ইকবাল (১৮৭৭–১৯৩৮)। কবি ও দার্শনিক ইকবাল লিখেছেন উর্দু, ফারসি ও ইংরেজিতে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ : "শিকওয়াহ", "জওয়াব-ই-শিকওয়াহ", "আসরার-ই-খুদী" প্রভৃতি। বাংলায় বহু অনূদিত ও আলোচিত।

ইকবাল ছিলেন ফররুখ আহমদের প্রধান প্রেরণা। ফররুখের প্রথম কবিতাগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি" 'বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ তামদ্দুনিক রূপকার, দার্শনিক মহাকবি, আল্লামা ইকবালের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে' উৎসর্গিত। ফররুখ ইকবালের অনেক কবিতার তরজমা করেছেন। ফররুখের মৃত্যুর পরে "ইকবালের নির্বাচিত কবিতা" (১৯৮০) নামে তাঁর কৃত ইকবালের অনূদিত কবিতা একত্রগ্রথিত হয়। ঐ বইয়ের বাইরেও ইকবাল-সম্পৃক্ত তাঁর কবিতা র'য়ে গেছে। যেমন, সাপ্তাহিক 'সৈনিক' পত্রিকার 'ইকবাল-ও-নজরুল-সংখ্যা'য় (২০শে মে ১৯৫১) ইকবালকে নিবেদিত 'ইকবাল স্মরণে' শীর্ষক তাঁর একটি কবিতা :

তোমার স্বপ্ন বহ্নি-শিখায়
ধরা হ'ল উত্তাল।
সারা জাহানের ধ্যানী কবি ইকবাল॥
শত নিশীথের টুটি কালঘুম
জাগে দুনিয়ার কোটি মজলুম
মৃত্যু-নিথর ধমনী আমার
হ'ল যে রক্ত-লাল॥
জাগলো আবার সারা দুনিয়ার
ভুখা গরীবের দল
উৎপীড়িতের পদ-ভারে ধরা
হ'ল আজ চঞ্চল॥
হে কাবার পাখী, তুমি গেছ ডাকি
জাগায়ে মাটিতে কালবৈশাখী
ব্যথিত মনের সাগরে জাগায়ে
তরঙ্গ সুবিশাল॥

www.pathagar.com

২০ রহীমুদ্দীন সিদ্দিকী : সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। দৈনিক 'মিল্লাত' ও অন্যান্য পত্রিকায় কাজ করেছেন।

২১ হাসান জামান : অধ্যাপক, এক-পর্যায়ের বি-এন-আর-এর প্রধান, প্রাবন্ধিক।

পত্র ১২

২২ ফররুখ আহমদের "নয়া জামাত" স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থ। চারটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিলো : প্রথম ভাগ পঞ্চম শ্রেণীর জন্যে, দ্বিতীয় ভাগ ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্যে, তৃতীয় ভাগ সপ্তম শ্রেণীর জন্যে ও চতুর্থ ভাগ অষ্টম শ্রেণীর জন্যে রচিত হয়েছিলো। প্রকাশক ছিলেন ঢাকার মখদুমী এ্যাণ্ড আহসানউল্লা লাইব্রেরী। ফররুখের এই স্কুলপাঠ্য গ্রন্থমালা জনপ্রিয় হয়েছিলো। তদানীন্তন 'ইস্ট বেঙ্গল টেকসট বুক কমিটি' প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভাগ অনুমোদন করেছিলেন। অত্যল্প কালের মধ্যে প্রথম ভাগ তৃতীয়বার মুদ্রণ করতে হয়েছিলো, অন্য তিনটি খণ্ড দ্বিতীয়বার মুদ্রণ করতে হয়েছিলো। কিন্তু প্রকাশক পাওনা ঠিকমতো পরিশোধ না-করায় ফররুখ প্রকাশকের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। "ধোলাই কাব্যে"-র সম্পাদক কবি ফারুক মাহমুদ ও 'মদিনা'-পত্রিকার সম্পাদক মওলানা মহীউদ্দীন খান ফররুখের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলেন। মামলায় ফররুখ জয়ী হয়েছিলেন।

পত্র ১৩

৫০, লালবাগ রোডে স্থাপিত 'তমদ্দুন প্রেস'-এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন তৈয়েবুর রহমান (১৯২৫-৮৬)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাসে এম.এ.পাশ করেছিলেন। 'তমদ্দুন প্রেস'-এর সূচনা কলকাতায়, প্রতিষ্ঠা ঢাকায়। 'তমদ্দুন প্রেস' থেকে ফররুখ আহমদের দুটি গ্রন্থ — "সাত সাগরের মাঝি"র দ্বিতীয় সংস্করণ ও "সিরাজাম মুনীরা"র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আরো বেশ কিছু গ্রন্থ তৈয়েবুর রহমান প্রকাশ করেছিলেন পঞ্চাশের দশকে — তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শাহেদ আলীর "জিবরাইলের ডানা" গল্পগ্রন্থটি। তমদ্দুন প্রেসের মালিকানায় কয়েকটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিলো - সাহিত্যপত্রিকা 'তাহজীব', শিশুকিশোর পত্রিকা 'সবুজ নিশান' এবং সাপ্তাহিক 'খবর'।

পত্র ১৪

আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-৮৮) কথাশিল্পী ও সাংবাদিক। দৈনিক আজাদ, পাকিস্তান অবজার্ভার প্রভৃতি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। বাংলা

www.pathagar.com

একাডেমীর উপ-পরিচালক হিশেবে অবসর গ্রহণ করেন। গল্প-উপন্যাস রচনা ছাড়াও অনুবাদ করেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন। বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক ইত্যাদির প্রাপক। "পদ্মা মেঘনা যমুনা" (১৯৭৪) তাঁর খ্যাততম উপন্যাস।

২৩ মওলানা মুজীবর রহমান ছিলেন অনুবাদক, ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী-র "রোজনামচা" তর্জমা করেছিলেন, বাংলা একাডেমীতে কর্মরত ছিলেন।

২৪ মওলানা মহীউদ্দীন খান ইসলামী চিন্তাবিদ। অনেক গ্রন্থ লিখেছেন ও তর্জমা করেছেন। মহীউদ্দীন খান 'আজ', 'মদীনা' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক — এসব পত্রিকায় নামে-বেনামে ফররুখ আহমদ অজস্র লিখেছেন।

পত্র ১৫

এই পত্রটি খুবসম্ভবত দৈনিক 'আজাদে'র কোনো সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো – – পাওয়া গেছে লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে, সাল জানা নেই। ফররুখ একসময় কয়েকটি স্কুলপাঠ্য-পুস্তক রচনা করেছিলেন। সেই সূত্রেই কিছু অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিলো। স্পষ্টভাষী ফররুখ দ্বিধা করেননি অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ-র (১৮৯৪-১৯৭৯) বিরুদ্ধতা করতে।

পত্র ১৬

এই পত্র কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কিনা, আমরা জানি না। পত্রটি পাওয়া গেছে লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে।

২৫ বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিনিয়ন্তা : খুবসম্ভবত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-৮২)। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও গবেষক। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের শব্দব্যবহার নিয়ে অনেকসময়ই বিতর্ক উঠেছে।

পত্র ১৭

ইব্রাহীম আকন্দ ছিলেন রেডিওর একজন কর্মকর্তা। ফররুখ নিজেও ছিলেন রেডিওর একজন স্টাফ আর্টিস্ট। ইব্রাহিম আকন্দ ছিলেন ফররুখের ব্যক্তিগত বন্ধু।

২৬ নুরুল আলম রইসী : চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনা করেছেন কয়েক বছর। বর্তমানে দুবাই-এ কর্মরত – শিক্ষকতা সূত্রেই। কবি ও প্রাবন্ধিক।

www.pathagar.com

পত্র ১৮

কবি রওশন ইজদানীর (১৯১৭–৬৭) স্ত্রীকে লেখা এই পত্রটি। রওশন ইজদানী বহু গ্রন্থপ্রণেতা। তার মধ্যে সুপরিচিত "চিনুবিবি" (১৯৫১), "খাতামুন নবীঈন" (১৯৫৩), "মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য" (১৯৫৮) প্রভৃতি। কবি হিসেবেই রওশন ইজদানীর প্রধান পরিচয় – যদিও নানারকম লেখা তিনি লিখেছেন। রওশন ইজদানী ১৯৬১ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন।

বেগম রওশন ইজদানীকে লেখা এই পত্রটি 'ষাটের দশকের প্রথম দিকের লেখা' ব'লে অনুমান করেছেন "রওশন ইজদানী"র (১৯৮৯) জীবনীলেখক কবি ইমামুর রশীদ। আমাদের বিবেচনায়, এটি ষাটের দশকের শেষভাগে – রওশন ইজদানীর অকালমৃত্যুর পরে – রচিত ও প্রেরিত।

পত্র ১৯

মিল্লাত আলী, অধ্যক্ষ, রম্যরচয়িতা।

পত্র ২০

শাহেদ আলী (জন্ম ১৯২৫) কথাশিল্পী ও প্রাবন্ধিক।

বাংলাদেশের জন্মের পর এই পত্রটি লেখা – একটি চিরকুটে।

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জি

www.pathagar.com

এক : গ্রন্থপঞ্জি (একক গ্রন্থ)

১. **কবি ফররুখ আহমদ : সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়** । প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৬৯। প্রচ্ছদ : কালাম মাহমুদ। পৃষ্ঠা : ৩০৪।মূল্য: নয়টাকা। প্রকাশক: নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা। সূচিপত্র : ১ আধুনিক বাংলা সাহিত্য : স্বাতন্ত্র্যকামী সাহিত্য-চেতনা ও ফররুখ আহমদ ; ২ ফররুখ-প্রতিভার রূপ ও রঙ ; ৩ ফররুখ আহমদের সাহিত্যকর্ম : বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন (ক) সাত সাগরের মাঝি (খ) সিরাজাম মুনীরা (গ) কাব্যনাট্যের নতুন দিগন্ত : নৌফেল ও হাতেম (ঘ) মুহূর্তের কবিতা (ঙ) হাতেম তা'য়ী (চ) পাখীর বাসা (ছ) হরফের ছড়া ; ৪ ফররুখ আহমদ : কবিভাষা।

২. **কবি ফররুখ আহমদ : ঐতিহ্যের নবরূপায়ণ : গোলাম মঈনুদ্দিন**। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮০। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৫। প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। পৃষ্ঠা : ১০৮। মূল্য : আঠারো টাকা। সূচিপত্র : প্রথম অধ্যায় : ইংরেজ শাসনাধীনে উপমহাদেশে মুসলমানদের অবস্থা : রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ; দ্বিতীয় অধ্যায় : জীবনী ও কাব্য-পরিচিতি।

৩. **ফররুখ আহমদ : আবদুল মান্নান সৈয়দ**। প্রথম প্রকাশ : ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮। প্রচ্ছদ : সমর মজুমদার। পৃষ্ঠা : ১০৮। মূল্য : পনেরো টাকা। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রসঙ্গ-কথা : আবু হেনা মোস্তফা কামাল। সূচিপত্র : ১ জন্ম ও বংশপরিচয় ; ২ শিক্ষাজীবন, সংসারজীবন ; ৩ কর্মজীবন ; ৪ সাহিত্যজীবন ; ৫ শেষজীবন ও মৃত্যু ; ৬ রচনা-পরিচিতি ; ৭ সমকালীন প্রতিক্রিয়া ; ৮ জীবনদর্শন ও সাহিত্যবৈশিষ্ট্য ; ৯ রচনার নিদর্শন।

৪. **ফররুখ প্রতিভা : মুহম্মদ মতিউর রহমান**। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯১। প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম। পৃষ্ঠা : ১৫৪। মূল্য : পঞ্চাশ টাকা। প্রকাশক : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা। সূচিপত্র : ১ প্রকাশকের কথা ; ২ ভূমিকা ; ৩ ফররুখ আহমদের কাব্য-স্বরূপ ; ৪ ব্যক্তিপরিচয় ; ৫ কাব্য-কৃতি ; ৬ হে বন্য স্বপ্নেরা ; ৭ কাফেলা ; ৮ সাত সাগরের মাঝি ; ৯ সিরাজাম মুনীরা ; ১০ ফররুখ-কাব্যে ঐতিহ্যানুসারিতা ; ১১ ফররুখ-কাব্যে রোমান্টিকতা।

৫. **চিরসংগ্রামী কবি ফররুখ : মুহাম্মদ জাফরউল্লাহ**। মূল্য : কুড়ি টাকা। প্রকাশক : নাবীলা প্রকাশনী, চট্টগ্রাম।

www.pathagar.com

৬. **ছোটদের ফররুখ আহমদ : অনীক মাহমুদ**। প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

৭. **ছোটদের ফররুখ আহমদ : আলী ইমাম**। প্রকাশক : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

(সম্পাদিত গ্রন্থ)

৮. **ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি : শাহাবুদ্দীন আহমদ-সম্পাদিত**। প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৮৪। প্রচ্ছদ : হাশেম খান। পৃষ্ঠা : ৬৭২। মূল্য : একশো টাকা। প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। সূচিপত্র : ১ ব্যক্তি (৪৪টি প্রবন্ধ) ; ২ কবি (২৯টি প্রবন্ধ) ; ৩ অমর কবি (৪টি প্রবন্ধ) ; ৪ জীবনীপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি ; ৫ লেখক ও লেখা পরিচিতি ; ৬ এ্যালবাম।

(অনূদিত গ্রন্থ)

৯. **Four Poets From Bangladesh : Translated by Abu Rushd.** 1984. Bangla Academy, Dhaka. Content : 1 Ghousul Ajam; 2 Tiredness; 3 Night At Kanchrapara; 4 A Winter morning at Sylhet Railway Station; 5 From Naufel and Hatem (1-2); 6 Extract from Hatem Tai; 7 The last Night at sea.

১০. **SIRAJAM MUNIRA : translated by Syed Sajjad Hussain.**

দুই : পত্রিকাপঞ্জি

১. **'সওগাত'**। ফররুখ-সংখ্যা। সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। প্রকাশ : আশ্বিন-কার্তিক ১৩৮১। ৫৬ : ১১-১২। সূচিপত্র :

   ১. কবি ফররুখ আহমদ : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন

   ২. ['সওগাতে' প্রকাশিত ফররুখ আহমদের ৬০টি কবিতা ধারাবাহিকভাবে পুনর্মুদ্রিত]

   ৩. পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য : ফররুখ আহমদ

   ৪. ফররুখ আহমদের কবিতা : বৈশিষ্ট্য ও পটভূমি : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ

   ৫. ফররুখ আহমদ প্রসঙ্গে : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

www.pathagar.com

২. **'মিছিল'। ফররুখ-সংখ্যা।** সম্পাদক : মোহাম্মদ ইদরিস আলী। প্রকাশ : নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৪। ১ : ৭। যশোর। প্রাসঙ্গিক সূচিপত্র :

১. 'মিছিল'-এর কথা (সম্পাদকীয়)

২ 'লাশ' (কবিতা) : ফররুখ আহমদ

৩. বড় অসময়ে চলে গেলে (নিবেদিত কবিতা) : মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী

৪. কবি ফররুখ আহমদ : শাহাদাত আলী আনসারী

৫. অভিমানী কবি ফররুখ আহমদ : আনোয়ারুল ইসলাম

৩. **'সূর্য সারথি'।** ফররুখ-সংখ্যা। সম্পাদক : মারুফী খান রকসী। প্রকাশ : ১০ জুন ১৯৭৫। ঢাকা। সূচিপত্র :

১. সম্পাদকীয়

২ লাশ (কবিতা) : ফররুখ আহমদ

৩. তুমি এসো ফিরে (কবিতা) : ওয়াহিদুজ্জামান (কবিপুত্র)

৪. কবি ফররুখ আহমদ (স্মৃতি) : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন

৫. একজন কবি : তার মৃত্যু (কবিতা) : শামসুর রাহমান

৬. সময়ের দক্ষিণা (কবিতা) : মারুফী খান রকসী

৭. ফররুখ আহমদ, তাঁর কবিতা (প্রবন্ধ) : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ

৮. কবি ফররুখ এবং আমরা (কবিতা) : মো. আলমাসুর রহমান বাদশাহ

৯. দুর্ভিক্ষ — ১৯৭৪ (কবিতা) : ফজল মাহমুদ

১০. কবিপ্রতিভা (প্রবন্ধ) : মুহম্মদ মতিউর রহমান

১১. তবু, তুমি জাগলে না? (কবিতা) : বদরুল হাসান

১২. মৃত্যুহীন হাত (কবিতা) : সিদ্দিকুর রহমান

১৩. ফররুখের কবরে কালো শেয়াল (কবিতা) : আল মাহমুদ

১৪. আউলাদ (কবিতা) : ফররুখ আহমদ

www.pathagar.com

৪. **'পাঞ্জেরী'**। সম্পাদক : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। প্রকাশ : ১৯ অক্টোবর ১৯৭৬। প্রকাশক : ফররুখ আহমদ কেন্দ্রীয় স্মৃতি সংসদ। প্রচ্ছদ : কালাম মাহমুদ। সূচিপত্র :

১. ভূমিকা : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

২. [ফররুখ আহমদের পরিকল্পিত "হে বন্য স্বপ্নেরা" কবিতাগ্রন্থের ৪৯টি কবিতা পুনর্মুদ্রিত]

৩. ফররুখ আহমদের কবিতা : সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

৫. **'বিবর্তন'**। ফররুখ-স্মরণসংখ্যা। সম্পাদক : বদরুল ইসলাম মুনীর। প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮৫। প্রকাশক : বিবর্তন সংঘ, ঢাকা। সূচিপত্র :

১. সম্পাদকীয়

২. অপরাজিত ফররুখ : আবু জাফর শামসুদ্দীন

৩. ফররুখ-কাব্যে রূপক-প্রতীক : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ

৪. চল্লিশ দশকের সেরা কবি ফররুখ : আবদুল মান্নান সৈয়দ

৫. আমাদের ফররুখ ভাই : সরদার জয়েনউদ্দীন

৬. ফররুখ-কাব্য : রাজনৈতিক মূল্যায়ন : সাঈদ-উর-রহমান

৭. ফররুখ আহমদের পাখীর বাসা : আতোয়ার রহমান

৮. নাট্যকার ও গীতিকার ফররুখ আহমদ : ড. এস. এম. লুৎফর রহমান

৯. ফররুখ আহমদ, স্বপ্নের কবি : নুরউল করিম খসরু

১০. কবি ফররুখকে যেমন দেখেছি : জুলফিকার আহমদ কিসমতী

১১. মুহূর্তের স্মৃতি : এম. এ. হোসেন পাটোয়ারী

১২. ফররুখ-কাব্যের নায়ক ও ভিলেন চরিত্র : বুলবুল সরওয়ার

১৩. সাক্ষাৎকার : ড. আশরাফ সিদ্দিকী/আল মাহমুদ/আফজাল চৌধুরী

১৪. ফররুখ আহমদ : তাঁর কবিতা [বিভিন্ন লেখকের মন্তব্য]

১৫. জীবনচিত্র [ফররুখ আহমদের]

www.pathagar.com

৬. 'বিবর্তন'। ফররুখ স্মরণ-সংখ্যা। সম্পাদক : মোহাম্মদ বদরুল ইসলাম মুনীর। প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮৬। প্রকাশক : বিবর্তন সংঘ, ঢাকা। সূচিপত্র :

১. সম্পাদকীয়

২ ফররুখ আহমদ : কবি ও আদর্শ : তালিম হোসেন

৩. আমার ফররুখ ভাই : কামরুল হাসান

৪. আমার বন্ধু ফররুখ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

৫. ফররুখ আহমদ : কবি : আবদুল মান্নান সৈয়দ

৬. "পাখীর বাসা"র কবি : আলী ইমাম

৭. ফররুখ আহমদ : এক বিরল কবি-ব্যক্তিত্ব : মুন্সী আবদুল মান্নান

৮. বাংলাদেশী জাতির সিন্দাবাদ কবি : খন্দকার আবদুল হামিদ

৯. রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী : আলী রিয়াজ

১০. জীবন-চিত্র [ফররুখ আহমদ]

১১. সাক্ষাৎকার : আশরাফ সিদ্দিকী/সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী/আজাদ রহমান

৭. 'অগ্রপথিক'। ফররুখ স্মরণ-সংখ্যা। সম্পাদক : অধ্যাপক আবদুল গফুর। ১৬ অক্টোবর ১৯৮৬। ১ : ২১। প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। প্রাসঙ্গিক সূচিপত্র :

১. সম্পাদকের কথা

২ ফররুখ-কাব্যে আঙ্গিক-বৈচিত্র্য : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ

৩. ফররুখ আহমদ : স্বকালের পটভূমিকায় : আবদুল মান্নান সৈয়দ

৪. নিবেদিত কবিতা : নূরুল আলম রইসী, শাহাদাত বুলবুল, মাহবুব বারী, ফজল মাহমুদ, ইকবাল আজিজ, রেজাউদ্দিন স্ট্যালিন, হাসান আলীম, নূরুল মোস্তফা রইসী

৫. আমার বন্ধু ফররুখ আহমদ : লুতফুর রহমান জুলফিকার

৬. অন্তরঙ্গ আলোকে ফররুখ : তৈয়েবুর রহমান

৭. ফররুখ আহমদ : একজন সুফী : অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম

www.pathagar.com

৮. ফররুখ সম্বন্ধে বেনজীরের শেষ কথা : আবদুল হাই শিকদার

৯. ফররুখ কাব্যে ঐতিহ্যানুসারিতা : মুহম্মদ মতিউর রহমান

১০. অভিন্ন কবি–ব্যক্তিত্ব ফররুখ আহমদ : এস. এম. শাহজাহান তালুকদার

১১. সাকী–নামা (গীতিবিচিত্রা) : ফররুখ আহমদ

১২ ফররুখ আহমদের জীবন ও গ্রন্থপঞ্জি

১৩. যাঁর লেখা পড়ে চমকে উঠেছিলাম : ইবনে ইমাম

৮. **'ফররুখ আহমদ'**। প্রকাশ : ১৫ এপ্রিল ১৯৮৭। প্রকাশক : সেবা, পুরানা পল্টন, ঢাকা। সূচিপত্র :

১. ফররুখ আহমদের কাব্য–নাটিকা ও সনেট–কাব্য : আবদুল কাদির

২ কবি ফররুখ আহমদ : মুজীবুর রহমান খাঁ

৩. ফররুখ আহমদের কবিতা : আবু জাফর শামসুদ্দীন

৪. কবি ফররুখ আহমদ : সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়

৫. ফররুখ আহমদের প্রভাব : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ

৬. মানবতার কবি ফররুখ : শাহাবুদ্দীন আহমদ

৭. ফররুখের স্বোপার্জিত মুদ্রা "হাবেদা মরুর কাহিনী" : আফজাল চৌধুরী

৮. ফররুখ আহমদের কবিতায় কিংবদন্তী : "হাতেম তা'য়ী" প্রসঙ্গ : সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

৯. ফররুখ আহমদের কবিতায় বাকপ্রতিমা : বিপ্রদাস বড়ুয়া

১০. আমার বন্ধু ফররুখ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১১. ফররুখ আহমদ : ব্যক্তিমানুষ : আশরাফ ফারুকী

১২ আমার ফররুখ ভাই : ফারুক মাহমুদ

১৩. কবি ফররুখ আহমদকে সাহায্য করুন : নাছিম

১৪. ফররুখ আহমদ : কবি : মহাদেব সাহা

১৫. রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী : আলী রিয়াজ

১৬. ফররুখ আহমদ : কবির প্রতিকৃতি : আতা সরকার

১৭. কোলাহলের বাইরে দাঁড়াতে বলি : আবদুল হাই শিকদার

www.pathagar.com

১৮. সংবর্ধনা

১৯. শেষ অভিবাদন

২০. সাক্ষাৎকার (ফররুখ আহমদের সঙ্গে)

২১. উজীরজাদার প্রতি হাতেম তায়ী : ফররুখ আহমদ

২২. ব্যঙ্গকবিতা : ফররুখ আহমদ

২৩. আনারকলি (গীতিনাট্য) : ফররুখ আহমদ

২৪. নিবেদিত কবিতা : আবুল হাশেম, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, মুফাখ্খারুল ইসলাম, আবদুল হাই মাশরেকী, আবদুর রশীদ খান, শামসুর রাহমান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আবদুস সাত্তার, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আতাউর রহমান, আল মাহমুদ, হেমায়েত হোসেন, দিলওয়ার, আফজাল চৌধুরী, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সিকদার আমিনুল হক, নুরুল আলম রইসী, মুহম্মদ নুরুল হুদা, আল মুজাহিদী, শাহাদাত বুলবুল, কাজী সালাহউদ্দীন, ফজল মাহমুদ, মাহবুব বারী, নিজামউদ্দীন সালেহ, ইকবাল আজিজ, রেজাউদ্দীন স্ট্যালিন, মুকুল চৌধুরী

২৫. জীবনপঞ্জী

২৬. গ্রন্থপঞ্জী

৯. 'শিল্পতরু'। সম্পাদক : আবিদ আজাদ। প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮৮। ১ : ৮। প্রাসঙ্গিক সূচিপত্র :

১. সম্পাদকীয়

২ অপ্রকাশিত ফররুখ : আহমদ আখতার

৩. অপ্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ (দূর বন্দরের স্বপ্নে, বিনোদপুর স্টিমার স্টেশনে, মধুমতী, তিক্ত তীব্র বেদনায়, লোকসাহিত্যের নায়িকা : ২, ময়নামতীর মাঠে : ২ক, ময়নামতীর মাঠে : ২খ, [শিরোনামহীন], কাব্যগীতি (লুৎফর রহমান), ১৯৭৪ (একটি আলেখ্য) : ফররুখ আহমদ

৪. অপ্রকাশিত 'সম্পাদকীয়' নিবন্ধ : ফররুখ আহমদ

৫. গ্রন্থকারের নিজস্ব ভূমিকা : ফররুখ আহমদ

www.pathagar.com

১০. 'উষালোকে'। ফররুখ-সংখ্যা। সম্পাদক : মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ। প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮৯। ৭ : ১-৪। প্রকাশক : নির্ঝর সাহিত্যগোষ্ঠী, ঢাকা। সূচিপত্র :

১. সম্পাদকীয়
২. ফররুখ আহমদের জীবনপঞ্জি
৩. মুক্তি (কবিতা) : ফররুখ আহমদ
৪. সিন্ধু-তরঙ্গ (গীতিকা) : ফররুখ আহমদ
৫. ফররুখ আহমদ (নিবেদিত কবিতা) : আবুল হোসেন
৬. ফররুখ আহমদ ও আমি : তালিম হোসেন
৭. ফররুখ আহমদ : নব মূল্যায়ন : আবু রুশদ
৮. আমার বন্ধু ফররুখ আহমদ : লুৎফর রহমান জুলফিকার
৯. একজন শনাক্তকারী কবি : মুহম্মদ নূরুল হুদা
১০. ফররুখ আহমদের কবিতার ভাষা : সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
১১. ফররুখ-কাব্য : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ : মহীবুল আজিজ
১২. ফররুখ আহমদ : উত্তরপ্রজ চেতনাসূত্রে : মুজতাহিদ ফারুকী
১৩. একটি কাব্যনাট্য : দুই লেখন : আবদুল মান্নান সৈয়দ
১৪. ফররুখ আহমদের কবিতা (সাক্ষাৎকার) : হাসান হাফিজুর রহমান
১৫. শেষ লেখা : সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
১৬. অগ্রন্থিত কবিতা : ফররুখ আহমদ
১৭. প্রচ্ছন্ন নায়িকা (গল্প) : ফররুখ আহমদ
১৮. প্রসঙ্গত ('এলান' নবেম্বর ১৯৭০ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রণ)
১৯. একটি চিঠি : ফররুখ আহমদ
২০. কাল-সমকাল (গদ্য) : ফররুখ আহমদ
২১. ইব্রাহিম আকন্দ-কে লেখা চিঠি : ফররুখ আহমদ
২২. ফররুখ আহমদকে লেখা চিঠি : শাহাবুদ্দীন আহমদ
২৩. ফররুখ-প্রাসঙ্গিক চিঠি : আবদুল কাদির
২৪. আশাবাদের রূপকার : আবদুল কাদির

www.pathagar.com

২৫. ফররুখ আহমদ : সুশীলকুমার গুপ্ত

২৬. 'ঝড়ের ইশারা ওরা জানে' (স্বরলিপি) : কথা : ফররুখ আহমদ, সুর : আবদুল আহাদ, স্বরলিপি : লায়লা আর্জুমন্দ বানু

২৭. শিশুর বন্ধু : হরফের ছড়া : সরদার ফজলুল করিম

২৮. বুদ্ধিদীপ্ত একটি জীবনীগ্রন্থ : কায়সুল হক।

তিন : নির্বাচিত প্রবন্ধপঞ্জি

১. আধুনিক কবিতা ও মুসলিম কবিগণ : আবু রুশদ। 'সওগাত', ভাদ্র ১৩৪৮।

২. "সাত সাগরের মাঝি" (গ্রন্থালোচনা) : বসুধা চক্রবর্তী। 'সওগাত', বৈশাখ ১৩৫২।

৩. নবীন কবি ফররুখ আহমদ : আবদুল কাদির। 'সওগাত', বৈশাখ ১৩৫৪।

৪. বাংলা কাব্যে কবি ফররুখ আহমদ : দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। 'দ্যুতি', ২ : ১, ১৯৫২।

৫. একজন আধুনিক কবি প্রসঙ্গে : শামসুর রাহমান। দৈনিক 'মিল্লাত', ১৯৫৩।

৬. ফররুখ আহমদের "নৌফেল ও হাতেম" : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। 'পূবালী', ১৯৬৩।

৭. Farrukh Ahmed : The representative Poet of East Pakistan : Mohammad Ajraf. 'Pakistan Review', Karachi, 1963.

৮. "হাতেম তা'য়ী" : ঐতিহ্যের নবরূপায়ণ : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। 'মাহে-নও', ১৯৬৬।

৯. নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা : মুজীবর রহমান খাঁ। 'পাকিস্তানী খবর', ১৯৬৭।

১০. ফররুখের কাব্যনাটক "নৌফেল ও হাতেম" : আবদুল হাফিজ। 'পূর্বমেঘ', রাজশাহী।

১১. "পাখীর বাসা" (গ্রন্থালোচনা) : আনিসুজ্জামান। 'এলান'। বেতারে পঠিত।

১২. "পাখীর বাসা" (গ্রন্থালোচনা) : অধ্যাপক আবদুল গফুর। দৈনিক 'আজাদ'।

১৩. "পাখীর বাসা" (গ্রন্থালোচনা) : হাবীবুর রহমান। 'পূবালী'।

১৪. পূর্ব পাকিস্তানের কাব্যসাহিত্য : কবিমানস ও ভূমিকা বিচার (দ্বিতীয় পর্যায়) : হাসান হাফিজুর রহমান। "আধুনিক কবি ও কবিতা" (১৯৬৫, বাংলা একাডেমী), পৃষ্ঠা ১৯৪-২০৯।

www.pathagar.com

১৫. কবি ফররুখ আহমদের কি অপরাধ? : আহমদ ছফা। দৈনিক 'গণকণ্ঠ', ১ আষাঢ়, ১৩৮০।

১৬. কবি ফররুখ আহমদ : শাহাবুদ্দীন আহমদ। 'বেতার বাংলা', নবেম্বর ১৯৭৪।

১৭ ফররুখ আহমদের কবিতা : সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। 'পাঞ্জেরী', অক্টোবর ১৯৭৬।

১৮. কবি ফররুখ আহমদ : আবুল কালাম শামসুদ্দীন। 'সওগাত', আশ্বিন-কার্তিক ১৩৮২।

১৯. ফররুখ আহমদের কবিতায় নাট্যগুণ : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। দৈনিক 'ইত্তেফাক', অক্টোবর ১৯৭৮।

২০. ফররুখ আহমদ (স্মৃতিকথা) : আবু হেনা মোস্তফা কামাল। "আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্মারকগ্রন্থ" : আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত। সেপ্টেম্বর ১৯৯১। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২১. "হে বন্য স্বপ্নেরা" (গ্রন্থালোচনা) : কবীর চৌধুরী। 'বেতার বাংলা'।

২২. "হে বন্য স্বপ্নেরা" (গ্রন্থালোচনা) : সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। সাপ্তাহিক 'সচিত্র স্বদেশ'।

২৩. ফররুখ আহমদ : জাতীয় চৈতন্যে তাঁর প্রভাব : সানাউল্লাহ নূরী। দৈনিক 'দেশ', ১৯শে অক্টোবর ১৯৭৯।

২৪. ফররুখ আহমদ : সংগ্রামী সত্তা : মনসুর মুসা। 'বেতার বাংলা'।

২৫. আমার বন্ধু ফররুখ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সাপ্তাহিক 'প্রতিক্ষণ'।

২৬. মানুষের কবি ফররুখ : চৌধুরী আমিন আহমদ। 'ঐতিহ্য', মে ১৯৮৫।

২৭. ফররুখ আহমদ : তালিম হোসেন। 'কিছুধ্বনি'।

২৮. "ফররুখ-রচনাবলী" (প্রথম খন্ড) (গ্রন্থালোচনা) : তালিম হোসেন। 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা'।

২৯. ফররুখ আহমদ (স্মৃতিকথা) : বেগম সুফিয়া কামাল। 'ঐতিহ্য', অক্টোবর-নবেম্বর ১৯৮৬।

৩০. ফররুখ আহমদের কবিতা : আবদুল মান্নান সৈয়দ। 'ঐতিহ্য', ভাদ্র ১৩৯৫।

৩১. আমাদের নবজাগরণ ও ফররুখ আহমদ : আবদুল মান্নান সৈয়দ। 'কলম', ডিসেম্বর ১৯৮৮।

৩২. ফররুখ আহমদের কবিতা : গাউসুর রহমান। 'ঐতিহ্য', আশ্বিন-কার্তিক ১৩৯৬।

৩৩. একজন শনাক্তকারী কবি : মুহম্মদ নূরুল হুদা। 'উষালোকে', ফররুখ-সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৯।

www.pathagar.com

৩৪. অন্তরঙ্গ আলোকে ফররুখ আহমদ : মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম। 'অগ্রপথিক', ফররুখ জন্মবার্ষিকী সংখ্যা, ৮ জুন ১৯৮৯।

৩৫. ফররুখ আহমদ : তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও কাব্যসত্তা : দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। ঐ।

৩৬. ফররুখ আহমদ : স্মৃতি থেকে : মোহাম্মদ আলমগীর। দৈনিক 'সংগ্রাম', ১৯শে অক্টোবর ১৯৯০।

৩৭. Farrukh Ahmed : Zillur Rahman Siddiqui. 'Bangla Academy Journal', July-December 1984.

৩৮. স্মৃতিকথা : ফজল শাহাবুদ্দীন। 'অগ্রপথিক'।

৩৯. ফররুখ আহমদ ও আমি : তালিম হোসেন। দৈনিক 'ইনকিলাব'।

৪০. ফররুখ আহমদের কবিতায় বাংলাদেশের নিসর্গ : অধ্যাপক আবদুল গফুর। 'পূর্বাচল'।

৪১. কবি ফররুখ : জীবনে ও শিল্পে : কাজী আযিযউদ্দীন আহমদ। 'নোঙর', নভেম্বর ১৯৯১। চট্টগ্রাম।

৪২. ফররুখ আহমদ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া : আবদুল মান্নান সৈয়দ। 'কিছুধ্বনি', ১৯৮৮।

৪৩. অগ্রন্থিত ফররুখ আহমদ : শান্তনু কায়সার। 'দৈনিক বাংলা', ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৩।

৪৪. Farrukh Ahmed : Abul Fajal. 'Bangladesh Times', ১৯ অক্টোবর ১৯৭৫।

৪৫. Farrukh Ahmed : A Bird's eye view on his work and Poet : Syed A. Masud. Observer Saturday Supplement, 'The Bangladesh Observer', 15 October 1983.

৪৬. Farrukh Rachanabali (vol I) (Book-Review) : S. N. Q. Zulfiqar Ali. 'The Bangladesh Observer', 25 May 1980.

৪৭. "হাতেম তায়ী" (গ্রন্থালোচনা) : আবদুস সাত্তার। 'সওগাত', শ্রাবণ ১৩৭৩।

৪৮. ফররুখ আহমদ : রূপকল্প ও ছন্দ : আবদুল মান্নান সৈয়দ। 'নোঙর', জুন ১৯৯৩।

www.pathagar.com

নির্দেশিকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৬৫, ৬৯, ১৮৬, ১৯৩, ১৯৮

অজিত গুহ ৫৭

অজিত দত্ত ১২, ৬৯, ১১৬, ১৮১, ১৮২, ১৯৮, ২৪৯

অতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৪৯

অন্নদাশংকর রায় ১৯৩, ২৬৭

অঞ্জলি বসু ৯২

অমিয় চক্রবর্তী ৫১, ৫২, ৫৬, ৬২, ৬৯, ৭৮, ৮২, ৮৪, ৮৫, ১৯৯, ২৬৬

অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তী (ঢা. বি.) ৫৭

অরবিন্দ গুহ ৭৫

অরুণকুমার সরকার ৫২, ৫৫, ৭৫, ৯৪, ১৮৬, ১৯৯

অরুণ ভট্টাচার্য ৫৩

অরুণ মিত্র ৫২, ৭৮, ৮৪

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩০৪

অবন্তী স্যানাল ৭৮, ৮৪

অশোকবিজয় রাহা ৫২

আখতার-উল-আলম ২২৩

আজহার ইসলাম ১৪০

আজহারুল ইসলাম ১৮২

আজিজুর রহমান ১৮২

আজীজুল হাকিম ২৩৭

আদমউদ্দীন আহমদ ১১৯, ১২১, ১২৩, ১৪০, ৩৪০

আ ন ম বজলুর রশীদ ৫৩, ১৮২

আতাউর রহমান ২০২

আনোয়ার পাশা ২৯৮, ৩০১

(ডক্টর) আনিসুজ্জামান ৩০৪

আতোয়ার রহমান ৩০৪

আফসারী খানম ১৯, ২৫

আবদুল কাদির ১৫, ৪৬, ৬০, ১৩৬, ১৬৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৮, ১৮১, ১৮২, ১৯৬, ২০৪, ২০৮, ২০৯, ২৩৪, ২৩৫, ২৪৫, ২৬৮, ২৭১, ২৭৫, ২৯৩, ২৯৮, ৩০৪

আবদুল আহাদ ১০, ১৯, ২৫, ২১০, ২৩৫, ২৩৭, ২৩৮, ২৬০, ২৬২

(মওলানা) আবদুল খালেক ১৩, ১৭৪, ৩২৩, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪০

আবদুল গনি হাজারী ৫৭, ৬০, ৮৭, ৯৩, ২০২, ২৫৪, ২৯৬

(অধ্যাপক) আবদুল গফুর ৩৪৪

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ৩০২

আবদুল মান্নান তালিব ২৫৭

আবদুল মান্নান সৈয়দ ৬০, ৬৭, ৬৮, ৭৭, ৯৩, ১৮২, ১৯৪, ২২১, ২২২,২৩৩,২৩৬, ২৫৭, ৩২০, ৩২১

আবদুল লতিফ ১৯, ২৫, ২৩৬–২৩৮

আবদুল হক ১৬, ১৭৬, ১৭৮, ৩২৫, ৩২৬, ৩৪১

(অধ্যাপক) আবদুল হাফিজ ৯৬, ২৯৩

(মওলানা) আবদুল হামিদ খান ভাসানী ৪৬

www.pathagar.com

আবদুল হালিম চৌধুরী ১৯, ২৩৬, ২৩৭, ২৫৯

আবদুর রশীদ ২৩৭

আবদুর রশীদ খান ২২, ১২১,২৩৪, ২৭৩, ২৯১, ৩২৮, ৩৩০, ৩৪৩, ৩৪৪

আবদুস সাত্তার ২৮৯, ২৯৯

আবদুর রউফ ২১৬

আবেদ হোসেন খান ১৯, ২৩৬, ২৫৯

আবিদ আজাদ ২৫৭

আবু রুশদ ১১, ১৪, ১৫, ৬০, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ১১৬, ১১৭, ১৭৩, ১৮১, ১৮২, ১৮৫–১৮৭, ১৯৫, ২০৭, ২৩৫, ২৩৭, ২৬৪, ২৬৫, ২৭৮, ৩০২, ৩৪১

আবু সাঈদ চৌধুরী ১৪, ২৪৬

আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৩৯, ২৭৫

আবু জাফর শামসুদ্দীন ১৮৫, ২৩৪, ২৫৪, ৩৩১, ৩৪৬

আবুল কালাম শামসুদ্দীন ২৮, ২৯, ১১৯, ১৩৬, ১৩৯, ১৬৪, ২৭২, ২৯৮

আবুল কাসেম ২১৯

আবুল ফজল ৪, ৪৬, ৪৭, ২০৭, ২২১

আবুল হাশেম ৪, ১২, ৬৮, ২০৭

আবুল হোসেন ৯, ১৫, ২০, ২৫, ৪৬, ৫২, ৭৫, ১৮২, ১৮৬, ১৯৯–২০২, ২০৭, ২১০, ২৬৪, ২৭১, ২৭৮

আবুল মনসুর আহমদ ১১৯

আলিমুজ্জামান (সাচ্চা) ১৯

আলোক সরকার ৯৪, ৯৫, ৯৭, ১০১, ১০২

(ডক্টর) আলীম-আল-রাজী ৪৬

আলাউদ্দিন আল আজাদ ২৭৮, ২৭৯

আশরাফ-উজ-জামান খান ৯

আশরাফ সিদ্দিকী ১৫, ২২, ৪৬, ১২০, ২০২, ৩২৫, ৩৪০

আসাফউদ্দৌলাহ রেজা ৪৬

আমীর খসরু ১১৮

আসকার ইবনে শাইখ ২৩৬, ২৭৮, ২৮০, ২৮৯, ৩৪৪

আরিস্টটল ১৯১, ১৯৫

আহমদ আখতার ৭, ২৬১

আহমদ শরীফ ২৭১, ২৭২

আহমদ ছফা ১০, ৪৬, ২১১

আহসান হাবীব ১৫, ২০, ২৫, ৫২, ৬০, ৭৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৯–২০৩, ২০৭, ২১০, ২৩৫, ২৬৪, ২৭১

(বেগম) ইউসুফ জামাল ২৩৬, ২৭৫, ২৭৬

ইব্রাহীম আকন্দ ৩৩৫, ৩৪৭

(অধ্যক্ষ) ইবরাহিম খাঁ ১৫, ৪৬, ১২০, ৩৪৭

ইমাউল হক ৫৩, ১১৭

ইমামুর রশীদ ৩৪৮

ইসমাইল হোসেন সিরাজী ১৯৬

(ডবলু. বি.) ইয়েটস ১০১, ২০২

উত্তম দাশ ১০১

(টি. এস.) এলিয়ট ১০১, ১১৭, ২০২, ২৯৪, ১২৯৬

এ. মুকতাদির ২১৯

এ. এইচ. এম. আবদুল কাদের ২৫৯

এ. এইচ. এস. ফররুখ ইসলাম খান ২৫০

এস. এম. বাজলুল হক ২১৫

ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী ৩৪৭

www.pathagar.com

কমলকুমার মজুমদার ১৬৪
কবীর চৌধুরী ২৩৪, ২৭৮, ২৯০, ৩০৩
কৃষ্ণ ধর ৫২, ৯৪, ২৯৭
কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী ৯৭, ১০২
কাজী আবুল হোসেন ১২২
কাজি আফসারউদ্দিন আহমদ ১৫, ১৮৫, ২১৫,২৪৩, ৩৪১, ৩৪২
কাজী ইমদাদুল হক ১৮২
কাজী আবদুল ওদুদ ২০৮, ২৬৭, ২৭২, ৩০২
কাজী নজমুল হক ২৩৭
(ডক্টর) কাজী দীন মুহম্মদ ১২২
কাজী মোতাহার হোসেন ২১৬, ২৪৫
কাজী সিরাজ ৩০৪
কাদের জামেরী ১৯, ২৩৭
কাদের নওয়াজ ১৯৬
কামরুল হাসান ৫৭, ২১৪, ২২০
কামালউদ্দিন খান ১৮২
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৫২, ৫৫, ৭৮, ৮৪
কাইয়ুম চৌধুরী ২১৬, ২২১
কায়কোবাদ ১৫, ১২০, ১২২, ১৮২, ২৭২
কায়সুল হক ২৩৪
কিরণশংকর সেনগুপ্ত ৫২, ৭৮, ৮৪
কীটস ১১, ২৯৩
কে. এম. শমশের আলী ১৮২
খান সারওয়ার মুরশিদ ২৭৮
খায়রুল কবির ২৫২
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৯৪
গিরিশংকর ৯৪
গ্যেটে ৪৩
গোপাল হালদার ৯৩
গোবিন্দ চক্রবর্তী ৫৩
গোলাম কুদ্দুস ১৩, ১৫, ৫২, ৭৮, ৮৪, ১৮২, ১৮৬, ২০০, ২৬৪, ২৭১
গোলাম মোস্তফা ৪, ১২৬, ১৫১, ১৯৬, ২০৭

চিন্মোহন সেহানবীশ ৩১৩, ৩২১
চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৫০
চিত্ত ঘোষ ৫২
চিত্তপ্রসাদ ৮৩
(দেশবন্ধু) চিত্তরঞ্জন দাশ ২৭৮

জগদীশ গুপ্ত ১৮৮
জগন্নাথ চক্রবর্তী ৭৫, ৯৪
জনাথন সুইফট ৩০৪
জহুর হোসেন চৌধুরী ১১৯
জয়নুল আবেদিন ৮৩, ৮৯, ২১৩
জয়নুল আবেদীন এম. এ. ২৬৬
জসীমউদ্‌দীন ৪৬, ৭০, ১১৫, ১৯৬, ২৭৪
জাকিউদ্দীন আহমদ ২৫৪
জালালউদ্দীন রুমী ৩৪৪
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ৩, ১৬, ২৪, ৯৩, ১৮৭, ২২১, ২২২, ২৪৬, ২৭৮, ২৮০, ৩২১, ৩৩৮
জীবনানন্দ দাশ ৫১, ৫৪, ৫৬, ৬২, ৬৫, ৬৯, ৭১, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৯৪, ৯৫, ১০১, ১১২, ১১৪-১১৭, ১২৭, ১৪০, ১৬৪, ১৮১, ১৮৪, ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২০৪, ৩২১
জে. এম. সিনজ ২৮৯

www.pathagar.com

জেড. এ. বোখারী ১০

জেব-উন-নেসা আহমদ ২৫৩

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ৫৭, ২৭৮, ২৯০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৮৬, ১৮৮

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ৭৮, ৮৪, ১৫০

তরুণ সান্যাল ৯৪

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩

তালিম হোসেন ২৪, ৫২, ৫৭, ৬১, ১২২, ১৪৪, ১৫০, ১৮২, ১৯৯, ২০১, ২০২, ২৭৩, ২৭৭, ২৯১, ২৯৭, ৩২৯, ৩৪৪

তৈয়েবুর রহমান ৩০, ১২১, ১৩৯, ২১৪, ২১৫, ৩৩১, ৩৪৬

দাউদ হায়দার ২৩৫

দিনেশ দাস ৫২, ৭৫, ৭৮, ৮৪, ১০৩, ১৬৬, ২০০

দিলীপ রায় ৫৩, ৯৪, ১০১

দীপক রায় ২৩৫

দেওয়ান মোহম্মদ আজরফ ২৭৩, ২৯৪

দেওয়ান শামসুল হক ২৩৭

দেবেন্দ্রনাথ সেন ১৮২

ধনঞ্জয় দাশ ১৩, ৫৬

ধীর আলী মিঞা ১৯, ২৩৭, ২৩৮

নওয়াজেশ আহমদ ২২১

(কাজী) নজরুল ইসলাম ১১, ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৬, ৬০, ৬৯, ৭২-৭৫, ৭৭, ৭৯, ৮৫, ১০১, ১০৮, ১১১-১১৭, ১২০, ১২৬, ১২৭, ১৪০, ১৫০, ১৫১, ১৬১, ১৬৪, ১৮৬, ১৯৩, ১৯৬, ১৯৭, ২০২, ২০৪, ২৪৯, ২৬৫, ২৬৯, ২৭১, ২৭২, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৮, ২৯৪

নজির আহমদ ৯

ননী ভৌমিক ১৩

নরেশ গুহ ৫২, ৫৫, ৭৫, ১৮৬, ১৯৯

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৮৬

নবেন্দু রায় ৭৮, ৮৪

নাজিরুল ইসলাম ১৮৫

নাজমুল আলম ৯

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩, ১৮৬

ন্যাশ ৩০৪

নিকোস কাজানজাকিস ১৩৭

নীরু শামসুননাহার ১৯

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৫২, ৫৫, ৭৫, ৯৪, ১৯৯

নীলিমা ইব্রাহিম ৪৬

নুরুল আলম রইসী ৩৪৭

নুরুল ইসলাম আলপনা ২১৬

নুরুল মোমেন ২৭৮, ২৮০

(বেগম) নুরুন নাহার ২৫৯, ২৭৫

পরিমল রায় ২৬৮

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ১০২

প্রবোধকুমার সান্যাল ১৯৩

প্রমোদ মুখোপাধ্যায় ৫২

প্রমথনাথ বিশী ৪, ২০৭

প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৪, ৪৫, ৫৪, ৬০, ৬৫, ৬৯, ৭১, ৭৪, ৭৭, ৭৮, ৮৪, ১০১, ১১২, ১১৫-১১৭, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৮, ২০৪

প্রাণকৃষ্ণ পাল ৮৩

www.pathagar.com

পূর্ণেন্দু পত্রী ৯৭, ১০২

ফজলুল হক ১৯৫

ফজল শাহাবুদ্দীন ২২১, ২৩৭

ফজলে নিজামী ২৫

ফতেহ লোহানী ৪, ২০৮

ফরিদা ইয়াসমিন ২৫

ফারুক মাহমুদ ২০, ২১০, ২৩৫, ২৩৮, ২৫৩, ৩১৫, ৩২১, ৩৪৬

ফৌজিয়া খান ১৯

বন্দে আলী মিয়া ১৮২, ১৯৬

বদরুল হাসান ২৫, ২১০

বসুধা চক্রবর্তী ২৬৬, ২৭১

বার্নার্ড শ ২৮৯

বিমলচন্দ্র ঘোষ ৫২, ৫৫, ৭৮, ৮৪

বিশ্বনাথ দে ২৩৮

বিলকিস নাসিরুদ্দীন ২৫

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ৫২, ১৯৯

বিষ্ণু দে ৪, ৫১, ৫২, ৫৪, ৬৯, ৭১–৭৪, ৭৭, ৭৮, ৮২, ৮৪, ৮৫, ১১২, ১১৬, ১৫০, ১৭৯, ১৮২, ১৯৬, ২০২, ২০৪, ২০৭, ২৯৪

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫২, ৫৫, ৬২, ৭৫, ১০৩, ১৮৬

বেগম সুফিয়া কামাল ৪৬, ১৯৬

বেগম রওশন ইজদানী ৩৩৫, ৩৪৮

বেনজীর আহমদ ৭, ১৮২, ১৯৬, ২১৩

বেদারউদ্দীন আহমদ ১৯, ২৩৭, ২৩৮

বুদ্ধদেব বসু ১২, ১৩, ১৪, ৪৩, ৪৫, ৫১, ৫২, ৬২, ৬৫, ৬৯, ৭১, ৭৮, ৭৯, ৮৪, ৮৫, ৯৫, ১০৩, ১০৪, ১০৮, ১১২, ১১৭, ১৪১, ১৪৩, ১৪৯, ১৮৬, ১৯৩, ১৯৮, ২০৭, ২৪৯

বুলবন ওসমান ৩০৪

ভারতচন্দ্র রায় ৭৪, ১৫১

ভূঁইয়া ইকবাল ১৯৪

মঈনুদ্দীন ১৯৬

মতিউল ইসলাম ২০, ৫৩, ১৮২

মনীশ ঘটক ১৫০

মরিস ২৯৪

মফিজ চৌধুরী ১৪

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ৭৫, ৮৫, ৮৭, ৯৩, ৯৪, ১০৩, ২০০

মহীউদ্দীন ১৯৬, ২৬৯

মহফিল হক ২৩৬

মণীন্দ্র রায় ৫২, ৫৫, ৭৮, ৮৪

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ২২, ৪৪, ৫৪, ৭২, ৭৩, ৭৭, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১০০, ১০৭, ১০৮, ১১৫, ১১৭, ১২১, ১২৮, ১৩৬, ১৩৯, ১৫০, ১৫১, ১৮২, ২০২–২০৪, ২৮৯

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩, ৭৯, ১৮৪, ১৮৮, ১৯৫

মাহবুবা রহমান ১৯

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ১৮২

মাসুদ আলী ২২২

মাসুদ আলী খান ২৫৯

মাহবুব জামাল জাহেদী ৫৭

মিন্নাত আলী ৩৩৬, ৩৪৮

মীর মশাররফ হোসেন ২৭২

www.pathagar.com

মেরী খাতুন ৩২৭, ৩৪১
(মওলানা) মোহাম্মদ আকরম খাঁ ২৮, ২৯, ১৮৪, ২০৭, ২৪৬ ২৫১, ২৫৮, ৩৪০
মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ ২৮, ২৯
(ওস্তাদ) মোহাম্মদ হোসেন খসরু ১৯, ২৩৬, ২৫৯
মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন ১৮৩, ২০৭, ২৪০
মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ২৫৬
মোহাম্মদ মামুন ২৩৪
মোহাম্মদ দানেশ ২৯৫
(ডক্টর) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ২৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৬৪, ২১০, ২৯৮, ২৯৯, ৩০১
মোহাম্মদ মতিউর রহমান ৩০৪
মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ ৬৭, ২৫৭
মোহাম্মদ মোদাব্বের ১১৯
মোহাম্মদ আবদুল বারী ১২৪, ১৪০
মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ ১৩৬, ১৪০, ১৬৪, ২৯৮
মোহাম্মদ নাসির আলী ২১৬, ২৩৪, ২৯৫
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ২৫৯
মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লাহ ১৮৫, ২৬৪
মোহাম্মদ হুরমতউল্লা ৪
মোশাররফ হোসেন ফরিদ ১৯, ২৩৬
(ব্যারিস্টার) মোস্তফা কামাল ৪৬
মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর) ১২৩
মোয়াহেদ বখত চৌধুরী ১৮২
মোহিতলাল মজুমদার ৫৪, ৭৪, ৭৭, ১০৫, ১০৮, ১১৫, ১১৬, ১২৬, ১৪০, ১৫১, ১৭৯, ১৯৩, ১৯৬, ২০৪,
মুহম্মদ আবদুল হাই ২৫, ৫৭, ২১০, ৩০৩
(স্যার) মুহম্মদ ইকবাল ৭৭, ১০৮, ১৭৪, ১৯৭, ১৯৯, ২০৭, ২৬১, ২৬৭, ২৭২, ২৭৫, ৩৪৫
(ডক্টর) মুহম্মদ এনামুল হক ২৭৭, ২৯৮, ৩০৪, ৩৪৭
মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ২২১
(মওলানা) মুজিবুর রহমান ৩৪৭
মুনশী রইসউদ্দীন ১৯, ২৩৬, ২৬১.
মুফাখখারুল ইসলাম ২২, ৩০, ৫২, ১৫০, ১৯৯, ২৭৭, ২৯১, ৩৪৪
মুজীবুর রহমান খাঁ ১১৯, ২৬৫, ২৯৩
মুনীর চৌধুরী ২৫, ৫৭, ১২২, ২০৯, ২১০, ২৩৮, ২৭৮, ২৮০
মুস্তাফা নুরউল ইসলাম ১৩৯, ২৪৮
মুস্তাফিজুর রহমান ২৫০

রওশন আরা বেগম ২৫৯
রওশন আখতার ৩, ২০৭
রওশন ইজদানী ৩৪৮
রণেশ মৈত্র ৩০৩
(ডক্টর) রফিকুল ইসলাম ১৮, ২৯৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫১, ৫৬, ৭১, ৭৪, ৭৯, ৯৭, ১০৭, ১১১, ১১৬, ১৫০, ১৫১, ২০২, ২০৮
রহিমুদ্দীন সিদ্দিকী ৩৪৬
রশীদ করীম ১৮৫, ২৮০
রশীদ-আল-ফারুকী ১৬৪, ২৯৮, ৩০০, ৩০১
রাজনারায়ণ বসু ২৮৯
রাম বসু ৫২, ৭৫, ৯৪, ১৬৬
(স্যার) রিচার্ড বার্টন ৭৮
রিয়াজউদ্দীন চৌধুরী ১৮২

www.pathagar.com

রেজাউল করীম ১৫, ১৭৫, ২০৮, ২৬৮, ২৭৮

লায়লা আরজুমান্দ বানু ১৯, ২৩৮, ২৬০, ২৬২

লীলা রায় ২৬৭

লুই আরাগঁ ৭১

লুৎফুর রহমান জুলফিকার ১২০, ১৩৯, ২৪৯

শওকত ওসমান ১১৬, ১৮৫, ১৮৬, ১৯৫, ২৬৪

শবনম মুশতারী ২৫, ২১০

(বেগম) শামসুন নাহার মাহমুদ ১৮৪, ২৪৩

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫২

শামসুর রাহমান ৯, ২৫, ২১০, ২৭৩–২৭৫

শামসুদ্দীন আবুল কালাম ১৮৫, ১৮৬, ২৭৮

শামসুননাহার করিম ১৯

শামসুল হুদা চৌধুরী ২৫, ৪৬, ২১০

শাহাদাৎ হোসেন ৯, ৭৭, ১০৫, ১০৮, ১২৬, ১৪০, ১৫১, ১৮২, ২০৪, ২৭৩

শাহাবুদ্দীন আহমদ ১০১, ১৮৩

শাহেদ আলী ১৪, ১৩৯, ১৮৫, ১৯৩, ৩৩৭, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৪৮

শার্ল বোদলেয়ার ১৩৮, ১৪২–১৪৪, ১৪৭

(পি. বি.) শেলী ১১

শেখ ফয়জুল্লাহ ২৬৮

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৮৬

সত্যজিৎ রায় ৪

সরলানন্দ সেন ১০

সমর দাস ১৯

সমর সেন ৫২, ৫৫, ৬২, ৭৫, ৭৮, ৮৪, ১০৩, ১৮৬, ১৯৯

সঞ্জয় ভট্টাচার্য ১০১

সরদার জয়েনউদ্দীন ৫৭, ১৮৫

সরদার ফজলুল করিম ৩০৪

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১২৬, ১৫১, ২৭৮

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ২৫০

সমরেশ বসু ১৮৬

স্বর্ণকুমারী দেবী ১২৩, ১৪০

সালেহা খাতুন ৩২৭, ৩৪১

সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু ৮, ৫৬, ৩৩৮

স্যামুয়েল ডানিয়েল ২৮০

সানাউল হক ৫২, ৭৫, ১৯৯, ২০২

সালমা চৌধুরী ২৫, ২১০

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ ১৪০

সিকান্দার আবু জাফর ৯, ৫২, ৫৫, ১৮২, ১৯৯, ২০২, ২৪৩

সিদ্ধেশ্বর সেন ৫২, ৫৫

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ২৫, ২১০, ২৭৮, ২৯২

সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৩, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৭৮, ৭৯, ৮২–৮৭, ৯০, ৯৩, ১১১, ১৫০, ১৯৯, ২০০, ২০২, ৩১৩, ৩৩৪

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৩, ৪৫, ৫১, ৫২, ৬২, ৬৯, ৭১, ৭৩–৭৫, ৭৭, ৮২, ১০৮, ১১৫, ১৪৯, ১৫১, ১৬৪, ১৬৫, ১৯৩, ১৯৯, ২০৪

সুধী প্রধান ১৫০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৯৭, ১০২, ১৫০, ২৩৫

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৬, ১৪১, ২১১, ২৯৮, ২৯৯, ৩০২

সুইন বার্ন ২৯৪

সুকুমার রায় ৩০৪

সুকুমার সেন ১২৪, ১৪০

www.pathagar.com

সুবোধ ঘোষ ১৫২

সুফী মোতাহার হোসেন ১৮২

সুকুমার ঘোষ ১৯৪

সুবিনয় মুস্তাফী ১৯৪

সুফী জুলফিকার হায়দার ৩২৭, ৩৪১

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৪, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৬০, ৬২, ৭০, ৭৫, ৭৮, ৭৯, ৮৪, ৮৫, ৯৩, ১৮৬, ১৯৮–২০০, ২০৮, ২৯৪, ৩৩৯

সৈয়দ আব্বাস আলী ৩

সৈয়দ আবদুল মান্নান ২৩৪, ২৭৭

সৈয়দ আলী আশরাফ ৫২, ১৫০, ২৪৫

সৈয়দ আলী আহসান ৯, ২০, ২২, ২৫, ৫২, ৬০, ৭৫, ১০৮, ১৫০, ১৬২, ১৬৪, ১৮২, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৫, ১৯৯, ২০২, ২০৩, ২১০, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৭, ২৫৯, ২৬৮, ২৭১, ২৭২, ২৭৭, ২৯৮, ৩০১–৩০৩

সৈয়দ এমদাদ আলী ২৬৫

সৈয়দ কাসেম আলী ৩

সৈয়দ হাতেম আলী ৩, ২০৭, ২০৮

সৈয়দ মুশীর আহমদ ৩

সৈয়দ সিদ্দিক আহমদ ৩, ৪, ২১১

সৈয়দা শরফুল আরা মোকাদ্দেসা খাতুন ৩

সৈয়দা তৈয়বা খাতুন (লিলি) ৪, ৬, ৭, ২০৮, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৯

সৈয়দ মোহাম্মদ নূরুল হুদা ৪, ৩৪০

সৈয়দ হামজা ১৩৫

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৮৫,১৮৬

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ২৭৮

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ ১১৮

হরপ্রসাদ মিত্র ৫৩

হাবীবুর রহমান ৫৭, ১৮২, ৩০৪

হাবীবুল্লাহ্ বাহার ১১৯, ১৮৪, ২০৭, ২৪৩, ২৬৭

হানস এ্যান্ডারসন ৩০৪

(ডক্টর) হাসান জামান ২৭৮, ৩৪৬

হাসান হাফিজুর রহমান ২৯৬

হুমায়ুন কবির ১৫, ৪৩, ৪৫, ১৮২

হুসনা বানু খানম ২৫৯

হেমায়েত হোসেন ৯

হোমার ১২৮, ১৩১

www.pathagar.com